সুনির্বাচিত

কিশোর উপন্যাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা - ৯

ভূপাল রহস্য

১

কাকাবাবু দারুণ চটে গেলেন নিপুদার ওপর।

নিপুদা মানুষটি খুব আমুদে ধরনের, সবসময় বেশ একটা হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে ভালবাসেন, আর কথাও বলেন জোরে জোরে।

নিপুদা আমার জামাইবাবুর ছোট ভাই। গত বছর আমার ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেল। ছোড়দি আর জামাইবাবুরা এখন থাকে মধ্যপ্রদেশের ভূপাল শহরে। নিপুদাও ভূপালেই পড়াশুনা করেছে, চাকরিও করে সেখানে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স।

অফিসের কাজে নিপুদাকে প্রায়ই আসতে হয় কলকাতায়। এসেই চার-পাঁচ দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছটা বাংলা সিনেমা থিয়েটার দেখে ফেলে। আমাদের খাওয়াতে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রিটের ভালভাল হোটেলে। নিপুদা এলে আমাদের সময়টা বেশ ভালই কাটে।

কিন্তু নিপুদার কথা শুনে যে কাকাবাবু প্রথমেই এতটা চটে যাবেন, তা আমিও বুঝতে পারিনি।

কাকাবাবু নিজের ঘরে বসে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে কিছু একটা পুরনো দলিল পরীক্ষা করছিলেন। আর অন্যমনস্কভাবে পাকাচ্ছিলেন বাঁদিকের গোঁফ। নিপুদা সে-ঘরে ঢুকেই কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল। কাকাবাবু, তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আরে, আরে ও কি , না, না, দরকার নেই।'

কাকাবাবু পছন্দ করেন না কেউ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করুক। কাকবাবুর একটা পা অকেজো বলেই বোধ হয় তাঁর বেশি সঙ্কোচ। নিপুদা তবু জোর করে প্রণাম সেরে নিয়ে বসল। তারপর বলল, 'কাকাবাবু, কেমন আছেন? ওঃ, নেপালে তো আপনারা একটা সাংঘাতিক কান্ড করে এলেন, পুরো একটা গুপ্তচর-চক্রকেই ধরে ফেললেন। ভূপালের কাগজেও খবরটা খুব বড় করে বেরিয়েছিল। আমরা অবশ্য ওখানে বোম্বের খবরের কাগজও পাই ... প্রথমে ওরা খবর দিয়েছিল, আপনি বুঝি সেই অ্যাবোমিনেব্‌ল স্নোম্যান, ইয়েতি যাকে বলে... তাই আবিষ্কার করে ফেলেছেন! আচ্ছা কাকাবাবু, ইয়েতি বলে সত্যিই কি কিছু আছে?

কাকাবাবু মুখখানা একটু হাসি হাসি করে বললেন, 'কি জানি!'

নিপুদা আবার বলল, 'আর ওই যে লোকটা, কেইন শিপ্‌টন, ও কি পালিয়েই গেল? ওকে আর ধরা গেল না?'

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'না!'

আমি বুঝতে পারলুম কাকাবাবু নিজের কোনও একটা চিন্তা নিয়ে মগ্ন আছেন, কথা বলার মুডে নেই।

নিপুদা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কাকাবাবু, আপনি কখনও ভূপাল গেছেন? একবার চলুননা, দারুণ জায়গা, আপনার খুব ভাল লাগবে!'

কাকাবাবু বললেন, 'ভূপাল আমি গেছি। দুবার বোধহয়। না, তিনবার।'

নিপুদা তবু খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আর একবার চলুন। এবারেই আমার সঙ্গে চলুন, একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে!'

'এখন তো আমার যাওয়া হবে না। অন্য কাজে ব্যস্ত আছি।'

'জানেন, ভূপালে গত এক মাসের মধ্যে তিনটে সাংঘাতিক খুন হয়েছে। পুলিশ কিচ্ছু করতে পারছে না।'

এবার কাকাবাবু মুখ তুলে সোজা তাকালেন নিপুদার দিকে।

নিপুদা বলল,'ওখানকার পুলিশগুলো কোনও কম্মের না! আপনি গেলে ঠিক খুনিকে খুঁজে বার করতে পারবেন। ওখানকার একজন পুলিশ অফিসারকে আমি বলেছি, তুমি মিঃ রায়চৌধুরীর নাম শুনেছ, তাঁকে ডেকে তাঁর বুদ্ধি নাও.... ।'

কাকবাবুর চোখ দুটি স্থির, মুখখানা লাল হয়ে গেছে। তখনই আমি বুঝতে পেরেছি যে কাকাবাবু বিরক্ত হয়েছেন। তাঁর অত রাগের কারণটা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম পরে। কাকাবাবু সাধারণ ডিটেকটিভ নন, খুনের তদন্ত করাও তাঁর পেশা নয়। কোনও বড় শিল্পীকে যদি সিনেমার পোস্টার আঁকতে বলা হয়, তা হলে তিনিও কাকাবাবুর মতনই চটে যাবেন নিশ্চয়ই।

রেগে গেলে কাকাবাবু বকাবকি, চ্যাঁচামেচি কিছুই করেন না, শুধু মুখখানা কি রকম চৌকো মতন হয়ে যায়।

কাকাবাবু চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর নিপুদার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, 'তোমাদের সব খবর টবর ভাল তো? রুমি ভাল আছে নিশ্চয়ই?'

নিপুদা তাও মহা উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল, প্রথম খুনটার ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় খুন... ডেডবডিটা পাওয়া গেল আরেরা কলোনিতে একটা পার্কের মধ্যে ...'

কাকাবাবু আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিপু, তুমি এখন ভেতরে যাও, অন্যদের সঙ্গে কথা-টথা বল —'

কাকাবাবু রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে পেছনের একটা দেওয়াল আলমারি খুলে বই ঘাঁটতে লাগলেন খুব মনোযোগ দিয়ে।

নিপুদা বলল, 'তারপর শুনুন, কাকাবাবু, থার্ড খুনটা...'

আমি এবার চুপিচুপি নিপুদাকে বললুম, 'চল নিপুদা, আমরা ভেতরে যাই।'

নিপুদা কী রকম যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, কী ব্যাপার, উনি আমার কথা শুনলেনই না!'

'কাকাবাবু নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছেন অন্য কিছু নিয়ে।'

'কিন্তু পরপর তিনটে নৃ-নৃ-নৃ, মানে ওই যে কী বলে লোমহর্ষ খুন ... হ্যাঁগো, সন্তু, এই লোমহর্ষ কথাটার মানে কি গো? হর্ষ মানে তো আনন্দ!'

আমি বললুম, 'লোমহর্ষ না, রোমহর্ষ। যা শুনলে ভয়ে সারা গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে।'

নিপুদা বলল, 'হ্যাঁ, সেইরকম ঘটনাই বটে। কাকাবাবু যদি কেসটা হাতে নেন, আমাদের মধ্যপ্রদেশে ওঁর খুব নাম হয়ে যাবে।'

'আমি কাকাবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট। আগে তো আমায় বলতে হবে কেসটা। আমি যদি মনে করি নেওয়া যেতে পারে, তা হলে কাকাবাবুকে রাজি করাব।'

কিন্তু কাকাবাবুর সহকারী হিসেবে নিপুদা আমায় বিশষ পাত্তা দিল না। ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি বুঝবে! এমন নৃ-নৃপুংসক ব্যাপার!'

'নৃপুংসক? ওঃ হো, নৃশংস! আমি কত সাংঘাতিক নৃশংস ব্যাপার দেখেছি, তুমি ধারণাই করতে পারবে না! জান, আন্দামানে কি হয়েছিল!'

নিপুদা বলল, "চল, তা হলে আজ সন্ধেবেলা 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমাটা দেখে আসি।"

'তা তো যাব। খুন তিনটের কথা বলবে না?'

নিপুদা আমাদের বাড়ির গেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও কে! তোমরা বাড়িতে নেপালি দারোয়ান রাখলে কবে?'

আমি বললুম, 'নেপালি দারোয়ান না তো! ও তো মিংমা, আমাদের বন্ধু। ওর জন্য কাকাবাবু আর আমি প্রাণে বেঁচে গেছি। ও ক'দিন আগে নেপাল থেকে বেড়াতে এসেছে আমাদের এখানে।'

'তাই বল। কি সুন্দর চেহারা ছেলেটির। খুব স্মার্ট, নয়?'

'মিংমা দু'বার এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিল।'

'ও, শেরপা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, একজন শেরপার নামও কাগজে বেরিয়েছিল বটে। এই-ই সেই? এ তো তাহলে খুব বিখ্যাত!'

মিংমা গেটের কাছে আমার কুকুরটাকে নিয়ে খেলছিল। এই প্রথমবার কলকাতায় এসেছে মিংমা। কলকাতার রাস্তায় ও একা-একা বেরুতে ভয় পায়। তাই আমাদের সঙ্গে ছাড়া বাড়ির বাইরে বিশেষ কোথাও যায় না। আমার কুকুরটার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেছে। বেশ বাংলা শিখে গেছে এর মধ্যে। শিস্ দিয়ে ডাকছে, 'র-কু-কু! ইধার এস! দৌড়কে এস।'

মিংমাকে ডেকে আমি আলাপ করিয়ে দিলুম নিপুদার সঙ্গে।

নিপুদা ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তুম তো নেপালকা আদমি হ্যায়, ভূপাল কভি দেখা? ভূপাল নেপালসে ভি আচ্ছা!'

মিংমা ভূপাল জায়গাটার নামই শোনেনি। সে অবাক হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে।

নিপুদা মিংমার বুকে টোকা মেরে বলল,' তুম নেপালি, হাম ভূপালি! তুম্ ভি হামলোগকা সাথ সিনেমা চল।'

সন্ধেবেলা সিনেমা দেখার পরই অবশ্য আমাদের বাড়ি ফিরে আসতে হল, বাইরের হোটেলে আর খাওয়া হল না। কারণ মা আজকে তিন রকম মাছ রান্না করেছেন মিংমার জন্য। মিংমা মাছ খেতে খুব ভালবাসে। বিশেষত ইলিশ আর চিংড়ি।

খাবার টেবিলে নানারকম গল্পগুজব হচ্ছে, হঠাৎ নিপুদা দুম্ করে কাকাবাবুকে বলল, 'কাকাবাবু, আপনি ভূপালে গেলে খুব ভাল হত। আমি ধীরেনদাকে প্রায় কথাই দিয়ে ফেলেছি যে, আপনাকে এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

কাকাবাবু খাওয়া বন্ধ করে অকারণেই একবার বাঁ হাত দিয়ে গোঁফটা মুছে গম্ভীর গলায় বললেন, 'নিপু, আমি জানি না ধীরেনদাটি কে। আর আমাকে জিজ্ঞেস না করে আমার সম্পর্কে কারুকে কথা দেওয়ার অভ্যেসটিও মোটেই ভাল নয়।'

এমন কী, মা পর্যন্ত বুঝতে পেরে গেলেন যে, কাকাবাবু খুবই রেগে গেছেন নিপুদার ওই রকম কথা শুনে। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, 'নিপু, তুমি আর একটা ইলিশ মাছ নাও। একটা পেটি নাও; তোমাদের ওখানে তো ইলিশ পাওয়া যায় না! তোমরা চিংড়ি মাছ পাও?'

নিপুদা মায়ের কথা গ্রাহ্য না করে আবার বলল, 'বুঝলেন না, তিন-তিনটে খুন. তিনজনই শিক্ষিত লোক, তাদের একেবারে গলা কেটে ফেলেছে। একটা ডেড বডি তো আমি নিজেই দেখেছি. ওঃ কী রক্ত!'

কাকাবাবু বললেন, 'খাওয়ার সময় ওসব রক্তারক্তির কথা বলতে নেই. তাতে হজমের গণ্ডগোল হয়: মন দিয়ে খেয়ে নাও। বরং বৌদি খুব সুন্দর রান্না করেছেন।'

কাকাবাবু নিজে আর বিশেষ কিছু খেলেন না। প্রায় তক্ষুনি উঠে পড়লেন। আমি শুনতে পেলাম কাকাবাবু ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন। অর্থাৎ এর পরেও যেন নিপুদা গিয়ে ওঁকে বিরক্ত করতে না পারে।

অবশ্য নিপুদার মুখে খুনের কথা শুনে আর সবাই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল।

বাবা বললেন, 'তোমাদের ওখানেও খুন-জখম শুরু হয়ে গেছে নাকি?'

মা বললেন, 'কোথাও আজকাল আর একটুও শান্তি নেই। খালি খুন আর খুন। তুমি নিজের চোখে দেখলে নিপু? কি রকম দেখলে, গলা কাটা?'

নিপুদা বলল, 'খুন তো সব জায়গাতেই হয়, কিন্তু এই খুনগুলো একদম অন্যরকম। তিনজনেই নিরীহ ভদ্রলোক, ,লেখাপড়ার চর্চা নিয়ে থাকতেন। একজন তো আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। ভদ্রলোকের নাম অর্জুন শ্রীবাস্তব, আমি কতদিন দেখেছি

মাঝরাতের পরেও ওঁর ছাদের ঘরে আলো জ্বলছে। সারারাতও নাকি জেগে কাটাতেন মাঝে মাঝে। যেদিন ঘটনাটা ঘটল সেদিনও রাত দুটোর সময় নাকি পাড়ার একটি ছেলে ওঁর ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছিল, আর ভোর বেলা দেখা গেল পার্কে একটা বেঞ্চের ওপর পড়ে আছে ওঁর দেহটা, আর মুন্ডুটা গড়াচ্ছে ঘাসের ওপর।'

মা বললেন, 'উফ! মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়!'

নিপুদা বলল,'শ্রীবাস্তবজী অতি শান্তশিষ্ট মানুষ, পাড়ার কারুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাবও ছিল না, ঝগড়াও ছিল না, নিজের মনে থাকতেন। এরকম লোককে কে যে মারবে।'

আমি বললুম, 'নিপুদা তুমি বার বার শুধু দ্বিতীয় খুনটার কথা বলছ কেন। প্রথম খুনটা কিভাবে হয়েছিল?'

'।দ্বিতীয় খুনটার পরই প্রথম খুনটার কথা ভালভাবে জানা গেল। খবরের কাগজে লিখল যে, অর্জুন শ্রীবাস্তবের মতনই ভূপাল মিউজিয়ামের কিউরেটর সুন্দরলাল বাজপেয়িকেও কেউ ওই রকমভাবে গলা কেটে খুন করেছে মাস খানেক আগে। তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছিল একটা কবরখানায়। সুন্দরলাল বাজপেয়ি অনেকদিন বিলেতে ছিলেন, খুব সাহেব ধরনের মানুষ, তাঁর চেহারাও ছিল বিশাল, ওই রকম একজন তাগড়া লোকের গলা কেটে খুন করাও তো সহজ কথা নয়।

'আর তৃতীয়টা?'

'তৃতীয় ঘটনাটা একটু অন্যরকম। সেটা তো ঘটল আমি আসবার মাত্র চারদিন আগে। এঁর নাম মনোমোহন ঝা। বেশ বয়স্ক লোক, চাকরি থেকে কিছুদিন আগে রিটায়ার করেছিলেন। ইনি থাকতেন একা একটি ফ্ল্যাটে। সঙ্গে একজন চাকর। একদিন সকালে দেখা গেল ওঁর ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা। মুখে বালিশ চাপা দিয়ে কেউ মনোমোহন ঝাকে খুন করে গেছে। তাঁর মুখের ওপর তখনও বালিশটা চাপা দেওয়া রয়েছে।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর সেই চাকরটা?'

নিপুদা বলল, 'সবারই প্রথমে চাকরটার কথাই মনে হয়েছিল। পুলিশও ভেবেছিল, চাকরটাই খুন করে পালিয়েছে। যদিও ঘরের জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায়নি, আর ওই চাকরটিও নাকি মনোমোহন ঝা-র কাছে কাজ করছে প্রায় তিরিশ বছর ধরে। পরদিন চাকরটাকে পাওয়া গেল ভূপাল থেকে দশ মাইল দূরে এক মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায়, জিবটা কাটা।'

মা বললেন, 'অ্যাঁ?'

কেউ তার জিবটা কেটে নিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। বুঝলেন না, একেবারে লোমহর্ষক ব্যাপার! চাকরটার চিকিৎসা হচ্ছে হাসপাতালে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ!'

'তারপর কি হল?'

'তারপর পুলিশ ভূপাল শহর একেবারে তোলপাড় করে ফেলেছে। কিন্তু কে বা কারা যে এমন খুন করে চলেছে, তার কোনও হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না।'

মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'রুমিরা বেশি রাত্তির করে আবার বেড়াতে-টেড়াতে যায় না তো?'

নিপুদা বলল, 'থার্ড খুনটা হওয়ার পর অনেকেই বেশ ভয় পেয়ে গেছে। একটু রাত্তির হলেই রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানেন, যে তিন জন খুন হয়েছে, তাদের কারুর বাড়ি থেকেই কোনও জিনিসপত্র বা টাকাকড়ি খোয়া যায়নি। মনে হয় কোনও পাগলের কান্ড।'

বাবা বললেন, 'সাধারণ পাগল হলে কি আর এতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে? পাগল-টাগল নয়, তোমাদের মধ্যপ্রদেশে তো অনেক বড় বড় ডাকাতের গ্যাং আছে।'

নিপুদা বলল, 'ডাকাতরা নিরীহ সাধারণ লোকদের মারে না, আর তারা শহরেও আসে না। এই খুনের উদ্দেশ্যটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

মা বললেন, 'হাত শুকনো হয়ে যাচ্ছে, এবার তোমরা উঠে পড়। হাত ধুয়ে নাও।'

নিপুদা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, চল সন্তু আমার সঙ্গে ভূপাল যাবি নাকি?'

নিপুদা জিজ্ঞেস করার আগেই আমি সব ঠিক করে ফেলেছি অনেকটা। আমার এখন ছুটি। অনায়াসেই ছোড়দির বাড়িতে কিছুদিন থেকে আসতে পারি। খালি একটা ব্যাপার আছে। আমি জানি, 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের রহস্য সমাধান করার জন্য যে আর্ন্তজাতিক তদন্ত কমিশন বসেছে, তাতে কাকাবাবুকে সদস্য করা হয়েছে। সানফ্রানসিসকো আর বারমুডার মাঝখানে সমুদ্রের একটা জায়গায় বড় বড় জাহাজ হঠাৎ ডুবে যায়। এমন কী, আকাশ থেকে অনেক এরোপ্লেনকেও যেন চুম্বকের মত টেনে নেয়। কত যে এইভাবে ডুবেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই তদন্ত কমিশনের কাজ শুরু করার জন্য কাকাবাবু নেমন্তন্ন পেয়েছেন আমেরিকা থেকে। কিন্তু কাকাবাবু লিখে জানিয়েছেন যে, তিনি কমিশনের সদস্য হতে আগ্রহী নন। তাঁকে যদি কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে তিনি একাই ওই রহস্য সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে পারেন।

কাকাবাবুর এই চিঠির উত্তর এখনও আসেনি। যদি ওরা রজি হয়, তাহলে কাকাবাবু তো আর একদম একা যাবেন না, নিশ্চয়ই আমাকেও নিয়ে যাবেন। ভূপাল গেলে যদি সেটা ফস্কে যায়?

অবশ্য আমেরিকা যেতে হলেও তো কাকাবাবু এক্ষুনি যাচ্ছেন না। অনেক কিছু ব্যবস্থা করতে হবে এখানে। এর মধ্যে আট-দশ দিনের জন্য আমি ভূপাল থেকে ঘুরে আসতে পারি। নিশ্চয়ই কাকাবাবু আমাকে ফেলে চলে যাবেন না। এর আগে সব কটি অভিযানে আমি কাকাবাবুর সঙ্গে গেছি।

নিপুদার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললুম, 'হ্যাঁ যাব।'

মিংমা এতক্ষণ মুখ নিচু করে মাছের কাঁটা বেছে খেয়ে যাচ্ছিল, এবার মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

আমি বললুম, ' মিংমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। ওর বেশ বেড়ান হবে।'

মা বললেন, 'না, না, এখন ভূপাল যেতে হবে না। খুনে গুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে!'

নিপুদা হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি? আমরা তো রয়েছি। আমাদের বাড়িতে লাইসেন্সড বন্দুক আছে. আজেবাজে লোক আমাদের বাড়ির ধার ঘেসতে সাহস করে না।'

বাবা বললেন, 'যাক্ না ঘুরে আসুক না, এখন তো ছুটি রয়েছে।'

পরদিন সকালে আমি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু, আমি কি নিপুদার সঙ্গে ভূপাল যাব ক'দিনের জন্য? খুব করে বলছেন ..'

কাকাবাবু আজও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস নিয়ে পুরনো কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। মুখ তুলে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও ঘুরে এস! কবে যাচ্ছ? আজই?'

মনে হল যেন আমরা আজকে গেলেই কাকাবাবু খুশি হন। তাহলে নিপুদা আর ওঁকে বিরক্ত করতে পারবে না।

'হ্যাঁ, আজকেই রাত্তিরের ট্রেনে। মিংমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব?'

এবার একটু ভেবে কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। মিংমাও ঘুরে আসুক। তবে ওইসব খুন-টুনের ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না!'

২

মধ্যপ্রদেশের নাম শুনলেই আমার মনে পড়ে শুধু জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়ের কথা। এছাড়া যেন ওখানে আর কিছু নেই। আমাদের চিড়িয়াখানায় যে সাদা বাঘ, তাও তো প্রথম এসেছিল ওই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল থেকে।

কিন্তু ভূপাল রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে খানিকটা আসবার পর আমি অবাক। এমন সুন্দর শহর আছে এই মধ্যপ্রদেশে! দারুণ দারুণ চওড়া রাস্তা, পরিষ্কার ঝকঝকে। দু-পাশে নতুন ডিজাইনের নানা রকম বাড়ি। শহরের মাঝখানে একটা বিশাল লেক, তার ও পাশে পুরনো শহর। একটা মস্ত বড় মসজিদের চূড়া দেখতে পাওয়া যায় অনেক দূর থেকে। নিপুদার মুখে শুনলাম, বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় নবাব পতৌদির বাড়ি আছে ওখানে। ঠিক করলুম, একদিন পতৌদির সঙ্গে দেখা করে ওঁর অটোগ্রাফ নিতে হবে।

শহরটা ঠিক সমতল নয়, রাস্তাগুলো উঁচু নিচু। পাহাড় কেটে যে শহরটা বানান হয়েছে, তা বেশ বোঝা যায়। এক এক জায়গায় বাড়িগুলো বেশ উঁচুতে। যেদিকেই তাকাই, চোখে বেশ আরাম লাগে।

ট্যাক্সিটা প্রায় সারা শহরটা পেরিয়ে এসে ঢুকল আরেরা কলোনিতে। এখানকার বাড়িগুলো যেন আরও বেশি কায়দার, যেন কার বাড়ি কত সুন্দর হবে এই নিয়ে একটা প্রতিযোগিটা আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গেই একটা করে বাগান। ইংরেজি সিনেমায় যে রকম বাড়ি-টাড়ি দেখি, সে তো এই রকমই।

একটা পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিপুদা বলল, 'এই পার্কেই পাওয়া গিয়েছিল সেকেন্ড ডেড বডিটা।'

ডান দিকে হাত তুলে একটা হালকা নীল রঙের তিনতলা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'আর ওই বাড়িতে থাকতেন অর্জুন শ্রীবাস্তব। ওই যে ছাদের ঘরটা দেখতে পাচ্ছিস, ওটাই ছিল ওঁর পড়ার ঘর।'

এরপর ট্যাক্সিটা ডান দিকে ঘুরতেই আমরা বাড়ি পৌঁছে গেলুম।

ছোড়দি তো আমায় দেখে অবাক! আগে থেকে আমরা কোনও খবরও দিইনি। আমায় জড়িয়ে ধরে ছোড়দি বলল, 'খুব ভাল সময়ে এসেছিস রে সন্তু! আমরা এই শনিবারই পাঁচমারি যাবার প্ল্যান করেছি। দেখবি, দারুণ ভাল লাগবে।'

আমি মিংমার সঙ্গে ছোড়দির আলাপ করিয়ে দিলুম। মিংমা এমনিতেই কম কথা বলে, নতুন জায়গায় এসে একদম চুপ।

ছোড়দি মিংমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বা, ছেলেটির চেহারা খুব সুন্দর তো!'

আমি বললুম, 'ছেলেটা বলছে কি। ওর বয়েস একত্রিশ বছর, তোমার চেয়েও বয়েসে বড়। আর ও বাংলা বোঝে!'

ছোড়দি বলল, 'চট করে হাতমুখ ধুয়ে নে। তোদের খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?'

সত্যিই বেশ খিদে পেয়েছে। ভূপালে কলকাতা থেকে একটানা ট্রেনে আসা যায় না। নাগপুর থেকে বদল করতে হয়। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল, চলেছি তো চলেছিই রাস্তা আর ফুরোচ্ছে না।

প্রথমে টপাটপ মিষ্টি খেয়ে ফেললুম কয়েকটা। তারপর ছোড়দি প্লেটে করে আরও মিষ্টি এনে দিল।

এ বাড়িটা দোতলা। ওপরে বেশ চওড়া বারান্দা, সেখানেই বসে গল্প করতে লাগলুম। বিকেল পেরিয়ে সবে মাত্র সন্ধে হব-হব সময়। আকাশে ঘুরছে কালো কালো মেঘ। রত্নেশদা এখনও অফিস থেকে ফেরেননি। নিপুদাও আমাদের পৌঁছে দিয়েই ছুটেছে নিজের অফিসের দিকে।

ছোড়দিদের বাড়ির সামনেও একটা বেশ সাজান বাগান। সেখানে লাফালাফি করছে মোটকা-সোটকা খুব লোমওয়ালা একটা কুকুর। একটু দূরে আর একটা

বাড়িতে একটা কুকুর অনবরত ডেকে চলেছে। আমরা আসার পর থেকেই ওই কুকুরটার ওই রকম একটানা ডাক শুনতে পাচ্ছি।

ছোড়দিই এক সময় বলল, 'ইশ্, ধীরেনদাদের কী অবস্থা! সর্বক্ষণ ওই রকম কুকুরের ডাক সহ্য করা ... '

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কুকুরটার কি হয়েছে? পাগল হয়ে গেছে নাকি?'

'না। ওই কুকুরটা ছিল অর্জুন শ্রীবাস্তব নামে এক ভদ্রলোকের। তিনি হঠাৎ মারা গেছেন কিছুদিন আগে। তারপর থেকেই কুকুরটা ডেকে চলেছে। মনিবের জন্য ও কাঁদে।'

'কিন্তু অর্জুন শ্রীবাস্তবের বাড়ি তো এই ডানদিকে, আর কুকুরটা ডাকছে এদিকের একটা বাড়ি থেকে!'

ছোড়দি একটু অবাক হয়ে তাকাল, আমার দিকে। তারপর বলল, 'ও, নিপু বুঝি এর মধ্যেই তোদের সব বলেছে? শ্রীবাস্তবজী মারা যাবার পর কুকুরটাকে দেখাশুনো করবার কেউ ছিল না, উনি তো একলাই কুকুরটাকে নিয়ে থাকতেন -- সেই জন্য ধীরেনদা নিজের বাড়িতে কুকুরটাকে নিয়ে এসেছেন।'

'ধীরেনদা কে?'

'নিপু তোদের ধীরেনদার কথা কিছু বলেনি?'

'নামটা শুনেছি একবার।'

'সন্ধেবেলা তোদের নিয়ে যাব ধীরেনদার বাড়িতে।'

কুকুরটা তখনও ডেকেই চলেছে। কী রকম যেন অদ্ভুত করুণ সুর। আমার মনে পড়ল, সেই নেপালের অভিযানে কেইন শিপটনেরও একটা সাদা লোমওয়ালা সুন্দর কুকুর ছিল। কেইন শিপটন পালাবার পর সেই কুকুরটাও এ-রকম একা-একা কাঁদত। কেউ খাবার দিলে খেতে চাইত না! শেষ পর্যন্ত কুকুরটা যে কার কাছে রইল কে জানে!

সন্ধেবেলা সবাই মিলে যাওয়া হল ধীরেনদার বাড়িতে। ধীরেনদা মানে ধীরেন চক্রবর্তী, একটা বিদেশি কোম্পানির বিরাট একটা কারখানার উনি ম্যানেজার। মানুষটি কিন্তু খুব হাসিখুশি। এখানকার অনেক বাঙালিই আসে এঁর বাড়িতে আড্ডা দিতে। সবাই ওঁকে ডাকে ধীরেনদা আর ওঁর স্ত্রীকে বলে রিনাদি।

ছোড়দি আমাদের আলাপ করিয়ে দেবার পর ধীরেনদা বললেন, 'আরে,তাই নাকি? এই তাহলে 'পাহাড় চূড়ায় আতঙ্কের' সেই হিরো সন্তু, আর এই সেই মিংমা? আজ তো দু'জন খুব বিখ্যাত মানুষ এসেছে আমাদের বাড়িতে। কাকাবাবু এলেন না? ইশ, কাকাবাবুকে একবার দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল।'

ধীরেনদাদের দুটি ছেলে, দীপ্ত আর আলো। এদের মধ্যে দীপ্ত প্রায় আমারই বয়েসী।

রিনাদি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সন্তু, তোমরা যে সিয়াংবোচিতে ছিলে, এভারেস্টের অত কাছে, সেখানে তোমাদের নিশ্বাসের কষ্ট হয়নি?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, প্রথম দু'একদিন হয়েছিল, আমাদের সঙ্গে অক্সিজেন মাস্কও ছিল, কিন্তু পরে সেগুলোর দরকার হয়নি, এমনিই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।'

ধীরেনদা বললেন, 'পাহাড় চূড়ায় আতঙ্কেরে হিরোরা এসেছে, আজ ওদের মাগুর মাছ খাওয়াব!'

কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলুম। মাগুর মাছ খাওয়ার মধ্যে আবার এমন কি বিশেষত্ব আছে?

ধীরেনদা বললেন, 'দীপু, আলো, চল আমরা এখন মাছ ধরব।'

সবাই মিলে চলে এলুম বাগানে। প্রথমে মনে হয়েছিল কোনও পুকুরে বুঝি মাছ ধরতে যাওয়া হবে। তা নয়। বাগানের এক কোণে রয়েছে একটা বেশ বড় চৌবাচ্চার মতন। পাশাপাশি চারখানা ক্যারাম বোর্ড রাখলে যত বড় হয়, ততখানি। কালো মিশমিশে জল, ওপরে ভাসছে পদ্মপাতা, দুটো পদ্মফুলও ফুটে আছে।

দুটো ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটের মতন হাত-জাল নিয়ে ধীরেনদা আর দীপু সেই জলের মধ্যে মাছ খুঁজতে লাগল। এক সময় দীপুর জাল থেকে একটা কি যেন লাফিয়ে পড়ল আমাদের সামনে।

প্রথমে চমকে উঠে আমি ভেবেছিলাম ওটা বুঝি সাপ। এত বড় মাগুর মাছ কখনও দেখিনি, প্রায় এক হাত লম্বা আর অ্যাত্ত বড় মাথা!

ছোড়দি ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'ধীরেনদা এই মাগুর মাছ সহজে তুলতে চান না। এখানে তো মাগুর মাছ পাওয়া যায় না। তোদের বেশি খাতির করার জন্যই ধরলেন।

চৌবাচ্চাটায় নিশ্চয়ই অনেক মাছ কিলবিল করছে, কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই ধীরেনদা আর দীপু সাত-আটটা মাছ তুলে ফেলল।

রিনাদি বললেন, 'আর দরকার নেই, সাতটা মাছ থাক, একটাকে জলে ছেড়ে দাও।'

বাগানের অন্য দিকে অর্জুন শ্রীবাস্তবের কুকুরটা ডেকেই চলেছে। একটা খুঁটির সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা। মিংমা মাছ ধরা না দেখে কুকুরটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধীরেনদা চেঁচিয়ে বললেন, 'ওর গায়ে হাত মাত দেও। কামড়ে দিতে পারে।'

কুকুরটা খয়েরি, খুব বেশি বড় নয়, কিন্তু গলার আওয়াজ বেশ জোরাল। মিংমা কুকুর খুব ভালাবাসে। কাছে দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে লক্ষ্য করল একটুক্ষণ। তারপর খপ্ করে এমন কায়দায় ওর ঘাড়টা এক হাতে চেপে ধরল যে কুকুরটার কামড়াবার কোনও সাধ্য রইল না।

অন্য হাত দিয়ে মিংমা কুকুরটার লোমের ভেতর থেকে পোকা বাছতে লাগল। বড় বড় এঁটুলি।

কুকুরটা ডাক থামিয়ে দিয়েছে। মনে হল যেন বেশ আরাম পাচ্ছে।

ধীরেনদা বললেন, 'এই মিংমার তো বেশ এলেম আছে। কুকুরটাকে এ পর্যন্ত কেউ সামলাতে সাহস পায়নি।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা ধীরেনদা, অর্জুন শ্রীবাস্তবের ঘরটা একবার দেখতে পারি? ঘরটা কি বন্ধ আছে?'

ধীরেনদা বললেন, 'কেন, তুমি এখানে গোয়েন্দাগিরি করবে নাকি? বেশ তো।'

ছোড়দি বলল, 'না, না, ও-সবে মাথা গলাবার দরকার নেই। মা আমাকে চিঠি লিখে বারণ করে দিয়েছেন কাকাবাবুর সঙ্গে থাকলে না হয় আলাদা কথা ছিল।'

ধীরেনদা বললেন, 'কাকাবাবু নেই বটে, কিন্তু আমরা তো আছি। অভিজ্ঞতা আছে, সেই সঙ্গে যদি আমরাও সাহায্য করি তা হলে হয়তো খুনিকে ধরে ফেলা যেতে পারে। মধ্যপ্রদেশের সরকার এর মধ্যেই দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।'

আমার অবশ্য খুনের তদন্ত করার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। কাকাবাবুর সঙ্গে আমি যে-সব অ্যাডভেঞ্চারে গেছি, তা আরও অনেক বড় ব্যাপার। তবু চুপ করে রইলুম।

ধীরেনদা বললেন, 'চাবি আমার কাছেই আছে। চল,এখুনি ঘুরে আসি।'

ধীরেনদা, আমি, দীপু আর মিংমা বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়। মিংমা কুকুরটাকেও সঙ্গে নিয়ে নিল। তিনতলার ওপর শুধু দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট আর ছাদ। অর্জুন শ্রীবাস্তব সেখানে একাই থাকতেন। সেখানে গিয়ে অবশ্য চমকপ্রদ কিছুই চোখে পড়ল না। দুখানা ঘরেই ঠাসা বইপত্র, প্রায় সব বইই ইতিহাস বিষয়ে। মনে হয় যেন বই ছাড়া অর্জুন শ্রীবাস্তবের আর কোনও সম্পত্তি ছিল না। কোথাও মারামারি , ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্নই নেই। দুটো বাক্স আর একটা আলমারি আছে, সেগুলোরও তালা ভাঙা হয়নি। চাবিও পাওয়া গিয়েছিল, পুলিশ এসে খুলে দেখেছিল যে ভেতরে ঘাঁটাঘাঁটি করেনি কেউ।

তাঁকে খুন করা হয়েছিল রাত একটা দেড়টার সময়।

অত রাতে শ্রীবাস্তবজী কি নিজেই পার্কে গিয়েছিলেন? না চেনা কেউ তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল?

কুকুরটা এখানে এসেই আবার চ্যাঁচাতে শুরু করেছে। ও নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে কিন্তু আমরা যে ওর ভাষা বুঝি না!'

শার্লক হোমসের মতন একটা পোড়া দেশলাই-কাঠি কিংবা এক টুকরো কাপড়ের মতন কোনও সূত্রই চোখে পড়ল না। তবু আমি উকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগলুম খাটের তলা-টলা।

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে সন্তু, কিছু বুঝতে পারলে।'

আমি চুপ করে রইলুম। অনেক বইতেই পড়েছি , বড় বড় ডিটেকটিভরা কোনও সূত্র বা প্রমাণ পেলেও প্রথম দিকটায় কিছুই বলতে চান না।

আমার একবার মনে হল, কাকাবাবু এখানে উপস্থিত থাকলে কি করতেন? তিনি কোন্ কোন্ জিনিস পরীক্ষা করতেন আগে? হয়তো তিনি এই বই গুলোই পড়তে শুরু করে দিতেন।

অর্জুন শ্রীবাস্তবের বিছানাটা এখনও একই রকমভাবে পাতা আছে। চাদরে কোনও ভাঁজ নেই, মনে হয় রাতে শ্রীবাস্তবজী শুতেই যাননি। বিছানাটার দিকে তাকাতেই আমার গা শিরশির করছে। এই বিছানায় কয়েকদিন আগেও একজন মানুষ শুয়েছে, আজ সে বেঁচে নেই।

ধীরেনদা বললেন, 'শ্রীবাস্তবজী ছিলেন আমার বন্ধু। অতি নিরীহ, শান্ত মানুষ. তাঁকে যে কেউ ওরকম ভয়ঙ্করভাবে খুন করতে পারে বিশ্বাসই করা যায় না।'

খানিক বাদে আমরা চলে এলুম সেখান থেকে।

তারপর ধীরেনদার বাড়িতে থাকা হল অনেক রাত পর্যন্ত। গল্প হল অনেক রকম। আমরা এই শনিবারই পাঁচমারি বেড়াতে যাচ্ছি শুনে ধীরেনদা বললেন, 'ইশ, আমরাও আর একটা গাড়ি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে গেলে পারতুম। কিন্তু শনিবার তো হবে না, সেইদিনই আমাদের কোম্পানির এক সাহেব আসছে আমেরিকা থেকে।'

ছোড়দি বলল, 'একটু চেষ্টা করে দেখুন না, ধীরেনদা, কোনও রকমে ম্যানেজ করতে পারেন না? আপনি গেলে খুবই ভাল হত।'

ধীরেনদা বললেন, 'কোনও উপায় নেই! ঠিক আছে, তোমরা পাঁচমারি থেকে ঘুরে এস, তারপর আমি তোমাদের আর একটা জায়গায় নিয়ে যাব।'

ছোড়দি বলল, 'কোথায়? সাঁচি?'

'সাঁচি তো আছেই। সেখানে যে-কোনও দিন যাওয়া যেতে পারে। আমি তোমাদের নিয়ে যাব ভীমবেঠ্কায়।'

'ভীমবেঠ্কায়? সেটা আবার কোন্ জায়গা?'

'নাম শোননি তো? যারা ভূপাল বেড়াতে আসে, তারা সবাই সাঁচি স্তূপ দেখে কিংবা পাঁচমারি যায়। কিন্তু আমার মতে ভীমবেঠ্কাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জায়গা। তোমাদের মতন যারা ভূপালে এসে বেশ কিছুদিন আছে, তারাও ওই জায়গাটার নাম শোনেনি!'

রিনাদি বললেন, 'ওই ভীমবেঠ্কা তোদের ধীরেনদার খুব ফেভারিট জায়গা। অবশ্য গেলে তোদেরও খুব ভাল লাগবে। ওই অর্জুন শ্রীবাস্তবই আমাদের প্রথম ভীমবেঠ্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তার আগে আমরাও নাম জানতুম না।'

ভীমবেঠ্কা নামটা শুনে আমারও কি রকম অদ্ভুত লাগল। ওই রকম কোনও জায়গার নাম শুনলেই যেতে ইচ্ছে করে।

যাই হোক, আগে তো পাঁচমারি ঘুরে আসা যাক।

পরের দিন নিপুদা আমাদের ভূপালের বিখ্যাত লেক দেখিয়ে আনল। নবাব পতৌদির বাড়িতেও গেলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলুম, পতৌদি এখন ভূপালে নেই, অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলা দেখতে গেছেন।

শনিবার সকালে পাঁচমারি যাবার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। রত্নেশদা একটা বড় স্টেশন ওয়াগন জোগাড় করে এনেছেন, আমরা সবাই তো যাবই, ধীরেনদার ছেলে দীপুও যাবে আমাদের সঙ্গে। এর মধ্যে দীপুর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে।

একে-একে সব জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে। পাঁচমারিতে নাকি রাত্রে খুব শীত পড়ে, তাই নিতে হচ্ছে কম্বল-টম্বল। রত্নেশদা সঙ্গে নিলেন একটা শটগান, যদি শিকার-টিকার কিছু করা যায়। আগেই শুনেছিলুম, পাঁচমারি যাবার পথে বাঘ দেখা যেতে পারে।

নিপুদা একটা ছোট্ট রেডিয়ো এনে বলল, 'এটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই, কি বল? ওখানে গিয়ে গান-টান শোনা যাবে।'

রেডিয়োর ব্যাটারি ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য নিপুদা একবার ওটা চালাল।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুনতে পেলুম একটা দারুণ দুঃসংবাদ!

রেডিয়োতে তখন স্থানীয় খবর শোনাচ্ছে। তাতে জানা গেল যে, বিখ্যাত পন্ডিত এবং ভূপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনাকে গত চব্বিশ ঘন্টা ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ছোড়দি বলল, 'অ্যাঁ? কি সর্বনাশ!

রত্নেশদা বলল, 'চুপ কর! আগে শুনতে দাও পুরো খবরটা।'

আরও জানা গেল যে, ডঃ শাকসেনা একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য জেনিভা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পরশু রাত্রে ফিরেছেন ভূপালে। রাত্রে তিনি যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলেন, সকালবেলা থেকে তাঁকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে তিনি কিছু বলে যাননি, এমনভাবে তাঁর উধাও হয়ে যাবার কোনও কারণই নেই। এর আগে যে তিনটি বীভৎস হত্যাকান্ড হয়েছে, তার জের টেনে ডঃ শাকসেনা সম্পর্কেও চরম আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ সাড়া মধ্যপ্রদেশ জুড়ে তল্লাশি শুরু করেছে এবং দিল্লিতে সব সি বি আই কেও জানানো হয়েছে।

নিপুদা বলল, 'এই রে , আর দেখতে হবে না! ওঁকেও মেরেছে।' ছোড়দি বলল, 'চুপ কর! আগে থেকেই এরকম বলতে শুরু কোর না। এখনও তো কিছু পাওয়া যায়নি।'

নিপুদা বলল, 'ওঁর মতন একজন শিক্ষিত বয়স্ক লোক কারুকে কিছু না বলেই বাড়ি থেকে চলে যাবেন, এ কি কখনও হয়? এ নিশ্চয়ই গুম খুনের কেস।'

রত্নেশদা বলল, 'আমাদের অফিসের ওই যে বিজয় শাকসেনা, তার তো আপন কাকা হন ইনি। একদিন বিজয়ের বাড়িতে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এমন কৌম্য

চেহারা যে, দেখলেই ভক্তি হয়। ওই রকম মানুষের কোনও শত্রু থাকতে পারে, তাই তো বিশ্বাস করা যায় না।'

নিপুদা বলল, 'এখন হোল্ ইন্ডিয়াতে ডঃ শাকসেনার মতন ইতিহাসের এত বড় পন্ডিত আর কেউ নেই। এত জায়গা থেকে ওঁকে চাকরি দেবার জন্য সেধেছে! কিন্তু উনি ভূপাল ছেড়ে কোথাও যেতে চান না।'

এই সময় এসে পড়ল খবরের কাগজ। তাতেও প্রথম পাতাতে ডঃ শাকসেনার ছবি দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে খবর বেরিয়েছে।

ছোড়দি আর নিপুদা কাগজটা আগে পড়বার জন্য কাড়াকাড়ি করতে লাগল। রত্নেশদা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, এখন নয়, আগে গাড়িতে উঠে পড়, যেতে-যেতে পড়বে! অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

একটু বাদেই আমাদের গাড়ি ছুটল পাঁচমারির দিকে।

৩

পাঁচমারি যে এত দূরে, তা আগে বুঝতে পারিনি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, তার মধ্যে কত রকম জায়গা যে পেরিয়ে এলুম তার ঠিক নেই। ধুধু করা মাঠ, ছোট ছোট শহর, কোথাও ঘন জঙ্গল। এক জায়গায় তো গাড়ি থেকে নেমে আমাদের সবাইকে হাঁটতে হল, সেখানে একটা নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, কিছুটা জায়গা বালির ওপর দিয়ে যেতে হয়, ভর্তি গাড়ি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, খালি গাড়িটা কোনরকমে হেলেদুলে গিয়ে উঠল ব্রিজে।

শেষের দিকে খানিকটা একেবারে পাহাড়ি রাস্তা। গাড়িটা উঠতে লাগল ঘুরেঘুরে। এক পাশে ঘন বন, আর একদিকে বহুদূর ছড়ান উপত্যকা। অনেকটা আমাদের দার্জিলিং-এর মতো। গাড়ি চালাচ্ছে নিপুদা, আর রত্নেশদা রাইফেলটা ধরে বসে আছে জানলার ধারে। খুব আশা করেছিলাম দু-একটা বাঘ-ভালুক দেখতে পাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা লুকিয়েই থেকে গেল।

পাঁচমারি শহরটা প্রথম দেখে কিছু নতুন মনে হয় না। মনে হয়, এমনিই পাহাড়ের ওপর একটা ছোট্ট শহর। কিন্তু কিছুক্ষণ থাকবার পর বোঝা যায়, এ-রকম জায়গা আমাদের দেশে বিশেষ নেই। ঠিক যেন ছবির বইতে কিংবা সিনেমায় দেখা ইওরোপের কোনও গ্রাম। সাহেবরাই এ পাহাড়ের ওপর জায়গাটা পরিষ্কার করে এক-সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বানিয়েছিল। সাহেবি ধরনের সব বাড়ি, সেই রকম ছোট্ট গির্জা। আমাদের দার্জিলিংও সাহেবদের তৈরি, কিন্তু এখন সেখানে অনেক নতুন বাড়ি-ঘর উঠেছে। কিন্তু সাহেবরা চলে যাবার পর পাঁচমারিতে আর তেমন নতুন বাড়িঘর বানাতে দেওয়া হয়নি, তাই শহরটাকে দেখতে ঠিক আগেকার মতনই আছে।

আমাদের হোটেলটা একটা টিলার ওপরে। এটাও আগে ছিল আগেকার এক সাহেবের। প্রত্যেক ঘরে ফায়ারপ্লেস। এখানকার বারান্দায় দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। ডানদিকে একটা উঁচু পাহাড়ে মন্দির। পাহাড়টা একেবারে খাড়া। ওই মন্দিরে মানুষ যায় কি করে কে জানে!

পাহাড়ি জায়গায় এসে মিংমা খুব খুশি। ও কথা খুব কম বলে, কিন্তু মুখচোখ দেখলেই বোঝা যায় এখানে এসে ওর খুব আনন্দ হয়েছে। হোটেলের পেছন দিকটায় একটা আমলকী গাছ, মিংমা সেটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে অনেক আমলকী পেড়ে ফেলল। প্রায় দু'কিলো হবে! আমলকী খাবার পর জল খেলে খুব মিষ্টি লাগে। কিন্তু এত আমলকী কে খাবে?

হোটেলে সব গুছিয়ে রাখার পর আমরা আবার বেরিয়ে পড়লুম। পাঁচমারিতে অনেক কিছু দেখবার আছে। মনে হয়, এই জায়গাটা শিবঠাকুরের খুব পছন্দ। এক জায়গায় পাথরের গায়ে এমনি এমনি ফুটে উঠেছে ত্রিশূলধারী শিবের ছবি। পাঁচমারি থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে রয়েছে একটা শিবলিঙ্গ, সেটা ওখানে কেউ বসায়নি। তৈরি হয়েছে স্বাভাবিকভাবে।

আর একটা ছোট টিলার ওপরে রয়েছে পাশাপাশি কয়েকটা গুহা। দেখলে মনে হয়, বহুকাল আগে কেউ ওখানে একটা বাংলো বানিয়েছিল। আমরা ওপরে উঠে দেখলুম, গুহাগুলো ঠিক ঘরের মতন। একজন গাইড বলল, 'এটা পঞ্চপাণ্ডবের গুহা। বনবাসের সময় পঞ্চ পাণ্ডব আর দ্রৌপদী এখানে কিছুদিন ছিলেন।

এই পাণ্ডব গুহার আবার ছাদ আছে। সেখানে এসে দেখলুম, একজন মানুষ পা ঝুলিয়ে বসে আছে এক ধারে। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পশ্চিমে একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, লোকটি চেয়ে আছে সেদিকে।

রত্নেশদা বলে উঠল, 'আরে , বিজয়!'

লোকটি চমকে আমাদের দিকে ফিরল। নাকের নিচে পাকানো গোঁফ, ভালমানুষের মতন চেহারা। কিন্তু মুখখানা গম্ভীর।

রত্নেশদা আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ হচ্ছে বিজয় শাকসেনা, আমার অফিসের কলিগ।'

ছোড়দি বিজয় শাকসেনাকে আগে থেকেই চেনে, সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কবে এসেছেন?'

বিজয় শাকসেনা হিন্দিতে উত্তর দিল, 'আজই দুপুরে। চিফ্ মিনিস্টার কয়েকদিন পর এখানে মিটিং করতে আসবেন, সেই ব্যবস্থা করতে এসেছি। '

রত্নেশদা বলল, 'হঠাৎ ঠিক হল বুঝি? কিসে এলে? আমাদের বললে পারতে, আমাদের গাড়িতে অনেক জায়গা ছিল—

বিজয় শাকসেনা বলল, 'একটা জিপ পেয়ে গেলাম। কোনও অসুবিধে হয়নি।'

নিপুদা বলল, 'আপনার আংক্‌ল ডক্টর শাকসেনার কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে?'

বিজয় অবাক হয়ে বলল, 'কেন, একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমার কাকা তো বিদেশে!'

'সে কী, আপনি শোনেননি! উনি ফিরে এসেছেন, তারপরই আবার উধাও হয়ে গেছেন, ওঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ সকালে রেডিওতে বলেছে, কাগজেও বড় বড় করে বেরিয়েছে...'

'ও, আমি ভোর চারটেয় বেরিয়েছি। রেডিও শুনিনি, কাগজও দেখিনি। কি বলছেন, উনি হারিয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ,উনি রহস্যময়ভাবে নিরুদ্দেশ। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, ওঁকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।'

'বাড়ি থেকে?'

'হ্যাঁ। উনি শুতে গিয়েছিলেন ...'

'অসম্ভব! বাড়ি থেকে কে ওঁকে নিয়ে যাবে? উনি খেয়ালি লোক, হঠাৎ মাথায় কিছু এসেছে, নিজেই কোথাও চলে গেছেন। আমার কাকিমা কি বলেন জানেন? উনি বলেন যে, ওঁর বয়েস যদি একহাজার বছর হত, তা হলে ভাল হত। কারণ অন্তত এক হাজার বছরের পুরনো না হলে ... কোনও কিছু সম্পর্কে আমার কাকার কোনও আগ্রহ নেই। নিশ্চয়ই এখন উনি কোনও ধ্বংসস্তুপের মধ্যে বসে আছেন!'

'না মানে, সবাই ভয় পাচ্ছে, ভূপালে হঠাৎ যে সব খুন-টুন হতে শুরু করেছে ..'

'আমার কাকাকে কে খুন করবে? কেন খুন করবে? না, না, না আপনারা শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন। চলুন নিচে যাওয়া যাক। এরপর অন্ধকার হয়ে যাবে।'

নিচে নামার পর বিজয় শাকসেনা আর বিশেষ কিছু না বলে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন।

রত্নেশদা বলল, 'চল সবাই, এক্ষুনি হোটেলে ফিরতে হবে। পাঁচমারির ব্যাপার জান তো, একটু রাত হলে আর বাইরে থাকা যায় না।'

আমি ভাবলুম, রাত্তিরবেলা বোধহয় এখানে বাঘ বেরোয়।

তা নয়, বাঘের চেয়েও সাংঘাতিক এখানকার শীত। এটাই পাঁচমারির বিশেষত্ব। দিনের বেলা এখানে গরম জামা গায়ে দিতেই হয় না। কিন্তু যেই সন্ধের পর অন্ধকার নামতে শুরু করে, অমনি আরম্ভ হয় শীত। সে কি সাংঘাতিক শীত! হোটেলে ফিরতে না ফিরতেই আমরা কাঁপতে লাগলুম ঠকঠক করে।

তাড়াতাড়ি রাত্তিরের খাওয়া সেরে নিয়ে আমরা সবাই মিলে একটা ঘরে বসলুম আড্ডা দিতে। অনেক কাঠ এনে ফায়ারপ্লেস জ্বালান হয়েছে, তবু শীত যায় না। আমরা আগুনের কাছে এসে মাঝে-মাঝে হাত-পা সেঁকে নিচ্ছি। আমরা যে কম্বল এনেছি, তাতে কুলোবে না, হোটেল থেকে আরও কম্বল দিয়েছে। একজন বেয়ারা বলেছে যে, প্রত্যেকের অস্তত তিনটে করে কম্বল লাগবে।

নিপুদা একসময় রত্নেশদাকে বলল, 'আচ্ছা দাদা, তোমার অফিসের ওই বিজয় শাকসেনার ব্যবহারটা কেমন একটু অস্বাভাবিক লাগল না?'

ছোড়দি বলল, 'আমার মনে হল, ভদ্রলোক আমাদের দেখে যেন একটু চমকে উঠলেন। আমরা যে এই শনিবার পাঁচমারিতে আসব তুমি অফিসে জানাওনি?'

রত্নেশদা বলল, 'হ্যাঁ, জানাব না কেন? বিজয়কেও তো বলেছিলাম। বিজয়ও যে এখানে আসবে, সেটা জানতুম না। অবশ্য চিফ্ মিনিস্টারের এখানে আসবার কথা আছে ঠিকই।'

আমি বললুম, 'ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনার নিরুদ্দেশ হবার কথা উনি আমাদের কাছে প্রথম শুনলেন?'

রত্নেশদা বলল, 'ও যে বলল আজ খুব ভোরে বেরিয়েছে। রেডিও শোনেনি, কাগজও পড়েনি। তাহলে জানবে কি করে?'

আমি বললুম, 'রেডিওতে আজ সকালে জানালেও ডক্টর শাকসেনাকে পাওয়া যাচ্ছে না কাল সকাল থেকে। কাল সারাদিনে উনি কোনও খবর পাননি? ওঁরা এক বাড়িতে থাকেন না বুঝি?'

রত্নেশদা বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। এক বাড়িতে না থাকলেও খুব কাছাকাছি বাড়ি। বিজয়ের কাকার বাড়ি থেকে দেখা যায়। ও-বাড়িতে কিছু হলে বিজয় নিশ্চয়ই জানবে!'

নিপুদা বলল, 'আমাদের মুখে খবরটা শুনেও ওকে খুব একটা ব্যস্ত হতে দেখলুম না। ওদের কাকা ভাইপোতে ঝগড়া নাকি?'

রত্নেশদা বলল. 'আরে না, না। বিজয় ওর কাকাকে একেবারে দেবতার মতন শ্রদ্ধা করে। তাছাড়া বিজয় মানুষটা খুব ভাল। কারুর সঙ্গে ওর ঝগড়াঝাঁটি নেই।

দীপু বলল, 'আমি একটা কথা বলব? আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? চিরঞ্জীব শাকসেনাকে কারা ধরে নিয়ে গেছে, তা ওই বিজয়বাবু জানেন! বিজয়বাবুকে ভয় দেখিয়েছে যে মুখ খুললেই মেরে ফেলবে। সেই জন্যই উনি পাঁচমারিতে পালিয়ে এসেছেন।'

ছোড়দি বলল, 'দীপু ঠিকই বলেছে, আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।'

রত্নেশদা বলল, 'ওর কাকার এত বড় বিপদ হল বিজয় নিজের প্রাণের ভয়ে চুপ করে থাকবে, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ও হয়তো সত্যিই খবরটা জানত না, কাল সারাদিন বোধহয় ব্যস্ত ছিল, ... আরে তাই তো , বিজয় তো গতকাল অফিসেও আসেনি।'

নিপুদা বলল, 'উনি পাঁচমারিতে কোথায় উঠেছেন, সে কথাও তো আমাদের বললেন না। হঠাৎ চলে গেলেন।'

রত্নেশদা বলল, 'পাঁচমারি ছোট জায়গা, সবার সঙ্গে সবার রোজ দেখা হয়। বিজয় নিশ্চয়ই সার্কিট হাউসে উঠেছে। কাল সকালেই আবার দেখা হবে।'

একটু বাদেই পরপর দুবার দুড়ুম দুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। আমরা চমকে উঠলুম।

জায়গাটা এমনই শান্ত আর নিস্তব্ধ যে, সেই আওয়াজ যেন কামানের মতন শোনাল।

শীত অগ্রাহ্য করেও আমরা চলে এলুম বারান্দায়। এই টিলার ওপর থেকে পাঁচমারির অন্য বাড়িগুলোর আলো একটু একটু দেখা যায়। যেন ছড়ান ছেটান অনেকগুলো তারা। দূরে কোথাও সামান্য গোলমালের আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। এত রাতে কে বন্দুক ছুঁড়বে? জঙ্গলে কেউ শিকার করতে গেছে? এই শীতের মধ্যেও যদি কেউ শিকারে যায় তবে তাঁর শখকে ধন্য বলতে হবে!

আর বেশিক্ষণ আমাদের গল্প জমল না। সকলের মন টানছিল বিছানার দিকে। শোওয়ামাত্র ঘুম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, তখন ন'টা বেজে গেছে। চারিদিকে ঝলমল করছে রোদ। শীতও অনেক কম।

হোটেলের লম্বা টানা বারান্দায় অনেকগুলো বেতের চেয়ার আর টেবিল। আমরা এক জায়গায় গোল হয়ে বসে চা খেতে লাগলুম। মিংমা চা খেল পরপর চার কাপ। ছোড়দির এই শীতে সর্দি লেগে গেছে, 'হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো' করছে বারবার।

কয়েকজন বেয়ারা এক কোণে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল গতকাল রাত্রের সেই গুলির আওয়াজের কথা। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'রত্নেশদা, কালকের সেই গুলি —'

রত্নেশদা বলল, 'ও হ্যাঁ, তাই তো!'

একজন বেয়ারাকে ডেকে রত্নেশদা জিজ্ঞেস করল 'কাল রাত্রে কিসের শব্দ হয়েছিল? তোমরা শুনেছ?'

বেয়ারাটি বলল, 'সাব, এমন কান্ড এখানে কোনদিন হয়নি! পাঁচমারিতে বেশি লোক আসে না, যারা আসে তারা সব বাছাই-বাছাই মানুষ। এখানে কোনদিন কোনও হাঙ্গামা -হুজ্জোত হয় না। এই প্রথম এখানে এমন একটা খারাপ ব্যাপার হল —'

'কী হয়েছে, আগে তাই বল না!'

'সার্কিট হাউসে কারা এসে কাল এক বাবুকে গুলি করেছে।'

রত্নেশদা চমকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ? সার্কিট হাউসে? কে গুলি করেছে? কাকে করেছে? কেউ মারা গেছে?'

বেয়ারাটি অত খবর জানে না। সে সব শুনেছে অন্য লোকের মুখে। একদল ডাকাত নাকি এসেছিল, একজন না দুজন মরে গেছে। ডাকাতরা অনেক কিছু নিয়ে গেছে!

ব্রেকফাস্ট না খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম তক্ষুনি। ছোড়দি আর মিংমাকে রেখে যাওয়া হল।

সার্কিট হাউসের সামনে তখনও কুড়ি পঁচিশ জন লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে। আমরা পৌঁছে বুঝলুম, আমাদের ঠিক পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। একটুর জন্য দেখা হল না।

কাল রাত্রে কেউ এসে গুলি ছুঁড়েছে ঠিকই। কেন ছুঁড়েছে বা কে ছুঁড়েছে তা বোঝা যায়নি। গুলির শব্দ শুনে সার্কিট হাউসের অন্য বাসিন্দারা উঠে এসে দেখে যে, বারান্দায় একজন লোক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তখনও মরেনি, অজ্ঞান। এখানকার হেল্‌থ সেন্টারে একজন মাত্র ডাক্তার, তিনি আবার কাল বিকেলেই চলে গেছেন জব্বলপুরে। তখন অন্যরা কোনও রকমে আহত লোকটিকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। গুলি লেগেছে উরুতে। আজ সকালে এই পাঁচ মিনিট আগে লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল শহরের হাসপাতালে। সঙ্গে সার্কিট হাউস থেকেও দুজন গেছেন।

একটু খোঁজ করতে জানা গেল, আহত লোকটির নাম বিজয় শাকসেনা।

৪

পাঁচমারিতে আমাদের থাকার কথা ছিল চার-পাঁচ দিন। কিন্তু আমরা ফিরে এলুম দু'দিনের মধ্যেই। এত ভাল জায়গা তবু আমাদের মন টিকছিল না। সেই গুলি চলবার পর টুরিস্টরা অনেকেই ফিরে গেল। জায়গাটা এমনিতেই ফাঁকা, এখন যেন একেবারে শুনশান। আমরা অবশ্য সেজন্য কিংবা ভয় পেয়ে ফিরিনি। ফিরতে হল ছোড়দির জন্য। ছোড়দির সর্দিটা খুব বেড়ে গিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ফিরে এসেই রত্নেশদা খবর নিল। বিজয় শাকসেনা এখানকার কোনও হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। অফিসেও কোনও খবর আসেনি।

আর ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা এখনও নিরুদ্দেশ। অবশ্য তাঁর মৃতদেহের সন্ধানও পাওয়া যায়নি।

রত্নেশদা বলল, 'ভূপাল অনেক দূর । পাঁচমারি থেকে কাছাকাছি কোনও হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে নিশ্চয়ই। অফিস থেকে তার খোঁজে চারদিকে খবর পাঠান হয়েছে।' এরপর আরও তিনদিন কেটে গেল, এরমধ্যে আর নতুন কোনও খবর নেই। আমি এখানে এসেই কাকাবাবুকে একটা চিঠি লিখেছিলুম, তার কোনও জবাব পাইনি। কিন্তু মা'র কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে, মা লিখেছেন তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যেতে। কাকাবাবুর আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হল কি না তা জানা গেল না।

এর মধ্যে একদিন ধীরেনদা এসে বললেন, 'চল সন্তুবাবু, এবারে তোমাদের একদিন ভীমবেঠ্কা দেখিয়ে নিয়ে আসি। সাঁচিও তো দেখনি! চল, কালকেই ভীমবেঠ্কা ঘুরে আসি। তারপর একদিন সাঁচি দেখে নিও।

দীপ্ত বলল, 'বাবা আমরা বেশ খাবার-দাবার নিয়ে যাব। ভীমবেঠ্কায় পিকনিক করা যাবে।'

আমি দীপ্তকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি ভীমবেঠ্কায় গেছ?'

দীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ, দুবার!'

'কি আছে সেখানে?'

দীপ্ত কিছু বলার আগেই ধীরেনদা বললেন, 'এখন বলিস না রে, দীপ্ত! ওটা সারপ্রাইজ থাক!'

রত্নেশদা আর নিপুদার অসুখ, ওরা যেতে পারবে না।

ছোড়দির সর্দি। সুতরাং রিনাদি আর ধীরেনদা, দীপ্ত আর আলো, আমি আর মিংমা,এই ক'জন গেলুম পরদিন। বেরিয়ে পড়লুম সকাল দশটার মধ্যে।

প্রথমে পাঁচমারির দিকেই খানিকটা যাবার পর এক জায়গায় আমরা বেঁকে গেলুম ডান দিকে। তারপর রাস্তাটা ক্রমশ একটু একটু উঁচুতে উঠতে লাগল অথচ সামনের দিকে ঠিক যে কোনও পাহাড় আছে তা বোঝা যায় না। আরও খানিকটা যাবার পর চোখে পড়ল রাস্তার এক পাশে রয়েছে অনেক বড়-বড় পাথরের চাঁই কিছুক্ষণ চলার পর ধীরেনদা একটা গাছের তলায় গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'এই হল ভীমবেঠ্কা!'

আমি ধীরেনদা আর রিনাদির মুখের দিকে তাকালুম। সারপ্রাইজ দেবার নাম করে কি আমাকে ঠকাতে নিয়ে এলেন এখানে? এ আবার কি জায়গা? একটা টিলার ওপরে কতকগুলো দোতলা-তিনতলা সমান পাথর পড়ে আছে। জায়গাটা সুন্দর নয়, তা বলছি না, বেশ নিরিবিলি, পিকনিক করার পক্ষে ভালই। কিন্তু যে কোনও পাহাড়ি জায়গাতেই তো এরকম দেখা যায়। দূরে কোথাও যাবার সময় রাস্তার ধারে এ রকম কত জায়গা চোখে পড়ে। আমি হিমালয়ের কত চূড়া দেখেছি, এভারেস্টের কাছাকাছি থেকে এসেছি, আমাকে ধীরেনদা এই কয়েকটা পাথর দেখিয়ে অবাক করতে চান?

ধীরেনদা বললেন, 'ভীমবেঠ্কার আসল নাম কি জান? ভীমবৈঠক। মহাভারতের ভীম নাকি এখানে আড্ডা দিতেন। বোধহয় হিড়িম্বার সঙ্গে!'

পেল্লায় আকারের. পাথরের চাঁইগুলোর চেহারায় খানিকটা ভীমভীম ভাব আছে বটে। কিন্তু এরকম গল্পও তো আগে অনেক জায়গায় গিয়ে শুনেছি।

ধীরেনদা আবার বললেন, 'এখন জায়গাটা অবশ্য ভীমের জন্য বিখ্যাত নয়। শোন, সন্তু, এরকম জায়গা কিন্তু সারা পৃথিবীতেই খুব কম আছে। তোমার কাকাবাবু এলে এ জায়গাটা খুবই পছন্দ করতেন।'

সারা পৃথিবীতে খুব কম আছে? ধীরেনদা এখনও আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন? এরকম ছোট পাহাড়ি জায়গা আমি নিজেই অন্তত একশোটা দেখেছি! রিনাদি আর দীপুরা মিটিমিটি হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

ধীরেনদা বললেন, 'বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, মনে হয় খুব সাধারণ জায়গা, তাই না? সেটাই এর মজা। একটু ভেতরে ঢুকলেই বুঝতে পারবে আসল ব্যাপার। চল!'

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, সামনের দিকে একটা বড় পাথরের গায়ে একটি আশ্রম। সেখানে দু'তিনজন এমনি লোক, একজন সাধু একটা গোরু আর একটা কুকুর রয়েছে, আর এই দিনের বেলাতেও ধুনির আগুন জ্বলছে। ভারতবর্ষে বোধহয় এমন কোনও পাহাড় নেই, যার চূড়ায় কোনও মন্দির বা সাধুর আশ্রম নেই।

ধীরেনদা চুপিচুপি বললেন, 'যখনই এই সাধুর আশ্রমটা দেখি, তখনই মন খারাপ হয়ে যায়। বুঝলে, একটা বেশ বড় গুহার মুখটি জুড়ে ওই আশ্রম। ওই গুহার মধ্যে যে কি অমূল্য সম্পদ ওই সাধুবাবাটি নষ্ট করেছেন, তা উনি নিজেই জানেন না! চল আমরা ডান দিকে যাব।'

বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোকে এক একটা আলাদা পাহাড় বলেও মনে করা যায়, আর সেগুলোর মাঝখান দিয়ে বেশ গলির মতন যাতায়াতের জায়গাও রয়েছে। একটা সেইরকম পাথরের সামনে এসে ধীরেনদা থামলেন এই পাথরটার গড়নটা একটু অদ্ভুত। মাঝখান থেকে অনেকটা যেন কেউ কেটে নিয়ে একটা বারান্দার মতন বানিয়েছে। মাথার ওপর ছাউনি অবশ্য, এমনিই পাথরটা ওই রকম।

ধীরেনদা বললেন, 'ধর, এখন যদি খুব বৃষ্টি নামে, তাহলে আমরা সবাই মিলে এখানে আশ্রয় নিতে পারি, তাই তো? এক লক্ষ বছর আগেও আমাদেরই মতন কোনও মানুষ ওই জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল!'

'এক লক্ষ বছর আগে?'

'প্রমাণ চাও? ওই দ্যাখ!'

ধীরেনদা আঙুল দিয়ে পাথরের দেওয়ালে একটা জায়গায় কি যেন দেখাতে চাইলেন। প্রথমে আমার চোখেই পড়ল না। তারপর দেখলুম দেওয়ালের গায়ে একটা হাতির ছবি। ছ'সাত বছরের বাচ্চারা যে-রকম আঁকে। অনেকটা সেই ছবির মতন।

ধীরেনদা বললেন, 'এই ছবিটা অন্তত পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছরের আগেকার আঁকা।'

আমি বললুম 'ধীরেনদা, আপনি আমাকে বড্ড বেশি ছেলেমানুষ ভাবছেন! আমি জানি, ওই ছবিটা আপনি নিজেই আগে একদিন এসে এঁকে রেখে গেছেন!'

ধীরেনদাস রিনাদি সবাই হেসে উঠলেন একসঙ্গে।

রিনাদি বললেন, 'আগেরবার সমরেশদা এসেও প্রথমে এই কথা বলেছিলেন না?'

ধীরেনদা বললেন, 'এই রকম জায়গাকে বলে রক শেলটার। সত্যিই আদিমকালের মানুষরা এখানে ছিল। এ-রকম একটা নয়, অন্তত একশ কুড়ি-তিরিশটা রক শেলটার আছে এই জায়গায়।'

'চল তোমায় দেখাব, আদিম মানুষদের আঁকা এ-রকম হাজার হাজার ছবি আছে। একসঙ্গে এত রক শেলটার, বললুম না, সারা পৃথিবীতে এ-রকম জায়গা খুব কম আছে!'

'কিন্তু এই ছবিটা যে অত পুরনো, তা বুঝব কি করে?'

'বড় বড় ঐতিহাসিকরা এই সব ছবি পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। রেডিও কার্বন টেস্টে যে-কোনও জিনিসের বয়স বার করা যায়। দীপু, তুই যা তো, সন্তুকে এবার বোর্ডটা পড়িয়ে নিয়ে আয়। আগে ইচ্ছে করে তোমায় ওটা দেখাইনি।'

দীপু আমাকে আবার নিয়ে এল রাস্তার ধারে। সেখানে একটা বড় নীল রঙের বোর্ড রয়েছে, তাতে সাদা অক্ষরে অনেক কথা লেখা। আমাদের দেশে সব ঐতিহাসিক জায়গাতেই পুরাতত্ত্ববিভাগ এ-রকম বোর্ড লাগিয়ে রাখে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম ধীরেনদা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না। সেই বোর্ডে লেখা আছে যে, ১৯৫৮ সালে ভি এস ওয়াকা নকার নামে একজন ঐতিহাসিক এই জায়গাটা আবিষ্কার করেছেন। বেশিদিন আগের তো কথা নয়। তার আগে এই জায়গাটার কথা কেউ জানতই না। বোর্ডে আরও লিখেছে যে, এত বেশি প্রাগৈতিহাসিক ছবি ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। এখানে প্রস্তর যুগের গোড়ার দিক থেকে (অর্থাৎ ১০০,০০০ বছর আগে) প্রস্তর যুগের শেষ পর্যন্ত (১০,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর আগে) একটানা মনুষ্য-বসবাসের চিহ্ন আছে তাদের তৈরি পাথরের কুঠার আর অন্যান্য জিনিসপত্তরও (মাইক্রোলিথিক টুলস) পাওয়া গেছে। আরও কী সব মেসোলিথিক, চালকোলিথিক যুগের কথা লেখা, তার মানে আমি বুঝতে পারলুম না, কাকাবাবু থাকলে বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

এখানকার এইসব গুহাতে সম্রাট অশোক কিংবা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় পর্যন্তও মানুষ ছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারপর এই জায়গাটার কথা সবাই ভুলে যায়। এখন আবার এক সাধুবাবাজী একটা গুহায় থাকছেন। সুতরাং এখনও এখানে সেই আদিম মানুষদের বংশধর রয়ে গেছে, তা বলা যায়!

বোর্ডটা পড়বার পর খানিকক্ষণ আমি হতবাক হয়ে রইলুম। এক লক্ষ বছর! আমি যে-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক এইখানে এক লক্ষ বছর আগে মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছে? লোহার মতন শক্ত তাদের শরীর, হাতে পাথরের হাতুড়ি, তারা দাঁতাল হাতি আর অতিকায় বাঘ-ভাল্লুক-গণ্ডারের সঙ্গে লড়াই করেছে।

দীপু বলল, 'এমন-এমন সব গুহা আছে, দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। মনে হবে তৈরি করা। কিন্তু কোনটাই তৈরি করা নয়। চল, আগে তোমায় থিয়েটার হলটা দেখাই।'

গিয়ে দেখলুম, ধীরেনদারা সেখানেই বসে আছে। সত্যিই জায়গাটা ছোট-খাট একটা থিয়েটার হলের মতন। বেশ চওড়া, চৌকামতন জায়গা, ওপরটা ঢাকা, একদিকে বেদীর মতন: দেখলে অবশ্য বোঝা যায়, কোনও মানুষ এটা তৈরি করেনি, প্রকৃতির হাতে গড়া।

ধীরেনদা বললেন, 'তখনকার লোকেরা থিয়েটার করতে জানত কি না তা অবশ্য আমরা জানি না। কিন্তু অনেকে নিশ্চয়ই এখানে ঘুমোত। কী চমৎকার জায়গা বল তো, বাইরে যতই ঝড়-বৃষ্টি হোক, গায়ে লাগবে না! বাইরের দিকটায় নিশ্চয়ই কয়েকজন সারা রাত জেগে পাহারা দিত, যাতে হিংস্র কোনও জন্তু এসে ঢুকে না পড়ে। আমার ইচ্ছে করে, বাড়িঘর ছেড়ে আমিও এরকম জায়গায় থাকি!'

রিনাদি বললেন, 'থাকলেই পার। বেশ চাকরি-বাকরি করতে হবে না, কোনও চিন্তা থাকবে না।'

আলো বলল, 'বেশ পড়াশুনোও করতে হবে না! ইস্কুলে যেতে হবে না।'

ধীরেনদা বললেন, 'কিন্তু খাব কি? সেই সময়কার লোকেরা হরিণ, শুয়োর, খরগোশ এইসব মেরে খেত। এখন তো আর সেসব পাওয়া যায় না। এখনকার দিনে গুহায় থাকতে হলে সাধু সাজতে হয়!'

দীপু বলল, 'বাঃ, এখনও এখানে হরিণ আছে। আমি আগের বার এসে নিচের দিকের গুহাগুলোর কাছে হরিণের পায়ের ছাপ দেখেছিলাম। টাটকা।'

রিনাদি বললেন, 'হরিণ না ছাই! নিশ্চয়ই ছাগলের পায়ের ছাপ। নিচের গ্রাম থেকে এখানে রাখালরা গোরু-ছাগল চরাতে আসে।'

ধীরেনদা বললেন, 'এখানকার দেওয়ালের গায়ে শ্যাওলা জমে আছে। সেইজন্যেই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এখানেও ছবি আছে। চল, অন্য গুহায় যাই, পরিষ্কার ছবি দেখতে পাওয়া যাবে।'

এর পরের গুহাটা আবার অন্যরকম। সামনের দিকটা ছোট মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়, কিন্তু ভেতরটা ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে। একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। ধীরেনদা টর্চ জেলে বললেন, 'এই দ্যাখ।'

এবার দেখলুম মাথার ওপরের পাথরে এক সারি মানুষ আঁকা। এই রকমঃ

ছবিগুলির রং গেরুয়া ধরনের। ওই রঙের কোনও পাথর ঘষে ঘষে আঁকা।

রিনাদি বললেন, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ, সব ছবি এক রকম নয়। এরই মধ্যে দু'একজন যেন নাচছে মনে হচ্ছে, তাই না? ওরা নিশ্চয়ই নাচতেও জানত।'

দীপু বলল, 'নাচতে তো সবাই জানে, মা! ধেই-ধেই করে লাফালেই নাচ হয়।'

আলো মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, ওরা এ-রকম বাচ্চাদের মতন ছবি আঁকত কেন?'

রিনাদি বললেন, 'এক লক্ষ বছর আগেকার মানুষ। তারা তো মনের দিক থেকে বাচ্চাই ছিল। ছবি আঁকার কথা যে চিন্তা করেছে, এটাই যথেষ্ট নয়?'

ধীরেনদা বললেন, 'আমরা প্রথমবার যেবার এসেছিলাম, সে-কথা মনে আছে, রিনা? কী ভয় পেয়েছিলুম! এই গুহাটাতেই তো, না?'

রিনাদি বললেন, 'হ্যাঁ এটাতেই। সেবার কী হয়েছিল জান, সন্তু? সেবার দীপু আর আলো আসেনি। আমি আর তোমাদের ধীরেনদা গুঁড়ি মেরে এই গুহাটাতে ঢুকে টর্চ জ্বেলেছি, দেখি যে এক কোণে একটা মানুষ বসে। আমি তো ভয় পেয়ে এমন চিৎকার করে উঠেছিলুম।'

ধীরেনদা হাসতে-হাসতে বললেন, 'শুধু চিৎকার! তুমি এমন লাফিয়ে উঠলে যে, ছাদে তোমার মাথা ঠুকে গেল।'

রিনাদি বললেন, 'আহা, তুমি ভয় পাওনি?'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ আমিও একটু একটু ভয় পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু চ্যাঁচাইনি! তারপর সেই মানুষটা হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। সে কে জান? ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা! উনি এই সব ছবির ফটোগ্রাফ তুলছিলেন, সেই সময় ওঁর ক্যামেরার ফ্লাশটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

রিনাদি বললেন, 'ডক্টর শাকসেনা তো এখানে বোধহয় প্রত্যেকদিন আসতেন। আমরা যতবার এসেছি, ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

আমি বললুম, 'ডক্টর শাকসেনাকে পাওয়া যাচ্ছে না..... উনি এ-রকম কোনও গুহার মধ্যে লুকিয়ে নেই তো?'

ধীরেনদা বললেন, 'ওঁর এখানকার সব ছবি তোলা হয়ে গেছে! চল, এখান থেকে বাইরে যাই।'

এরপর কয়েকটা গুহায় আমরা ওইরকম একই ছবি দেখলুম। তারপরের একটা গুহায় দেখা গেল হরিণের ছবি।

ধীরেনদা বললেন, 'জান তো, ঐতিহাসিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, একই দেওয়ালে এক যুগের আঁকা ছবির ওপর অন্য যুগের মানুষরা ছবি এঁকেছে। খুব বড় ম্যাগনিফায়িং গ্লাস আনলে বোঝা যায়। চল, পাশের গুহাটায় চল, একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি।'

সেই গুহাটা অনেকটা খোলামেলা। খানিকটা উঁচুতেও বটে। মুখটা প্রকাণ্ড, ভেতরটা সরু। একটা ডিমের আধখানা খোলার মতন। পাশের একটা পাথরের ওপর উঠে সেটাতে ঢোকা যায়। সেই গুহার ছাদে আঁকা একসার মানুষের মধ্যে একটা মানুষ একেবারে আলাদা। সেই মানুষটা একটা ঘোড়ায় চড়ে বর্শার মতন একটা জিনিস দিয়ে একটা হরিণকে মারছে।

ধীরেনদা বললেন, 'এটাকে দেখছ? এই ঘোড়ার পিঠে চড়া মানুষ কিন্তু অনেক পরের যুগে আঁকা। মানুষ বেশি দিন ঘোড়ায় চাপতে শেখেনি। এমন কী, রামায়ণ-মহাভারতের সময়েও ছিল না।'

দীপু আর আমি দু'জনেই একসঙ্গে বললুম, 'রামায়ণ-মহাভারতে ঘোড়া নেই?'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, আছে ঘোড়ায় রথ টেনেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে কেউ চেপেছে কি? রাম-লক্ষ্মণ কিংবা অর্জুনের মতন বীর কখনো ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছে? তা কিন্তু করেনি!'

'মহাভারতের যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল না?'

'ছিল কি না তা জানি না। কিন্তু সেরকম যুদ্ধের কোনও বর্ণনা নেই। হাতির পিঠে চেপে যুদ্ধ করার বর্ণনা আছে, শল্য এসেছিলেন হাতিতে চেপে, কিন্তু ঘোড়ায় চেপে কে এসেছিলেন বল?'

রিনাদি হেসে বললেন, 'তোমাদের ধীরেনদা আগে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, এখন হয়ে উঠছেন ইতিহাসের পণ্ডিত!'

ধীরেনদা রিনাদির ঠাট্টাকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'আরও একটা ব্যাপার কী জান! এই সব ছবির মধ্যে কিছু কিছু আছে একদম ভেজাল। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই তো এর কোন মূল্য বোঝে না। সাহেবদের দেশে এ-রকম এতকালের পুরনো কোনো ব্যাপার পাওয়া গেলে কত যত্ন করে ঘিরে-টিরে রাখত, পাহারাদার থাকত। কিন্তু এখানে যে-যখন খুশি আসতে পারে, ইচ্ছে মতন এসব ছবি নষ্টও করতে পারে। ভাগ্যিস বেশি লোক এই জায়গাটার খোঁজ রাখে না। তবু কিছু লোক এখানে কোনও কোনও গুহার ছবির পাশে ইয়ার্কি করে নিজেরা ছবি এঁকে গেছে। সেগুলো অবশ্য দেখলেই চেনা যায়।'

রিনাদি বললেন, 'যাই বল বাপু, জায়গাটা বড্ড নির্জন। আমার তো বেশিক্ষণ থাকলে গা ছম্‌ছম্ করে। এখানে যদি কেউ কোনও মানুষকে খুন করে রেখে যায়, অনেক দিনের মধ্যে তা কেউ টেরও পাবে না।'

দীপু বলল, 'মনোমোহন ঝাঁর চাকরকে জিব-কাটা অবস্থায় এখানেই কোথায় পাওয়া গিয়েছিল না?'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, এই পাহাড়ের নিচে। দু'দিন ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল! তারপর এখানকার সাধুজী ওকে দেখতে পেয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে একটা গাড়ি থামিয়ে খবর দেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'সেই লোকটি বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ, বেঁচে উঠেছে। লোকটি নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে। হয়তো মনোমোহন ঝাঁর খুনিকেও ও দেখেছে। মুখ দিয়ে শব্দ করে ও কিছু বলতে চায়, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা নেই। ও লেখাপড়াও জানে না! তা হলে লিখে বোঝাতে পারত।'

আর দু'তিনটে গুহা ঘোরার পর রিনাদি বললেন, 'আমি বাপু আর পারছি না। আমরা ওপরে বসি। এবার দীপু দেখিয়ে আনুক সন্তুকে।'

ধীরেনদা বললেন, 'তাই যাক। অবশ্য একশ তিরিশটা গুহার সব ওরা দেখতে পারবে না একদিনে। যতগুলো ইচ্ছে হয় দেখে আসুক।'

গুহাগুলো ক্রমশই নেমে গেছে পাহাড়ের নিচের দিকে। মাঝে মাঝে আবার ওপরেও উঠতে হচ্ছে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম একটার পর একটা গুহা।

ছবি অবশ্য বেশির ভাগ গুহাতেই এক রকম। মানুষের ছবিই বেশি। একটাতে দেখতে পেলুম কয়েকটা রথের মতন জিনিসের ছবি।

মিংমা সব সময় আমাদের পেছনে পেছনে ছায়ার মতন আসছে। এখানকার ব্যাপারটা সে বুঝতে পারেনি, আমি যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। এক-একটা গুহার মধ্যে ঢুকে অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে ছোট ছোট ছবি খুঁজে বার করার ব্যাপারে ও নিজেই বেশ মজা পেয়েছে। যেগুলো আমরা দেখতে পাই না সেগুলো ও দেখায়।

একটা গুহা বিরাট বড়। এটাকে ঠিক গুহা তো বলা যায় না, নিচে বেশ সিমেন্টের মেঝের মতন মসৃণ পাথর আর তার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথর যেন ঝুলছে। অবশ্য সেই পাথরটা পড়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, হয়তো ওই অবস্থাতেই রয়েছে কয়েক লক্ষ বছর। মাঝখানের জায়গাটিতে অন্তত পঞ্চাশ ষাট জন লোক শুয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এত বড় একটা গুহাতে কিন্তু আমরা কোনও ছবি খুঁজে পেলুম না। এক এক জায়গায় মনে হল যেন ছবি আঁকা ছিল, কেউ ঘষে ঘষে মুছে দিয়েছে।

আমরা মন দিয়ে সেই গুহার মধ্যে ছবি খুঁজছি, এমন সময় হঠাৎ এমন বিকট একটা আওয়াজ হল যে, দীপু আর আমি দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলুম। আমরা ভয় পাওয়ার চেয়েও চমকে গেছি বেশি। কোনও মানুষ না জন্তু ওই আওয়াজটা করল তা বুঝতে পারলুম না।

তক্ষুনি আবার সেই আওয়াজটা হল। এবার বুঝলাম, কোনও জন্তু ও-রকম শব্দ করতে পারে না! মানুষেরই মতন গলা, যেন কেউ কোনও হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে শব্দ করছে হী-ঈ-ই-ঈ-ঈ! এমনই ভয়ঙ্কর সেই শব্দ যে শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে।

গুহাটার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ান যায় না, আমরা দাঁড়িয়েছিলুম ঘাড় বেঁকিয়ে। সেই অবস্থাতেই মিংমা সাঁ করে ছুটে গেল বাইরে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিংমার গলার একটা কাতর আওয়াজ পাওয়া গেল আঃ!

এবার আমি আর দীপুও বাইরে চলে এলুম। এসে যা দেখলুম, তা ভাবলে, এখনও যেন গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

মিংমা গুহার বাইরে লুটিয়ে পড়ে আছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। হ্যাঁ, মানুষই বটে! সারা মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা, মাথায় জট-পাকানো চুল গা-ভর্তি বড় বড় লোম আর দৈত্যের মতন চেহারা। একটা পুরো কলাপাতা তার কোমরে জড়ান, সেইটাই তার পোশাক, হাতে একটা পাথরের মুগুর। ঠিক ছবিতে দেখা গুহামানব যেন একটি।

লোকটি আগুনের ঢেলার মতন চোখে কট্‌মট্‌ করে তাকাল আমাদের দিকে। ঠিক যেন বলতে চায়; আমার গুহায় তোমরা ঢুকেছ কেন? ওই পাথরের হাতুড়ি দিয়ে মারলে আমার আর দীপুর মাথা তক্ষুনি ছাতু হয়ে যেত। কিন্তু কোনও কারণে আমাদের ওপর দয়া করে মারল না, চট করে সরে গেল পাথরের আড়ালে।

দীপু আর আমি পাথরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলুম। একটুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলুম না। সত্যিই এক লক্ষ বছরের কোনও গুহামানবের বংশধর এখনও এখানে রয়ে গেছে?

মিংমা আবার 'আঃ' শব্দ করতেই আমাদের দু'জনের বিস্ময়ের ঘোর ভাঙল। দু'জনে কোনও আলোচনা না-করেই মিংমাকে চ্যাং-দোলা করে তুলে ছুট লাগালুম। বারবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম, সেই মানুষটা তাড়া করে আসছে কি না!

মিংমার বাঁ কানের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুগুরের আঘাতটা ওর মাথায় লাগেনি, লেগেছে ঘাড়ে। তাতে ও একটুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই জ্ঞান ফেরায় ও বলল, ছোড় দোও, আভি ছোড় দোও।

বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে আমরা মিংমাকে শুইয়ে দিলুম এক জায়গায়। মিংমা উঠে বসে হাত দিয়ে কানের রক্ত মুছল, মাথাটা ঝাঁকাল দু' তিনবার। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে এক সাংঘাতিক কাণ্ড করল। একটা বড় পাথর টপ্‌ করে তুলে নিয়ে ও তরতর করে ছুটে গেল সেই গুহাটির দিকে। আমাদের বাধা দেবার কোনও সুযোগই দিল না। মিংমা পাহাড়ি জায়গার মানুষ, কেউ আঘাত করলে ওরা প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না।

দীপুকে বললুম, 'চল, আর বাও নাই।'

দীপু আর আমিও তুলে নিলুম দুটো পাথর। তারপর অনুসরণ করলুম মিংমাকে। সেই বড় গুহাটার বাইরে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেলে দেখা হল ভাল করে। সেখানে ওই লোকটা ঢোকেনি। মিংমা এদিক-ওদিকেও খানিকটা খুঁজে এসে বলল, 'ভাগ গয়া!'

এখানে কেউ যদি লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে খুঁজে বার করা এক রকম অসম্ভব বললেই হয়। একটা এইরকম ছোট পাহাড়ে এতগুলো গুহা, বোধহয় আর কোথাও নেই।

দীপু বলল, 'চল, ওপরে গিয়ে বাবাকে বলি!

ওপরে উঠতে উঠতে আমি ভাবতে লাগলুম, ব্যাপারটা কী হল, আজকের দিনে কোনও আদিম মহামানব কি টিঁকে থাকতে পারে? তাও ভূপাল শহরের এত কাছে? না, অসম্ভব! এ-কথা শুনলে যে কেউ হাসবে। তা হলে কেউ আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। কেন? কেউ কি চায় যে, আমরা আর ওই গুহাগুলোর মধ্যে না ঢুকি? একটা পাহাড়ের গুহার মধ্যে আদিম মানুষদের আঁকা ছবি দেখব, এতে কার কী আপত্তি থাকতে পারে? এই পাহাড়টা নিশ্চয়ই গভর্নমেন্টের সম্পত্তি।

হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ হল, যাকে একটু আগে দেখলুম, মাথায় চুলের জটা, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল.... ও রকম চেহারা তো কোনও সাধুরও হতে পারে। ওপরে একটা গুহায় একজন সাধুবাবা যে মন্দির বানিয়েছে, তিনিই আমাদের ভয় দেখাতে আসেননি তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। সাধুবাবা চান যাতে এখানে বাইরের লোকজন না আসে।

যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। দীপু দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে যখন ধীরেনদাকে সব ঘটনাটা বলল, তখন ধীরেনদা হা-হা করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'দীপু যখন-তখন গল্প বানায়, ভাবে যে আমরা বিশ্বাস করব।'

রিনাদি বললেন, 'তুই মোটেই লেখক হতে পারবি না দীপু, তোর গল্পগুলো বড্ড গাঁজাখুরি হয়। যা, যথেষ্ট হয়েছে, গাড়ি থেকে টিফিন কেরিয়ারগুলো নিয়ে আয়, এবার খেয়ে নেওয়া যাক।'

দীপু বলল, 'তোমরা বিশ্বাস করলে না? সন্তুকে জিজ্ঞেস কর! আর ওই দ্যাখ মিংমার কানের পাশ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে!'

রিনাদি বললেন, 'সন্তু আর কী বলবে, ওকে তো আগে থেকেই শিখিয়ে এনেছিস। মিংমা নিশ্চয়ই আছাড়-টাছাড় খেয়ে পড়েছে কোথাও!'

ধীরেনদা বললেন, 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরিতে গুহামানব, অ্যাঁ? দু' একটা থাকলে মন্দ হত না। কেয়া হুয়া মিংমা? আছাড় খাকে গির্ গিয়া, তাই না?' মিংমা বলল 'একঠো আদমি, বহুত তাগড়া জোয়ান পাঠ্যে, হাঁতে পাথরের লাঠি, খুব জোরসে হামায় মারল!'

ধীরেনদার ধারণা হল, মিংমা বোধহয় মিথ্যে কথা বলছে না। তিনি একটু চিন্তিতভাবে বললেন, 'সত্যিই মেরেছে? তাহলে কোনও পাগল-টাগল হবে বোধহয়!'

রিনাদি বললেন, 'দেখি, কতটা লেগেছে?'

পরীক্ষা করে দেখা গেল, মিংমার শার্টের নিচে কাঁধেও খানিকটা থেঁতলে গেছে। বেশ জোরেই আঘাত করেছে, মিংমার আরও বেশি ক্ষতি হত, যদি মাথায় লাগত।

ধীরেনদা বললেন, 'চল তো, সাধুবাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, এখানে কোনও পাগল-টাগল ঘুরে বেড়ায় কিনা। উনি নিশ্চয়ই জানবেন।'

আমিও তাই চাই। সাধুবাবাকে একবার দেখা দরকার। আমি বললুম 'চলুন ধীরেনদা, সাধুবাবার কাছে চলুন।'

গুহাগুলোর পাশ দিয়ে যে গলি-গলি মতন রয়েছে, ধীরেনদা সেই পথ খুব ভাল চেনেন। বেশ শর্টকাটে উনি আমাদের চট্ করে নিয়ে এলেন সাধুবাবার আশ্রমের কাছে।

সেখানে জ্বলন্ত ধুনির পাশে একটা খাটিয়ায় একজন মানুষ আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসে আশ্রমের দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। দূর থেকে সেই চেহারা দেখেই আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠল। পেছন থেকে কাঁধের ভঙ্গিটাই যে খুব

চেনা মনে হচ্ছে। আমরা একটু কা যেতেই আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে সেই মানুষটি মুখ ফেরাল আমাদের দি .

আমি চিৎকার করে বলে উঠ-ুম, 'কাকাবাবু?'

৫

ধীরেনদা, রিনাদিরাও কাকাবাবুকে দেখে যেমন চমকে উঠলেন, তেমনই খুশি হলেন।

মিংমাও 'আংক্‌ল সাব' বলে লম্বা একটা সেলাম দিল।

কাকাবাবু অবশ্য আমাদের দেখে একটুও অবাক হলেন না। বরং তাঁর মুখে একটা রাগ-রাগ ভাব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মিংমা, তুমহারা কানসে খুন গিরতা! কেয়া হুয়া?'

এবারে দীপুর বদলে আমিই সবিস্তারে ঘটনাটা জানালুম।

কাকাবাবু এতেও বিচলিত হলেন না। শুধু বললেন, ' হুঁ '। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মিংমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মুছে ফেল! আর ওই যে গাঁদাফুলের গাছ দেখছ, ওর কয়েকটা পাতা হাত দিয়ে চিপে সেই রসটা কাটা জায়গায় লাগিয়ে দাও!'

ধীরেনদা বললেন, 'কাকাবাবু, আপনি ভূপালে এসেছেন, সেটা আমাদের বিরাট সৌভাগ্য। কিন্তু ... আপনি এ জায়গায় কি করে রাস্তা চিনে এলেন? আপনি ভীমবেঠ্‌কার কথা আগে জানতেন? কাকাবাবু কোনও উত্তর দেবার আগেই আশ্রমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক সাধু। গেরুয়া কাপড় পরা, রোগা লম্বা চেহারা, থুতনিতে একটু দাড়ি, মাথায় চুলও কম।

কাকাবাবু বললেন, 'নমস্তে, সাধুজী! আচ্ছা হ্যায় তো?'

সাধুজী চোখ কুঁচকে কাকাবাবুকে ভাল করে দেখে তারপর বললেন, 'কওন? আরে, ইয়ে তো রায়চৌধুরীবাবু! রাম, রাম! ভগবান আপকা ভালা করে!'

বুঝলুম, কাকাবাবু যে শুধু ভীমবেঠ্‌কার কথা আগে থেকে শুনেছেন তাই নয়। তিনি এখানকার সাধুজীকেও চেনেন!

আরও দু'একটা কথা বলার পর কাকাবাবু সাধুজীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, সাধুজী, আপনার এখানে কোনও পাগল-টাগল ঘুরে বেড়ায়? এরা একজনকে দেখেছে বলল —'

সাধুজী হিন্দিতে বললেন, 'হ্যাঁ, পাগল তো এক আমিই আছি। আর কোন্‌ পাগল এখানে থাকবে?'

একটু থেমে সাধুজী আবার বললেন, 'তবে কি জানেন, রায়চৌধুরীবাবু, রাত্তিরের দিকে কারা যেন এখানে আসে! আমি শব্দ পাই। আগে, জানেন তো, ভূত-প্রেতের ভয়ে সাঁঝের পর এখানে মানুষজন আসত না। কাছাকাছি গাঁয়ের লোক তো এ-জায়গার নাম শুনলেই ভয় পায়। আমি ভূতপ্রেত মানি না। আমি জানি ওসব কিছু নেই। কিন্তু এখন রাত্তিরে কারা আসে তা আমি জানি না।'

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ, আমিও তাই ভেবেছিলুম।' —

উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ্ বগলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, 'সাধুজী, আমি একটু পরে ঘুরে আসছি। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'চল।'

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কখন পৌঁছলেন ভূপালে?'

কাকাবাবু হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'এই এগারোটার সময়। রুমি বলল যে, সন্তুরা সবাই ভীমবেঠ্‌কায় গেছে। তাই আমিও একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে এলুম।'

রিনাদি বললেন, 'তা হলে তো আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়নি। আমাদের সঙ্গে খাবার আছে, আসুন আমরা খেয়ে নিই।'

কাকাবাবু বললেন, 'বেশ তো।'

গাড়ি থেকে আমরা টিফিন কেরিয়ারগুলো আর জলের বোতল নামিয়ে নিলুম। তারপর গিয়ে বসলুম একটা বিরাট পাথরের ছায়ায়।

রিনাদি যে কতরকম খাবার এনেছেন তার ঠিক নেই। হ্যাম স্যান্ডুইচ, সসেজ, স্যালামি, চিকেন রোস্ট, রাশিয়ান স্যালাড, আরও কত কী।

খাওয়া শুরু করার পর আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু আপনি হঠাৎ ভূপালে এলেন কেন? তখন না বলেছিলেন..'

কাকাবাবু বললেন, 'আসতে হল বাধ্য হয়ে। ওই যে নিপু, ও একটা গাধা। কলকাতায় গিয়ে বারবার বলছিল, ভূপালে তিনটে খুন হয়েছে। খুনি ধরা কি আমার কাজ? কিন্তু নিপু একবারও বলেনি, যে তিনজন খুন হয়েছেন, তাঁরা তিনজনই পরস্পরকে চিনতেন, তিনজনেই গবেষণা করতেন ইতিহাস নিয়ে।'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, অর্জুন শ্রীবাস্তবকে সব সময় ইতিহাসের বই-ই পড়তে দেখেছি।'

কাকাবাবু বললেন, 'অর্জুন শ্রীবাস্তব, সুন্দরলাল বাজপেয়ী, মনোমোহন ঝাঁ —এঁরা তিনজনেই ইতিহাসের নামকরা পণ্ডিত। সুন্দরলাল বাজপেয়ীর সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল, একবার ভূপালে এসে আমি সুন্দরলালের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম।'

রিনাদি বললেন, 'তা হলে তো ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনাও ..'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঐতিহাসিক হিসেবে ওঁর ভারতজোড়া নাম। চিরঞ্জীব আমার বিশেষ বন্ধু। একবার আফগানিস্তানে আমরা দু'জনে একসঙ্গে এক্সকাভেশানে গিয়েছিলাম। সেবারেই একটা দুর্ঘটনায় আমার একটা পা নষ্ট হয়ে যায়।'

ধীরেনদা বললেন, 'ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, শুনেই আপনি ভূপালে এসেছেন তা হলে?'

কাকাবাবু বললেন, 'অর্জুন শ্রীবাস্তব, সুন্দরলাল বাজপেয়ী আর মনোমোহন ঝাঁ-র মৃত্যুর খবর কলকাতার কাগজে বেরোয়নি। নিপু যদি ওদের নাম বলত তা হলে আমি তখুনি বুঝতে পারতুম। যাই হোক, চিরঞ্জীব শাকসেনার উধাও হয়ে যাবার খবর সব কাগজেই বেরিয়েছে। সেইসঙ্গে আগের তিনটে খুনের খবর। তখনই আমি বুঝতে পারলুম, এগুলো সাধারণ খুন নয়। কেউ একজন বেছে বেছে ঐতিহাসিকদের মারছে কেন? এর মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে। এদের সরিয়ে দেওয়ায় কার কি স্বার্থ থাকতে পারে সেটাই আগে দেখা দরকার। সেইজন্যই আমি এসেছি।'

ধীরেনদা বললেন, 'আশ্চর্য! বেছে বেছে শুধু ইতিহাসের পণ্ডিতদের মেরে কার কি লাভ? কেউ কি কোনও ইতিহাস মুছে দিতে চায়?'

কাকাবাবু বললেন, 'সেই জন্যই রুমির কাছে শোনামাত্র চলে এলুম এখানে। মনে হল, তোমাদের এখানে কোনও বিপদ হতে পারে।'

আমি আর ধীরেনদা দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলুম, 'এখানে. কেন!'

কাকাবাবু বললেন, 'ছোটখাট একটা বিপদ যে ঘটেই গেছে তা তো দেখাই যাচ্ছে!'

তারপর মিংমার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন. 'মিংমা. তুমি চিন্তা কোর না। তোমায় যে আঘাত করেছে, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। আমার হাত থেকে সে, কিছুতেই ছাড়া পাবে না।'

মিংমা বলল, 'ও আদমি আভিতক্ ইধার-উধার হ্যায়!'

কাকাবাবু বললেন, 'রহনে দেও। ধরা সে পড়বেই!'

রিনাদি বললেন, 'তোমরা কাকাবাবুকে পাঁচমারির ঘটনাটা বল।'

ধীরেনদা তখন ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনার ভাই বিজয় শাকসেনার সঙ্গে পাঁচমারিতে দেখা হয়ে যাওয়া এবং তার পরের ঘটনা জানালেন কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর অনেকটা আপন মনেই বললেন, 'তিনজন খুন হয়েছে, আর একজন নিরুদ্দেশ, প্রত্যেকেই ইতিহাসের পণ্ডিত। এমনও হতে পারে, এঁরা ইতিহাসের কোনও একটা বিষয় নিয়েই চারজন গবেষণা করছিলেন। চিরঞ্জীব শাকসেনা এই ভীমবেঠ্‌কা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন গত মাসে।

সেইজন্য আমার সন্দেহ হচ্ছে, সমস্ত রহস্য আছে এই ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়ের গুহাগুলোর মধ্যেই। খাওয়া শেষ তো, এবার ওঠা যাক্, অনেক কাজ বাকি আছে। ধীরেনবাবু, আপনার ওপর দু'একটা দায়িত্ব দেব।'

ধীরেনদা বললেন, "আমাকে 'বাবু' আর 'আপনি' বলবেন না। শুধু ধীরেন বলুন।"

কাকাবাবু বললেন, 'বেশ তো ধীরেন, তুমি এখন মিংমাকে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও, ওর চোটের জায়গায় ওষুধ লাগিয়ে দেবে। তারপর ফোলডিং খাট

কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়, সে রকম দুটো খাটও জোগার করা দরকার। আজ সন্ধের পর থেকে মিংমা আর আমি এখানে থাকব।' ধীরেনদা অবাক হয়ে বললেন, 'এখানে থাকবেন? রাত্তিরবেলা?'

'হ্যাঁ। আমি আগেও তো এখানে থেকেছি। ১৯৫৮ সালে এই গুহাগুলো আবিষ্কার হবার ঠিক পরের বছরই চিরঞ্জীব আর আমি এখানে এসে দু'রাত্তির ছিলাম। তখন গুহাগুলোর মার্কিং হচ্ছিল।'

আমি বললুম, 'তাহলে তিনটে খাট লাগবে। আমিও থাকব।'

ধীরেনদা রিনাদির দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি যদি বাচ্চাদের নিয়ে বাড়ি সামলাতে পার, তা হলে আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এখানে থেকে যাই। যদি কাকাবাবুর সঙ্গে নতুন অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হতে পারি—'

রিনাদি বললেন, 'সে তোমার ইচ্ছে হলে থাক না! আমি বাড়িতে ঠিক ম্যানেজ করতে পারব।'

কাকাবাবু বললেন, 'অত লোক থাকলে কোনও লাভ হবে না। ধীরেন তোমাকে শহরে থেকেই কিছু কাজ করতে হবে। সন্তুরও থাকবার দরকার নেই। মিংমা তো থাকছেই আমার সঙ্গে।' মিংমা বলল, 'নেহি, সন্তু সাব্‌ভি রহেগা। আচ্ছা হোগা!'

কাকাবাবু বললেন, 'তবে তাই হোক। চল, এখন আমাকেও একবার শহরে যেতে হবে। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে , কিছু কেনাকাটিও আছে।'

কাকাবাবু যে গাড়িটা এনেছিলেন, সেটা এখনও রয়েছে। মিংমা ধীরেনদাদের গাড়িতে উঠল, আমি রইলুম কাকাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক হল যে বিকেল পাঁচটার সময় আমরা ধীরেনদার বাড়িতে মিট করব।

গাড়িতে ওঠার সময় কাকাবাবু বললেন, 'ধীরেন, তোমরা একটু সাবধানে থেক। হঠাৎ কোনও বিপদ হতে পারে। রাত্তিরবেলা বাড়ির দরজা-জানলা সব ভালভাবে বন্ধ করে রাখবে।'

ধীরেনদা হেসে বললেন, 'বারে! আমরা থাকব নিজেদের বাড়িতে, আর আপনারা থাকবেন পাহাড়ের ওপর খোলা জায়গায়। আপনি আমাদের বলছেন সাবধানে থাকতে?'

'আমাদের তো অভ্যেস আছে। আমরা আগে থেকে বিপদের গন্ধ পাই। কিন্তু তোমরা যে আজ ভীমবেঠকায় এসেছ আমার সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, এতে তোমাদের ওপর শত্রুপক্ষের নজর পড়তে পারে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, কোনও সাংঘাতিক নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর দল এর পেছনে আছে। যারা এইরকম বীভৎসভাবে খুন করতে পারে —'

'আপনারা এখানে রাত্তিরে থাকবেন?'

'তার কোনও ঠিক নেই। এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।'

'তা হলে আমি কিন্তু একটা রাত অন্তত আপনাদের সঙ্গে এখানে কাটাব।'

'আচ্ছা সে দেখা যাবে। তা হলে বিকেল পাঁচটায়?'

দুটো গাড়িই ছাড়ল একসঙ্গে। কাকাবাবু কয়েকটা জায়গায় থামলেন। আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে উনি যেন কার কার সঙ্গে দেখা করে এলেন। দেখা যাচ্ছে কাকাবাবু ভূপালের অনেককেই চেনেন।

তারপর আর একটা বাড়ির সামনে এসে বললেন, 'সন্তু এবার তুই চল আমার সঙ্গে।'

সেই বাড়ির গেটের পাশে নেমপ্লেটে লেখা ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনার নাম।

বেশ বড় তিনতলা বাড়ি, সামনে-পেছনে অনেকখানি বাগান। বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ রয়েছে সেই বাগানে। কয়েকটা পাথরের মূর্তিও দেখতে পেলাম। এক জায়গায় একটা বেঞ্চে বসে আছে দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ।

এত বড় বাড়িটা কিন্তু একদম চুপচাপ। কোনও লোকজনের শব্দ নেই। আমরা গেট ঠেলে ঢুকতেই একজন পুলিশ এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

কাকাবাবু জানালেন যে, তিনি ডক্টর শাকসেনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান।

পুলিশটি বলল যে, তিনি কারুর সঙ্গেই দেখা করছেন না। খবরের কাগজ থেকে অনেক লোক এসেছিল, সবাই ফিরে গেছে। ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা নিরুদ্দেশ হয়েছেন প্রায় আটদিন আগে, এই ক'দিনে তাঁর স্ত্রী একবারও তিনতলা থেকে নিচে নামেননি।

কাকাবাবু নিজের একটা কার্ড দিয়ে বললেন, 'এটা ভেতরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। উনি আমার সঙ্গে ঠিকই দেখা করবেন।'

একটু বাদেই বাড়ির ভেতর থেকে বুড়ো মতন একজন লোক বেরিয়ে এসে আমাদের ডেকে বলল, 'আপলোগ আইয়ে।'

চিরঞ্জীব শাকসেনার স্ত্রীর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রং একদম মেমসাহেবের মতন। একটা চওড়া হলুদপাড় সাদা শাড়ি পরে আছেন। এঁর মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। পরে জানলুম, ইনি গুজরাটের মেয়ে হলেও একটানা আট বছর ছিলেন শান্তিনিকেতনে।

বসবার ঘরে ঢুকেই উনি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী, আপনি কবে এসেছেন?'

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বসুন, ভাবিজী, বসুন। আজই এসেছি, দাদার খবরটা শুনেই চলে এলুম। ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছিল বলুন তো!'

ভদ্রমহিলা বেশ শক্ত আছেন, শোকে-দুঃখে ভেঙে পড়েননি। এই আট দিনের মধ্যেও যে চিরঞ্জীব শাকসেনার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি, এক হিসেবে সেটাই ভাল খবর। তার মানে ওঁকে এখনো মেরে ফেলা হয়নি। কোনও এক জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই।

উনি বললেন, 'আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না তো আপনাকে কি বলব। উনি আগের দিন বিদেশ থেকে ফিরলেন, খুব ক্লান্ত ছিলেন, ভাল করে কথাই বলতে পারিনি ... পরদিন থেকেই নিখোঁজ। কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, কার সঙ্গে গেলেন, কিছুই জানি না।'

'এর মধ্যে অন্য কেউ কোনও চিঠি বা খবর পাঠায়নি?'

'না। এই ছেলেটি কে?'

'ও আমার ভাইপো, ওর নাম সন্তু। আচ্ছা ভাবিজী, একটা কথা মনে করে বলুন তো, অর্জুন শ্রীবাস্তব, মনোমোহন ঝাঁ আর সুন্দরলাল বাজপেয়ি — এঁরা শেষ কবে আপনার বাড়িতে এসেছিলেন? এঁদের আপনি চেনেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ চিনি। এঁরা তো প্রায়ই আসতেন।'

'শেষ কবে এসেছিলেন?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান ভেবে দেখি, হ্যাঁ, উনি বিদেশ যাবার ঠিক আগেই সন্ধেবেলাতেই তো এসেছিলেন সবাই। আরও অনেকে এসেছিলেন, কিন্তু ওঁরা ছিলেন অনেক রাত পর্যন্ত।'

'কি কথা হয়েছিল বলতে পারেন?'

'তা তো জানি না। ওঁরা তো প্রায়ই দরজা বন্ধ করে কি সব আলোচনা করতেন। সেদিন ওঁরা চার-পাঁচজন মিলে খুব চিল্লাচিল্লি করছিলেন বটে।'

'চার-পাঁচজন? ঠিক ক'জন ছিলেন?'

'তা তো জোর দিয়ে বলতে পারব না। তবে ওরা সবাই তো খুব চায়ের ভক্ত, কয়েকবার করে চা পাঠাতে হয়েছে। প্রত্যেকবার পাঁচ কাপ করে।'

'তার মানে অন্তত পাঁচ জন। আমরা চারজনের হিসেব পাচ্ছি, আর একজন কে?'

'তা জানি না। ওরা চারজনই বেশি আলোচনা করতেন, হয়তো সেদিন আরও কেউ একজন ছিলেন। অনেকেই তো আসতেন নানা কাজে।'

'চিরঞ্জীবদাদা বিদেশে থাকার সময় ওঁর যে তিনজন বন্ধু এখানে খুন হয়েছেন, সে-কথা উনি জেনেছিলেন?'

'যেদিন ফিরলেন, সেদিনই আমি বলিনি। ভেবেছিলাম কী, পরে এক সময় বলব। আসার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা আঘাত ...'

'অন্য কেউ বলে দিতে পারে?'

'আমি বিজয়কেও নিষেধ করে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ ভাল কথা। ভাবিজী, বিজয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'সে তো হোসাঙ্গাবাদ হাসপাতালে আছে। পাঁচমারিতে ডাকাতরা তাকে গুলি করেছিল। তবে জখম বেশি হয়নি, দু'চারদিনের মধ্যে ফিরে আসবে।'

'চিরঞ্জীবদাদার যে একজন খুব বিশ্বাসী লোক ছিল, সব সময় সঙ্গে থাকত, কি নাম যেন ... ও হ্যাঁ, ভিখু সিং, সে কোথায়?'

'উনি বিদেশে যাবার সময় সে ছুটি নিয়ে নিজের বাড়ি গিয়েছিল। ওর বাড়ি বিলাসপুর। এতদিন তার ফিরে আসার কথা । কিন্তু সে আসেনি।'

'হুঁ! ঠিক আছে, ভাবিজী, আমরা এবার যাব। বেশি চিন্তা করবেন না। আজ বা কাল যদি দৈবাৎ চিরঞ্জীবদাদা ফি্‌র আসেন, তবে বলবেন যে আমি ভীমবেঠ্‌কায় আছি।'

এতক্ষণ বাদে চমকে উঠলেন চিরঞ্জীব শাকসেনার স্ত্রী বীণা দেবী। তিনি বললেন, 'ভীমবেঠ্‌কায়? আপনি ওখানে থাকবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? ভীমবেঠ্‌কায় তো থাকার জায়গা নেই, রাত্তিরবেলা কোনও বিপদ হতে পারে; মানে, আপনার দু'পা ঠিক নেই .. না, না, ও-কাজ করবেন না!'

'ভাবিজী, কিছুদিন ধরে চিরঞ্জীবদাদা ওই ভীমবেঠ্‌কা নিয়ে খুব চিন্তা কর ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওখানে যে ব্রাহ্মী লিপি আছে, তার নাকি পাঠোদ্ধার অনেকখানি করেছেন, এ-রকম তো শুনছিলাম।'

'অনেকখানি করেছেন? পুরোটা পারেননি?'

'সেই রকমই তো জানি।'

'বুঝলাম। এবার তাহলে আমরা উঠি।'

বীণাদেবী ব্যাকুলভাবে বললেন, 'আপনি রাতে ওই নিরালা জায়গায় থাকবেন এটা আমার মনে ভাল লাগছে না। দিনকাল ভাল না, কখন কী হয়...।'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার সঙ্গে অন্য আরও লোক থাকবে। তা ছাড়া আমি তো চিরঞ্জীবদাদার মতন ভালমানুষ নই, আমার সঙ্গে রিভলভার থাকে।'

বীণাদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলুম ধীরেনদার বাড়িতে।

মিংমাকে ডাক্তার ইঞ্জেকশন আর ওষুধ দিয়েছেন। একটা ব্যান্ডেজও বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা খুলে ফেলেছে মিংমা। ও বলেছে, ব্যান্ডেজের কোনও দরকার নেই।

সে-কথা শুনে কাকাবাবু বললেন, 'ও ঠিক আছে।'

তিনখানা ফোলডিং খাট, কম্বল, নানারকম খাবার-দাবার গুছিয়ে রাখা হয়েছে এর মধ্যেই। ছোড়দিরাও এখানে এসে জড় হয়েছে। আমরা তিনজন ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়ে থাকব শুনে ধীরেনদার মতন নিপুদা আর রত্নেশদা যেতে চাইল সঙ্গে। কিন্তু কাকাবাবু আর কারুকে নেবেন না।

ছোড়দি আমায় কিছুতেই যেতে দিতে চায় না। কাকাবাবুকে তো আর কেউ ফেরাতে পারবে না। কিন্তু ভূপালে এসে আমার যদি কোনও বিপদ হয়, তবে সেটা যেন ছোড়দিরই দায়িত্ব।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, 'বাবা আমায় কি বলে দিয়েছেন জানিস না? কাকাবাবু যখন যেখানে থাকবেন, সব সময় আমাকে ওঁর সঙ্গে থাকতে হবে।'

আর দেরি করলে পাহাড়ে উঠতে বেশি রাত হয়ে যাবে। সেইজন্য কাকাবাবু বললেন, 'চল, এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

ধীরেনদা বললেন,'কিন্তু আপনাদের খবর পাব কি করে? কাল সকালে কি আমরা কেউ যাব?'

কাকাবাবু বললেন, 'না, তোমাদের যাবার দরকার নেই। আমরা দু'দিনের মতন খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে যদি না ফিরি, তা হলে একজন কেউ কিছু খাবার পৌঁছে দিয়ে এস।'

'কিন্তু আপনার ভাড়া-করা গাড়িটা তো ওখানে দু'দিন থাকবে না, পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। হঠাৎ যদি আপনাদের ভূপালে আসার দরকার হয়, তা হলে আসবেন কি করে?'

'সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিকই, তোমাদের যাতে বেশি চিন্তা না হয়, সেই জন্য এটা তোমাদের দেখিয়ে রাখছি।'

কাকাবাবু তাঁর কিট ব্যাগ খুলে রেডিও'র মতন যন্ত্র দেখালেন। ওটা একটা শক্তিশালী ওয়ারলেস ট্রান্সমিশান সেট। বহু দূরে খবর পাঠান যায়।

আমি জানি, কাকাবাবু কলকাতার বাইরে কোথাও গেলেই ওই যন্ত্রটা সব সময় সঙ্গে রাখেন।

সিংমা আর আমি ড্রাইভারের পাশে বসলুম। কাকাবাবু পেছনের সীটে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'পৌঁছতে অন্তত দেড় দু'ঘন্টা লাগবে, ততক্ষণ আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।'

৬

সন্ধে হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পুরোপুরি আলো মিলিয়ে যায়নি। দূর থেকে ভীমবেঠ্কা পাহাড়টা দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। মনে হয় যেন একটা সাধারণ উঁচু টিলা। এর ভেতরে যে অতগুলো গুহা আছে, তা কল্পনা করাই শক্ত। আসলে পাহাড়টা একটা মৌচাকের মতন, রক শেলটার বা গুহাতেই ভর্তি।

কাকাবাবু নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন। ওপরে পৌঁছবার পর আমরা ওঁকে জাগিয়ে দিলুম। মালপত্রগুলো সব বয়ে নিয়ে যাওয়া হল সাধুবাবার আশ্রমের কাছে। তারপর গাড়িটা ফিরে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপ করে নামল অন্ধকার। সেই অন্ধকার এমন কুচকুচে কালো যে পাশের লোককেও দেখা যায় না। শুধু দূরে দেখা যায় ধুনির আগুন।

সাধুবাবা সত্যিকারের সাহসী লোক। রাত্তিরে এখানে উনি একা থাকেন। যে দু'তিনজন লোককে দিনের বেলা ওঁর আশ্রমে দেখেছিলুম, তারা পাহাড়ের নিচের গ্রামের লোক। সন্ধেবেলা ফিরে যায়।

ধুনির আগুনের কাছাকাছি আমাদের খাটগুলো পেতে ফেলা হল। রাত্তিরে মিংমা আমাদের জন্য রান্না করবে। মিংমা দারুণ খিঁচুড়ি রাঁধে।

সাধুবাবা ধ্যানে বসেছেন, ওঁর সঙ্গে কোনও কথা বলা গেল না। কাকাবাবু ঘড়ির ওপর টর্চের আলো ফেলে বললেন, সাড়ে সাতটা বাজে, রাত দশটা আন্দাজ চাঁদ উঠবে, তখন আমরা একটু বেড়াতে বেরুব।'

জায়গাটা যে কি অসম্ভব নিস্তব্ধ, তা বলা যায় না। এখানে ঝিঁঝির ডাক পর্যন্ত নেই। সেরকম একটা জঙ্গলও দেখিনি এই পাহাড়ে। মাঝে মাঝে একটা দুটো বড় বড় গাছ, তবে ছোট গাছই বেশি। অবশ্য দুপুরবেলা গুহাগুলো দেখতে দেখতে যখন পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে নিচে নামছিলাম, তখন আরও নিচের দিকে জঙ্গলের মতন দেখেছি। আমরা ঘুরেছিলাম মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা গুহায়, আরও কত গুহা না-দেখা রয়ে গেছে।

দিনের বেলায় ধীরেনদার সেই কথাটা মনে পড়ল। তাই আমি কাকাবাবুকে বললুম, আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা এই ক'দিন একটা বেশ ভালমতন গুহার মধ্যে থাকলে পারতুম না?'

কাকাবাবু বললেন, 'হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেকালের মানুষের পক্ষে গুহায় থাকাই সবচেয়ে সুবিধের ছিল। কিন্তু একালে মানুষই সবচেয়ে হিংস্র। আমাদের যদি কেউ মারতে চায়, তাহলে গুহার বাইরে থেকে গুলি চালিয়ে খুব সহজেই মেরে ফেলতে পারে। তা ছাড়া, আমরা একটা গুহার মধ্যে ঢুকে বসে রইলে চারিদিকে নজর রাখতে পারব না।'

তারপর সাধুবাবার আশ্রমের দিকে হাত তুলে বললেন, 'দেখছিস, সাধুজী কি চমৎকার জায়গা বেছেছেন। সামনে দেওয়াল। সবাইকে এখানে সামনে দিয়েই আসতে হবে। এখানে বসে থাকলে গাড়ির রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়?'

সাধুবাবা একটা হরিণের ছালের ওপর জোড়াসনে শিরদাঁড়া একদম সোজা করে বসে আছেন। চোখ দুটো বোজা। আমরা যে নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, তাতেও উনি একবারও চোখ খোলেননি।

মিংমা মুগ্ধ হয়ে সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ও নিশ্চয়ই হিমালয় পাহাড়ে এ-রকম আরও সাধু দেখেছে, তাই ওর চেনা লাগছে। আমি গল্পের বইয়ের ছবিতে ছাড়া এরকম কোনও ধ্যানমগ্ন সাধুকে দেখিনি। উনি কি সারারাতই এইভাবে থাকবেন নাকি?

কাকাবাবু আমায় বললেন, 'খাওয়া হয়ে গেলে তুই আর মিংমা যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তে পারিস। আমি রাত আড়াইটে পর্যন্ত জাগব। তারপর মিংমাকে তুলে দেব।'

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। পৌনে আটটা মোটে। সময় যেন কাটতে চায় না।

একটু বাদে মিংমা স্টোভ জ্বেলে রান্না চাপিয়ে দিল। আমি ওর পাশে বসে ব্যগ্রভাবে চেয়ে রইলুম। রান্না দেখা ছাড়া আর তো কোনও কাজ নেই।

হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনে আমি চমকে ভয়ে পেয়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ছিলুম আর একটু হলে। মিংমা হি হি করে হেসে উঠল। আসলে আওয়াজটা মোটেই বিকট কিংবা অদ্ভুত নয়। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম বলেই প্রথমে মনে হয়েছিল, দুপুরবেলা শোনা গুহার বাইরে সেই শব্দের কথা।

আগে লক্ষ্য করিনি, আশ্রমের সামনের চাতালের এক কোণে একটি গোরু শুয়ে আছে। দুপুরে বরং এখানে একটি কুকুর দেখেছিলুম, সেটা এখন নেই। বোধহয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিচে নেমে গেছে।

কিন্তু গোরুটা হঠাৎ ডেকে উঠল কেন? আমি টর্চ নিয়ে গেলুম গোরুটার কাছে। অন্ধকারের মধ্যে গোরুর চোখে টর্চের আলো পড়লে ঠিক আগুনের ভাঁটার মত জ্বলজ্বল করে। মনে হয় কোনও হিংস্র প্রাণী।

গোরুটা আর একবার ডাকল, হা-ম-বা।

আর অমনি সাধুবাবা চেঁচিয়ে বললেন, বোম্ ভোলা-মহাদেও-শঙ্করজী!'

এবার সাধুবাবার ধ্যানভঙ্গ হল। মনে হল, গোরুটাই যেন সাধুবাবার ঘড়ির কাজ করে। সাধুবাবা যাতে ধ্যান করতে করতে সারা রাত কাটিয়ে না দেন কিংবা ঘুমিয়ে না পড়েন, সেই জন্য গোরুটা রোজ এই সময় ওঁর ধ্যান ভাঙিয়ে দেয়।

কাকাবাবু সাধুবাবাকে বললেন, 'সাধুজী, আমরা আপনার অতিথি হয়ে এসেছি। এখানে থাকব।'

সাধুবাবা বললেন, 'হাঁ হাঁ, থাকুন। আরামসে থাকুন। কোই বাত নেই। এ-পাহাড় তো আমার নয়। পাহাড়, সমুন্দর, জঙ্গল এ সবই ভগবানকা, যে-কোনও মানুষ থাকতে পারে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনি ঠিক বললেন না, সাধুবাবা। দিন কাল বদলে গেছে। ভগবানের আর অত বেশি সম্পত্তি এখন নেই। পৃথিবীর সব পাহাড় আর জঙ্গলই এখনও কোনও না কোনও গভর্নমেন্টের। আমি যদি এই পাহাড়ে বাড়ি বানিয়ে থাকতে যাই, অমনি সরকারের লোক এসে আমাদের ধরবে। সমুদ্রের কিছুটা জায়গা এখনও খালি আছে বটে।'

সাধুবাবা বললেন, 'আমি তো এখানে আছি বহোত দিন।'

'আপনাদের কথা আলাদা। আপনি সাধুবাবা, আমাদের সরকার এখনো সাধু-সন্ন্যাসীদের কিছু বলে না। আচ্ছা সাধুজী, আপনি যে বলছিলেন, রাত্রে এখানে শব্দ শুনতে পান, তা কিসের শব্দ? মানুষের চলাফেরার?'

'হাঁ, হাঁ।'

'একজন মানুষ, না অনেক?'

'দো-তিন আদমি আসে মনে হয়।'

'আপনি কোনও গাড়ির শব্দ পান? তারা গাড়িতে আসে?'

'না, গাড়ির আওয়াজ পেয়েছি না।'

'হুঁ। আচ্ছা, আপনি রাত্রে কি খাবেন? আমাদের হাতের রান্না আপনি খাবেন কি?'

সাধুজী জানালেন, না, উনি রাত্রে শুধু এক বাটি দুধ ছাড়া আর কিছু খান না। উনি ঘুমোনও খুব তাড়াতাড়ি। ধুনির আগুনে মাঝে-মাঝে কাঠ ফেলার জন্য অনুরোধ জানিয়ে উনি একটু বাদেই চলে গেলেন আশ্রম-গুহার মধ্যে।

মিংমা রান্না সেরে ফেলার পর আমরাও খেয়ে নিলুম।

কাকাবাবু ঠিকই বলেছিলেন। সাড়ে নটা বাজবার পর পাশের পাহাড়ের আড়াল থেকে একটু-একটু করে উঠতে দেখা গেল চাঁদের মুখ। আস্তে আস্তে গাড় অন্ধকারটা পাতলা হয়ে একটু আলো ফুটে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, 'চল, সবাই মিলে একটু ঘুরে আসা যাক। খাওয়ার পর একটু হাঁটাও হবে।'

খানিকক্ষণ হেঁটে আমরা প্রথম সারির গুহাগুলোর কাছে দাঁড়ালুম। টর্চ নিবিয়ে দিতেই গা'টা কেমন ছমছম করে উঠল। এরকম অদ্ভুত অনুভূতি আমার আর কোনও জায়গায় গিয়ে হয়নি। মনে হল, আমরা যেন পঞ্চাশ হাজার কিংবা একলক্ষ বছর আগেকার সময়ে ফিরে গেছি। আদিম গুহাবাসী মানুষেরা এখানে থাকে। এক্ষুনি তাদের কারুকে দেখতে পাব। আবছা আলোয় একটু দূরের পাথরের চাঁইগুলোকে মনে হচ্ছে কালো কালো হাতির পাল।

আর থাকতে না পেরে আমি টর্চ জ্বেলে ফেললুম।

তারপরই দারুণ ভয় পেয়ে বলে উঠলুম, 'ও কি!'

টর্চের আলোটা সোজা যেখানে গিয়ে পড়েছে, সেখানে একটা পাথরের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে আছে একজন মানুষ।

কাকাবাবুও দেখতে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার উঁচিয়ে বললেন, হু ইজ দেয়ার? উধার কৌন হ্যায়?'

লোকটি তাতেও নড়ল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, 'দো হাত উপর উঠাকে সামনে চলা আও। নেহি তো গোলি চালায় গা!'

লোকটি এবার আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। ধুতি আর শার্ট পরা, গ্রাম্য লোকের মতন চেহারা। কিন্তু মুখে একটা হিংস্র ভাব। আমাদের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইল, তারপর সামনে এগিয়ে আসার বদলে চট্ করে লুকিয়ে পড়ল একটা পাথরের আড়ালে।

সেইটুকু সময়ের মধ্যেই কাকাবাবু ওকে গুলি করতে পারতেন বটে, কিন্তু মারলেন না।

চাপা গলায় আমায় বললেন, 'সন্তু, টর্চটা নিবিয়ে দিয়ে চট্ করে শুয়ে পড় মাটিতে।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা বড় পাথরের টুকরো গিয়ে পড়ল আমাদের পেছনে। ওই পাথরটা মাথায় লাগলে আর দেখতে হত না।

তারপরই মিংমার গলার আওয়াজ পেলুম, 'আংকেল সাব, পাকাড় গ্যায়া।'

মিংমা বুদ্ধি করে এরই মধ্যে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পেছন দিক দিয়ে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলেছে। আমি টর্চ জ্বেলে ছুটে গেলুম সেই পাথরটার কাছে।

মিংমা সেই লোকটার দুটো হাত পেছন দিকে মুচড়ে ধরে আছে। ছোটখাট চেহারা হলেও মিংমার শরীরে দরুণ শক্তি। এ লোকটা ওর সঙ্গে জোরে পারবে কেন!

ক্রাচ নিয়ে কাকাবাবুর এসে পৌঁছতে একটু দেরি হল। তিনি বললেন, 'সন্তু এর মুখে ভাল করে আলো ফেলে দ্যাখ তো, এই লোকটাই দুপুরে তোদের ভয় দেখিয়েছিল কিনা!'

আমি সঙ্গে-সঙ্গেই বললুম, 'না।'

মিংমাও মাথা ঝাঁকাল। কারণ, এই লোকটা বেশ রোগা আর মুখখানা লম্বাটে। বয়েসও যথেষ্ট, প্রায় ষাটের কাছাকাছি। পরচুলা আর নকল দাড়ি লাগিয়েও ওর পক্ষে আদিম গুহাবাসীর ছদ্মবেশ ধরা সম্ভব নয়।

কাকাবাবু বললেন, ' তা হলে এ-লোকটা এখানে একা বসে আছে? সন্তু, দ্যাখ তো ওর জামার পকেটে কি আছে? মিংমা, ভাল করে ধরে থাক ওকে।'

জামার পকেটে একটা বিড়ির কৌটো, দেশলাই আর কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেলনা। কাগজ পত্র কিছু নেই। কিন্তু লোকটির কোমরের কাছে কি যেন একটা শক্ত, উঁচু জিনিস হাতে লাগল। জামাটা তুলে দেখলুম, একটা বেশ বড় ভোজালি ওর কোমরে গোঁজা।

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ! সঙ্গে এত বড় ছুরি, আবার পাথর ছুঁড়ে আমাদের মারতে চেয়েছিল, তা হলে তো ইনি সাধারণ কোনও লোক নন। এই, তুম্ কৌন হ্যায়?'

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

'তুম্ কাঁহে পাথ্থর ফেকা? হামলোগ তুম্‌হারা দুশমন হ্যায়?' লোকটা তবুও চুপ।

ইত্‌না রাতমে কাঁহে ইধার বৈঠা থা? তুম্‌হারা মতলব কেয়া হ্যায় ঠিক বাত্ বাতাও!'

লোকটা তবু কোনও সাড়া শব্দ করে না।

কাকাবাবু এবার মিংমাকে বললেন, 'আর একটু জোরে চাপ দাও তো! দেখি ও কথা বলে কিনা!'

মিংমা লোকটার হাত দুটো বেশি করে মুচড়ে দিতে লাগল। একটু একটু করে লোকটার মুখে ফুটে উঠল ব্যথার চিহ্ন। তারপর এক সময় সে চিৎকার করে উঠল, অ্যাঁ, অ্যাঁ —।

ঠিক বোবা মানুষদের মতন আওয়াজ!

টর্চের আলোয় দেখা গেল, লোকটার মুখের মধ্যে জিব নেই। জিব ছাড়া কোনও মানুষের মুখ তো আমি আগে দেখিনি! মুখের ভেতরটা অদ্ভুত গোল,দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে।

আমি উত্তেজিতভাবে বললুম, 'কাকাবাবু!'

কাকাবাবু বললেন, 'তুই বুঝতে পেরেছিস, সন্তু? এ লোকটা নিশ্চয়ই মনোমোহন ঝাঁর সেই চাকর, যার জিব কেটে দেওয়া হয়েছে।'

আমি বললুম, 'ওকে জিব কাটা অবস্থায় এই পাহাড়ের কাছেই পাওয়া গিয়েছিল।'

কাকাবাবু বললেন, 'ওখানকার পুলিশের কাছে সেই খবর শুনে আমার আরও সন্দেহ হয়েছিল, এই পাহাড়টা ঘিরে সব রহস্য আছে।'

'এই লোকটা কথা বলতে পারবে না। আর লিখতে-পড়তেও জানে না ...।'

'কিন্তু জায়গা চেনার ক্ষমতা ওর আছে। খুঁজে খুঁজে এখানে আবার এসেছে নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবার জন্য।'

কাকাবাবু মিংমাকে বললেন, 'লোকটিকে ছেড়ে দিতে। তারপর ওকে বললেন,'শুনো হামলোগ তুমহারা মনিব মনোমোহন ঝা-জীকা দুশমন নেহি: হামলোগ তুমহারা ভি দোস্ত্ হ্যায়। খুনিকো হামলোগ পাকাড়নে চাহ্‌তা হ্যায়।'

লোকটি কাকাবাবুর কথা কতটা বুঝতে পারল কে জানে। তবে মনোমোহন ঝাঁ'র নামটা শুনে একটু বোধহয় ভাবান্তর দেখা গেল।

কাকাবাবু আবার হিন্দিতে বললেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে এস। আমরা এখানে থাকছি, তুমিও সঙ্গে থাকবে।'

লোকটিকে আমাদের সঙ্গে আসবার ইঙ্গিত করে কাকাবাবু চলতে শুরু করলেন। লোকটা কয়েক পা এল পেছন-পেছন। তারপরই হঠাৎ দৌড় লাগাল।

মিংমা আর আমি দু'জনেই দৌড়লাম ওকে ধরবার জন্য. কিন্তু লোকটা যেন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল চোখের নিমেষে।

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ব্যর্থ হয়ে আমরা ফিরে এলুম কাকাবাবুর কাছে। দিনের বেলায়ই কেউ এখানে লুকোতে চাইলে তাকে খুঁজে বার করা মুশকিল, আর রাত্তিরবেলা তো অসম্ভব।

কাকাবাবু আফশোস করে বললেন. 'রাগে-দুঃখে লোকটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে আমাদের কথা শুনল না কেন? ও একা একা কি করে প্রতিশোধ নেবে? শত্রুপক্ষ যে অতি ভয়ংকর, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। চল্, আমরা এবার শুয়ে পড়ি।

আমরা আবার ফিরে এলুম আশ্রমের কাছে। শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম ওই জিব-কাটা মানুষটির কথা! ইস্, মানুষ এত নিষ্ঠুরও হয় যে, অন্য একজন মানুষের জিব কেটে দিতে পারে! ওরা তো আরও তিনজন নিরীহ ঐতিহাসিককে খুন

করেছে। মনোমোহন খাঁ'র এই সঙ্গীটিকে তো ওরা খুন করতে পারত, তার বদলে শুধু জিব কেটে দিল কেন? আরও বেশি অত্যাচার করার জন্য?

সহজে ঘুম আসতে চায় না। চিত হয়ে শুলেই ওপরে দেখা যায় আকাশ। এখন কয়েকটা তারাও ফুটেছে। বেশ ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। দু'একটা শুকনো পাতা উড়ে যাবার খরখর শব্দ শুনতে পাচ্ছি এক-একবার। তারপর দূরে এক জায়গায় যেন একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ পেলাম। কাকাবাবু বললেন, ও কিছু না।'

তারপর কখন যেন চোখ বুজে এসেছিল। আর-একবার একটা শব্দ পেয়ে আবার জেগে উঠলুম।

কাকাবাবু ধুনির আগুনে কাঠ ছুড়ে দিচ্ছেন। কাকাবাবুর হাতে একটা কাপ। এর মধ্যে কখন যেন নিজের জন্য কফি বানিয়ে নিয়েছেন। রাত এখন ক'টা বাজে কে জানে। পাশের খাটে মিংমা ঘুমোচ্ছে অঘোরে।

এক সময়ে চোখে আলো পড়তে ঘুম ভেঙে গেল। ওমা, সকাল হয়ে গেছে দেখছি! তাহলে সারা রাত কিছুই ঘটেনি?

কাকাবাবু আর মিংমা সাধুবাবার সঙ্গে চা-খেতে-খেতে গল্প করছেন। তাহলে আমাদের তৈরি চা খেতে আপত্তি নেই সাধুবাবার। তড়াক করে নেমে পড়লুম খাট থেকে।

কাকাবাবু বললেন, 'বিছানা তুলে খাটটা ফোল্ড করে ফ্যাল, সন্তু! খাটগুলো সব আশ্রমের পেছন দিকে লুকিয়ে রাখতে হবে। দিনের বেলা এখানে কিছু কিছু লোক আসতে পারে। আমরা যে এখানে থাকি, তা তাদের জানানর দরকার নেই।'

এখানে জলের বেশ সমস্যা আছে। আমরা দুটো বড় ফ্লাস্ক ভর্তি জল এনেছিলাম, সে তো মুখ হাত ধুতেই ফুরিয়ে যাবে। সারাদিন আমাদের অনেক জলের দরকার হবে।

সাধুবাবা জানালেন যে, পাহাড়ের নিচে নেমে খানিকটা দক্ষিণে গেলে যে গ্রামটা আছে, সেখানকার কুয়ো থেকে জল আনা যায়। অথবা, পাকা রাস্তা ধরে নেমে গেলে মাইল দু'এক দূরে যে লেভেল ক্রশিং আছে একটা, সেখানকার গুমটি-ঘরের পাশে টিউবওয়েল আছে। আমরা জলের ব্যবস্থার কথা আগে চিন্তা করিনি। ঠিক হল যে, আমি আর মিংমা নিচে যাব জলের সন্ধানে। সাধুবাবার শিষ্যরা তাঁর জন্য দু'তিন দিন চলার মতন জল একেবারে এনে দেয়।

আমরা পাউরুটি আর জেলি খেয়ে নিলুম। তারপর কাকাবাবুকে রেখে মিংমা আর আমি বেরিয়ে পড়লুম জলের জন্য।

কাল রাত্তিরবেলা অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় পাহাড়টাকে কী রকম ভয়ের জায়গা বলে মনে হচ্ছিল। এখন দিনের আলোয় সব কিছুই সুন্দর। সেই জিব-কাটা লোকটা কি

এখনও লুকিয়ে আছে এই পাহাড়ের মধ্যে? তাহলে সে খাবে কি? আর সেই লোকটা যে গুহামানব সেজে আমাদের ভয় দেখিয়েছিল?

দিনের আলোয় ভয় থাকে না, তবে আমরা এগোতে লাগলুম সাবধানে, গুহাগুলো সবই পাহাড়ের এক দিকে, অন্য দিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের উপত্যকায়। আমরা হাঁটতে লাগলুম সেই ফাঁকা দিকটা ঘেঁষে।

কিছুক্ষণ নামবার পর একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। মিংমাকে নিয়ে আমি লুকোলুম একটা গাছের আড়ালে। গাড়িটা এই পাহাড়ের ওপরেই আসছে।

গাড়িটা হুশ করে আমাদের পেরিয়ে যাবার পর আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'আরেঃ! এই থাম, থাম!'

চ্যাঁচামেচি শুনে গাড়িটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আবার ব্যাক করে এল। গাড়িতে ধীরেনদা আর রত্নেশদা। ওঁরা বোধ হয় আর থাকতে পারেননি, ভোর রাতেই বেরিয়ে পড়েছেন আমাদের খোঁজ নিতে।

ধীরেনদা বললেন, 'কি, তোমরা সব ঠিকঠাক আছ তো?'

আমরা গাড়িতে উঠে পড়ে বললুম,'গাড়ি ঘোরান, আমাদের জল আনতে যেতে হবে। আপনারা এসে পড়েছেন, বেশ ভালই হল, হাঁটতে হবে না।'

ধীরেনদা বললেন, 'তাই তো এখানে যে জল নেই, সেটা আমারও খেয়াল হয়নি।'

'যখন এক সময় মানুষ থাকত, তখন তারা জল পেত কোথায়?'

ধীরেনদা বললেন, 'তখনকার লোকদের তো কোনও কাজ ছিল না, তারা পাহাড়ের তলা থেকে রোজ জল নিয়ে আসত। কিংবা তখন হয়তো, কোনও ঝরনা ছিল এই পাহাড়ে। এখন শুকিয়ে গেছে! এক লক্ষ বছর আগে কি ছিল, তা তো বলা যায় না!

আমারা ফ্লাস্ক দুটো এনেছিলাম, কিন্তু ওইটুকু জলে তো চলবে না। তাই ধীরেনদা আমাদের দিয়ে গেলেন কাছাকাছি একটা ছোট শহরে। জায়গাটার নাম ওবায়দুল্লাগঞ্জ। সেখান থেকে কেনা হল বড়-বড় তিনটে কলসি। এক দোকান থেকে বেশ গরম গরম জিলিপি আর কচুরি খেয়ে নিলাম পেট ভরে। কাকাবাবুর জন্যও নিয়ে যাওয়া হল কিছু।

ফেরার পথে কলসির জল ছলাত ছলাত করে পড়তে লাগল গাড়িতে। আমি আর মিংমা ধরে বসে আছি।

রত্নেশদা বলল, 'কাল সকালেও তো আবার জল আনতে যেতে হবে। আবার আসতে হবে আমাদের।'

ধীরেনদা বললেন, 'ভাবছি, একজন ড্রাইভারসুদ্ধু একটা গাড়ি জোগার করে আজ বিকালে এখানে পাঠিয়ে দেব। যে কদিন দরকার, সে এখানে থাকবে!'

আমি বললুম,'না,না, গাড়ির দরকার নেই। যেমনভাবে আগেকার গুহাবাসীরা নিচ থেকে জল আনত, সেইরকমভাবে কাল থেকে আমি আর মিংমা জল বয়ে আনব।'

পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে আশ্রমের সামনে কাকাবাবুকে দেখতে পেলুম না। সাধুবাবাও নেই।

গুহাগুলোর দিকে গিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই অবশ্য কাকাবাবুকে পাওয়া গেল। যে বড় গুহাটার নাম অডিটোরিয়াম অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহ, সেটার সামনে একটা বড় পাথরের ওপরে বসে কাকাবাবু একটা কাগজে সেটার ছবি আঁকছেন।

ধীরেনদাদের দেখে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, তোমরা কেমন আছ? রাত্তিরে কোনও বিপদ-টিপদ হয়নি তো?'

ধীরেনদা হেসে ফেলে বললেন, 'না, কিছু হয়নি। আপনারাও তো ভালই আছেন দেখছি!'

কিছুক্ষণ গল্প করার পর ধীরেনদারা চলে গেলেন। তার একটু পরেই আবার শুনতে পেলুম একটা গাড়ির আওয়াজ।

৭

দ্বিতীয়বার গাড়ির আওয়াজ শুনে কাকাবাবু বললেন, 'হয়তো কোনও ভিজিটর আসছে। আমি এখানে বসে ছবি আঁকব, তোরা দু'জনে দু'দিকে দাঁড়িয়ে থাক। বাইরের লোকেদের সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই।'

মিংমা চলে গেল আশ্রমের দিকে। আমি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দিয়ে চলে এলুম রাস্তার ধারে একটা গুহার কাছে। এ দিকের কয়েকটা গুহা আমাদের দেখা হয়নি।

এখানে রয়েছে একটা দোতলা গুহা। একটা ছোট গুহার অনেক ওপরে আর একটা। প্রকৃতিই নিজের খেয়ালে এ-রকম বানিয়েছে। ওপরের গুহাটায় ওঠা খুব সহজ নয়, পাশের একটা বড় পাথর বেয়ে-বেয়ে উঠতে হয়। খানিকটা ওপরে ওঠার পর পরিষ্কার দেখতে পেলুম রাস্তাটা।

একটা কালো গাড়ি এসে বড় নিমগাছটার তলায় থামল। তারপর গাড়ি থেকে যিনি নামলেন, তাঁকে প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল, বুঝি কোনও ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা সাহেব। বেশ লম্বা, ধপধপে ফরসা রং, মাথার চুল একদম সাদা। বেশ রাশভারি চেহারা।

লোকটি গাড়ি থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাল।

এরপর নামল আরও দু'জন গাঁট্টাগোট্টা গুণ্ডার মতন চেহারার লোক। একজনের হাতে লম্বা একটা বাক্স। বেশ সন্দেহজনক চরিত্র। এদের ইতিহাসে কোনও আগ্রহ আছে কিংবা গুহার মধ্যে আঁকা ছবি দেখাবার জন্য এতদূর আসবে তা ঠিক মনে হয় না। তাছাড়া এরা এমনভাব দেখাচ্ছে যেন এই জায়গাটা ওদের বেশ চেনা।

গাড়ি থেকে নেমেই ওরা কাকে যেন খুঁজছে মনে হল। চারিদিকটা দেখবার পর নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কিছু বলে ওরা এগোল আশ্রমের দিকে।

আমার মনে হল, কাকাবাবুকে বোধহয় সাবধান করে দেওয়া উচিত। নামবার জন্য পা বাড়াতেই আর একটু হলে আমি খতম হয়ে যেতাম। একটা আলগা পাথরে পা দিতেই সেটা গড়াতে গড়াতে দারুণ শব্দ করে পড়ল নিচে। আমি কোনওরকমে ঝুঁকে একটা পাথরের দেওয়াল ধরে সামলে নিলুম।

পাথরের আওয়াজ শুনতে পেয়ে লোক তিনটি থেমে গেল, দু'জন ছুটে এল এদিকে। আমার তখন তাড়াতাড়ি নামবার উপায় নেই, এক যদি ওপরের গুহাটার মধ্যে লুকানো যায়। কিন্তু একটা পাথর সরে যাওয়ায় অনেকখানি উঁচুতে পা দিতে হবে। আমি পেরে ওঠবার আগেই ওরা এসে পৌঁছে গেল। আমি আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলম। ফরসা-লম্বা লোকটি এসে পড়ে আমাকে ভাল করে দেখল। তারপর আমাকে দারুণ অবাক করে দিয়ে ভাঙা-বাংলায় বলল, 'এ খোঁকা, তোমার চাচাজি কোথায় আছে?'

এই লোকটা আমায় চেনে? কাকাবাবুর কথা জানে? কিংবা শত্রুপক্ষের লোক, খবর পেয়ে আমাদের ধরতে এসেছে।

আমি কোনও উত্তর দিলুম না বলে লোকটি এবার হুকুমের সুরে বলল, 'নিচে উতারকে এস।'

পালাবার উপায় নেই, নামতেই হবে। আমি বসে পড়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিচে নামতে লাগলুম। ওদের একজন লোক একটু উঠে এসে আমার কোমর ধরে মাটিতে নামাল।

ফরসা-লম্বা লোকটির চোখের মণি নীল রঙের। যথেষ্ট বয়েস হলেও বোঝা যায় গায়ে বেশ শক্তি আছে। আবার গম্ভীর গলায় বলল, 'কোথায় তোমার চাচাজি? চল।'

আমি খুব জোরে চেঁচিয়ে বললুম, 'কা-কা-বা-বু! আপনাকে খুঁজতে এ-সে-ছে!'

ফরসা-লম্বা লোকটি এবার হেসে বলল, 'হুঁ! ছোকরা বিলকুল তৈয়ার! তার মানে তোমার কাকাবাবু কাছাকাছিই আছে। চল, চল।'

ওর গুণ্ডামতন একজন সঙ্গী আমার হাত ধরল। আমি হাঁটতে লাগলুম অডিটোরিয়াম গুহার দিকে। কাকাবাবুকে সাবধান করে দিয়েছি, এবার যা ব্যবস্থা করার উনিই করবেন।

যা ভেবেছি ঠিক তাই। একটু আগে তিনি যেখানে বসে ছবি আঁকছিলেন, এখন সেখানে নেই। নিশ্চয়ই আমার চিৎকার শুনতে পেয়ে লুকিয়েছেন।

ফরসা-লম্বা লোকটি গুহার মধ্যে একবার উঁকি মেরে দেখে বলল, 'এখানে ছিল? নেই তো, কাঁহা গেল?'

তারপর আমাকে আরও সাংঘাতিক অবাক করে দিয়ে সেই লোকটি চেঁচিয়ে ডাকল, 'রাজা! রাজা! এদিকে এস।'

কাকাবাবুর ডাকনাম রাজা। একমাত্র আমার বাবা ছাড়া আর কারুকে ওই নাম ধরে ডাকতে শুনিনি। এই লোকটি সেই নাম জানল কি করে?'

এবার একটা গুহার আড়াল থেকে রিভলভার হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। রিভলভারটা পকেটে ভরতে-ভরতে হেসে বললেন, 'চিরঞ্জীবদাদা!'

বুঝতে বাকি রইল না যে, ইনিই ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা।

ডক্টর শাকসেনা এগিয়ে গিয়ে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর খানিকটা স্নেহের সুরে বকুনি দিয়ে বললেন, 'রাজা তুমি কি পাগল বনে গেছ? এই খোঁকাকে সাথ্ নিয়ে তুমি এখানে রাত কাটাচ্ছ? কত্ত রকম বিপদ হতে পারে।'

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, আপনি ভাবীকে দিয়ে অতগুলো মিথ্যে কথা বলালেন, ভাবীর খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওঁর তো মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই।'

'তুমি বুঝতে পারলে? তাজ্জব কথা!'

'হ্যাঁ, ভাবীর সঙ্গে একটুখানি কথা বলেই আমি বুঝে গিয়েছিলুম যে, উনি জানেন, আপনি কোথায় আছেন। তার মানে, আপনি নিরুদ্দেশ হননি, ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছেন।'

'তোমাকে ফাঁকি দেবার উপায় কি আছে। বীণার বোঝা উচিত ছিল, তোমাকে সত্যি কথা বলতেই পারত।'

'আপনি বলে গিয়েছিলেন, যেন কেউ জানতে না পারে।'

'কী করি বল। বিদেশ থেকে ফিরতে না-ফিরতেই শুনলাম যে অর্জুন, সুন্দরলাল আর মনোমোহন মার্ডার হয়ে গিয়েছে, অমনি সমঝে নিলাম কি মাই লাইফ অলসো ইজ ইন ডেনজার।'

'তখন আপনি আপনার ভাইপো বিজয়কে নিয়ে পাঁচমারি গিয়ে লুকোলেন।'

'পাঁচমারি খুব লোনলি জায়গা। ভাবলাম কী,এখানে কেউ খোঁজ পাবে না, আমারও বিশ্রাম হবে। কিন্তু ওঁরা ঠিক হাজির হল।'

'চিরঞ্জীবদাদা, ওরা মানে কারা? সেটা বুঝেছেন?'

'না। এখনও জানি না। বাট্ দে আর আ ডেঞ্জারাস লট্।পাঁচমারিতেও হঠাৎ আমার সামনে একটা লোক এসে গোলি চালিয়ে দিল। খত্মই হয়ে যেতাম, বুঝলে রাজা, ঝটাকসে বিজয় এসে পড়ল মাঝখানে। আমার বদলে সে-ই জীবন দিতে যাচ্ছিল।'

'হ্যাঁ শুনেছি, সে আপনাকে খুব ভক্তি করে। যাক, সে বেঁচে গেছে শুনেছি।'

'আমিই তাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে জিম্মা করে দিয়েছি।'

পাশের লোক দুটিকে দেখিয়ে ডক্টর শাকসেনা বললেন, 'এঁরা দু'জন পুলিশ অফিসার। তারপর থেকে এঁদের প্রটেকশান নিতে বাধ্য হয়েছি। ঠিক আছে, আপলোগ গাড়িমে যাকে আরাম কিজিয়ে।'

পুলিশ দু'জন চলে যাবার পর ডক্টর শাকসেনা আর কাকাবাবু পাশাপাশি বসলেন একটা পাথরে। মিংমাও আমাদের কথাবার্তা শুনে এসে হাজির হয়েছে এর মধ্যে।

কাকাবাবু মিংমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ডক্টর শাকসেনার। আমরাও দু'জনে বসলুম সামনের একটা গুহার মুখে বেদীর মতন জায়গায়।

চিরঞ্জীব শাকসেনা পকেট থেকে লম্বা একটা চুরুট বার করে ধরালেন। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এবার বল তো রাজা, ভীমবেঠ্কায় রাত-পাহারা দেবার মতন বেপট্ ভাবনা তোমার মাথায় এল কি করে?'

কাকাবাবু বললেন, 'তাতে আমি ভুল করিনি নিশ্চয়ই। ভীমবেঠ্কা সম্পর্কে আপনারা নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি?'

'নতুন আর কি হবে?'

'নির্ঘাত নতুন-কিছু পেয়েছেন?'

'শোন, আইডিয়াটা প্রথমে আসে মনোমোহনের মাথায়। সে একদিন বলল কী, এখানে যে এত গুহার মধ্যে ছবি আছে, তার সব ছবি সির্ফ ছবি নয়। সেগুলো ভাষা। তার মানে চিত্রভাষা। মিশরে পিরামিডের মধ্যে যেমন হিয়েরোগ্লিফিকস্, অর্থাৎ ছবির মধ্যে ভাষা আছে, সেই রকম!'

'আমিও সেই রকমই আন্দাজ করেছিলুম দাদা।'

'তুমি তো জান রাজা, ওই মনোমোহন ছিল, অ্যামেচার হিস্টোরিয়ান। তার কথা প্রথমে আমবা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। আহা বেচারা বড় ভালমানুষ ছিল। হার্ট অব গোল্ড যাকে বলে। কে ওকে মারল?'

'সেইটাই তো কথা, ওঁকে মারল কে?'

'এ জরুর কোনও ম্যানিয়াকের কাজ। নইলে কি এমন বীভৎসভাবে গলা কাটে?'

'কোনও ম্যানিয়াক বেছে-বেছে শুধু ইতিহাসের পণ্ডিতদের খুন করবে কেন? যাই হোক, সে-কথা পরে ভাবা যাবে। আপনি বলুন, মনোমোহন এই গুহার চিত্রলিপি সম্পর্কে কি জেনেছিলেন!'

'শুনলে ওয়াইলড্ আইডিয়া বলে মনে হবে। সে বলল, 'কিছু কিছু ছবির মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে। সেই ছবি দিয়ে যেন কিছু বলা হচ্ছে। মনোমোহন সেই ভাষাটা পড়বার জন্য খুব মেতে উঠল আর আমরা হাসলুম।'

'মনোমোহন কিছু প্রমাণ করতে পেরেছিলেন?'

'হ্যাঁ। বড় তাজ্জবের কথা। এক গুহার ছবি দেখে মনোমোহন বলল, 'এতে লেখা আছে, 'মহান বীর ভোমা তাঁর নিজের বাস গুহাতেই শুয়ে রইলেন।'

'এর তো একটাই মানে হয়?'

'ঠিক বলেছ। আমরা আধা বিশ্বাস আর অবিশ্বাস নিয়ে দেখলাম কি, যে গুহাতে এই ছবি আছে, সেই গুহার জমিন খুব প্লেন, আর সেখানে পাথরের সঙ্গে মিশে আছে মাটি। জায়গাটা খোঁড়া হল। সেখানে পাওয়া গেল এক কঙ্কাল। বহুত পুরনো—'

'কোন্ পিরিয়ড?'

'চালকোলিথিক হবে মনে হয়। আমরা তো অ্যাস্টাউন্ডেড। সেই কঙ্কালের সঙ্গে পাওয়া গেল কয়েকটা দামি জহরত। টারকোয়াজ! তার দাম তুমি জান। এখন মনোমোহন তো আমাদের ধোঁকা দেবার জন্য ওই গুহার মধ্যে একটা কঙ্কাল আর দামি জহরত পুঁতে রাখেনি।'

'এটা কতদিন আগের কথা?'

'পাঁচ মাস।'

'এ আবিষ্কারের কথা তো কোনও কাগজে বেরোয়নি দাদা?'

'ইচ্ছা করেই গোপন রেখেছি। ঠিক প্রমাণ দাখিল না করলে সবার কাছে লাফিং হয়ে যাব না? চিত্রভাষার অ্যালফাবেট তো বুঝতে হবে? সেই কঙ্কাল আর জহরত জমা রেখেছিলাম এখানকার মিউজিয়ামে।'

'অর্থাৎ সুন্দরলাল বাজপেয়ীর কাছে। সে-ও জেনেছিল।'

'সুন্দরলালেরই তো বেশি উৎসাহ হল। মনোমোহনকে নিয়ে সেও এখানে আসতে লাগল ঘন ঘন। কিন্তু মুশকিল বাধল, ওই যে ছবির প্যার্টান, তা কিন্তু সব গুহাতে নেই। অধিক সংখ্যক গুহাতেই সাধারণ ছবি, বিচ্ছিন্ন ছবি। আদিম মানুষদের মধ্যে দু'একজন থাকত শিল্পী স্বভাবের, তারা ইচ্ছামতন এঁকেছে। সেখানে চিত্রভাষা নেই। এর মধ্যে অর্জুন শ্রীবাস্তব আবার প্রমাণ করে দিলে যে, এতগুলো রক শেলটারের মধ্যে পাঁচ জায়গার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা। ভিন্ন জাতের। সেই ছবি খুব পুরানো দেখতে লাগলেও আসলে নতুন এক দেড় হাজারের বেশি বয়স না!'

'তার থেকে আবার নতুন কিছু পাওয়া গেল?'

'মনোমোহন বলল, এই যে পাঁচটা রক শেলটারের ছবি, ওর মধ্যেও চিত্রভাষা আছে। তখন তো পুরোদমে লিপি চলছে, তবু কেউ ইচ্ছা করে ছবির মধ্যে সাঙ্কেতিক কিছু লিখে রেখে গেছে।'

'ওখানে তো ব্রাহ্মী লিপিও আছে, আপনি তা পড়ে ফেলেছেন?'

'তার মধ্যে এমন কিছু নেই। শুধু কয়েকটা নাম। কিন্তু আমাদের মনোমোহন আবার একটা চিত্রভাষা পাঠ করে ফেলল। আমার বিদেশ যাবার ঠিক চার-পাঁচ দিন আগে।'

'কি সেটা?'

'বুঝলে, বাজা, আমার তো ধারণা সেটা গল্প। কেউ চিত্রভাষায় একটা গল্প লিখে গেছে। যদি অবশ্য ওই ভাবা সত্যি হয়।'

'তবু বলুন দাদা, কি লেখা আছে সেই গুহায়?'

'সেটা পড়ে মনে হয়, মধ্যযুগে কোনও এক রাজা তার রাজ্য হারিয়ে শত্রুর তাড়া খেয়ে এখানে কোনও গুহায় লুকিয়েছিল। তারপর এখানেই তার মৃত্যু হয়। গুহার দেওয়ালে ছবিতে লেখা আছে যে, অক্ষম, বৃদ্ধ পরাজিত এক রাজা বড় অতৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে। তবু এখানেই রইল তার সব কিছু। চল্লিশ মানুষ দূরে রইল চল্লিশ। কোনও বংশধর একদিন পেলে নতুন রাজ্য পত্তন করবে।'

'চিরঞ্জীবদাদা, এ তো শুনে মনে হচ্ছে কোনও গুপ্তধনের সঙ্কেত।'

'আবার গাঁজাখুরি গল্পও হতে পারে। লোভী লোকদের জন্য কেউ ভাঁওতা দিয়েছে। এর মধ্যে সঙ্কেত কোথায়? চল্লিশ মানুষ দূরে চল্লিশ, তার মানে কে বুঝবে বল?'

'একমাত্র আপনিই বুঝতে পারবেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্কেত ও হেঁয়ালি., এই বিষয়ে আপনার থিসিস আছে, আমি জানি।'

'কিন্তু আমি মাথা ঘামাবার সময় পেলাম কোথায়! চলে তো গেলাম দেশের বাইরে!'

'দাদা এমনও তো হতে পারে যে, আপনি যখন বিদেশে ছিলেন তখন মনোমোহন বা সুন্দরলাল বা অর্জুন শ্রীবাস্তব এরা কেউ এই সঙ্কেতের অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছে। অর্থাৎ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে।'

'তা অসম্ভব কিছু নয়।'

'আপনার বাড়িতে যখন এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হত, তখন আর কে উপস্থিত ছিল?'

'আর কে ছিল, কেউ না!'

আপনারা পাঁচজন ছিলেন। বীণা ভাবীজি পাঁচ কাপ চা করে পাঠিয়েছেন।'

'পাঁচজন? অর্জুন, সুন্দরলাল, মনোমোহন,আমি আর হাঁ হাঁ, তুমি ঠিক বলেছ তো, প্রেমকিশোর ছিল এক দুদিন।'

'এই প্রেমকিশোর গুপ্তধনের কথা শুনেছে!'

'তা শুনেছে।'

'তাহলে তো ওই প্রেমকিশোরের ওপরেই সন্দেহ পড়ে। সে কোথায়? তিনজন খুন হয়েছে, আপনাকেও মারার চেষ্টা হয়েছিল। অর্থাৎ আপনারা চারজন এই পৃথিবী থেকে সরে গেলে শুধু প্রেমকিশোরই ওই গুপ্তধনের কথা জানবে। এই সব ঘটনার পেছনে নিশ্চয়ই সে আছে।'

চিরঞ্জীব শাকসেনা হেসে বললেন, 'প্রেমকিশোর কে তা তুমি জান না? সে তো সুন্দরলালের ছেলে। সতেরো-আঠারো বছর মাত্র বয়েস, দিল্লিতে কলেজে পড়ে। কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে এসেছিল।'

কাকাবাবু একটুখানি চুপ করে গেলেন। আমি ওঁদের কথাবার্তা গোগ্রাসে গিলছিলুম এতক্ষণ। আমারও মনে হয়েছিল পঞ্চ ব্যক্তিই এ-সব কিছুর জন্য দায়ী। কিন্তু প্রেমকিশোরের এত কম বয়েস? তা ছাড়া, সে তো আর তার বাবাকেও খুন করবে না।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রেমকিশোর এখন কোথায় তা জানেন?'

ডক্টর শাকসেনা বললেন, 'দিল্লিতেই আছে নিশ্চয়ই। আমি তো ফিরে এসে আর কোনও খবর পাইনি!'

'এক্ষুনি তার খোঁজ নেওয়া দরকার। তারও তো কোনও বিপদ হতে পারে। এখন আমারও মনে পড়ছে বটে, সুন্দরলালের বাড়িতে তার ছেলেকে দেখেছিলুম, তখন সে খুবই ছোট। সুন্দরলাল খুবই ভালবাসত তার ছেলেকে।'

'তা ঠিক।'

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন, দাদা!'

'তাই চল, ফিরে যাওয়া যাক!'

'না, আমি ফিরে যাবার কথা বলিনি। যে গুহাটায় আপনারা ওই গুপ্তধনের সঙ্কেত লিপি পেয়েছেন, আমি সেই গুহাটা দেখতে চাই।'

'সেটা অনেক নিচে। খুবই দুর্গম জায়গায়, তুমি সেখানে যেতে পারবে না।'

ঠিক পারব।'

'তুমি ক্রাচ্ বগলে নিয়ে অতখানি নামবে? তোমার খুবই কষ্ট হবে। তা ছাড়া, রাজা, তুমি এই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছ কেন? আমি পুলিশকে সব জানিয়েছি ..'

'চিরঞ্জীবদাদা, কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। আর বিপদের মধ্যে না জড়ালে বিপদকে জয় করা যাবে কীভাবে?'

'রাজা, তুমি এখনও এইকথা বলতে পার! কিন্তু আমি বুড়ো হয়ে গেছি, থকে গেছি, আমি এখন ক্লান্ত। আমি এখন বিশ্রাম নিতে চাই .. তবু চল, তুমি যখন বলছ ..'

৮

সরু রাস্তা দিয়ে পাথরের ওপর পা দিয়ে-দিয়ে নিচে নামা সত্যিই কষ্টকর। একটানা নিচে নামা নয়, মাঝে-মাঝে আবার ওপরেও উঠতে হয়। ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনাই একটু পরে হাঁপিয়ে গেলেন। অথচ কাকাবাবুর মুখে কোনও পরিশ্রমের চিহ্ন নেই। অন্য কেউ নিষেধ করলেও কাকাবাবু শুনছেন না, আবার নিজের কোনও রকম অসুবিধে হলেও কারুকে জানাবেন না।

যে বড় গুহাটার সামনে মিংমাকে একজন মেরেছিল, সেখান পৌঁছে আমি বললুম, 'কাকাবাবু ঠিক এই জায়গায় সেই লোকটা --'

কাকাবাবু ডক্টর শাকসেনাকে ঘটনাটা শোনালেন।

উনি তো খুবই অবাক। আদিম গুহামানবের ছদ্মবেশ? এ রকম উদ্ভট চিন্তা কার মাথায় আসতে পারে?

কপাল কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে উনি বললেন, 'আর বোধহয় যাওয়া উচিত নয় আমাদের। অন্তত পুলিশ দু'জনকেও সঙ্গে আনলে হত!'

কাকাবাবু বললেন, 'এতখানি যখন নেমেছি, তখন সেই গুহাটা আমি একবার দেখে আসতে চাই।'

'শোন রাজা, এখানে যদি কয়েকজন খুনে-গুন্ডা লুকিয়ে থাকে, আমাদের পক্ষে তা বোঝার উপায় নেই। যদি হঠাৎ তারা আক্রমণ করে ... আমি আর যেতে চাই না... তুমি আমাকে ভীতু ভাবতে পার, কিন্তু আমার ওপর ওরা তাক করে আছে, পাঁচমারিতে একবার খুন করতে এসেছিল ...'

'তা হলে এক কাজ করা যাক। আপনি ওপরে উঠে যান, সন্তু আর মিংমা আপনাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে। সেই গুহাটা এখান থেকে কোন্ দিকে হবে আমায় বলে দিন, আর কত নম্বর, আমি একাই সেখানে যাব।'

'তুমি দেখছি আচ্ছা পাগল। চল, এসেছি যখন সবাই যাই!'

আমরা পাহাড়ের অনেকখানি নিচের দিকে নেমে এসেছি। এখান থেকে ওঠবার সময় আমার আর মিংমার তেমন অসুবিধে হবে না হলেও কাকাবাবু আর শাকসেনার তো প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এর থেকে তো পাহাড়ের উলটো দিকে ঘুরে এসে নিচ থেকে ওপরে ওঠা সোজা ছিল।

ডক্টর শাকসেনা বললেন, 'এসে গেছি, ওই যে ডাহিন দিকে গাছের আড়ালে —'

সেদিকে কয়েক পা এগোতেই আমরা একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলুম। একজন মানুষ যেন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় উঁ উঁ করছে।

মিংমাই প্রথম দৌড়ে গেল সেদিকে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, 'সন্তু সাব্, ইধার আও।'

সেখানে গিয়ে আমি প্রায় আঁতকে উঠলুম। একটা পাথরের নিচে আধখানা চাপা পড়ে আছে একজন মানুষ। সেই গুহামানব। মাটিতে অনেকখানি রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। লোকটা ওখানে গেল কি করে? নিশ্চয়ই কেউ ওপর থেকে পাথরটা গড়িয়ে ফেলে ওকে চাপা দিয়েছে। কিংবা এমনি-এমনিও পড়তে পারে।

মিংমা আর আমি ঠেলে পাথরটা সরাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সেটা দারুণ ভারী। এর মধ্যে কাকাবাবু আর শাকসেনাও পৌঁছে গিয়ে হাত লাগালেন। অনেক কষ্টে পাথরটাকে একটু মোটে নাড়ান গেল, সেই অবস্থায় মিংমা লোকটির হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বাইরে।

এবার ভাল করে দেখেও মনে হল লোকটি যেন সত্যিই একজন আদ্যিকালের গুহামানব।

চিরঞ্জীব শাকসেনা হাঁটু মুড়ে লোকটির পাশে বসে পড়ে প্রথমে নাকে হাত দিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'বেঁচে আছে। এখনও চিকিৎসা করলে বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি এখানে এসে না পড়তুম কেউ দেখতে পেত না ওকে, এই অবস্থায় মরে যেত।'

কাকাবাবু বললেন, 'কিন্তু লোকটা কে? ওর গোঁফ-দাড়ি মাথার চুল টেনে দেখুন তো? মনে হচ্ছে নকল।'

সত্যিই তাই। মিংমা ওর চুল ধরে টান দিতেই সবসুদ্ধ উঠে এল। দাড়ি-গোঁফেরও সেই অবস্থা।

চিরঞ্জীব শাকসেনা দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'তাজ্জব না তাজ্জব! এও কি বিশ্বাস করা যায়? এ যে ভিখু সিং!'

কাকাবাবু বললেন, 'ভিখু সিং? যে সব সময় আপনার সঙ্গে থাকত?'

'হ্যাঁ! ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল। সে এখানে কি করছে?'

'বুঝতে পারছেন না, ও এসেছিল গুপ্তধনের সন্ধানে। নিশ্চয়ই আপনাদের আলোচনা লুকিয়ে-চুরিয়ে শুনেছে!'

মাটিতে বসে পড়ে চিরঞ্জীব শাকসেনা বললেন, 'হা ভগওয়ান, গুপ্তধনের এত লোভ? এত বিশ্বাসী নোকর ভিখু সিং। হাঁ, ও আমাদের কথাবার্তা তো শুনতেই পারে। আমার সঙ্গে ও ভীমবেঠকাতেও এসেছে কতবার।'

কাকাবাবু বললেন, 'এখন ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করা দরকার। ওর কাছ থেকে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওকে এতখানি ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে কি করে? বেশি নড়াচড়া করা উচিতও না!

ভিখু সিংয়ের এখনো জ্ঞান ফেরেনি, আধা-অজ্ঞান অবস্থায় মাঝে-মাঝে আঃ আঃ শব্দ করছে। ওর একটা হাত আর পা প্রায় থেঁতলে গেছে মনে হয়। মাথাতেও চোট লেগেছে।

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, এক কাজ করা যাক। আপনার গাড়িটাকে যদি ঘুরিয়ে এই পাহাড়ের নিচে আনা যায়, তা হলে ওকে এখান থেকে সহজে নামিয়ে নেওয়া যাবে।'

ঠিক হল মিংমা ওপরে গিয়ে শাকসেনার লোকজনের [illegible] খুঁজিয়ে বলতে পারবে না বলে শাকসেনা একটা কাগজে লিখে [illegible], মিংমা সেটা নিয়ে চলে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু, ও এরকম সেজেছে কেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'ইতিহাসের পণ্ডিতের সঙ্গে তো, [illegible] নিজেও ইতিহাসের অনেক কিছু জেনে গেছে। অনেক বইতে ছবি টবিও দেখেছে নিশ্চয়ই। ভেবেছে গুহামানব সেজে থাকলে কেউ ওকে দেখলেই ভয় পাবে।'

শাকসেনা বললেন, 'ঠিক বলেছে, ব্যাটা তাই ভেবেছিল নিশ্চয়ই। আমার মনে হয় ও এখানে কিছু খোঁড়াখুঁড়িও করেছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'এর মধ্যেই একটা বেশ বড় গর্ত আমার চোখে পড়েছে। সেটা ওর একার পক্ষে খোঁড়া সম্ভব নয়। হয় ওর সঙ্গে আরও লোক ছিল, কিংবা যে বা যারা ওকে মেরেছে, তারাও গর্ত খুঁড়েছে।'

আমি বললুম, 'কাকাবাবু, বোধহয় ওরা গুপ্তধন পেয়ে গেছে, তাই ওকে ভাগ না দেবার জন্য ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল?'

কাকাবাবু বললেন, 'কথাটা কিন্তু সন্তু একেবারে মন্দ বলেনি, দাদা? এখানে নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু পাওয়া গেছে। নইলে, শুধু গুপ্তধন পাওয়া যেতে পারে, এই উড়ো কথাতেই তিনজন মানুষ খুন হয়ে গেল? কিছু পাবার পরে লোভ বেড়েছে, এমনও হতে পারে। সন্তু, দ্যাখ্ তো এদিকে এ-রকম গর্ত ক'টা আছে?'

আমি খানিকটা ঘুরে বেশ বড়-বড় পাঁচটা গর্ত দেখতে পেলুম। সবগুলোই এক-মানুষ, দু'মানুষ গভীর। একটা গর্তের মুখে বারুদের দাগ দেখে মনে হল, সেটা ডিনামাইট দিয়ে ওড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে দু-একটা গর্ত বেশ নতুন। একটাকে তো মনে হয় কালকেই খোঁড়া হয়েছে।

ফিরে এসে সে-কথা জানাতে কাকাবাবু বললেন, 'দেখলেন তো!'

শাকসেনা বললেন, কিন্তু ওরা সঙ্কেতের অর্থ জানবে কেমন করে? তা তো জানতে পারে না। যদি মনোমোহন কারুকে না বলে।'

'মনোমোহন তাহলে জানত?'

'মনোমোহন আমাকে পীড়াপীড়ি করেছিল ওর একটা অর্থ উদ্ধার করে দিতে, আমি স্টাডি করার তত সময় পাইনি তো, তবু একটা আন্দাজ করেছিলুম। মনোমোহন বলল, 'তাহলে সেই অনুযায়ী এক্সকাভেশন করা হোক'। আমি বললুম, যদি গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে আগে সরকারকে সব জানাতে হবে। গুপ্তধন সাধারণত সরকারের সম্পত্তি হয়, অন্য কেউ নিতে পারে না। সরকারকে জানিয়ে কাজ শুরু করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, তাই বলেছিলাম, আমি বিদেশ থেকে ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে।'

'নিশ্চয়ই মনোমোহন সেই কথা চেপে রাখতে পারেনি। অর্জুন শ্রীবাস্তব আর সুন্দরলালকেও বলেছিল কোনও এক সময়। সুন্দরলাল বলেছে তার ছেলেকে। আপনি বিদেশে ছিলেন, এই চারজনের কোনও একজনের কাছ থেকে শুনে ফেলেছে বাইরের কোনও লোক। তারপরই শুরু হয়েছে গন্ডগোল। আপনাকে বলা হয়নি, এই পাহাড়ে আরও একজন ঘুরছিল কাল রাত্রে, আমরা দেখেছি। সে হল মনোমোহনের চাকর, যার জিভ কেটে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম ও এসেছিল প্রতিশোধের জন্য, কিন্তু এমনও হতে পারে, ও-ও এসেছে গুপ্তধনের লোভে।'

'বাপ রে, বাপ! আর বোল না, আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। মানুষের এত লোভ! ভিখু সিং, আমার এত বিশ্বাসের লোক ছিল ... সে বেওকুফটা পর্যন্ত এখানে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে...'

কাকাবাবু বললেন, চলুন দাদা, ততক্ষণ গুহাটার ভেতরে একটু দেখে আসি।'

এই গুহাতেও একটু উঁচুতে, কয়েকটা পাথরের ওপর পা দিয়ে সিঁড়ির মত উঠতে হয়। কাকাবাবু কারুর সাহায্য না নিয়ে উঠে পড়লেন ওপরে।

গুহাটা চৌকো ধরনের, প্রায় একটা ঘরের মতন। খাট-বিছানা পেতে এখানে বেশ ভালভাবেই থাকা যায়। কোনও পলাতক রাজার পক্ষে এখানে আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে সব দেওয়ালগুলো দেখতে লাগলেন। কোনও দেওয়ালেই ছবি নেই। ছবি দেখতে পাওয়া গেল ছাদে। পাশাপাশি নানা ভঙ্গির অনেকগুলো মানুষ। অন্য গুহাগুলোরই মতন খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দমের মতন চেহারার মানুষ। আমি সংখ্যা গুনতে লাগলুম।

চিরঞ্জীব শাকসেনা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ইস, ছি ছি ছি ছি ছি! কি অন্যায়! কি অন্যায়! ভ্যান্‌ডাল্‌স! এদের ফাঁসি হওয়া উচিত।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

'ওই দ্যাখো! দেখছ, ভাঙা জায়গা? ছেনি কিংবা বাটালি দিয়ে কেউ ওখানে পাথর ভেঙে নিয়েছে।'

'ওখানে ছবি ছিল?'

'আলবাত!'

'কেউ ছবিগুলো কপি করে নিয়ে তারপর আসল ছবিগুলো নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছে। যাতে আর কেউ এখান থেকে কোনও সূত্র না পায়।'

'ছি ছি ছি, এরকম মূল্যবান ছবি! দেশের সম্পদ।'

আমি ততক্ষণে গুনে ফেলেছি। এখন ছবি আছে মোট সাতশটা মানুষের। তার পাশে পাথরের চলটা উঠে গেছে অনেকখানি।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আগে কি এখানে মোট চল্লিশ জন মানুষের ছবি ছিল?'

চিরঞ্জীব শাকসেনা বললেন, 'না। সেইটাই তো মজা। সাংকেতিক ভাষায় চল্লিশজন মানুষের উল্লেখ থাকলেও এখানে ছবি ছিল মোট একশো পঁয়তিরিশটা। আমরা খুব শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস এনেও দেখেছি, তার পাশে আরও ছবি মুছে যাওয়ার চিহ্ন ছিল।'

'আচ্ছা দাদা, কতকগুলো এ-রকম মানুষের ছবি দেখে কি করে একটা ভাষা পড়া যায়?'

'ওটা ছিল মনোমোহনের ব্যাপার। তবে দেখছ তো, প্রত্যেকটা ছবির হাত-পায়ের ভঙ্গি আলাদা? ওই হাত-পায়ের ওঠানামার মধ্যেই একটা ভাষা থাকতে পারে। অনেকটা সিমাফোর-এর মতন। তুমি নিশ্চয়ই সিমাফোর কি তা জান, আমি এ বাচ্চাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'শুনো সন্তু বেটা, সিমাফোর হচ্ছে একটা কথা-না-বলা ভাষা। অনেকটা তোমার টেলিগ্রাফের টরেটক্কার মতন। তুমি এখানে পোস্ট অফিসে বসে টরেটক্কা কর, বহুত দূরে আর একজন সেই ভাষা বুঝে যাবে। এই

টরেটক্কাকে বলে মর্স কোড। আর সিমাফোর তারও আগের। মনে কর তুমি একটা দ্বীপে একটা বিপদে পড়ে আছ, দূর দিয়ে একটা জাহাজ যাচ্ছে। তুমি চিৎকার করলেও তো সমুদ্রের আওয়াজের জন্য তোমার গলা কেউ শুনতে পাবে না। তখন যদি তুমি সিমাফোর কোড জান, তাহলে একটা পতাকা কিংবা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঠিক-ঠাক নাড়ালে জাহাজের ক্যাপ্টেন বুঝতে পেরে যাবে। সামনের দিকে দু'বার নাড়ালে বুঝবে খাদ্য, আর মাথার ওপর দু'বার ঘোরালে বুঝবে হিংস্র প্রাণী, এই রকম , বুঝলে তো?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এই গুহাবাসীরা সিমাফোর জানত?'

'সিমাফোর ঠিক নয়, ওরা নিজস্ব অন্য একটা ভাষা তৈরি করে নিয়েছিল। মনোমোহন তার পাঠ উদ্ধার করেছে।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'মূল ছবিগুলোর সব ছবি তোলা আছে আপনার কাছে?'

'আমার কাছে নেই, তবে মনোমোহনের কাছে অনেক রকম এই ছবি তোলা ছিল।'

'সবাই জানে, যে তিনজন খুন হয়েছে, তাদের কিছু চুরি যায়নি। কিন্তু মনোমোহনের ঘর থেকে এই ছবিগুলো উধাও হয়ে গেছে কি না পুলিশ নিশ্চয়ই সে খোঁজ নেয়নি?'

'ঠিক বলেছ! পুলিশের একথা মাথাতেই আসবে না।'

'চলুন। এখানে আর কিছু দেখবার নেই। বাইরে যাই।'

বাইরে গিয়ে দেখলুম, ভিখু সিং চোখ মেলেছে, কোনও রকমে উঠে বসবার চেষ্টা করছে। চিরঞ্জীব শাকসেনাকে দেখে সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, ওকে জিজ্ঞেস করুন, ওকে যে মেরেছে তাকে ও দেখতে পেয়েছিল কি না?'

কিন্তু ভিখু সিং কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু কেঁদেই চলল।

চিরঞ্জীব শাকসেনা বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর্। তোর ভয় নেই, তোকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।'

কাকাবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা ঘটেছে নিশ্চয়ই কাল রাত্তিরে। ওপরে বসে পাহারা দিয়ে কোনও লাভ হল না। ওপরের গাড়ির রাস্তা দিয়ে না এসে যে কেউ পাহাড়ের নিচ দিয়ে এদিকে আসতে পারে।'

একটু পরেই তলা থেকে মিংমার গলা পেলাম, 'আংক্‌ল সাব! আংক্‌ল সাব।'

বুঝলাম, গাড়ি এসে গেছে এদিকে।

মিংমা আর পুলিশ দু'জন ওপরে উঠে এল জঙ্গল ঠেলে। তারা তিনজনে ধরা ধরি করে ভিখু সিংকে নামিয়ে নিয়ে চলল।

চিরঞ্জীব শাকসেনা কাকাবাবুকে বললেন, 'রাজা, তুমিও চল আমার সঙ্গে। এখানে থেকে আর কি করবে।'

ভেবেছিলুম কাকাবাবু সে-কথা শুনবেন না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কাকাবাবু তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'হাঁ, চলুন। এখানে আর থেকে কি হবে। এখানে সত্যিই যদি গুপ্তধন থাকে, তবে তা উদ্ধার বা রক্ষা করবার দায়িত্ব সরকারের, আমাদের তো নয়।'

৯

আমাদের খাটিয়া আর সব জিনিসপত্তর পড়ে রইল পাহাড়ের ওপরে, সাধুবাবার আশ্রমে। আমরা ফিরে এলুম ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনার গাড়িতে।

মিংমা আর আমি নেমে গেলুম আরেরা কলোনির কাছে। কাকাবাবু গেলেন ভিক্কু সিংকে নিয়ে হাসপাতালে।

ছোড়দিতো আমাদের ফিরতে দেখে অবাক। এত তাড়াতাড়ি আমাদের অ্যাডভেঞ্চার শেষ হয়ে যাওয়ায় আমিও বেশ একটু নিরাশ বোধ করছি। ভেবেছিলুম ভীমবেঠ্কা পাহাড়ে অন্তত দিন সাতেক থাকা হবে। জলের কলসি-টলসি কেনা হল কোনওই কাজে লাগল না। বেশ লাগছিল কিন্তু ওখানে থাকতে।

তাছাড়া খুনিরাও তো ধরা পড়ল না!

রত্নেশদা, ধীরেনদা, নিপুদারা সবাই অফিসে। দীপ্ত আর আলোও স্কুলে গেছে। দুপুরে কিছু করার নেই, আমি তাই খেয়ে-দেয়ে ঘুমোলুম। মিংমা ঘুমোয় না, ও সারা দুপুর খেলা করল কুকুরটাকে নিয়ে।

কাকাবাবু ফিরলেন বিকেলে। উশকো-খুশকো চুল ক্লান্ত চেহারা। মনে হয় সারাদিন কিছুই খাননি। সঙ্গে একটা বিরাট ব্যাগ ভর্তি অনেক রকম কাগজ আর বইপত্তর।

ছোড়দিকে বললেন, 'কিছু খাবার-টাবার তৈরি কর তো, আমি স্নানটা করে আসি।'

বিকেলের দিকে খবর পেয়ে ধীরেনদা ছুটে এলেন কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, কাকাবাবু খুনি ধরা পড়ল না?'

কাকাবাবু বললেন, 'খুনি ধরা তো আমার কাজ নয়। ভীমবেঠ্কার সঙ্গে যে ওই তিনটে খুনের সম্পর্ক আছে, তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। পুলিশ খুনিদের খুঁজে বার করবে। খুনের মোটিভ বা কারণটা জানা গেলে কাজ অনেক সহজে হয়ে যায়।'

ধীরেনদা বললেন, 'যাঃ। আমরা খুব আশা করেছিলুম আপনিই ওদের শাস্তি দেবেন।'

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'নাঃ এবারে আর তা হল না। এক হিসেবে ধরতে পার, এবারে আমার হার হল। ওই সব সাংঘাতিক খুনির সঙ্গে আমি পারব কেন। পুলিশই পারতে পারে।'

ধীরেনদা বললেন, 'এখানকার পুলিশ .. আমার অত বিশ্বাস নেই।'

'কাল থেকে ভীমবেঠকার ওই গুহাগুলোও পুলিশ পাহারায় থাকবে, যাতে ওখানে কেউ আর খোঁড়াখুঁড়ি করতে না পারে; সে ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।'

'কাল থেকে? যদি আজ রাত্তিরেই ওরা এসে কিছু করে যায়?

'সেটাও সরকারের দায়িত্ব। তবে ...'

কাকাবাবু কথা বলতে-বলতে থেমে চুপ করে রইলেন। একটু ভেবে আবার বললেন, 'তবে এমনও হতে পারে, কাল থেকে পুলিশ হয়তো পুরো ভীমবেঠকা পাহাড়ই ঘিরে রাখবে, কোনও লোককেই যেতে দেবে না, আমাদের জিনিসপত্রের কি হবে? সেগুলো আনব কি করে? বিশেষত আমার ট্রান্সমিশান সেটটাও ওখানে পড়ে আছে।'

'আপনাকে নিশ্চয়ই যেতে দেবে। তা কখনও হয়?'

'বলা তো যায় না। বরং এক কাজ করা যাক, এই তো সবে সন্ধে হচ্ছে, এখনই গিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে আসা যাক। ট্রান্সমিশান সেটটা হারালে খুব মুশকিল হবে।'

'সেটা এমনি ফেলে এসেছেন?'

'সাধুবাবার কাছে জমা দিয়ে এসেছি। ধীরেন, তোমার গাড়ির ড্রাইভার আছে না?'

'আমিই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না, না, তার দরকার নেই। তোমাকে যেতে হবে না। ড্রাইভার থাকলেই হবে, আমরা যাব আর আসব।'

'তা হয় না, কাকাবাবু, এই রাত্তিরেই আপনাকে আমরা একলা যেতে দেব না। আমি যাবই আপনার সঙ্গে।'

'ধীরেন, তুমি জান না। ওই সন্তুকে জিজ্ঞেস কর, আমি একবার না বললে আর হ্যাঁ হয় না। আমি বলছি, তোমার যাবার দরকার নেই।'

'আপনি কেন একথা বলছেন, আমি জানি। আপনি ভাবছেন, আমার যদি কোনও বিপদ হয়, তাহলে আমার স্ত্রী আর ছেলেরা আপনাকে দোষ দেবে। যে ড্রাইভার বেচারা যাবে, তারও স্ত্রী আছে, দুটো বাচ্চা আছে। তার বিপদ হলেও সেই একই ব্যাপার। তাছাড়া আপনি না থাকলেও আমি মাঝে-মাঝে এ-রকম বিপজ্জনক ঝুঁকি নিই। চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই, বেরিয়ে পড়া যাক।'

'তুমি যাবেই বলছ? বেশ। তুমি ফায়ার আর্মস চালাতে পার? তোমার আছে কিছু?'

'এককালে আমার শিকারের শখ ছিল। কিন্তু এখন তো বন্দুক পিস্তল কিছু নেই আমার। একটা বড় ছুরি আছে। ওঃ, হ্যাঁ, রত্নেশের তো রাইফেল আছে, সেটা নিতে পারি?'

'তাই নাও। একটা কিছু হাতিয়ার সঙেগ রাখা ভাল।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কাকাবাবু কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন একটা ব্যাগ। ভীমবেঠকায় পৌঁছবার আগেই নেমে এল অন্ধকার। এখানকার রাস্তা অবশ্য অন্য অনেক পাহাড়ি রাস্তার মতন তেমন বিপজ্জনক নয়। হেডলাইট জ্বেলে ধীরেনদা সাবধানে চালাতে লাগলেন গাড়ি।

কালকের মতন আজও সাধুবাবা চোখ বুজে ধ্যানে বসেছেন।

কাকাবাবু বললেন, 'এখন ওকে ডাকা ঠিক হবে না। একটুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক।'

আশ্রমের পেছন দিকে আমাদের গোটান খাটগুলো পেয়ে গেলুম। কিন্তু স্টোভ আর অন্যান্য জিনিসপত্র কিছু নেই। সেগুলো হয়তো সাধুবাবা আশ্রমের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু সাধুবাবার অনুমতি না নিয়ে আশ্রমের মধ্যে ঢোকা উচিত নয়।

আমরা সকালে চলে যাওয়ার সময় সাধুবাবাকে একটা খবরও দিয়ে যেতে পারিনি। উনি কী ভেবেছেন, কে জানেন। নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম এদিক-ওদিক। আজ আর তেমন অন্ধকার নয়, আকাশ বেশ পরিষ্কার।

ধীরেনদা চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন, 'সাধুজির ধ্যান কখন ভাঙবে? যদি সারারাত উনি ওই রকম বসে থাকেন?'

ধীরেনদা এই কথা বলার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কালকের মতন গোরুটা দুবার ডেকে উঠল, হাম্বা হাম্বা। ।

তারপরই সাধুবাবা বললেন, 'ব্যোম্ ভোলা, মহাদেও, শঙ্করজী।'

আশ্চর্য। সত্যিই তো দেখা যাচ্ছে, এই গোরুটা একদম ঠিক ঘড়ির মতন।

কাকাবাবু বললেন, 'নমস্কার,সাধুজী।'

সাধুজী বললেন, 'রায়চৌধুরীবাবু, আপলোগ অচানক চলে গ্যয়ে ম্যায় শোচ্ তা হুঁ ..'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা পাহাড়ের নিচে নেমে গিয়েছিলুম, তাই আপনাকে আর খবর দিতে পারিনি। আমার জিনিসপত্র ...'

সাধুবাবা জানালেন যে, সেগুলো আশ্রমের মধ্যে আছে। ভেতরে ঢুকে তিনি একে-একে সবই এনে দিলেন।

কাকাবাবু সাধুবাবাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাবার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সাধুজী, আমরা চলে যাবার পর আর কেউ এসেছিল? আপনার নজরে পড়েছে?'

উনি দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

'জানেন, সাধুজী, এই পাহাড়ে গুপ্তধনের হদিস পাওয়া গেছে?'

সাধুবাবা হিন্দিতে বললেন যে, 'গুপ্তধন? তা বেশ তো! তাতে ওঁর কিছু যায় আসে না। ওঁর তো কোনও জিনিসে প্রয়োজন নেই।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার সাধুজী। আবার পরে এলে দেখা হবে।'

মালপত্রগুলো সব নিয়ে আসা হল গাড়ির কাছে। ওপরের কেরিয়ারে বাঁধা হল খাটগুলো। আমরা গাড়িতে উঠে বসেছি, কাকাবাবু তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে। উনি যেন শেষবারের মতন দেখে নিচ্ছেন পাহাড়টাকে। কিন্তু আবছা অন্ধকারে কিছুই দেখবার নেই অবশ্য। অন্ধকার গুহাগুলোর দিকে তাকিয়ে আজও আমার গা ছম্‌ছম্‌ করছে।

কাকাবাবু বললেন, 'এত দূর এলুম যখন, একবার গুপ্তধনের খোঁজ করে যাব না?'

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকাবাবু, আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, এখানে গুপ্তধন আছে?' আমি কিন্তু এখনও ঠিক ...'

'তোমাকে কেন আনতে চাইনি জান ধীরেন? গুপ্তধন পেলে তোমাকেও ভাগ দিতে হবে, সেইজন্য!'

আমি আর ধীরেনদা দুজনেই অবাক। কাকাবাবুর মুখে এ-রকম কথা আমি কখনও শুনিনি। উনি গুপ্তধনের জন্য লোভ করবেন, তা হতেই পারে না।

কাকাবাবু বললেন, 'মিংমা চল তো আমরা একবার নিচের সেই গুহাটা থেকে ঘুরে আসি। ধীরেন আর সন্তু এখানে অপেক্ষা করুক।'

ধীরেনদা বললেন, 'আপনি এই অন্ধকারের মধ্যে এতখানি নিচে নামবেন? এ যে অসম্ভব ব্যাপার!'

'অসম্ভব বলে আবার কিছু আছে নাকি? ছবির ভাষার যে সঙ্কেত তা আমি বুঝতে পেরে গেছি। সেটা সত্যি কিনা আজই আমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কাল থেকে পুলিশ পাহারা দেবে ... তোমরা দুজনে এখানে অপেক্ষা কর বরং ...'

ধীরেনদা কাকাবাবুকে থামাবার চেষ্টা করলন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কাকাবাবু যাবেনই গুপ্তধনের সন্ধানে। তাহলে ধীরেনদা আর আমারও এখানে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।

এবার আমার সত্যিকারের ভয় করতে লাগল। হোঁচট খেয়ে পড়া কিংবা নিচে গড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তো আছেই। তাছাড়া কে-কোথায় লুকিয়ে আছে, ঠিক নেই। যে-কেউ পাথর ছুঁড়ে কিংবা গুলি করে আমাদের মেরে ফেলতে পারে।

ঠিক হল সবাই যাব, একসঙ্গে, পরস্পরকে ছুঁয়ে থেকে। আমার আর মিংমার হাতে টর্চ, সামনে রাইফেল হাত ধীরেনদা, একদম পেছলে রিভলভার হাতে কাকাবাবু!

নামতে-নামতে এক-একবার কোনও শব্দ শুনেই চমকে উঠছি আমরা। হয়তো আমাদেরই পায়ের শব্দ কিংবা পায়ের ধাক্কায় ছিকটে যাওয়া কোনও নুড়ি। মাথার ওপর দিয়ে শান-শান করে উড়ে গেল একদল বাদুড়। এই অন্ধকারের মধ্যে ক্রাচে ভর দিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে নামা যে কত শক্ত, তা আমরা বুঝব কি করে! দু'পায়ে ভর দেওয়া সত্ত্বেও প্রায়েই হড়কে যাচ্ছে আমাদের পা, কাকাবাবু কিন্তু একবারও পিছলে গেলেন না।

বেশি নিচে নামতে হল না। মাঝামাঝি এসে এক জায়গায় কাকাবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'দ্যাখ তো সন্তু, সামনের গুহাটার নম্বর কত?'

কোনও কোনও গুহার বাইরে আলকাতরা দিয়ে নম্বর লেখা আছে বটে। এখানে একটা গুহার বাইরে লেখা 'আর এস্ ফিফ্‌টি টু।'

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে দ্যাখ আর এস্ ফিফ্‌টি ফোরটা কাছাকাছি হবে।'

টর্চের আলো ঘোরাতেই এক জায়গায় দুটো আগুনের মতন চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

আমি চমকে উঠতেই ধীরেনদা বললেন, 'ওটা নিশ্চয়ই কোনও পাখি। হ্যাঁ,এই তো প্যাঁচাটা এত আলো দেখেও নড়ে-চড়েনি। একদৃষ্টে চেয়েছিল আমাদের দিকে। আমি আর মিংমা হুস্-হাস করতে অনিচ্ছার সঙ্গে উড়ে গেল। গুহাটার মধ্যে খুব ভাল করে দেখলুম যে, আর কিছু নেই। তারপর, ঢুকে পড়লুম সেটার মধ্যে।

এক দিকের দেওয়ালে দেখলুম, পর পর কয়েকটা মানুষের ছবি, আর দুটো জন্তুর, খুব সম্ভবত মোষের।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কাকাবাবু, ছবি আছে।'

'ক'টা মানুষ?'

'তেরোটা।'

'অন্য দেওয়াল দ্যাখ।'

'আরেকটি দেওয়ালেও এক সার মানুষ রয়েছে। এখানে আছে আঠারটা। পেছন দিকের দেওয়ালে নটা।

সে কথা কাকাবাবুকে জানাতে উনি বললেন ভাল করে ছাদটাও দেখতে।

'হ্যাঁ ছাদেও ছবি আছে অনেকগুলো। এখানেও তেরোটা।'

কাকাবাবু বললেন, 'তাহলে কত হল? চল্লিশ না? ঠিক আছে এবারে বেরিয়ে আয়।'

শরীরটা একবার কেঁপে উঠল আমার। চল্লিশ মানুষ! গুপ্তধনের সংকেতে চল্লিশজনের উল্লেখ আছে। তা হলে কি এখানেই আছে সেই গুপ্তধন?

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে টর্চের আলোয় দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, মিলেছে। আমি দুপুরে মিউজিয়ামে গিয়ে দেখে এসেছি কোন গুহায় কত ছবি আছে, তার লিস্ট আছে সেখানে। দুটো মোষের ছবিও দেখিসনি?'

'হ্যাঁ দেখেছি কাকাবাবু।'

এবার দ্যাখ তো, পাশের গুহাটায় কি আছে?'

সে-গুহাটায় ঢুকে দেখলুম, সেখানে আর কোনও ছবি নেই, শুধু দুটো মোষের ছবি।

কাকাবাবু নিজের ঝোলা-ব্যাগ থেকে একটা শাবল বার করে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আর একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না। এইদুটো গুহার মাঝখানেই আছে সেই গুপ্তধন। চটপট গর্ত করে দেখতে হবে।'

প্রথমে ধীরেনদা চেষ্টা করলেন শাবল দিয়ে গর্ত খোঁড়বার। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে খিছু মাটিমেশানো জায়গাও আছে। সেখানে ছাড়া অন্য জায়গায় শুধু শাবল দিয়ে গর্ত খোঁড়া প্রায় অসম্ভব। ধীরেনদা খানিকটা খুঁড়বার পর মিংমা ওঁর হাত থেকে শাবলটা নিয়ে জোরে জোরে গর্ত খুঁড়তে লাগল। বেশ কিছুটা গর্ত করার পর ঠং-ঠং শব্দ হতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, 'দাঁড়াও, আমি দেখছি।'

তিনি গর্তটার পাশে বসে পড়ে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। কিছুই নেই শুধু কঠিন পাথর।

কাকাবাবু দ্বিতীয়টাও পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'আর একটা খুঁড়ে দ্যাখ, কিছু এখানে থাকতে বাধ্য।'

তৃতীয় গর্তটা অনেকখানি গভীর হল। এক সময় কাকাবাবু মিংমাকে বললেন, 'ব্যাস, আর না। সরে এস, আমি ভেতরটা খুঁজে দেখছি। সবাই টর্চ নিবিয়ে দাও তো একবার কিসের যেন শব্দ পেলাম।'

বড়-বড় পাথরের ফাঁকে আকাশের আলো আসে না, টর্চ নেবাতেই আমরা ডুবে গেলাম ঘুট-ঘুটে অন্ধকারে। সবাই কান খাড়া করে রইলাম।

দূরে যেন শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ হল। কেউ যেন হাঁটছে। তবে আওয়াজটা এত ক্ষীণ যে মনে হয় যেই হাঁটুক সে অনেক বেশি দূরে, কিংবা শেয়াল-টেয়ালের মতন ছোট কোনও প্রাণী।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কাকাবাবু ফিসফিসিয়ে বললেন, 'একটু টর্চ জ্বাল একবার। মনে হয় কী যেন পেয়েছি।'

কাকাবাবু প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'এই তো, সোনার মূর্তি। আমার ধারণা অনেক মূর্তি এখানে পোঁতা আছে। এর এক-একটার দাম কত হবে বল তো, ধীরেন?'

ধীরেনদা এত অবাক হয়ে গেছেন যে কথাই বলতে পারছেন না। সত্যিই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি আমরা। এই যে মাঝারি মাপের একটা [illegible] সোনার মূর্তি টর্চের আলোয় [illegible] ঝকঝক করছে।

কাকাবাবু বললেন, 'অন্তত লাখ দু-এক টাকা এক-একটার দাম হবে। যথেষ্ট হয়েছে, চল এবার, বেশি লোভ করা ভাল নয়। আমরা বেআইনি কাজ করছি। তা ছাড়া যে-কোনও মুহূর্তে বিপদ হতে পারে।'

মিংমাকে তিনি বললেন, চটপট গর্তগুলো বুজিয়ে দিতে। তারপর আমরা ফেরার পথ ধরলুম। এত জোরে উঠতে লাগলুম যেন কেউ আমাদের তাড়া করে আসছে। গুপ্তধন নিয়ে পালাচ্ছি বলে ধক্‌ধক্ করছে বুকের মধ্যে।

বিনা বিপদেই আমরা পৌঁছে গেলুম ওপরের রাস্তার দিকটায়। এখানে আসবার পর ভয় কেটে গেল। অন্ধকার গুহাগুলোর আশেপাশে যে-কেউ আমাদের আক্রমণ

করতে পারত। কিন্তু এখানে সে ভয় নেই। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা, আমাদের কাছে একটা রাইফেল আর রিভলভার আছে।

গাড়িটাতে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগলুম খানিকক্ষণ। তারপর কাকাবাবুর কাছ থেকে মূর্তিটা নিয়ে সবাই দেখলুম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। মূর্তিটা বেশ ভারি। এতকাল মাটির তলায় ছিল, কিন্তু একটুও ভাঙেনি, শুধু রংটা একটু কালো হয়ে গেছে। তবু বোঝা যায় জিনিসটা সোনার।

ধীরেনদা বললেন, 'এবার তা হলে কেটে পড়ি আমরা?'

কাকাবাবু বললেন, 'তোমাদের খিদে পায়নি? এত পরিশ্রম হল? আমার তো খিদেয় পেট জ্বলছে।'

ধীরেনদা বললেন, 'ওবায়দুল্লাগঞ্জে হোটেল খোলা থাকতে পারে। চলুন সেখানে খেয়ে নেবেন।'

গাড়ির সামনে ঘাসের ওপর বসে পড়ে কাকাবাবু ক্রাচ দুটো এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, 'ভাবছি পথে কোনও বিপদ হবে কি না। পাহাড় থেকে নামবার পথে যদি কেউ আমাদের গাড়ি আটকায়? একটা পাথরের চাঁই গড়িয়ে দেয়? পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গলের আড়াল থেকে কেউ যদি আমাদের দেখে থাকে ... আমাদের সঙ্গে এত দামি জিনিস ...। তার চেয়ে এক কাজ করলে তো হয়, রাত্তিরটা আমরা এখানেই থেকে যাই, সঙ্গে তো স্টোভ আর চাল-ডাল আছেই, মিংমা খিঁচুড়ি রাঁধবে।'

ধীরেনদা বললেন, 'সারারাত এখানে থাকব?'

'কেন, অসুবিধের কি আছে?'

'আমি যদি খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যাই?'

'তাতে বিপদ আরও বাড়বে। রাস্তার মাঝখানে পাথর ফেলে রাখলে আমাদের গাড়ি উলটে যাবে। তার চেয়ে বরং এখানে সারা রাত জেগে পাহারা দেব। সেই তো ভাল।'

'বাড়িতে কিছু বলে আসিনি। ওরা চিন্তা করবে। ভেবেছিলুম রাত দশটার মধ্যে ফিরব!'

'এখনই তো দশটা বেজে গেছে। তোমাদের বাড়িতে খবরদেবার ব্যবস্থ্যা আমি করছি। থানায় খবর দিচ্ছি, ওরা তোমার বাড়িতে জানিয়ে দেবে।'

কাকাবাবু ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশান যন্ত্রটা খুললেন। সেটাতে কড় কড় শব্দ হতেই উনি বললেন, 'রায়চৌধুরী স্পিকিং, ফ্রম দা ভীমবেঠ্‌কা হিলস ... রায়চৌধুরী ...'

মিংমা এই সব কথাবার্তা শুনে গাড়ি থেকে স্টোভটা বার করে জ্বেলে ফেলেছে। কাকাবাবু বললেন, 'আগে একটু চা করো। তারপর খিঁচুড়ি-টিচুড়ি হবে।'

জলের কলসিগুলো কিন্তু সাধুবাবার আশ্রমের কাছে রয়ে গেছে।

ধীরেনদা বললেন, 'চল সন্তু, তুমি আর আমি ধরাধরি করে একটা কলসি এখানে নিয়ে আসি। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে আমাদের মুনলিট পিকনিক হবে।'

আমি বললুম, 'ধীরেনদা, আপনার একবারও বুক কাঁপেনি? আমার তো এখনও বুকের মধ্যে দুম্ দুম্ হচ্ছে। গুপ্তধনের জন্য গর্ত খোঁড়ার সময় সব সময় মনে হচ্ছিল, কারা যেন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখছে। এই বুঝি গুলি চালাল।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছিল? আমার এখন কি মনে হচ্ছে জান? রাত্তিরে যখন থেকেই যাওয়া হল, তখন আর-একবার ওখানে গেলে হয় না?'

'আবার যেতে চান?'

'আরও কত জিনিস আছে দেখতুম! সত্যি, গুপ্তধনের একটা সাংঘাতিক নেশা আছে।

'যারা গুপ্তধন খুঁজতে যায়,তারা কেউ সাধারণত প্রাণে বাঁচে না।'

'এর মধ্যে তিনজন খুন হয়েছে। কে জানে, তারাও আলাদাভাবে এখানে গুপ্তধনের জন্য এসেছিল কিনা! এসে হয়তো কিছু পেয়েও ছিল, খুন হয়েছে সেই জন্য!

'তবু আপনি বলছেন আবার যাব!'

'তবু ইচ্ছে করছে যেতে। তা হলেই বুঝে দ্যাখ কি রকম নেশা!'

জলের কল্‌সিগুলো বাইরেই পড়ে আছে। সাধুবাবা ঘুমোতে গেছেন। আমি আর ধীরেনদা একটা কল্‌সি দু'জনে ধরে তুললাম।

সেটাকে ধরাধরি করে কিছুটা নিয়ে এসেছি, এমন সময় কোথায় যেন প্রচন্ড জোরে দুম্-দুম্ করে দুটো শব্দ হল। ঠিক যেন কামানের আওয়াজ কিংবা বোমা ফাটার মতন।

দু'জনে এতই চমকে গিয়েছিলুম যে, হাত থেকে পড়ে গেল কল্‌সিটা। দু'জনেরই মনে হল, কাকাবাবুর কোনও বিপদ হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটলুম গাড়ির দিকে।

কাকাবাবু আমাদের চিন্তায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমরা এসে পৌঁছবার পর কাকাবাবু বললেন, 'যাক, তোমরা এসেছ, নিশ্চিন্ত! মিংমা, তোমায় আর খিঁচুড়ি রাঁধতে হবে না, আমরা একটু বাদে ফিরে যাব।'

হাতের সোনার মূর্তিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এটারও আর কোনও দরকার নেই।'

ধীরেনদা বললেন, 'কি হল ব্যাপারটা?'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'ওটা সোনার মূর্তি নয়। সাধারণ লোহার মূর্তির ওপর পেতলের পাত মোড়া।'

ধীরেনদা চোখ একেবারে কপালে তুলে বললেন, 'আপনি ওই গুপ্তধনের জায়গায় এই লোহার মূর্তি পেয়েছেন? গর্তের মধ্যে?

কাকাবাবু হাসলেন।

'মূর্তিটা গর্তে ছিল না। ছিল আমার ঝোলায়। অন্ধকারের মধ্যে গর্তে লুকিয়ে তারপর তোমাদের তুলে দেখিয়েছি। ওটা গুপ্তধনের জায়গাও না, ওখানে আমি দুটো

ফাঁদ পেতে রাখতে গিয়েছিলাম। আমার কায়দাটা কাজে লেগে গেছে দেখছি। এক্ষুনি দেখতে পাবে। ওরে মিংমা, চা-টা অন্তত তৈরি করে ফ্যাল্।'

মিংমা ফ্লাস্কের জল নিয়ে সস্প্যানে চাপিয়ে দিল।

ধীরেনদা মাটি থেকে মূর্তিটা তুলে নিয়ে বললেন, 'আমার আগেই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেরকম কথা একবার ভাবিওনি। গর্তের মধ্যে থেকে বেরুল ... কাকাবাবু, আমি কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না এখনও। বোমা ফাটল কোথায়? কারা ফাটাল?'

'আমি ফাটালাম।'

'আপনি?'

'বোস, বলছি। আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম যে, যারা গুপ্তধনের লোভে মানুষ খুন করেছে, তারা আজ রাতেই কিছু একটা হেস্তনেস্ত করার চেষ্টা করবে।

'কাল থেকে পুলিশ-পাহারা বসবে। আজ রাতে, অন্ধকারের মধ্যে যদি ওই গুহা আর জঙ্গলে আট-দশটা লোকও লুকিয়ে থাকে, তাহলেও তাদের ধরা সম্ভব নয়। অন্ধকারে খুঁজে পাবে কি করে? তাই আমি একটা ফাঁদ পাতলুম। অনেক চেষ্টা করে আজ দুপুরে এখানকার আর্মির কাছ থেকে আমি দুটো মিথেন বোমা যোগাড় করেছি। কোনও লোহার জিনিস দিয়ে ছুঁলেই এই বোমা ফেটে যায় তখন দুশো ফুটের মধ্যে যত মানুষ থাকবে সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে। যেখানে আমরা গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিলাম, ওখানে গুপ্তধন থাকার কোনও কথাই নয়। তবু ওখানে গর্ত খুঁড়িয়ে একটাতে এই রকম আর-একটা পেতলের মূর্তি, আর দুটোতে দুটো বোমা আমি লুকিয়ে রেখে এসেছি তখন। জানতুম,আড়াল থেকে কেউ-না-কেউ আমাদের লক্ষ্য করবেই। ঠিক সেটাই হয়েছে। ওই শোন।'

এবার জঙ্গলে শোনা গেল অনেক হুইশেলের শব্দ, মানুষের গলার আওয়াজ। আর বড়-বড় ফ্লাশলাইটের আলো ঝলসে উঠল। কৌতূহল সামলাতে না-পেরে আমরাও এগিয়ে গেলুম খানিকটা।

প্রায় কুড়িজন পুলিশ মিলে বয়ে নিয়ে এল আটজন ঘুমন্ত বন্দীকে। তাদের মধ্যে প্রথমেই আমি চমকে উঠলুম সাধুবাবাকে দেখে।

ধীরেনদা বললেন, 'ইস্, সাধুবাবা পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারেননি!'

কাকাবাবু বললেন, 'ইনি আসল সাধুবাবা নন. আগের বার এসে দেখেছিলাম দু'জন সাধুকে। ও ছিল চেলা। আসল বড় সাধুবাবা কাশীতে তীর্থ করতে গেছেন।'

পুলিশের অফিসার বললেন, 'আরও তিনজনকে চিনতে পারা গেছে। একজন মিউজিয়ামের দারোয়ান, একজন পুলিশের লোক আর এই যে গোঁফওয়ালাটিকে দেখছেন, ও সেই কুখ্যাত ডাকাত রামকুমার পাখি, খুনগুলো সম্ভবত এই করেছে। ভোজালি দিয়ে মুন্ডু কেটে ফেলা এর স্টাইল। ওর নামে দশহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা আছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আর সবাইকে চিনতে পারবেন ঠিকই। সবই একজাতের পাখি। এদের একটু চাপ দিলেই জানতে পারবেন, কোথায় এরা সুন্দরলালের ছেলে প্রেমকিশোরকে আটকে রেখেছে। সম্ভবত প্রেমকিশোরের মুখ থেকেই এরা প্রথমে ব্যাপারটা জানতে পারে। তার কি সাংঘাতিক পরিণতি।'

পুলিশ অফিসারটি বললেন, 'স্যার, আপনি যে অসাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে এ-রকমভাবে ওদের ধরতে আমাদের সাহায্য করবেন...'

কাকাবাবু সে-কথা না শুনে মিংমার দিকে ফিরে বললেন, 'কই রে, তৈরি হল না এখনও? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। এখন ভাল করে এক কাপ চা খেতে চাই।'

অন্ধকারের বন্ধু

১

ঠিক যেমনভাবে কালবৈশাখী ঝড় ওঠে, সেইরকমই হঠাৎ এসে পড়ে দস্যুর দল। তারা ঘোড়ায় চড়ে আসে। তাদের ঘোড়ার পায়ের খুরে ধুলোর মেঘ ওঠে। টগবগ টগবগ শব্দের সঙ্গে দস্যুরা এমন চিৎকার করে সবাই মিলে, যা শুনলে ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

ঝড়ের মতন আসে, আবার ঝড়ের মতনই চলে যায় ওরা। বেশিক্ষণ থামে না। এক-একটা গ্রামের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লুটপাট করে সোনাদানা, টাকা-পয়সা, শস্য। ঘরের দরজা ভেঙে, সিন্দুক ভেঙে, হাঁড়ি-কলসি ভেঙে এইসব খোঁজে। কেউ বাধা দিতে এলেই ঘাড়ে মারে তলোয়ারের কোপ।

তারপর সমস্ত গ্রামে জ্বালিয়ে দেয় আগুন। ওরা যখন চলে যায়, তখন পেছনে পড়ে থাকে গ্রামের মানুষের কান্না। কাঁদতে-কাঁদতে তারা আগুন নেবাবার চেষ্টা করে। কেউ-কেউ আহত, নিহতদের মধ্যে খোঁজে প্রিয়জনদের।

কতদূর থেকে আসে সেই দস্যুরা, তা কেউ জানে না। তাদের তেজী ঘোড়াগুলো পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা-জঙ্গলের বাধা মানে না। তাদের মুখের ভাষাও বোঝে না কেউ।

বাংলার বহু গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে এই দস্যুদের অত্যাচারে। যেসব গ্রামে তারা এখনও আসেনি, সেখানকার মানুষরাও ভয়ে কাঁপে প্রতিদিন। কবে সেই ঝড় আসবে তার ঠিক নেই। তখন কি হবে?

রতন বৈরাগী গান গেয়ে-গেয়ে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়ায়। তার ঘর-সংসার নেই, কেউ নেই। তাই তার কোনও বন্ধনও নেই। রাত্তিরবেলায় সে কোনও গাছতলায় কিংবা মন্দিরের সিঁড়িতে শুয়ে থাকে। শীত-গ্রীষ্মে কোনও ভেদাভেদ নেই। তার চেহারা দেখলে তার বয়েসও বোঝা যায় না। বেশ লম্বা আর রোগা, মাথায় চুলের জটা আর মুখভর্তি দাড়ি। গেরুয়া কাপড় পরে থাকে সারাক্ষণ। অনেকে বলে, গত কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে রতন বৈরাগীর চেহারা ওই একই রকম আছে। তার বয়েসের গাছ-পাথর নেই।

রতন বৈরাগী এই বাসন্তীপুর গ্রামে বারবার ফিরে-ফিরে আসে। দামোদর নদীর ধারে দামোদরপুর ভারি সুন্দর গ্রাম। এখানে রয়েছে নবদুর্গার মস্তবড় মন্দির। সেই মন্দিরের তিনটি চূড়া, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। মন্দিরের একপাশে একটা দিঘি, তার জল কাকের চক্ষুর মতন টলটলে। আর-একদিকে ফলের বাগান। এ-গ্রামের

জমিদার রাধু রায় দেশ-বিদেশ থেকে নতুন-নতুন গাছ এনে এখানে লাগিয়েছেন। জমিদারের খুব বাগানের শখ।

মন্দিরের সামনে অনেকখানি বাঁধানো চাতাল। তার পাশে-পাশে কয়েকটা খড়ের ঘর। কিছু-কিছু সাধু-সন্ন্যাসী থাকে সেইসব ঘরে। প্রতিদিন মন্দিরে খিচুড়ি-ভোগ হয়, তা ছাড়া বাগানের ফলমূল আছে। সাধু-সন্ন্যাসীদের খাওয়ার জন্য কোনও চিন্তা করতে হয় না।

কেউ-কেউ রতন বৈরাগীকে বলে, 'তুমি গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়াও কেন? এই বাসন্তীপুরের নবদুর্গা মন্দিরেই তো থেকে গেলে পার! সবাই তোমাকে যত্ন করবে!'

রতন বৈরাগী তা শুনে জিব কেটে বলে, 'আমি যে বৈরাগী! বৈরাগীদের এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে নেই তা হলে পায়ে শেকড় গেঁথে যায়।'

এই রতন বৈরাগীই দূর-দূর দেশের খবর আনে এই গ্রামে।

বাসন্তীপুর গ্রামে কোনও অশান্তি নেই। লোকেরা চাষবাস করে, নদীতে মাছ ধরে। কয়েক ঘর তাঁতি আছে, তারা কাপড় বোনে। তাদের তাঁতের কাপড়ের বেশ নাম আছে। ওই তাঁতিপাড়ায় একটা গানের দল আছে, তারা মাঝে-মাঝে সারা গ্রাম ঘুরে-ঘুরে গান গায়। অন্যরাও যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। সন্ধেবেলা তাঁতিদের গানের দলটা এলে সব বাড়ি থেকে তাদের সন্দেশ-বাতাসা খেতে দেয়, কেউ-কেউ তাদের সঙ্গে খোল-করতাল বাজায়। শুধু বেচারাম নামে একটা ছেলে বড্ড বেতাল ঢোল বাজায়। সে বাজাতে শুরু করলেই অন্যরা হইহই করে থামিয়ে দেয় তাকে। বেচারামের কিন্তু ঢোল বাজাবার খুব শখ। সে তখন একা-একা চলে যায় নদীর ধারে।

এই গ্রামে ডাকাতদের খবর প্রথম নিয়ে এল রতন বৈরাগী। রতন বৈরাগী প্রত্যেকবার যখন বাসন্তীপুরে ফিরে আসে, তার সঙ্গে থাকে একটা গল্পের ঝুলি। তাকে দেখলেই ছোট ছেলেরা ঘিরে ধরে। গল্প বলতে রতন বৈরাগীর ক্লান্তি নেই। কতরকমের গল্প, তার কতটা সত্যি আর কতটা আজগুবি তা বোঝা ভার। সে নাকি তিন ঠ্যাংওয়ালা মানুষ, আর মুলোর মতন দাঁতওয়ালা দৈত্য দেখেছে। কোথায় নাকি জল জমে শক্ত হয়ে যায় পাথরের মতন।

ছোটদের সঙ্গে-সঙ্গে বড়রাও তার গল্প শোনে। ওই জল জমে পাথরের মতন শক্ত হওয়ার গল্প শুনলে সবাই হো-হো করে হাসে।

এবারে রতন বৈরাগী ফিরে এল মুখ গোমড়া করে। সকালবেলা সে নামল একটা গয়নার নৌকো থেকে। তাকে দেখেই ছোটরা ছুটে এসে চ্যাচাতে লাগল, 'গল্প বলো, গল্প বলো, নতুন গল্প!'

অন্যবার বৈরাগী বলে, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও বাপধনরা, একটু জিরিয়ে নিই। খাওয়াদাওয়া করি, তারপর তো গল্প হবে!'

এবার সেসব কিছুই বলল না, গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ছেলেদের দিকে। তারপর নবদুর্গার মন্দিরের দিকে যেতে যেতে থেমে গেল এক জায়গায়। তারপর শুয়ে পড়ল একটা গাছের নিচে।

সারাদিন সে সেখানেই শুয়ে রইল। উঠল না, কিছু খেল না।

এই গ্রামের আর-একজন মানুষের নাম বাঁকা চৌধুরী। তাঁর ভাল নাম বঙ্কিম, কিন্তু সবাই তাঁকে বাঁকাবাবু বলেই ডাকে। তাঁর সাজগোজ খুব ফুলবাবুর মতন। ফরসা, কোঁচানো ধুতি, সিল্কের ফতুয়া, হাতে একটা রুপোবাঁধানো ছড়ি। মাথায় চকচকে কালো চুল পাতাকাটা! বিকেল হলেই বাঁকা চৌধুরী পাড়া বেড়াতে বেরোন, লোকের বাড়ির খবর নেন!

হাঁটতে-হাঁটতে বাঁকা চৌধুরী দেখলেন, এক জায়গায় গাছতলায় একটা ছোটখাট ভিড়। কাছে এসে বাঁকা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, কি হয়েছে রে?'

কয়েকটি বাচ্চা ছেলে বলল, 'বৈরাগীর অসুখ হয়েছে। বৈরাগী কথা বলতে পারছে না।'

বাঁকা চৌধুরী হুকুমের সুরে বললেন, 'সরে যা, তোরা সামনে থেকে সরে যা! আমি দেখি।'

বাঁকা চৌধুরীকে সবাই মানে। তাঁর কথায় ফাঁকা হয়ে গেল সামনেটা। তখন দেখা গেল, একটা ছেঁড়াখোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে রতন বৈরাগী। আর কোঁ-কোঁ শব্দ করছে!

একটু ঝুঁকে বাঁকা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে, ও রতন, কি হল তোমার?'

রতন বৈরাগী এ-পর্যন্ত কারও ডাকে সাড়া দেয়নি। এবার মুখ ফিরিয়ে বাঁকা চৌধুরীকে ডেকে বলল, 'আমি মরে গেছি! কত্তামশাই, আমি মরে গেছি!'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'বালাই ষাট, তুমি মরবে কেন? অসুখ-বিসুখ করেছে বুঝি?'

রতন বৈরাগী আর কোনও উত্তর না দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এবার বাঁকা চৌধুরী ভুরু কোঁচকালেন। রতন বৈরাগীকে এ-পর্যন্ত কেউ কখনও কাঁদতে দেখেনি। সে গান গায় আর হাসিমুখে গল্প করে সব সময়। কান্না যেন তাকে মানায় না। তা হলে তো গুরুতর ব্যাপার।

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'ভয় নেই, রতন। তুমি মরবে না, আমরা তোমাকে বাঁচাব।'

রতন বৈরাগীকে ধরাধরি করে আনা হল বাঁকা চৌধুরীর বাড়িতে। কবিরাজকে ডাকা হল। কবিরাজও রতনকে ভাল করে দেখে গম্ভীরভাবে বললেন, 'খুবই চিন্তার কথা!'

রতন বৈরাগীর পিঠে একটা বেশ বড় দগদগে ক্ষত । কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে মারা হয়েছে । এমন মানুষকে কে মারবে ? জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে, জ্ঞানও নেই ।

তিনদিন পরে তার জ্ঞান ফিরল ।

চোখ মেলেই সে বলল, 'হা ভগবান ! মানুষ মানুষকে এমনভাবে মারে ? বলাই কোথায় গেল, বলাই ? বলাই এলি ?'

বাঁকা চৌধুরী কাছে এসে বললেন, 'বলাই কে রে ? এ-গ্রামে তো বলাই নামে কেউ নেই !'

রতন বৈরাগী একটুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল । তারপর ফিসফিস করে বলল. 'কত্তামশাই, বলাইকে বাঁচাতে পারলাম না ! তাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল !'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'তুই কি বলছিস, কিছুই যে বুঝতে পারছি না ! বলাই কে ! কারা ধরে নিয়ে গেল ?"

রতন বলল, 'বলাই একটা ছোট ছেলে । আমাকে বড় ভালবাসে । তার গলায় একটা সোনার হার ছিল, তাই দেখে ওরা এমন টান দিল যে, ছেলেটা ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘোড়ার পায়ের তলায় ।'

'ওরা মানে ?'

'ওরা মানে ডাকাতরা । হা ভগবান, তাদের প্রাণে দয়ামায়া কিছু নেই ! তারা কাউকে ছাড়ে না ! কত্তাবাবু আমি বলাইকে বাঁচাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লাম । তখন একজন আমার পিঠে কোপ মারল ।'

'ডাকাত পড়েছিল, কোন্ গ্রামে ?'

'সে-গ্রামের নাম গোষ্ঠতলা । আমি মাঝে-মাঝে যাই । সে গ্রামের সর্বনাশ হয়ে গেছে । শুধু গোষ্ঠতলা নয় গো, তার আগে লক্ষ্মীপুর, বাদুগঞ্জ, রহমতপুর, রায়নগর সব গ্রাম শেষ ! এ-ডাকাতদের কেউ আটকাতে পারে না । এরা দিনের বেলা আসে।'

'দিনের বেলা ? বলিস কি রে ?'

'হ্যাঁ গো, কত্তামশাই, নবাবের সৈন্যরাও এই ডাকাতদের ভয় পায় ! ডাকাতদের আসতে দেখলে তারা পালায় ! আমি এদের কথা আগে শুনেছি, এবার স্বচক্ষে দেখলাম । বলাইকে বাঁচাতে পারলাম না ।'

'দিনের বেলা ডাকাত আসে, এমন তো কখনও শুনিনি । তাদের এত সাহস হল কি করে ? নবাব-বাদশারা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে ?'

হঠাৎ উঠে বসে রতন বৈরাগী পাগলাটে গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু আমায় কে বাঁচাল ? আমায় কে বাঁচাল ? আমার তো বাঁচার কথা ছিল না ।'

সে নিজের পিঠে হাত দিয়ে দেখল, কেঁপে উঠল তার শরীর । সে বলল, 'আমার পিঠে কোপ মারল, আমি মাটিতে পড়ে গেলাম । তারপরেই ভাবলাম, এবার আমার গায়ের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দেবে । হঠাৎ শুনতে পেলাম, একটু দূরে কে যেন বজ্রগম্ভীর স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, সাবধান !'

'আমি মুখ তুলে এক পলকের জন্য দেখলাম সেদিকে। মনে হল, একটা গাছের নিচে যেন একজন দেবতা এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মুখ দেখা গেল না। মুখখানা একটা লাল কাপড়ে ঢাকা। পরনেও লাল কাপড়। হাতের তলোয়ারখানা সোনা দিয়ে গড়া। তিনি হুঙ্কার দিয়ে দু'বার বললেন সাবধান! তারপর আর মনে নেই। আমি জ্ঞান হারালাম। সেই দেবতাই নিশ্চয়ই আমাকে বাঁচিয়েছেন।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'লাল কাপড়-পরা দেবতা?'

রতন বলল, 'পেছন থেকে সূর্যের আলো পড়ে তাঁর মাথার পেছনটায় জ্যোতি দেখা যাচ্ছিল। তিনি আমাকে বাঁচাবার জন্যই এসেছিলেন। নিশ্চয়ই বলাইটাও বেঁচে গেছে।'

দেবতার কথাটা বাঁকা চৌধুরী ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। রতন বৈরাগী এরকম কিছু বানিয়ে বলে। কিন্তু ডাকাতদের খবরটা তাঁকে চিন্তিত করে তুলল। রতন বৈরাগীর পিঠে তলোয়ারের আঘাত আছে, এটা তো আর মিথ্যে নয়!

বাঁকা চৌধুরী তখন গেলেন জমিদার রাধু রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। রাধু রায় এখন বেশ বৃদ্ধ হয়েছেন, একটা পায়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটেন। আগে তিনি ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াতেন, এখন আর তিনি ঘোড়ায় চাপতে পারেন না। বাড়ি থেকে বেরোন না বেশি। মাসে একবার মন্দিরে আসেন পালকিতে চেপে।

রাধু রায় পুজোয় বসেছিলেন। বাঁকা চৌধুরীকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। প্রাসাদের সামনের ঘরটাতে চৌকির ওপর ফরাস পাতা। একজন ভৃত্য তাঁকে তামাক খাবার গড়গড়া দিয়ে গেল।

পুজো সেরে রাধু রায় সেই ঘরে ঢুকেই বললেন, 'কী বাঁকা, ডাকাতের কথা বলতে এসেছ তো?'

বাঁকা চৌধুরী চমকে উঠলেন। তাঁর ধারণা, গ্রামের সব খবর তিনিই আগে পান। রতন বৈরাগী এখনও তাঁর বাড়িতে রয়েছে। রতন ছাড়া ওই ডাকাতদের কথা এখন পর্যন্ত আর কেউ জানে না। রাধু রায় কি মনের কথা পড়তে জানেন নাকি?

রাধু রায় আবার হেসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মানুষের মনের কথা মুখ দেখলেই বুঝতে পারি। বিপদের কথা না থাকলে আর বাঁকা চৌধুরী আমার কাছে আসবে কেন?'

রাধু রায় দূর সম্পর্কে বাঁকা চৌধুরীর মামা হন। এক সময় বাঁকা চৌধুরী তাঁর খুব অনুগত ছিলেন। এ-বাড়িতে আসতেন প্রায়ই। ঈদানীং আসা-যাওয়া কমে গেছে।

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'আপনি ডাকাতদের কথা শুনেছেন তা হলে?'

রাধু রায় বললেন, 'আমার বাবা বড় জমিদার ছিলেন। এখন জমিদারির অনেকটা গেছে। তবু তো লোকে এখনও আমাকে জমিদার বলে মানে! তাই সব সময় চোখকান খোলা রাখতে হয়। বাড়ি থেকে বেরই না বটে, তবু এ-তল্লাটের সব খবরই রাখি!'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'মামা, শুনলাম এরা সাঙ্ঘাতিক ডাকাত ! দিনের বেলাতেও আসে ! নবাবের ফৌজকেও এরা ভয় পায় না ।'

রাধু রায় বললেন, 'হুঁ । জানি । এই ডাকাতরা এদেশি নয় । আসে বহুদূব থেকে । তবে আমাদের এলাকায় এখনও আসেনি ।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'এখনও আসেনি । কিন্তু আসবে না, তা কি বলা যায় ?'

রাধু রায় বললেন, 'আসতেই পারে । এদের লোভ আর সাহস ক্রমশই বাড়ছে । ওরা শুধু সোনাদানা লুট করে না, শস্যও নেয় বলে খবর পেয়েছি । শস্যের লোভেই তারা এদিকে আসবে ।'

'তখন কি হবে ?'

'জানি বাঁকা, তুমি কী বলতে এসেছ । আমি জমিদার, আমারই দায়িত্ব এই এলাকার মানুষকে রক্ষা করা । এই ডাকাতদের কথা যতটুকু জেনেছি, তাতে তো মনে হয়, এদের আটকাবার ক্ষমতা আমাদের নেই । আমার আছে মাত্র শ'খানেক লাঠিয়াল । ওরা দুর্বল প্রজাদের ধরে পেটাতে পারে কিন্তু ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলেই চম্পট দেবে !'

'তা জানি । আপনার লাঠিয়ালরা ডাকাতদের ঠেকাতে পারবে না ।'

'যৌবনে আমি তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ালে আমার সামনে আসার ক্ষমতা অনেকেরই ছিল না । ঘোড়া ছুটিয়ে আমি অনেক ডাকাত-ঠ্যাঙাড়ে শায়েস্তা করেছি । কিন্তু এখন একটা পা দুর্বল হয়ে গেছে । আর যুদ্ধ করতে পারি না ।'

'মামা, অল্প বয়সে আমিও ভালই যুদ্ধ করতাম । অনেক লড়াই করেছি । কিন্তু একবার আমার শিরদাঁড়ায় চোট লাগায় আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না । লোকে তাই আমার নাম দিয়েছে বাঁকা ।'

রাধু রায় হা-হা করে হেসে উঠলেন । হাসতে-হাসতে বললেন, 'আমাদের এখন গোটা বাঙালি জাতটারই পা দুর্বল আর শিরদাঁড়ায় চোট । লড়াই করার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি । বাইরের শত্রুরা এসে আমাদের পেটাবে । তাতে আর আশ্চর্য কী ।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'শেষে কী ডাকাতের হাতে ধন-মান সব যাবে ?'

রাধু রায় বললেন, 'যদি বাঁচতে চাও তো এ-গ্রাম ছেড়ে পালাও ! ওদের আসতে আর দেরি নেই ।'

'আর আপনি ?'

'আমি পৈতৃক ভিটে ছেড়ে যেতে পারব না । মরতে হলে এখানেই মরব !'

'জমিদার বংশের সন্তান হয়ে আপনি ডাকাতদের হাতে প্রাণ দেবেন ?'

রাধু রায়ের মুখের হাসিটি মোছেনি । তারই মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর উপায় কী বলো ?'

দু'জনে মিলে পরামর্শ করলেন কিছুক্ষণ । তারপর ঠিক হল, এই গ্রাম থেকে চার পাঁচজনের একটি দল পাঠানো হবে গোষ্ঠতলায় । তারা যাবে গুপ্তভাবে । ডাকাতদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেবে ।

কিন্তু ডাকাতদের কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই সবাই এমন ভয় পেয়ে গেল যে, কেউ আর যেতে চায় না। দুটি ছেলেকে রাজি করানো হল কোনওক্রমে। শেষ পর্যন্ত বাঁকা চৌধুরী বললেন, তিনিই যাবেন ওই ছেলে দুটির সঙ্গে।

অমাবস্যার রাত্তিরে নৌকোয় রওনা দিল সেই তিনজন।

২

অমাবস্যার রাতে চতুর্দিক একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে একটাও তারা দেখা যায় না। মনে হয় যেন চোখ বুজে থাকা আর চোখ খুলে থাকা সমান।

সন্ধের খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়ে গ্রামের মানুষ। কোথাও কোনও শব্দ নেই। মাঝে-মাঝে শোনা যায় দু-একটা কুকুরের ডাক। নৌকার বৈঠা ফেলা হচ্ছে খুব সাবধানে, তবু সামান্য ছপছপ আওয়াজ হচ্ছে। এ-নৌকোয় আলাদা কোনও মাঝি নেই, বাসন্তীপুর গ্রামের দুটি সাহসী ছেলেই নৌকো চালাচ্ছে। তাদের নাম কালকেতু আর গোপাল। এরা দু'জনেই জঙ্গলে শিকার করে। হরিণ, ভাল্লুক মারে। একবার একটা চিতাবাঘও মেরেছিল।

এই দু'জনের চেয়ে বাঁকা চৌধুরী বয়েসে বড়। তাঁর শরীরেও বিশেষ জোর নেই। কিন্তু গ্রামের আর কেউ তো দূরে যেতে সাহস করল না। এমন অবস্থা হয়েছে, সাধু-বৈরাগীরা ছাড়া গ্রাম ছেড়ে কেউ আর বাইরেই যায় না, বাইরের জগতের খবরও রাখে না।

নদীর নাম দামোদর। মস্ত বড় নদী। বর্ষার সময় প্রতি বছর বান আসে, দু'কূল ছাপিয়ে যায়। এখন অবশ্য শীতের শেষ, তত জল নেই। অন্ধকারে সামনের দিকটা দেখারও উপায় নেই। নৌকো চলেছে আন্দাজে।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর গোপাল বলল, 'চৌধুরীকর্ত্তা, আমরা কতদূরে যাব ; বুঝব কী করে যে, কোথায় যাচ্ছি ?'

বাঁকা চৌধুরী একটা হুঁকোয় তামাক টানতে-টানতে চোখ বুজেছিলেন। চোখ মেলে দু'পাশটা দেখবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'রতন বৈরাগী বলেছিল গোষ্ঠতলার কথা। ততদূর যাব না। গোষ্ঠতলার আগে রায়মল্ল গ্রাম, তার আগে হেমকুঠি। হেমকুঠির এদিকে একটা মস্ত বাদা অঞ্চল, তার আগে পঞ্চানন্দপুর। সেই পঞ্চানন্দপুর পর্যন্ত যাব। তার বেশি আর যাওয়ার দরকার নেই।'

গোপাল বলল, 'অন্ধকারে সেই পঞ্চানন্দপুর বা চিনব কি করে ?'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'ও-জায়গা চিনতে অসুবিধে নেই। পঞ্চানন্দপুরে একটা বিরাট শ্মশান আছে। মস্ত বড় কালীমন্দিরও আছে। অনেক গ্রামের লোক সেখানে মড়া পোড়াতে আসে, দিন-রাত চিতা জ্বলে। দূর থেকেই দেখা যাবে সেই আগুন।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এত জায়গা চিনলেন কি করে ?'

বাঁকা চৌধুরী হেসে বললেন, 'তোমাদের মতন বয়সে আমি অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার খুব শখ ছিল দেশ দেখার। আমি আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পাটনা পর্যন্ত গেছি। ইচ্ছে ছিল রাজধানী দিল্লি পর্যন্ত যাওয়ার। কিন্তু বারাণসীর পথে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ি। ঘোড়াসুদ্ধ একটা খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। ঘোড়াটা মারা গেল, আমার শিরদাঁড়ায় আঘাত লেগেছিল প্রচণ্ড! বাঁচার আশা ছিল না, তবু বেঁচে উঠলাম ভাগ্যবলে।'

কালকেতু আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ঘোড়াটা খাদে পড়ল কি করে? ডাকাতে তাড়া করেছিল?'

'ডাকাতে না রে, বাঘে। পাহাড়ের সরু রাস্তা। সামনের দিকে দেখি দুটো বাঘ খেলা করছে। তখনও সন্ধে হয়নি। স্পষ্ট দেখা যায়। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে একটা বাঘ মুখ তুলে তাকিয়ে হুঙ্কার দিল। সে কী প্রচণ্ড আওয়াজ। শুধু বুক কাঁপে না রে, সেই আওয়াজের চোটে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। আমি কিছু বোঝার আগেই ঘোড়াটা পেছন ফেরার জন্য লাফ দিল, সঙ্গে-সঙ্গে খাদে গড়িয়ে পড়লাম!'

হঠাৎ গোপাল বলল, 'চুপ! কিসের যেন শব্দ শুনছি। উলটো দিক থেকে আর একটা নৌকো আসছে মনে হচ্ছে।'

সবাই কথা থামিয়ে কান পেতে শুনল। সত্যি, জলে বৈঠা ফেলার শব্দ হচ্ছে। একটু পরে সামান্য একটু আলোও দেখা গেল। নদীটা সেখানে বাঁক নিয়েছে।

গোপাল ফিসফিস করে বলল, 'এখন কি করি? যদি ওটা ডাকাতের নৌকো হয়?'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'কিনারার দিকে আমাদের নৌকোটা ভিড়িয়ে ফেল। অন্ধকারে আমাদের দেখতে পাবে না।'

গোপাল আর কালকেতু জোরে-জোরে বৈঠা টেনে নৌকোটা নিয়ে এল কূলের কাছে। সেখানে কিছু ঝোপঝাড় রয়েছে। ওরা নৌকোটা বেঁধে, পাড়ের ওপর উঠে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইল।

বাঁক ঘোরার পর অন্য নৌকোটাকে দেখা গেল স্পষ্ট। বেশ বড় নৌকো। তাতে রয়েছে অন্তত দশ-বারোজন লোক, দু'দিকে দু'জনের হাতে জ্বলন্ত মশাল। সাজপোশাক দেখে মনে হয়, এরা নবাবের সৈন্য, কয়েকজনের হাতে বর্শা, একজনের হাতে বন্দুক।

এমন দিনকাল পড়েছে যে, নবাবের সৈন্যদের দেখলেও ভয় লাগে। রক্ষকরাই এখন ভক্ষক। নবাবের সৈন্যরাও যাকে-তাকে ধরে নিয়ে যায়, বণিকদের নৌকো দেখলে লুটপাট করে, প্রতিবাদ করলে মেরে ফেলে দেয়।

সৈন্যরা মশাল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছে নদীর দুই ধার। বাঁকা চৌধুরীদের নৌকোটাও তাদের চোখে পড়ল, কিন্তু সেটাতে কোনও মানুষ নেই দেখে আর আমল দিল না।

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি রে । এই রাত্তিরে আমাদের দেখতে পেলে আর রক্ষে ছিল না । কিছু বলার আগেই বোধহয় মেরে ফেলত !'

গোপাল বলল, 'কত্তা, তা হলে কি আর এগিয়ে লাভ আছে ? ওদিকে ডাকাতের ভয়, আবার নবাবের সৈন্যদেরও ভয় । তা হলে বাঁচব কি করে ?'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'তবু তো বাঁচার চেষ্টা করতে হবে । অন্য কেউ বাঁচাবে না, নিজেদেরই বাঁচার চেষ্টা করতে হবে ।'

গোপাল বলল, 'দিল্লির বাদশা তাঁর প্রজাদের দেখবেন না ?'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'দিল্লির খবর আমরা কি জানি ? যতটুকু শুনেছি, বাদশা এখন নিজের সিংহাসন সামলাতেই ব্যতিব্যস্ত । আমাদের কথা তাঁর ভাববার সময় নেই ।'

কালকেতু বিরক্তভাবে বলল, 'ডাকাতের খোঁজে আমাদের এতদূর আসার কী দরকার, তা তো বুঝছি না । গ্রামে গিয়ে ঘর সামলাবার ব্যবস্থা করলেই তো হয় !'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'এ তো ছোটখাট ডাকাতের ব্যাপার নয় । এমনিতে তো চুরি-ডাকাতি লেগেই আছে । এরা যে অদ্ভুত ধরনের ডাকাত । বহুদূর থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসে, দিনের বেলা লুটপাট করে, নবাবের সৈন্যদেরও পরোয়া করে না! গ্রামে বসে এদের আমরা রুখব কি করে ? ভাল করে জানা দরকার, এরা সত্যিই ডাকাত, না বিদেশি সৈন্য !'

গোপাল বলল, 'ঘোড়ায় চেপে দিনের বেলায় আসে, তা হলে নিশ্চয়ই বিদেশি সৈন্য । নবাবের বদলে এরাই এরপর রাজত্ব করবে ।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'বিদেশি সৈন্য হলে গ্রামের পর গ্রাম দখল করে রাখত । লুটপাট করে ফিরে যাবে কেন ? সেইটাই তো বোঝা যাচ্ছে না । রতন বৈরাগী ঠিক গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না । এদিকে একটা গ্রাম থেকে ডাকাতদের কথা ঠিক মতন শুনে আসতে হবে !'

গোপাল জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা চৌধুরীকত্তা, রতন বৈরাগী নাকি বলেছে কোনও এক দেবতা নাকি তাকে বাঁচিয়েছে । ডাকাতরা যখন তাকে তলোয়ারের কোপ দিয়ে মারতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে এক দেবতা এসে লড়াই করতে লাগল ডাকাতদের সঙ্গে । সেই দেবতার মুখ লাল কাপড়ে ঢাকা, মাথার পেছনে আলো জ্বলছিল ।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'হ্যাঁ, রতন বৈরাগী এরকম বলেছে বটে । কিন্তু সে হল অসুখের ঘোরের কথা । সে কী দেখতে কী দেখেছে, কে জানে । আমাদের এখন এমনই দুর্দিন, দেবতারাও আমাদের দয়া করতে আসেন না । ভেবে দ্যাখ না, সারা দেশে বিপদের পর বিপদ চলছে, তবু কি দেবতাদের দয়া হয় ?'

নবাবের সৈন্যদের নৌকোটা মিলিয়ে গেছে অনেক দূরে । নদী আবার অন্ধকার হয়ে গেছে । বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'চল, আমরা এগই ! আজ রাতের মধ্যে পঞ্চানন্দপুর পৌঁছতে পারলে কাল সকালেই ফিরব !'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে ওরা নেমে এল জলের দিকে ।

এমন সময় অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, আর-একজন লোক নেমে আসছে উলটো দিক থেকে, যেন ওই নৌকোটাতেই উঠতে চায় ।

বাঁকা চৌধুরী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে রে ? কে ?'

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে নৌকোর দড়ির বাঁধন খোলার চেষ্টা করল তাড়াতাড়ি ।

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'আমাদের নৌকো চুরি করছে । আটকা, ওকে আটকা।'

গোপাল আর কালকেতু হুড়মুড়িয়ে ছুটে গেল সেদিকে । বাঁকা চৌধুরী দৌড়তে পারেন না, তিনি হাতের তলোয়ার তুলে ঝোপ-জঙ্গলটা একবার দেখবার চেষ্টা করলেন, আর কোনও লোক আছে কী না !

ওই লোকটার সঙ্গে গোপাল আর কালকেতুর ঝটাপটি লেগে গেছে । লোকটা গোপালকে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দিয়ে একটা পা দিল নৌকোর ওপর । কালকেতু লোকটাকে মারবার জন্য লাঠি তুলল ।

বাঁকা চৌধুরী এবার কাছে এসে বললেন, 'ওর মাথায় মারিস না, পায়ে মার ।'

কালকেতু লোকটার পায়ে সজোরে মারলেও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল আবার । বাঁকা চৌধুরী তার বুকে তলোয়ার ঠেকিয়ে বললেন, খবরদার, নড়লেই মুন্ডু কেটে ফেলব । এবার বল, তুই কে ?'

৩

এতক্ষণ বোঝা যায়নি যে, আকাশে জমাট মেঘ । অন্ধকারে আকাশ, নদী, গাছপালা সব একাকার । হঠাৎ এই সময় বিদ্যুৎ চমকাল । এত জোর বিদ্যুৎ যেন চিরে দিয়ে গেল আকাশের একদিক থেকে অন্যদিক ।

সেই বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল লোকটিকে । তার মুখভর্তি দাড়ি, মাথার চুল জট-পাকানো । চওড়া বুক । একটা খুব ময়লা ধুতি পরা । তার চোখ দুটো এমন লাল যে, দেখলে ভয় করে ।

বাঁকা চৌধুরী শক্ত করে তলোয়ারটা চেপে ধরলেন ।

লোকটা কিন্তু আর কোনও বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল । বাঁকা চৌধুরীর এক হাঁটু চেপে ধরে বলল, 'ওগো, আমাকে মের না ! মের না ! তা হলে কোনওদিন আর নন্দকে খুঁজে পাব না !'

বাঁকা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কে ? নন্দ কে ?'

আবার বিদ্যুৎ চমকাল, সঙ্গে-সঙ্গে বজ্রের গর্জন । বৃষ্টিও এসে গেল ঝাঁকিয়ে ।

গোপাল নৌকোয় উঠে এসে বলল, 'এখানে কোনও ছাউনি নেই । ভাসিয়ে দিই নৌকো ? এই ব্যাটাকে পাড়ে নামিয়ে দিন, কত্তা ।'

লোকটি আবার কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'আমায় নামিয়ে দেবেন না। আমাকে নিয়ে চলুন। আমাকে পঞ্চানন্দপুরে যেতেই হবে!'

গোপাল বলল, 'এ লোকটা চোর। ব্যাটা আমাদের নৌকোটা চুরি করে পালাবার মতলবে ছিল!'

লোকটি বলল, 'ওগো, না গো, আমি চোর নই। পঞ্চানন্দপুরে সবাই আমাকে চেনে। আমি গোয়ালা।'

কালকেতু ধমক দিয়ে বলল, 'তবে তুমি আমাদের নৌকোটা খোলার চেষ্টা করছিলে কেন?'

লোকটি বলল, 'আমার যে উপায় নেই, পঞ্চানন্দপুরে যেতেই হবে। দেখলাম, এখানে নৌকোটা খালি পড়ে আছে। কাছাকাছি কেউ নেই।'

বাঁকা চৌধুরী নৌকোর গলুইতে পা ঝুলিয়ে বসে নদীর জলে পায়ের কাদা ধুতে লাগলেন। মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, একে নিয়ে চল আমাদের সঙ্গে। আমরা তো পঞ্চানন্দপুরেই যাব!'

নৌকো জলে ভাসল। বৃষ্টি পড়ছে বেশ জোরে। বসে-বসে ভেজা ছাড়া উপায় নেই। লোকটি এখনও ফোঁপাচ্ছে।

বাঁকা চৌধুরী লোকটির হাঁটুতে এক চাপড় মেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার তোর সব কথা খুলে বল্ তো! শুধু-শুধু কাঁদলে আমরা বুঝব কি করে?'

লোকটি বাঁ হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছল। তারপর ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, কত্তা, আপনারা পঞ্চানন্দপুরের কোনও খবর জানেন? আজ-কালের মধ্যে গেছিলেন সেদিকে?

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'না, যাইনি। কেন, কি হয়েছে পঞ্চানন্দপুরে?'

লোকটি বলল, 'আপনারা ডাকাতির খবরও জানেন না?'

অন্য তিনজন একসঙ্গে আঁতকে উঠল।

কালকেতু বলল, 'অ্যাঁ, পঞ্চানন্দপুরেও ডাকাতরা এসেছিল নাকি?'

লোকটি বলল, 'সব ছারখার করে দিয়েছে গো। ঘর-বাড়ি লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি।'

কালকেতু আর গোপাল জল থেকে বৈঠা তুলে নিল।

গোপাল বলল, 'সর্বনাশ! ডাকাতরা এত কাছে এসে গেছে? ও চৌধুরীকত্তা, তা হলে আর সেখানে গিয়ে কি হবে? চলুন, ফিরি।'

বাঁকা চৌধুরী লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে সেখানে এসেছিল ডাকাতরা?'

লোকটি বলল, 'আমার ঠিক মনে নেই! দুই দিন, কিংবা চারদিনও হতে পারে!'

বাঁকা চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন, 'দুই দিন কিংবা চারদিন? তাও তোর মনে নেই কেন? তুই তখন কোথায় ছিলি?'

নৌকোটা থেমে গেছে। কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'চৌধুরীকত্তা, নৌকো ঘোরাই?'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'দাঁড়া, আগে এর কথাটা ভাল করে শুনে দেখি । ওরে গয়লার পো, তুই ডাকাতদের নিজের চক্ষে দেখেছিস ?'

লোকটি বলল, 'হুজুর, আমার নাম পরান । আমার বাড়িতে আটখানা গোরু । দুধ-ঘি বেচে আমার সংসার চলে যায় ভালভাবেই । দু'বছর আগে আমার বউ মারা গেছে। একটি মোটে মা-মরা ছেলে নন্দ । তার বয়েস মোটে চার বছর । পৃথিবীতে ওই নন্দই আমার সব । সেদিন বিকেলে আমি বাড়িতে বসে গোরুগুলোর শিং-এ রং লাগাচ্ছি, আমার সব গোরুর শিং-এ লাল রং থাকে, দূর থেকেই চেনা যায় । আমি রং লাগাচ্ছি, এমন সময় হইহই করে একটা আওয়াজ উঠল । বহু লোক ছুটে পালাতে লাগল, তখনই বুঝলাম, ডাকাত আসছে । আর রক্ষা নেই । আমিও তখন বাড়ির সব কিছু ফেলে রেখে নন্দকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড় লাগালাম । বেশি দূর .....'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বাঁকা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাকাত এলেই গ্রামের সব লোক পালায় ? গ্রামের লোক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে না ?'

পরান চোখ গোল-গোল করে বলল, 'বাধা দেবে কি, কত্তা! সে সাধ্য কার আছে? কালবৈশাখীর ঝড় কী কেউ ঠেকাতে পারে ?'

'ডাকাতের দলে ক'জন থাকে ?'

'গুনে শেষ করা যায় না । সমুদ্দুরের ঢেউয়ের মতন, ঝাঁকের পর ঝাঁক ।'

'কি অস্ত্র থাকে তাদের হাতে ?'

'তলোয়ার, বর্শা, বন্দুক । বাদ নেই কিছু । সবাই একসঙ্গে চিৎকার করতে করতে আসে । চিৎকার করে কী যে বলে, বোঝাই যায় না ।'

'তারপর কি হল ? তুমি বাড়ি ছেড়ে পালালে ?'

'বেশি দূর যাওয়া গেল না, হুজুর । ওরা যে ঘোড়ায় চড়ে ছোটে । ওরা গ্রামের একজনকেও ছাড়ে না । বাড়ি-ঘর তো পুড়িয়ে দেয় বটেই, মানুষজনদেরও ধরে নিয়ে যায় ।'

'ধরে নিয়ে যায় ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ । অন্য গ্রামগুলো থেকে আগে অনেক মানুষ ধরে নিয়ে গেছে । আমি প্রাণ-ভয়ে দৌড়লাম । দু'জন ঘোড়সওয়ার ডাকাত তাড়া করে এল আমার পিছু-পিছু! আমি এসে পড়লাম নদীর ধারে । আমাদের পঞ্চানন্দপুরের পাড়টা দেখেছেন, হুজুর? অনেকখানি খাড়া । এখনও বর্ষা নামেনি, তাই জল খুব নিচে । অতখানি উঁচু দিয়ে ঝাঁপ দিলে প্রাণ বাঁচানো শক্ত । আমি একেবারে নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ালাম, ডাকাত দুটো হা-হা করে হেসে উঠল । আর উপায় নেই । একজন আমাকে মারার জন্য বর্শা তুলল ।'

গোপাল আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ওরা শুধু-শুধু মানুষ মারে ? আগেও কত ডাকাতের গল্প শুনেছি । তারা সোনা-দানা লুট করে চলে যায়, বাধা না দিলে তো তারা মানুষ মারে না !'

পরান বলল, 'এরা আমার মতন জোয়ানদের মারে। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। আমি তখন ভাবলাম, আমার ছেলেটা তো খুবই ছোট, ওকে বোধহয় তারা কিছু বলবে না। অতটুকু শিশুকে মারতে কি ডাকাতদের হাত উঠবে ? তাই ছেলেটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে আমি নদীতে ঝাঁপ দিলাম।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'অত উঁচু নদীর পাড় থেকে ?'

পরান বলল, 'হ্যাঁ হজুর। তখন তো আমার দিক্-বিদিক্ জ্ঞান নেই। সাঁতার আমি ভালই জানি, ছোটবেলা থেকে নদী পারাপার করেছি। তবে এবার ঝাঁপ দেওয়ার পর কিসে যেন চোট লাগল মাথায়। এমন জোরে লাগল যে সঙ্গে-সঙ্গে চক্ষে একেবারে অন্ধকার। মরেই যেতাম। অজ্ঞান হয়ে ভাসতে-ভাসতে কোথায় চলে যেতাম কে জানে! কিন্তু আয়ু ফুরোয়নি যে! এইখানকার ঘাটে কয়েকজন সাধু স্নান করছিলেন, আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে গেলেন। সেই সাধুরাই সেবা-যত্ন করে বাঁচিয়ে তুললেন আমাকে।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'এটা কবে হয়েছিল ?'

পরান বলল, 'সেইটাই তো জানি না। সাধুবাবারা আমার জ্ঞান ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু আমার কোনও কিছুই যে আর মনে পড়ে না। ওঁরা বারবার জিজ্ঞেস করেন, 'কি হয়েছে কি হয়েছে' আমি শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি! মাথায় খুব বেদনা। সাধুবাবারা খিচুড়ি খেতে দিলেন, তাই খাই আর ঘুমাই। আজ রাতে, সাধুদের আখড়ায় ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন ডাকল, 'বাবা! বাবা' অমনই ঘুম ভেঙে গেল, এ যে আমার নন্দর ডাক। সব মনে পড়ে গেল। নন্দকে ডাকাতদের সামনে মাটিতে বসিয়ে আমি নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম। আমি এতবড় হতভাগ্য! আর থাকতে পারলাম না, সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দৌড় লাগালাম। নদীর ঘাটে এসে দেখি, একটা নৌকো বাঁধা আছে। আমার ছেলেটার কী হয়েছে, এখনও জানি না। বাড়ি-ঘরও আছে কী না, কে জানে!'

বাঁকা চৌধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'নবাবের ফৌজ এই ডাকাতদের কথা জানে না ? একটু আগে তো একটা বজরা গেল, দেখলাম!'

পরান বলল, 'ডাকাতরা চলে যাওয়ার পর নবাবের ফৌজ আসে হম্বিতম্বি করে। বাকি যা কিছু থাকে, তাও লুটপাট করে নিয়ে যায়!'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'বাঃ!'

গোপাল বলল, 'কত্তা, তা হলে আর পঞ্চানন্দপুরে গিয়ে কি হবে ? এই লোকটাকে পাড়ে নমিয়ে দিলেই তো হয়। হেঁটে চলে যাক!'

কালকেতু বলল, 'আমাদের যা জানার, তা তো জানা হয়েই গেল!'

পরান বলল, 'হুজুর, একটা কথা বলি। একবার যে-গ্রামে ডাকাতরা হামলা করে যায়,সেখানে আর তারা আসে না। পঞ্চানন্দপুরে এখন আর কোনও ভয় নেই।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'চল, এতদূর এসেছি যখন, পঞ্চানন্দপুরের অবস্থাটা দেখে আসি। কত বাড়ি-ঘর তারা পুড়িয়ে দেয়, তাও বোঝা যাবে!'

এরপর নৌকো চলতে লাগল সামনের দিকে।

ঘন্টাখানেক পরে দেখা গেল, দূরের এক জায়গায় উঁচু পাড়ে আগুন জ্বলছে।

পরান আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'ওই যে পঞ্চানন্দপুর। চিতার আগুন জ্বলছে।'

নৌকো বেঁধে রেখে একটা খাড়া রাস্তা ধরে ওরা উঠে এল ওপরে।

গোটা চারেক চিতা জ্বলছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে কিছু মানুষ। সকলের চোখ শুকনো। ওরা যেন কাঁদতেও ভুলে গেছে।

পরান এক-একজনের কাছে গিয়ে বলতে লাগল, 'ওগো, তোমরা কেউ আমার ছেলে নন্দর কোনও খবর জান? তাকে দেখেছ?'

কেউ কোনও উত্তর দেয় না।

তবু পরান জনে-জনে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল। অনেকে পরানকে চিনতেই পারল না।

দূরের এক বটগাছতলা থেকে একজন লোক শুধু উঠে এসে বলল, 'তুমি পরান গোয়ালা না? তোমার ভাল খবর আছে গো! বাড়ি যাও, শিগগির বাড়ি যাও।'

পরান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

চোখের জল মুছে ফেলে বলল, 'বাড়ি যাব? আমার বাড়ি কি আছে?'

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, বাড়ি আছে। তোমার ছেলেও তো ফিরে এসেছে গো!'

পরান এক বিরাট চিৎকার করে বলল, 'ছেলে ফিরে এসেছে?'

সেই লোকটি বলল, 'হ্যাঁ গো! তুমি নদীতে ঝাঁপ দিলে, আমি দেখেছি। আমি তখন একটা গাছের ওপর উঠে বসেছিলাম। ডাকাতরা তোমার ছেলেকে তুলে নিয়ে চলে গেল। তারপরেও আমি ভয়ে নামিনি গাছ থেকে। গ্রামের অনেক বাড়ি তখনও আগুনে পুড়ছে। তারই মধ্যে দেখি কী, এক দেবতা তোমার ছেলেকে কোলে নিয়ে ফিরে এলেন। ছেলেকে নামিয়ে দিলেন নদীর ধারে।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'দেবতা?'

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ গো, কত্তা, সাক্ষাৎ দেবতা। অত ডাকাতদের ভেদ করে তিনি বেরিয়ে এলেন। লাল কাপড় পরা, এক লাল কাপড়ে মুখ ঢাকা। সাদা রঙের ঘোড়ায় চেপে এলেন। ছেলেটিকে নামিয়ে রেখে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন!'

লোকটি দু'হাত জোড় করে প্রণাম করল।

৪

খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল
বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে!

এ হচ্ছে সেই বর্গিদের আক্রমণের সময়কার কাহিনী। সারা দেশে তখন অরাজক অবস্থা। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লিতে মোগল বংশ খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। বাংলার নবাব তখন আলিবর্দি, তিনি বিহার আর ওড়িশাও শাসন করছেন, দিল্লির কর্তৃত্ব তিনি মানেন না।

দক্ষিণ ভারতে তখন প্রবল হয়ে উঠেছে মারাঠারা। তাদেরই সৈন্যদের একটা শ্রেণীর নাম বর্গি। যেমন এদের সাহস, তেমনই দুর্ধর্ষ এদের গতিবেগ। ছোট-ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চেপে হাজার-হাজার বর্গি সৈন্য ওড়িশা পেরিয়ে ঢুকে পড়ে বাংলা দেশে, লুঠতরাজ ও ধ্বংসকান্ড চালিয়ে প্রায় চোখের নিমেষে ওরা আবার সরে পড়ে। এই বর্গিরা এতই চতুর যে, কখনও ঠিক নবাবের সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি লড়াই করতে চায় না, কিন্তু অনেক সময় ছোটখাট সৈন্যদল দেখলে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কচুকাটা করে। সাধারণ মানুষদের মতন এখন সৈন্যরাও বর্গিদের নামে ভয় পায়।

গ্রামের পর গ্রাম বর্গিদের অত্যাচারে জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে।

দামোদরের ধারে বাসন্তীপুর গ্রাম। শীতকালের নদীতে তেজ নেই। একদিকে শুকনো বালি, অন্যদিকে জলের ধারা। সেই ধারা দিয়ে নৌকো চলাচল করে।

এই সময় নৌকোয় ধান, পাটই বেশি যায়। এবং মানুষ, ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, শিশু ভর্তি এক-একটা নৌকো। এখন কোনও মেলা নেই এদিকে, উৎসব নেই, তবু এত মানুষ যাচ্ছে কোথায়?

বাঁকা চৌধুরী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সেইসব নৌকোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। অন্য কোনও সময় তিনি এত নৌকোভর্তি লোক যেতে দেখেননি। নৌকোগুলো পাল তুলে স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছে। বাঁকা চৌধুরীর মনে হল, এরা সবাই বর্গির ভয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু বর্গির ভয়ে নিজেদের গ্রাম ছেড়ে এরা যাবে কোথায়? কত দূরে? কিছুদিন আগেও বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা। এখন মুর্শিদাবাদ। সেখানে নেমেই কি বাঁচা যাবে? নবাব আলিবর্দি লড়াই করতে গেছেন ওড়িশায়, এখন বর্গিরা যদি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে, তা হলে কে বাঁচাবে?

রতন বৈরাগী দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা চৌধুরীর পাশে। হাতে তার একতারা। তা পিড়িং-পিড়িং করে বাজিয়ে সে গুনগুনিয়ে একটা গান গাইছে। তারই মধ্যে একবার সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'হায় গো, কী দশা হল দেশটার!'

বাঁকা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে রতন, এই মানুষগুলো যাচ্ছে কোথায়?'

রতন বৈরাগী বলল, 'ডেকে জিজ্ঞেস করব?'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'দ্যাখ না, যদি কোনও উত্তর দেয়!'

এর মধ্যে একটা নৌকো তীরের দিকে চলে এল। অনেক লোক একসঙ্গে নামতে গেল যেই, অমনই নৌকোটা একদিকে কাত হয়ে উলটে গেল। একদল মানুষ চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচাও, বাঁচাও!'

বাঁকা চৌধুরী রতনকে নিয়ে ছুটে গেলেন বালির ওপর দিয়ে । গ্রামের অনেক মানুষ দৌড়ে এল । সবাইকে তোলা হল জল থেকে । জল বেশি নেই বলে স্রোতের টানও কম, তাই কেউ ভেসে যায়নি ।

নৌকোটাকে তোলা হল, জল সেঁচে ফেলা হল ।

একজন মাঝি বলল, 'আমরা একটু খাবার পানি নেওয়ার জন্য থেমেছিলাম । মাঝে-মাঝে নদী দিয়ে মড়া ভেসে যাচ্ছে, তাই নদীর পানি খাওয়া যায় না ।'

বাঁকা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'ও মিঞা, তোমরা কোন্ গ্রামের মানুষ । চললে কোথায় ?'

মাঝিটি বলল, 'আমরা আসছি তো বর্ধমানের মানিকপির গাঁ থেকে । যাব যেখানে আল্লা স্থান দেবেন !'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'সে কী, কোথায় যাবে, তা জান না ?'

অন্য একজন লোক বলল, কলকেতায় যাব । কলকেতায় !'

'সে আবার কোথায় ?'

'আছে গো কত্তা, হুগলি নদীর ধারে ।'

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর বাঁকা চৌধুরী চললেন জমিদার বাড়ির দিকে ।

সেখানে কয়েকখানা গোরুর গাড়িতে মালপত্র চাপানো হচ্ছে । ছুটোছুটি করছে বাচ্চারা । কারা যেন চলে যাচ্ছে এ-বাড়ি ছেড়ে ।

একটু ভেতরে ঢুকতেই জমিদার রাধু রায়ের দেখা পাওয়া গেল । তিনি ব্যস্তভাবে কথা বলছেন কয়েকজন পাইকের সঙ্গে । পাইকদের হাতে নতুন বর্শা, চকচকে তাদের ফলা ।

রাধু রায় বললেন, 'সাবধানে যাবি তোরা। শুধু দিনে-দিনে যাবি । সন্ধে হলেই থেমে পড়বি কোনও পান্থশালা দেখে । অন্ধকার হলে আর এক পাও যাবি না ।'

বাঁকা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'মামা, এরা কোথায় যাচ্ছে ?'

রাধু রায় বললেন, 'এবার তো এখান থেকে পাট উঠল হে । বর্গিরা এসে পড়ল বলে ! সবদিকে আগুন লাগিয়ে দেবে !'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'সে কী মামা, আপনি বর্গির ভয়ে পালাবেন ? কোথায় পালাবেন ?'

'কলকাতা । তা ছাড়া আর তো কোনও জায়গা নেই !'

'কলকাতায় ? সেটা আবার কোথায় ? নৌকোয় করে অনেক লোক পালাচ্ছে, তারাও কলকাতার নাম বলল । এ নাম তো আগে শুনিনি !'

'কলকাতার নাম শুনিসনি ? সাহেবদের নতুন শহর । সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা, এই তিনখানা ছোট-ছোট গ্রাম নিয়ে নতুন শহর হয়েছে ।'

'টুপিওয়ালা লালমুখো সাহেব ? তারা শহর গড়েছে?'

'সাহেবদের মধ্যে অনেক জাত আছে । ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার। সবাই এখন নিজেদের শহর বানাচ্ছে । কলকাতা হচ্ছে ইংরেজদের শহর ।'

'ওই টুপিওয়ালা সাহেবরা বর্গিদের সঙ্গে পারবে ? ওরা তো এক গাদা জামাকাপড় পরে ।'

'আরে, লড়াই করার ক্ষমতা না থাকলে কি এত দূরের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এদেশে আসে ? ওরা ব্যবসা করতে এসেছে বটে, কিন্তু লড়াই করতেও জানে । ওদের কাছে ছোট-ছোট কামান আছে, সেগুলোর জোর খুব । বিলেত থেকে জাহাজে আরও বন্দুক-কামান আসছে খবর পেয়েছি ।'

'ইংরেজের শহরে আমাদের থাকতে দেবে ?'

'শহরটা ইংরেজরা বানাচ্ছে বলে কি সেখানকার সবাই ইংরেজ ? ওরা আসবার আগেও তো ওখানে শেঠ-বসাকরা ছিল । এখন দলে দলে লোক যাচ্ছে ওই শহরে । গেলেই কাজ পাওয়া যায় ।'

'মামা, আপনি এ-গ্রামের জমিদার । এখানে আপনার কত খাতির আর সম্মান । এইসব ছেড়ে আপনি ওই ম্লেচ্ছ ইংরেজদের আশ্রিত হবেন ? গ্রামের মানুষ তা হলে ভরসা পাবে কি করে ?'

'আমি থাকলেই বা কী ভরসা দিতে পারব, বল্ । তবে, আমি নিজে যাচ্ছি না । নিজের পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে যাব না তোকে বলেছিলাম ! আপাতত নায়েব-গোমস্তা আর পাইকদের সঙ্গে এ-বাড়ির আশ্রিত লোকজন আর শিশু-বৃদ্ধদের পাঠিয়ে দিচ্ছি কলকাতায় । আমার যা হয় হবে !'

'আমিও কিছুতেই এ-গ্রাম ছেড়ে যাব না । মরতে হয় লড়াই করে মরব !'

'তুই তো অনেক গ্রাম দেখে এলি, বাঁকা ? কী বুঝলি, বর্গিদের কেউ আটকাতে পারছে ?'

'না, মামা ? দুরন্ত ঝড় যেমন রোখা যায় না, তেমনই এই বর্গিদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারছে না । ওরা সব লুটেপুটে নিচ্ছে । সোনার বাংলা একেবারে ছারখার হয়ে যাচ্ছে ।'

'কেউ রুখতে পারবে না ওদের । শুনেছি, ওদের সেনাপতির নাম ভাস্কর পন্ডিত। সে অতি দুর্ধর্ষ সেনাপতি । নবাব আলিবর্দিকে পর্যন্ত ঘোল খাইয়ে দিচ্ছে । তবে, নবাব আলিবর্দির এক অল্পবয়সী নাতি আছে, তার নাম সিরাজ, সে নাকি দু-এক জায়গায় বর্গিদের সঙ্গে সাহসের সঙ্গে লড়েছে ।'

'সিরাজের বয়েস অতি অল্প । সে আর কী লড়াই করবে !'

বাঁকা চৌধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন । হঠাৎ তাঁর অন্য একটি কথা মনে পড়ল ।

তিনি বললেন, 'মামা, যেসব জায়গায় বর্গিরা অত্যাচার করছে, সেখানে কিন্তু একজন দেবতার কথা শোনা যাচ্ছে খুবই । তিনি বিপন্নদের উদ্ধার করছেন ।'

'রাধু রায় বললেন, 'দেবতা ! সেরকম একটা গুজব আমারও কানে এসেছে বটে । কিন্তু তাকে কি কেউ চোখে দেখেছে ? তুমি দেখেছ ?'

'না, আমিও চোখে দেখিনি ।'

'তবে ? কেউ দেখেনি। ওটা একটা গুজব।'

'কিন্তু উনি কয়েকজনকে বাঁচিয়েছেন, তা অনেকেই জানে। একজন গয়লার ছেলেকে বর্গিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেই দেবতা আবার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন।'

'ওসব উড়ো কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

এর মধ্যে একজন কর্মচারী এসে বলল, 'হুজুর, গোরুর গাড়িতে সব মালপত্র উঠে গেছে। এবার কি আমরা রওনা হব ?'

রাধু রায় বললেন, 'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি রওনা হওয়াই ভাল। চল, দেখি গিয়ে।'

দুটো গোরুর গাড়ি বোঝাই করা হয়েছে মালপত্রে। তিনখানা পালকি সাজানো রয়েছে মহিলাদের জন্য। আর একটা হাতিতে হাওদার ওপর বসেছে রাধু রায়ের দুই ছেলে ও এক ভাই। প্রায় কুড়ি-বাইশজন পাইক-বরকন্দাজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি।

বাঁকা চৌধুরী ভাবলেন, বর্গি এসে পড়লে এইসব পাইক-বরকন্দাজরা লড়াই করতে পারত, অথচ এদেরও পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাহেবদের তৈরি নতুন শহরে।

জমিদার বাড়ি থেকে বাঁকা চৌধুরী আবার চলে এলেন নদীর ধারে। এই গ্রামে তিনি জন্মেছেন, বড় হয়েছেন। এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। তিনি বিয়ে করেননি, সংসারের কোনও বন্ধন নেই, তবু গ্রামের সব মানুষকে তাঁর আত্মীয় মনে হয়।

নদীর ধারে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। আস্তে-আস্তে সন্ধে হয়ে এল।

সন্ধে হলেই গ্রাম প্রায় নিঝুম হয়ে যায়। কয়েকটা বাড়িতে মিটমিট করে পিদিম জ্বলছে। তাঁতিপাড়া থেকে ভেসে আসছে গান। বাঁকা চৌধুরী বসেই রইলেন একই জায়গায়। আস্তে-আস্তে সব বাড়ির বাতি নিবে গেল, থেমে গেল সব শব্দ।

এক সময় তিনি একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলেন।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ, না ? তা হলে কি বর্গিরা এসে পড়ল ? অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই ঘুমন্ত গ্রামটার ওপর ? তা হলে যে একজনও বাঁচবে না!

তিনি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন।

কান খাড়া করে শুনলেন যে, ঘোড়ার পায়ের শব্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু অনেক না, একজনই অশ্বারোহী যেন ছুটে আসছে এদিকে। কপাকপ কপাকপ করে শব্দ হচ্ছে।

খুব কাছে এসে পড়ার পরও অশ্বারোহীকে চিনতে পারা গেল না। অন্ধকারের মধ্যে একটি কালো রঙের মূর্তি।

বাঁকা চৌধুরী সাহস করে বলে উঠলেন, 'কে যায় ?'

অশ্বারোহী বাঁকা চৌধুরীকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল, সেই ডাক শুনে ঘোড়ার রাশ সংযত করল। এদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল স্থির হয়ে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে। সেই আলোয় দেখা গেল ঘোড়াটির রং সাদা আর তার আরোহী টকটকে লাল রঙের কাপড় পরা।

বাঁকা চৌধুরীর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

তবে, এই কি সেই দেবতা ?

৫

সাদা ঘোড়ার অশ্বারোহী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঘোড়া সমেত বাঁকা চৌধুরীর একেবারে কাছে চলে এসে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে ?'

বাঁকা চৌধুরী এমনই অবাক হয়ে গেছেন যে, তাঁর গলা থেকে কোনও স্বরই বেরোচ্ছে না।

ঘোড়ার মুখটা একেবারে বাঁকা চৌধুরীর নাকের সামনে। ঘোড়াটা এবার সামনের দু'পা উঁচু করে দাঁড়াল, মনে হল যেন এক্ষুনি বাঁকা চৌধুরীর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাঁকা চৌধুরী ভয়ে আঁ-আঁ শব্দ করে পিছিয়ে যেতে-যেতে একটা গাছে ধাক্কা খেলেন।

অশ্বারোহী এবার নেমে পড়ল মাটিতে। কোষ থেকে তলোয়ার টেনে বার করল বিদ্যুতের মতন। তারপর বলল, 'তোমার কাছেও অস্ত্র আছে দেখছি। লড় !'

বাঁকা চৌধুরী তোতলাতে-তোতলাতে বললেন, 'প্রভু, আমি পারব না, আমি পারব না।'

অশ্বারোহী বলল, 'পারবে না মানে ? তুমি 'কে যায়' বলে আমায় ডেকে থামালে। আমি যদি কোনও দস্যু হই, তখন কি করবে ? লড়বে না।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'না না, প্রভু, দেবতার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা আমার নেই!'

অশ্বারোহী একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, 'দেবতা, এখানে দেবতা কোথায়, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'প্রভু, আপনিই দেবতা। আমি ঠিক চিনেছি!'

অশ্বারোহী এবার হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'আমি দেবতা ? আমি নিজে কখনও দেবতা দেখিনি, আমি এই বর্ধমান জেলার একজন মানুষ বলেই তো নিজেকে জানি। তা আমি দেবতা হই কিংবা দানব হই, আমি যদি তোমায় মারতে যাই, তা হলে তুমি বাধা দেবে না ?'

এই বলে অশ্বারোহী বাঁকা চৌধুরীকে মারবার জন্য তলোয়ার তুলল।

বাঁকা চৌধুরী তো নিজের তলোয়ার মাটিতে ফেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। হাত জোড় করে বললেন, 'প্রভু, আমাকে মারতে ইচ্ছে হয়, মারুন। দেবতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার সাধ্য আমার নেই!'

অশ্বারোহী এবার ঠোট বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'এই জন্যই এ জাতটা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। কথায়-কথায় অস্ত্র ফেলে দেয়। তাই এ জাতটাকে দেবতারাও দয়া করেন না, শত্রুরাও দয়া করে না।'

তারপর সে বাঁকা চৌধুরীর চুলের মুঠি ধরে তীব্র স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কে, ঠিক করে বল! তুই কি কোনও গুপ্তচর? এত রাতে তুই এখানে একা বসেছিলি কেন?'

বাঁকা চৌধুরী কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, 'আমি কার গুপ্তচর হব? আমি এই গ্রামে থাকি। এখানেই আমার সাত পুরুষের বাস। আমার মাথায় অনেক চিন্তা, তাই একা বসেছিলাম এখানে।' অশ্বারোহী বলল, 'তবু তুই আমাকে দেখে ফেলেছিস। তোকে তো এখানে আর থাকতে দেওয়া যায় না।'

এই সময় ঘোড়ায় চড়ে আরও দু'জন লোক এল সেখানে। এদের পোশাকের রং কালো, তাই রাত্রির অন্ধকারে এদের ভাল করে দেখা যায় না।

কালো কাপড়-পরা অশ্বারোহী ওদের দেখে বলল, 'আলি, এই লোকটার চোখ বাঁধো, মুখ বাঁধো। তারপর একে সঙ্গে নিয়ে চল। ও আমাদের ওপর নজর রাখছিল কী না, তা যাচাই করে দেখতে হবে!'

অন্য লোক দুটি সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে বেঁধে ফেলল বাঁকা চৌধুরীর হাত আর মুখ। একটা কালো কাপড়ে চোখ ঢেকে দিল এমন ভাবে যে, বাঁকা চৌধুরী আর কিছুই দেখতে পেলেন না!

তারপর তাঁকে ওঠান হল একটা ঘোড়ায়।

এবার তারা কোন্ দিকে যে যেতে লাগল, তাও বুঝতে পারলেন না বাঁকা চৌধুরী। মাঝে-মাঝে জলাজায়গা পার হতে হচ্ছে। মাঝে-মাঝে তাঁর গায়ে লাগছে গাছের ডালপালা। ওরা চলছে তো চলছেই।

অশ্বারোহীরা কেউ কোনও কথা বলছে না। বাঁকা চৌধুরী ভাবতে লাগলেন, তিনি কাদের হাতে পড়লেন। প্রথমে তিনি কালো কাপড় পরা সাদা ঘোড়ার সওয়ারকে সত্যিই দেবতা ভেবেছিলেন। অনেকেই এরকম একজন দেবতার কথা বলাবলি করছে চারদিকে, যিনি বর্গিদের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করেন। কিন্তু দেবতা হলে তিনি বাঁকা চৌধুরীকে মারতেই বা আসবেন কেন, আর বন্দিই বা করবেন কেন? তবে কি তিনি বর্গিদের হাতে বন্দি হলেন? বর্গি হলে এরা বাংলায় কথা বলবে কেন? অন্যদের মুখে তিনি শুনেছেন, বর্গিরা নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলে, তা কেউ বোঝে না!

প্রায় দু' ঘন্টা বাদে ওরা এক জায়গায় থামল।

দু'জন লোক বাঁকা চৌধুরীকে ঘোড়া থেকে তুলে খানিকটা বয়ে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দিল এক জায়গায়। বাঁকা চৌধুরী ভেবেছিলেন, মাটিতে পড়ার সময় তাঁর খুব লাগবে। কিন্তু লাগল না। তিনি পড়লেন এক খড়ের গাদায়। সেই গাদা যেন নরম বিছানার মতন।

একজন কেউ বলল, 'এখানেই থাক রাত্তিরটা। কাল সকালে দেখা যাবে।'
তাঁর হাত-মুখ চোখের বাঁধন খোলা হল না।
বাঁকা চৌধুরী নিশ্চেষ্টভাবে শুয়ে রইলেন।
বিকেল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। এতক্ষণ খাওয়ার কথা মনেও ছিল না। ওরা যেই বলল যে, সারারাত তাঁকে এইভাবে শুয়ে থাকতে হবে, তখনই তিনি বুঝতে পারলেন, সারারাত তাঁর খাওয়া জুটবে না। একটা রাত কিছু না খেলেও চলে, কিন্তু জলতেষ্টা পাচ্ছে যে! এর মধ্যেই গলা শুকিয়ে এসেছে। এরা একটু জলও দেবে না? মুখ বাঁধা, জল চাইবারও উপায় নেই।
তিনি কোনও ক্রমে উঁ-উঁ শব্দ করতে লাগলেন। কেউ শুনল না।
আবার কতক্ষণ কেটে গেল, কে জানে?
হঠাৎ এক সময় টের পেলেন, কেউ তাঁর হাতের বাঁধন খুলে দিচ্ছে। তারপর মুখ ও চোখের বাঁধন খুলে গেল। এতক্ষণ চোখ বন্ধ ছিল বলে চোখ খোলার পরও কিছু দেখতে পেলেন না। সব অন্ধকার।
কয়েক মুহূর্তে পরে দৃষ্টি ফিরে এল বটে, কিন্তু তিনি যা দেখলেন, তা অবিশ্বাস্য মনে হল। তবে কি এটা স্বপ্ন?
তিনি দেখলেন, তাঁর পাশেই বসে আছে একটি মেয়ে। খুবই সুন্দরী। পূর্ণিমার চাঁদের মতন মুখের রং। সতের-আঠার বছর বয়েস। তার হাতে একটা ছুরি। সেই ছুরিটা সে ধরে আছে বাঁকা চৌধুরীর একেবারে বুকের কাছে।
বাঁকা চৌধুরীকে চোখ মেলতে দেখে মেয়েটি বাঁশির মতন সুরেলা গলায় বলল, 'তুই কে রে? তুই কি সত্যি গুপ্তচর? আমাদের সর্বনাশ করতে চেয়েছিলি? তা হলে তোকে এখুনি শেষ করে দেব!'
বাঁকা চৌধুরীকে তাঁর গ্রামের সব লোক সম্মান করে। এতটুকু একটা মেয়ে তাঁকে 'তুই' 'তুই' বলে কথা বলছে!
হাতে ছুরি থাকলেও এ-রকম একটি ফুটফুটে মেয়েকে দেখে তিনি ভয় পেলেন না। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ, কথাও বলতে পারছেন না। একটা হাত তুলে জল খাবার ইঙ্গিত করে তিনি ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, 'একটু জল!'
মেয়েটি বলল, 'জল দেব না। আগে বল, তুই বর্গিদের লোক? সত্যি করে বল!'
বাঁকা চৌধুরী অতি কষ্টে বললেন, 'মা, আমি বর্গিদের কখনও চোখে দেখিনি! আমার নাম বাঁকা চৌধুরী। আমি বর্গিদের ভয়ে পালাইনি। তোমার মতন আমার একটি ভাইঝি আছে, আমি তোমার ক্ষতি করব কেন!'
মেয়েটি এবার বলল, 'ওঃ, বাঁকা চৌধুরী। রতন বৈরাগীর কাছে তোমার কথা শুনেছি। আগে নিজের নামটা বলনি কেন?'
বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'আগে তো কেউ জিজ্ঞেস করেনি!'
মেয়েটি বলল, 'এখানে চুপটি করে শুয়ে থাক। আমি আসছি!'

মেয়েটি চলে গেল। বাঁকা চৌধুরী এবার দেখলেন, তিনি শুয়ে আছেন একটা তাঁবুর মধ্যে, খড়ের বিছানায়। বাইরে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার আকাশ। মেঘ একেবারে সরে গেছে, ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। তা ছাড়া আর কোনও আলো নেই।

মেয়েটি ফিরে এল একটা জলের ঘটি নিয়ে।

সেটা বাঁকা চৌধুরীর হাতে দিতেই তিনি ঢকঢক করে প্রায় আধ ঘটি জল শেষ করে ফেললেন। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। তিনি বললেন, 'আঃ!'

তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেঁচে থাক, মা। তোমার অনেক পুণ্য হোক। তুমি কে মা?'

মেয়েটি ধমকের সুরে বলল, 'আমাকে মা-মা করবে না। আমি তোমার মা হতে যাব কেন? আমি তোমার ভাইঝিও নই!'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'আমি তো তোমার নাম জানি না। তোমাকে কি বলে ডাকব তবে?'

মেয়েটি বলল, 'আমার নাম রাকা। আমার ওপর তোমার পাহারার ভার। তুমি বাঁকা চৌধুরীই হও, আর যে-ই হও, বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করলে তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দেব।'

বাঁকা চৌধুরী এবার হাসলেন। এইটুকু মেয়ে কী তেজ! এত চমৎকার চেহারা, এমন মিষ্টি গলার আওয়াজ, অথচ এই মেয়ের হাতে ছুরি। এরকম কেউ কখনও দেখেছে?

তিনি এবার উঠে বসে বললেন, 'আমাকে তোমরা শত্রু বলে ভাবছ কেন?'

রাকা বলল, 'আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। চতুর্দিকে বিশ্বাসঘাতক। বর্গিদের সঙ্গে যাদের লড়াই করার সাহস নেই, তারা বর্গিদের পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ে। আমাদের ধরিয়ে দেবার জন্য খবর জোগাড় করে।'

'তোমরা কারা?'

'তোমাকে বলব কেন?'

'আমাকে ধরে আনা হল কেন, সেটা কি বলবে? আমি কী দোষ করেছি?'

'তুমি অন্ধকারের মধ্যে এক জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে বন্ধু গুপ্তের ওপর নজর রাখছিলে।'

'বন্ধু গুপ্ত! সে কি?'

'তা জান না! সত্যি জান না!'

'না, জানি না।'

'যথা সময়ে জানতে পারবে।'

'এই জায়গাটা তো মনে হচ্ছে একটা জঙ্গল। এখানে তাঁবু খাটিয়ে তোমরা থাক।'

'অত প্রশ্ন করছ কেন? তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে? অন্য খাবার কিছু নেই। একছড়া কলা আছে। তুমি কলা খাবে?'

'না। কিছু খেতে চাই না। তুমি যে জল দিয়েছ, সেটাই যথেষ্ট।'

একটু দূরে কারও পায়ের শব্দ হতে দু'জনেই ঘুরে তাকাল। একজন লোক আসছে এদিকে। ধুতির ওপর কালো রঙের ফতুয়া পরা একজন বেশ লম্ব-চওড়া মানুষ।

কাছে এসে সে বলল, 'এ কী রাকা, তুমি ও-লোকটার বাঁধন খুলে দিয়েছ ?'

রাকা পলল, 'এই তাঁবুর সামনে পাহারা দিতে-দিতে এক সময় জলতেষ্টা পেল। নিজে জল খেতে গিয়ে মনে পড়ল, এই বন্দি তো এক ফোঁটাও জল পায়নি। যত বড় শত্রুই হোক, তাকে জল খেতে না দেওয়াটা পাপ। তাই আমি ওকে একঘটি জল এনে দিলাম।'

লোকটি বলল, 'ঠিক আছে, জল খেতে দিয়েছ, বেশ করেছ। শুধু মুখের বাঁধন খুলে দিলেই চলত। হাতের বাঁধনও খুলে দিলে কেন ? ও যদি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করত ?'

রাকার চোখ দুটো ঝকমক করে উঠল। ছুরিটা ওপরে তুলে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'পালাবে। ইস ! একবার চেষ্টা করে দেখুক তো ! প্রত্যেকটি বিশ্বাসঘাতককে খুন করব, তবে আমার পিতৃহত্যার জ্বালা মিটবে !'

লোকটি এবার বাঁকা চৌধুরীর দিকে চেয়ে বলল, 'ওহে বন্দি, রাকাকে সাধারণ মেয়ে ভেব না। ওর বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। তুমি গন্ডগোল করলে নিস্তার পাবে না।'

বাঁকা চৌধুরীর চোখ জলে ভরে গেল। হাত জোড় করে তিনি কাতর গলায় বললেন, 'তোমরা আমাকে শত্রু মনে করছ কেন ? কেন ? কেন ?'

৬

রাতটা কেটে গেল কোনও রকমে।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বাঁকা চৌধুরী, চোখ মেলে দেখলেন রাকা নামের মেয়েটি এখনও পাহারায় বসে আছে একটু দূরে। হাঁটু গেড়ে বসে মাটির ওপর একটা ছবি আঁকছে।

বাঁকা চৌধুরী ভাবলেন, এ মেয়েটির কি চোখে ঘুম নেই ?

বাঁকা চৌধুবীকে জাগতে দেখে রাকা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'সামনেই একটা পুকুর আছে, যাও, মুখটুখ ধুয়ে এস, পালাবার চেষ্টা কোর না যেন !'

বাঁকা চৌধুরী এগিয়ে গেলেন পুকুরের দিকে। যেতে-যেতে দেখলেন, জঙ্গলের মধ্যে অনেক ছোট-ছোট তাঁবু রয়েছে। তাঁবুগুলোর সামনে কিছু-কিছু লোক তীর-ধনুক ছোঁড়া চর্চা করছে, কয়েকজন তলোয়ার খেলছে। এরা কোনও সৈন্য যে নয়

তা বোঝা যায়, এরা সৈনিকের উর্দি পরে নেই। সবাই মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, খালি গা।

পুকুরধারেও অনেক মানুষ। কেউ কাপড় কাচছে, কেউ সাঁতার কাটছে। তাদের কেউ বাঁকা চৌধুরীকে গ্রাহ্য করল না।

বাঁকা চৌধুরী ভাবলেন, জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে রয়েছে এত লোক, এরা কি কোনও দস্যুর দল ; কিন্তু চেহারা দেখে তা মনে হয় না। ডাকাতদের ভীমের মতন স্বাস্থ্য হয়, কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই রোগাপটকা। কয়েকজন হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছে, সাধারণ মানুষের মতন।

বাঁকা চৌধুরী হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এলেন নিজের তাঁবুর কাছে। তার এখন পালাবার কোনও ইচ্ছেই নেই। তিনি দেখতে চান, এই লোকগুলো কারা।

সবাই প্রায় পুরুষ, মেয়ে বিশেষ চোখেই পড়ে না। রাকার মতন পাঁচ-সাতটি মেয়ে আছে মাত্র, তাদের সকলেরই হাতে বর্শা কিংবা কোমরে তলোয়ার বাঁধা। বাংলার মেয়েরা বাড়ির বাইরেই বেরয় না, তারা আবার অস্ত্র ধরতে শিখল কবে ? রাকার বয়সী মেয়েরা পুরুষদের দেখলেই ঘোমটা দেয়। এখানে এরা স্বচ্ছন্দে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করছে !

তাঁবুতে ফেরার পর রাকা তার হাতে একবাটি মুড়ি দুটো কলা দিয়ে বলল, 'নাও, খেয়ে নাও ! তারপর তোমাকে যেতে হবে !'

বাঁকা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যেতে হবে ?'

'গেলেই দেখতে পাবে !'

'তুমি আমার সঙ্গে ধমকে-ধমকে কথা বলছ কেন? আমি তোমার চেয়ে বয়সে কত বড় !'

'তাতে কী হয়েছে ? বয়েসে বড় লোকরা কি পাজি, চোর-ডাকাত হয় না ? আগে দেখতে হবে, তুমি দুষ্ট লোক না ভাল লোক, তারপর তোমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করা হবে, তা ঠিক করব !'

'তুমি যে বললে, তুমি রতন বৈরাগীর কাছে আমার কথা শুনেছ?'

'তা শুনেছি বটে। তখন হয়তো তুমি ভাল ছিলে। তারপর যে তুমি গুপ্তচর হয়ে যাওনি, তার কি কোনও ঠিক আছে ? এখন অনেকেই এরকম হচ্ছে।'

'আচ্ছা, রাকা, তুমি ঘুমোও না ? সারারাত তুমি জেগেছিলে ?'

আমার ঘুম নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করো, তারপর তোমার হাত বাঁধব।'

'কেন, হাত বাঁধবে কেন ? আমি পালাব না, পালাবার কোনও চেষ্টা করব না, কথা দিচ্ছি !'

'তবু বিচারসভায় তোমাকে হাতবাঁধা অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে। এটাই আদেশ !'

বাঁকা চৌধুরী বাটিটা নামিয়ে রাখলেন। রাকা কাছে এসে তাঁর হাত দুটো পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে একটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল।

তারপর ফিসফিস করে বলল, 'যদি তুমি অপরাধী হও, তা হলে এ-জীবনে আর তোমার হাতের বাঁধন খোলা হবে না !'

পাশের তাঁবু থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'কই রাকা, তোমার বন্দিকে নিয়ে তৈরি হয়েছ ?'

রাকা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, তৈরি ।'

এবার সেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল একজন যুবক, তার সঙ্গে একজন হাত-বাঁধা লোক ।

সেই লোকটিকে দেখলে মনে হয়, অতি নিরীহ, ছোটখাট চেহারা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ছেঁড়া ধুতি পরা, গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা ।

বাঁকা চৌধুরী ভাবলেন, আহা, এই গরিব বেচারিকেও বন্দি করেছে কেন ? ও কি দোষ করেছে ?

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কয়েকটা তাঁবুর পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে ওরা পৌঁছল একটা বড় তাঁবুর সামনে । পাশেই একটা বিশাল, ঝাঁকড়া বটগাছ, তার নিচে অনেকটা ফাঁকা জায়গা ।

সেখানে কুড়ি-পঁচিশজন লোক গোল হয়ে বসে আছে । লোকগুলো সবাই সাধারণ ধুতি পরা, কারও খালি গা, কারও গায়ে ফতুয়া । শুধু তাদের মাঝখানে, একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আছে একজন । তার পরনে টকটকে লাল রঙের কাপড়, তার মুখখানাও লাল কাপড়ে বাঁধা, শুধু চোখের সামনে দুটো গর্ত, আর ঠোঁটের কাছে একটুখানি কাটা । তাকে যাতে চেনা না যায়, সেইজন্যই মুখখানা ঢাকা।

রাকা সেই লোকদের পাশে বাঁকা চৌধুরীকে নিয়ে বসল । বাঁকা চৌধুরী দেখলেন, রুদ্রাক্ষের মালাপরা লোকটি ছাড়া আরও একজন হাতবাঁধা বন্দি রয়েছে, সে একটা সতের-আঠার বছরের ছেলে ।

বাঁকা চৌধুরী লাল কাপড়ে মুখঢাকা লোকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনি কে ?'

রাকা বলল, 'ইনিই বন্ধু গুপ্ত ।'

'বন্ধু গুপ্ত ? কোথায় এঁর বড়ি ?'

'চুপ, কোনও প্রশ্ন করবে না ।'

লাল কাপড়ে মুখঢাকা বন্ধু গুপ্তের পাশে একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার বিচার শুরু হল । প্রথম আসামি ফজল মোল্লা । কই, ফজল মোল্লাকে সামনে এনে দাঁড় করাও !'

সতের-আঠার বছরের ছেলেটিকে টানতে-টানতে একজন নিয়ে গেল বন্ধু গুপ্তের সামনে । বন্ধু গুপ্ত কোনও কথা বললেন না, তার পাশের লোকটিই সব কথা বলছে । সে জিজ্ঞেস করল, 'ওই ফজল মোল্লার নামে কার কি অভিযোগ আছে, বলো।'

দু-তিনজন লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ও ব্যাটা বর্গিদের চর ! ও আমাদের সর্বনাশ করেছে।'

বন্ধু গুপ্তের সহকারী বলল, 'সবাই একসঙ্গে না । একজন একজন করে বলো । আগে বলো, এর বাড়ি কোথায় ?'

একজন বলল, 'রহমতপুর ।'

'এর অপরাধ ? নিজের চক্ষে যা দেখেছ, তাই বলবে । শোনা কথা বলবে না ।'

'একে বর্গিদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখেছি ।'

'বর্গিদের গ্রামে ডেকে এনেছে ?'

'না, তা দেখিনি । তবে বর্গিরা যখন লুটপাট করে চলে যায়, তখন বর্গিদের পেছন-পেছন গিয়েছিল । বর্গিরা ওকে মারেনি ।'

'ও নিজের হাতে গ্রাম লুট করেছে বর্গিদের সঙ্গে ?'

'না, তা দেখিনি বটে । তবে ও ব্যাটা নির্ঘাত বর্গিদের চর ।'

'নিজে যা দেখেছ, তাই-ই বলবে !'

'একজন বর্গি ওর পিঠে চাপড় মেরে হাসছিল । ফজল মোল্লাও হাসছিল ।'

'ও বর্গিদের গোলাম হতে চেয়েছিল ।'

অন্যদের কথা শোনার পর বন্ধু গুপ্তের সহকারী এবার হাতবাঁধা ছেলেটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ফজল মোল্লা, তোমার কিছু বলার আছে ?'

ছেলেটি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে বলল, 'হুজুর, আমি দোষ স্বীকার করছি । প্রাণের ভয়ে আমি বর্গিদের গোলাম হতে চেয়েছিলাম । একজন বর্গির সর্দার আমাকে বলেছিল, তুই আমাকে গ্রামের বড়-বড় লোকদের বাড়ি চিনিয়ে দিবি, তোকে আমরা মারব না ।'

'তুই তাই করেছিলি ?'

'না, হুজুর । আর-একজন বর্গি সর্দার গ্রামে এসে বলল, 'ধুত, এ চিনিয়ে দেবে কি ? এ-গ্রামে কোনও বড় বাড়িই নেই ! তখন আমি বললাম, তা হলে আমি পাশের গ্রামটায় নিয়ে যেতে পারি । সেখানে বড় জমিদারের বাড়ি আছে ।'

'নিয়ে গিয়েছিলি পাশের গ্রামে ?'

'না হুজুর । তার আগেই আমি আপনাদের হাতে ধরা পড়ি । আমায় মারবেন না হুজুর, মেরে ফেলবেন না । বাড়িতে আমার বুড়ো বাপ আছে ।'

সহকারী বন্ধু গুপ্তর দিকে তাকাল ।

এবার ছদ্মবেশী বন্ধু গুপ্ত মুখ খুললেন । গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ফজল মোল্লার বয়েস কম, তাই ওকে চরম শাস্তি দেওয়া হল না । ওকে দশ ঘা চাবুক মেরে জঙ্গল থেকে বার করে দাও । বলে দাও, ফের যদি ও বিশ্বাসঘাতকতা করে, তা হলে নির্ঘাৎ মৃত্যু থেকে ওকে কেউ বাঁচাতে পারবে না ।'

ফজল মোল্লা চিৎকার করে বলল, 'আর কোনওদিন করব না, হুজুর, কোনওদিন না।'

একজন লোক তাকে টানতে-টানতে নিয়ে চলে গেল ।

বন্ধু গুপ্তর সহকারী বলল, 'এর পরের জন !'

এবার ওঠানো হল, রুদ্রাক্ষের মালা পরা লোকটিকে।

সহকারীটি বলল, 'এর নাম বৃন্দাবন গোঁসাই, তাই না ? মুরারিপুকুর গ্রামে বাড়ি । এর নামে কী অভিযোগ শুনি । কে কি দেখেছ ?'

একজন মাঝবয়েসী লোক উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'এই মানুষটা একটা শয়তান ! এ আমাদের সর্বনাশ করেছে !'

'কীভাবে সর্বনাশ করেছে ?'

'আমাদের বল্লভপুর গ্রামে ওকে আমরা ঘোরাফেরা করতে দেখেছি । আমাদের বল্লভপুর গ্রামটা কেমন জানেন তো ? একধারে নদী । সেই নদীতে অনেক জল । আপনারা সবাই জানেন, বর্গিরা নদী পার হয়ে আসতে চায় না । তাই আমরা ভেবেছিলাম, বল্লভপুর গ্রামটা নিরাপদ । কিন্তু পেছনের জঙ্গল দিয়ে আমাদের গ্রামে আসার আর-একটা পথ আছে । সেই পথের কথা অনেকে জানে না । এই গোঁসাই সেই পথ দিয়ে বর্গিদের নিয়ে এসেছে । বর্গিরা আমাদের গ্রাম ছারখার করে দিয়েছে । আমার বউ, ছেলেমেয়ে মারা গেছে !'

বৃন্দাবন গোঁসাই বলে উঠল, 'মিথ্যা কথা । এসব মিথ্যা কথা !'

অভিযোগকারীর দু'চোখ দিয়ে জল ঝরছে । সে বলল, 'আমি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলি না । আমি জানি, এই গোঁসাই-এর জন্য আমাদের গ্রামের মানুষের সর্বনাশ হয়ে গেছে ।'

বৃন্দাবন গোঁসাই আবার বলল, 'আমি বর্গিদের সঙ্গে কোনওদিন কোনও গ্রামে যাইনি । আমি কি ঘোড়ায় চড়তে পারি ? পারি না !'

অন্য দু'জন লোক দু'দিক থেকে উঠে দাঁড়াল । একজনকে থামিয়ে দিয়ে অন্যজন বলল, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি, বর্ধমানে এই গোঁসাই বর্গিদের তাঁবুতে ঢুকেছে । বর্গিদের ওপর নজর রাখার জন্য আমি বর্ধমানে গিয়েছিলাম, তা বন্ধু গুপ্ত জানেন ।'

বৃন্দাবন গোঁসাই বলল, 'হ্যাঁ, বর্গিদের তাঁবুতে গিয়েছিলাম । ওদের নেতা ভাস্কর পণ্ডিত আমার কাছে কীর্তন গান শুনতে চেয়েছিল । ভাস্কর পণ্ডিত ডেকে পাঠালে যাব না ? না গেলে বেঁধে নিয়ে যেত ।'

সহকারীটি জিজ্ঞেস করল, 'গোঁসাই, তুমি ভাস্কর পণ্ডিতকে গান শুনিয়েছিলে ?'

'তা শুনিয়েছি !'

'ক'খানা গান গেয়েছিলে ?'

'চারখানা । বর্গি হলেও ভাস্কর পণ্ডিত বাংলার কীর্তন গান শুনতে ভালবাসে ।'

'হুঁ, ভাস্কর পণ্ডিত বাংলার গান ভালবাসে । বাংলার মানুষের মুণ্ডু কাটতে ভালবাসে । বাংলার সমস্ত ধনসম্পদ লুঠ করতে ভালবাসে । তা গোঁসাইজি, বর্গি-সর্দারকে গান শুনিয়ে তুমি কত টাকা দক্ষিণা পেয়েছিলে ?'

'টাকা-পয়সা কিছু নিইনি । আমি গরিব মানুষ, আমার সংসার কোনওভাবে চলে যায় । টাকা-পয়সার লোভ নেই । ভাস্কর পন্ডিতকে গান শোনাবার অপরাধে তোমরা আমাকে ধরে এনেছ !'

'টাকা-পয়সা নাওনি, তাই না ? তা হলে গোঁসাই, বলো তো, তোমার বাড়ি থেকে যখন তোমাকে আমরা ধরে আনি, তখন তোমার রান্নাঘরের একটা হাঁড়ির মধ্যে দশটা মোহর পাওয়া গেল কি করে ? গরিব মানুষের বাড়িতে কি মোহর থাকে ?'

'ওগুলো ...... ওগুলো আমার ঠাকুরদার আমলের !'

রান্নাঘরে লুকিয়ে রেখেছিলে ? আর যে দু'খানা নতুন রেশমের চাদর পাওয়া গেল, তাও ঠাকুরদার আমলের ? গোঁসাই, তুমি ভাস্কর পন্ডিতকে গান শোনাতে যাওনি, তুমি গিয়েছিলে গুপ্তচরবৃত্তি করতে ! এদিকের যেসব গ্রামে ধনসম্পদ বেশি আছে, সেইসব গ্রামের সুলুক-সন্ধান তুমি জানিয়ে দিয়েছ বর্গিদের ।'

'মিথ্যা কথা । মিথ্যা কথা !'

'তোমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য গ্রামের পর গ্রামে আগুন জ্বলছে । বর্গির তলোয়ারের কোপে নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছে । তোমার শাস্তি কী হবে, তা বন্ধু গুপ্ত ঠিক করবেন ! '

বন্ধু গুপ্ত এতক্ষণ স্থির হয়ে বসেছিলেন । তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'মৃত্যুদন্ড । এর হাত-পা বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দাও । সেটাই হবে বিশ্বাসঘাতকের উচিত শাস্তি ।'

বৃন্দাবন গোঁসাই এই আদেশ শুনে কেঁপে উঠল ।

হাত জোড় করে বলল, 'তোমরা আমাকে ভুল সন্দেহ করেছ । যাই হোক, এবারের মতন ক্ষমা করে দাও । আমাকে প্রাণে মের না ।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'তুমি বর্গিদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেশের মানুষের সর্বনাশ করেছ । তোমার কোনও ক্ষমা নেই । বিশ্বাসঘাতকদের আমরা ক্ষমা করি না ।'

বৃন্দাবন গোঁসাই এখনও ভেঙে পড়ল না । একটা হাত তুলে তেজ দেখিয়ে বলল, 'তোমরা আমাকে মারবে ? তোমরা আমাকে শাস্তি দেওয়ার কে ? মুখোশ-পরা তুই একটা ডাকাত সর্দার । তুই বর্গিদের সঙ্গে পারবি ? আমি ব্রাহ্মণ, আমি অভিশাপ দিলে তোরা ধ্বংস হয়ে যাবি । কেউ আমার গা ছুঁবি না !'

বন্ধু গুপ্ত এবার হেসে উঠলেন । তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'ব্রাহ্মণ, আমাদের অভিশাপের ভয় দেখাচ্ছ ? দূর দেশ থেকে বর্গিরা এসে যখন বাঙালির সর্বনাশ করছে, তখন তুমি তাদের অভিশাপ দিতে পারনি ! বর্গিরা পুত্রের সামনে পিতাকে হত্যা করেছে, মায়ের কোল থেকে শিশুদের কেড়ে নিয়েছে, তাদের অভিশাপ দিয়ে ধ্বংস করতে পারনি কেন ? বরং তাদের পক্ষে গিয়ে নিজের জাতির এত ক্ষতি করেছ । পাপী ব্রাহ্মণ, তোমার অভিশাপকে আমরা ভয় পাই না !'

দু'জন রক্ষী ছুটে গিয়ে গোঁসাইকে চ্যাংদোলা করে তুলে ছুটতে-ছুটতে চলে গেল নদীর দিকে ।

৭

বাঁকা চৌধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন । অন্য বন্দিদের টানতে-টানতে বৃত্তের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি নিজেই গেলেন সেখানে । বন্ধু গুপ্তের দিকে তাকিয়ে উদাসীন গলায় বললেন, 'আমার কিছুই বলার নেই । তোমরা আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পার ।'

বন্ধু গুপ্তর সহকারী সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এর নামে কি অভিযোগ আছে ?'

একটি যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই লোকটি একজন গুপ্তচর । এ আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখে ।'

বাঁকা চৌধুরী কৌতূহলের সঙ্গে যুবকটির দিকে তাকালেন । একে আগে কখনও দেখেছেন বলে মনে হল না । ছেলেটির মুখে প্রতিহিংসার ছাপ লেগে আছে ।

'আর কেউ ওকে গুপ্তচরগিরি করতে দেখেছ ?'

'কলাপোতা গ্রামের ভানু মন্ডল দেখেছে ।'

'ভানু মন্ডল কোথায় ?'

নাম ধরে ডেকে ভানু মন্ডলকে পাওয়া গেল না । দু-তিনজন ছুটে গেল তাকে খুঁজে আনতে । ততক্ষণ বাঁকা চৌধুরী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন । আর কেউ কোনও কথা বলছে না । শুধু তাঁর মনে হল, বন্ধু গুপ্ত নামের ছদ্মবেশী লোকটি তাঁকে একদৃষ্টিতে লক্ষ করছে ।

ভানু মন্ডলকে দাঁড় করিয়ে একজন বলল, 'বন্ধু, ভানু মন্ডলের তিন ছেলেমেয়ে মারা গেছে । তাই শোকে দুঃখে তার মাথার ঠিক নেই । ওই গুপ্তচরটিই ভানু মন্ডলের ছেলেমেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী !'

সহকারী জিজ্ঞেস করল, 'ভানু মন্ডল, ভাল করে দ্যাখ, তুমি এই লোকটিকে চেন ?'

ভানু মন্ডল বলল, 'আইজ্ঞা চিনি হুজুর । এই লোকটা একটা দুশমন । বর্গির কাছ থেকে পয়সা খেয়ে আমাদের সর্বনাশ করেছে ।'

'ওর নাম কি ?'

'পরান সরকার । আমাদের গ্রামেই বাড়ি । শিব মন্দিরের পাশে থাকে ।'

বাঁকা চৌধুরী এবারেও কোনও প্রতিবাদ করলেন না । মুখ নিচু করে রইলেন ।

রাকা হঠাৎ এগিয়ে এসে বলল, 'কিছু একটা ভুল হয়েছে । কলাপোতা গ্রামে আমার মামার বাড়ি । সেখানে শিব মন্দিরের ধারে পরান সরকার নামে একজন ব্রাহ্মণ

থাকে আমি দেখেছি, কিন্তু সে অনেক বেঁটে আর রোগা। এই লোকটিকে মামাবাড়ির গ্রামে কখনও দেখিনি।'

আরও একজন লোক উঠে বলল, 'কলাপোতা গ্রামের শিব মন্দিরের বামুন তো অন্য লোক। তার বয়েস অনেক বেশি।'

ভানু মন্ডল বলল, 'তা হবে। আমি চোখে ভাল দেখি না। কিন্তু সেই বামুন কোথায় গেল, তাকে ধরতে পারনি? সে আরও মানুষের ক্ষতি করে যাবে!'

সহকারী বলল, 'তা বলে একজনের দোষে অন্য একজনকে শাস্তি দেওয়া যায় না।'

প্রথম যে-ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে এবার চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা জানি, এই কোমর-ঝোঁকা লোকটা দোষী! ও আমাদের আসা-যাওয়ার পথে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। আমাদের গতিবিধির কথা শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেয়। এখন সন্ধের পর জন-মনুষ্য বাইরে বেরয় না ভয়ে, ও কেন একা-একা গাছতলায় বসে থাকে?'

সহকারী বাঁকা চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে বন্দি, তুমি কেন সন্ধের পর আমাদের গোপন পথের ধারে বসে থাক?'

বাঁকা চৌধুরী কোনও উত্তর দিলেন না।

সেই ছেলেটি আবার বলল, 'কাল রাতে ও বঙ্কু গুপ্তকে ধরিয়ে দেওয়ার তালে ছিল। বঙ্কু গুপ্তকে বর্গিরা ধরার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তা তোমরা সবাই জান। ও বঙ্কু গুপ্তকে দেখে চিৎকার করছিল-কে যায়? কে যায়? ভেবেছিল বঙ্কু গুপ্ত একা, ও ঝাঁপিয়ে গিয়ে ধরবে। জানত না তো আমরা কাছাকাছি আছি! যেই আমরা এসে পড়লাম, অমনই ও পাগল সাজার ভান করল। বলতে লাগল, 'দেবতা, দেবতা!'

বঙ্কু গুপ্ত শব্দ করে হেসে উঠলেন।

সহকারী বলল, 'বন্দি, তুমি কী মতলবে অন্ধকারে আমাদের যাতায়াতের পথে বসেছিলে, এখনও বলবে না? তা হলে কিন্তু আমরা তোমাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হব।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'না, আমি কিছুই বলব না। কারণ, বললেও তোমরা বিশ্বাস করবে না! তোমরা আমাকে যা শাস্তি দিতে চাও, দাও!'

তারপর তিনি অভিযোগকারী যুবকটির দিকে ফিরে বললেন, 'ওহে, সবাইকে যদি তুমি সন্দেহ করো, তা হলে তোমাদের দলে লোক বাড়বে কি করে?'

যুবকটি মাটিতে থুঃ করে থুতু ফেলে বলল, 'তোমার মতন শয়তানদের আমরা দলে চাই না।'

রাকা বলে উঠল, 'এ-লোকটা তা হলে সত্যিই বিশ্বাসঘাতক? এর কান আর নাক কেটে ফেলা উচিত। সেটাই বিশ্বাসঘাতকদের উচিত শাস্তি!'

সহকারী এবার বঙ্কু গুপ্তের দিকে ফিরে বলল, 'রাকা ঠিকই বলেছে। তা হলে কি ওর নাক-কান কেটে ছেড়ে দেওয়া হবে? ওকে দেখে অন্য বিশ্বাসঘাতকরা ভয় পাবে।'

অনেকে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই দেওয়া হোক!'

বন্ধু গুপ্ত একটা হাত উঁচু করে সবাইকে থামতে বললেন । তারপর গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, 'ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও !'

কেউ বন্ধু গুপ্তের এই আদেশের মানে বুঝতে পারল না । যে লোকের নাক আর কান কাটা যাবে, তার হাতের বাঁধন খোলার কী দরকার ! তা হলে তো সে বাধা দিতে চাইবে ।

তবে বন্ধু গুপ্তের আদেশ অগ্রাহ্য করার সাহস কারও নেই ।

সহকারীটিই এগিয়ে গিয়ে বাঁকা চৌধুরীর হাতের বাঁধন খুলে দিল ।

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'বর্গিরা অনেক অত্যাচার করেছে, মানুষ মারছে । তা হলে কি আমরাও মানুষের ওপর অত্যাচার করব ? যাকে-তাকে কি মারব ? তা হলে বর্গিদের সঙ্গে আমাদের তফাত কি রইল ?'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'বিশ্বাসঘাতকদের অবশ্যই আমরা নির্মম শাস্তি দেব । কিন্তু তার আগে ভাল করে দেখতে হবে, আমাদের ভুল না হয় ।'

বন্ধু গুপ্ত হাতের ইঙ্গিতে বাঁকা চৌধুরীকে কাছে ডাকলেন । বাঁকা চৌধুরী ভেবেছিলেন, এক্ষুনি তাঁর নাক আর কান দুটো কাটা যাবে, হঠাৎ ঘটনাটা বদলে যাওয়ায় তিনি বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে পারলেন না । এগিয়ে গেলেন পায়ে পায়ে ।

বন্ধু গুপ্ত নিজের পাশে বাঁকা চৌধুরীকে একটা বসবার জায়গা দিলেন ।

তারপর অন্যদের উদ্দেশে বললেন, 'এই মানুষটি সন্ধের পরও অন্ধকারে একা-একা একটা গাছতলায় বসেছিল, তার মানেই কি এ বিশ্বাসঘাতক ? এমনও তো হতে পারে যে, এই লোকটি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সাহসী ?'

কেউ কোনও উত্তর দিতে পারল না ।

বন্ধু গুপ্ত আবার বললেন, 'বিশ্বাসঘাতকরা কাপুরুষ হয়, দুর্বল হয় । তারা মরতে খুব ভয় পায় । কিন্তু এই লোকটি একবারও ক্ষমা ভিক্ষা করেনি, দয়া চায়নি । অর্থাৎ এর মান-সম্মান জ্ঞান আছে । মরতেও ভয় পায় না । এইসব দিকও আমাদের বুঝতে হবে । না হলে বিচারের ভুল হবে ।'

একজন জিজ্ঞেস করল, 'তবে কি এই লোকটা নির্দোষ ?'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'কাল রাত্তিরেই আমি এর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম । এই লোকটির নাম বাঁকা চৌধুরী । এর গ্রামের লোক একে খুব সম্মান করে । বর্গির ভয়ে এর গ্রামের মানুষরা যখন পালাচ্ছে, তখন এই বাঁকা চৌধুরী সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বর্গির হামলা ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল । রতন বৈরাগী বলেছে, 'বাঁকা চৌধুরী খুব খাঁটি মানুষ । দেশকে ভালবাসে ।'

বন্ধু গুপ্তের সহকারী এবার লজ্জায় জিব কেটে বলল, 'আরে ছি, ছি, ছি । তবে তো খুব ভুল হয়ে যাচ্ছিল !'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, চৌধুরীবাবু ! আপনাকে সারা রাত বেঁধে রাখা হয়েছে, কিছু খেতে দেওয়া হয়নি । ভারি অন্যায় হয়েছে । আপনি আমাদের মাফ করে দেবেন তো ?'

বাঁকা চৌধুরীর চোখে জল এসে গেল ।

শুধু যে প্রাণ ফিরে পেলেন, সেজন্য নয় । তিনি সম্মান ফিরে পেয়েছেন । সম্মান ছাড়া প্রাণের মূল্যও কমে যায় । এই লোকগুলো তাঁকে খারাপ ভাবেনি । তাঁকে চিনেছে !

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'চৌধুরীবাবু, এইসব ছেলেমেয়ে আপনাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কেন জানেন ? একটু বুঝিয়ে বলি, ওই যে যুবকটি আপনার নামে প্রথম অভিযোগ এনেছিল, ওর বোন, ভাই, বাবা-মা কেউ নেই । সবাই বর্গির তলোয়ারের কোপে প্রাণ দিয়েছে । সুতরাং যারা বর্গিদের সামান্য সাহায্য করে, তাদের ওপর ওর জাতক্রোধ তো থাকবেই ! আর ওই যে দেখছেন রাকা নামের মেয়েটিকে, এক জমিদার বাড়ির মেয়ে । ওর চোখের সামনে বর্গিরা ওর মাকে আর বাবাকে হত্যা করেছে । রাকা পালাতে পেরেছিল কোনক্রমে । সেই থেকে ওর মাথায় প্রতিশোধের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছে ।'

রাকা এবার ছুটে এল এদিকে ।

বাঁকা চৌধুরীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি প্রথম থেকেই মনে করেছিলাম, তুমি নির্দোষ । রতন বৈরাগী তোমার কত গুণগান করেছে । কিন্তু অন্যরা বলল কিনা তুমি বিশ্বাসঘাতক, তাই আমার মাথা গুলিয়ে গেল । আমি ভাবলাম, তুমি যদি সত্যি লোভে পড়ে বদলে গিয়ে থাক ।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'রাকা এবার চৌধুরীবাবুকে তাঁবুতে নিয়ে যাও । ওঁকে ভাল করে খেতে-পরতে দাও । যত্ন কর ।'

রাকা ওঁর হাত ধরে বলল, 'এস !'

ঠিক তক্ষুনি দূরে একটা হইহই উঠল । একদল লোক ছুটে এল এদিকে কয়েকজন চিৎকার করে বলল, 'বন্ধু গুপ্ত, বন্ধু গুপ্ত, বর্গি আসছে ! বর্গি আসছে !'

বন্ধু গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন । তাঁর মুখ দেখা যায় না । তবু তাঁকে খুব বিচলিত মনে হল না । তিনি শান্তভাবে বললেন, 'সবাই মিলে একসঙ্গে চ্যাঁচামেচি কোর না । তাতে কিছুই বোঝা যায় না । একজন রক্ষী এগিয়ে এসে সব কথা খুলে বল ।'

একজন খুব জোয়ান চেহারার পুরুষ লাফ দিয়ে চলে এল কাছে । তার মুখ-ভর্তি দাড়ি, গোঁফ, হাতে একটা তেল-চুকচুকে লাঠি ।

সে কিছু বলবার আগেই বন্ধু গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি পাহারায় ছিলে ? নিজের চক্ষে কিছু দেখেছ ?'

'হ্যাঁ, বন্ধু, বর্গিরা এদিকেই আসছে ।'

'বটে ! তারা কত দূরে ?'

'বড়জোর দুই ক্রোশ । মাঝখানে নদী আছে । বর্গিরা সাঁকো বানাচ্ছে । দু-তিন ঘন্টার মধ্যেই এসে পড়বে ।'

'তা হলে তো অনেক সময় আছে। সবাই তাঁবু গোটাও! এখানে যেন আমাদের কোনও চিহ্ন না থাকে। আমাদের গভীর জঙ্গলের দিকে চলে যেতে হবে। সবাই তৈরি হও!'

তারপর তিনি বাঁকা চৌধুরীর দিকে ফিরে বললেন, 'দেখলেন তো, কেন আমরা বিশ্বাসঘাতকদের ভয় পাই? নিশ্চয়ই কেউ আমাদের এই গোপন আস্তানার খবর দিয়ে দিয়েছে বর্গিদের।

খটাখট শব্দে তাঁবুর দড়ি-বাঁধা খোঁটাগুলো তুলে ফেলা হতে লাগল। সবাই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

গভীর জঙ্গলের দিকে যাওয়ার সময় বাঁকা চৌধুরী রইলেন বন্ধু গুপ্তের কাছাকাছি। রাকা তাঁকে পথ দেখাচ্ছে। বাঁকা চৌধুরী খুব উত্তেজিত বোধ করলেন। এবার তিনি বর্গিদের নিজের চোখে দেখতে পাবেন। বর্গিরা অনেক দূর থেকে আসছে, তাদের কেমন দেখতে হয়, সে সম্পর্কে বাঁকা চৌধুরীর খুব কৌতূহল ছিল।

তিনি বন্ধু গুপ্তকে বললেন, 'আমাকে একটা তলোয়ার দেবেন? আমারটা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আমার শরীর ভেঙে গেছে বটে, তবু হাতে অস্ত্র থাকলে আমি গোটাকয়েক বর্গিকে খতম করতে পারব। তারপর মরি তো মরব। এ-জীবন নিয়ে আর কি করব?'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'আপনার তলোয়ার নিশ্চয়ই আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তবে, চৌধুরীসাহেব, এখনই লড়াই করার দরকার হবে না। যখন আপনার কাছ থেকে সাহায্যের দরকার হবে, তখন ঠিকই বলব!'

তারপর বাঁকা চৌধুরী আর বন্ধু গুপ্তকে দেখতে পেলেন না।

সবাই মিলে চলে আসা হল খুব ঘন জঙ্গলের মধ্যে। এখানে কোনও পথ নেই। অচেনা মানুষের পক্ষে এখানে চিনে আসা খুবই কঠিন।

জঙ্গলেন মধ্যে রয়েছে একটা পুরনো আমলের গড়। অনেকটাই ভাঙা, তবে কিছু-কিছু উঁচু দেওয়াল অক্ষত আছে, দেওয়ালের মাঝে-মাঝে ছোট গর্ত। সবাই আশ্রয় নিল সেখানে।

বাঁকা চৌধুরী একটা গর্তে চোখ লাগিয়ে বসে রইলেন। তাঁর পাশে রইল রাকা। দু'জনেরই হাতে তলোয়ার।

অনেকক্ষণ বাদে শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ঝড়ের গতিতে ছুটে যাচ্ছে একদল অশ্বারোহী। কিন্তু তাদের দেখা যাচ্ছে না। গাছপালার আড়ালে তারা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

রাকা ফিসফিস করে বলল, 'ওই যে যাচ্ছে বর্গি। ওরা আমাদের কথা টের পায়নি। অন্য দিকে ছুটছে।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'বর্গিরা এত কাছে এসে গেছে, তবু আমরা লড়াই করছি না কেন?'

রাকা বলল, 'এখনও সময় আসেনি। আমরা যথেষ্ট তৈরি নই। বর্গিদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে গেলে আমরা হেরে যাব। এখন বর্গিদের শুধু ভয় দেখান দরকার। যাতে ওদের মনের বল নষ্ট হয়ে যায়।'

রাকা হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়াল। কোনও দেবতার উদ্দেশে যেন প্রার্থনা জানাল সে।

তারপর বলল, 'আমাদের মধ্যে একমাত্র কে বর্গিদের ভয় দেখাতে পারে, জান? ওই দ্যাখো, সে যাচ্ছে।'

বাঁকা চৌধুরী দেখলেন, সেই ভাঙা গড় থেকে বেরিয়ে এলেন এক অশ্বারোহী। সাদা রঙের ঘোড়া, তার সওয়ার সারা গায়ে লাল রঙের কাপড় জড়িয়ে আছেন। বন্ধু গুপ্ত?

সেই অশ্বারোহী একা যেন চুম্বকের টানে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন বর্গিদের দিকে।

৮

বর্গিদের গতি কেউ রোধ করতে পারে না। গ্রামের মানুষরা তাদের আসতে দেখলেই পালায়। পালাতে গিয়ে অনেকে প্রাণ দেয়। বর্গিরা অবাধে লুটপাট চালিয়ে যায়, সন্ধেবেলা ফিরে যায় তাদের তাঁবুতে।

বাংলার নবাব আলিবর্দি এখন রয়েছেন ওড়িশায়। সেই সুযোগে বর্গিরা সোনার বাংলা ছারখার করে দিচ্ছে। মুর্শিদাবাদে নবাবের সৈন্য যা কিছু আছে তারাও বর্গিদের মুখোমুখি হতে সাহস পায় না। বর্গিদের সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে, কোনওদিন হয়তো তারা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদই দখল করে নেবে।

বর্গিদের মনে কোনও ভয় নেই, মায়া-দয়া নেই, তারা বেপরোয়া। কিন্তু সন্ধেবেলা তাঁবুতে ফেরার পথে তারা হঠাৎ-হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে। কোনও একটা উঁচু জায়গায় সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা কোনও মানুষ, না দেবতা? তার মুখ দেখা যায় না। লাল কাপড়ে ঢাকা থাকে তার সর্বাঙ্গ, শুধু খোলা থাকে চোখ দুটি। সে হুঙ্কার দিয়ে বলে, 'সাবধান!'

বর্গির দল হাজার চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারেনি। দু'দিক থেকে তাড়া করে গেলেও সেই অশ্বারোহী যেন কোথায় মিলিয়ে যায় চোখের নিমেষে। আবার একটু পরেই সেই অশ্বারোহী ছোট একটা বর্গির দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এত জোরে সে তলোয়ার চালায় যে, কেউ তার সামনে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াতেই পারে না। কচু-কাটার মতন তাদের মুন্ডু খসে পড়ে। বেশিক্ষণ যুদ্ধ করে না সেই অশ্বারোহী, চার-পাঁচজন বর্গিকে মেরেই আবার কোথায় লুকিয়ে পড়ে।

যেসব বর্গি কোনও শিশুকে ধরে নিয়ে যায়, তাদের ওপরেই যেন ওই লাল কাপড়-জড়ান অশ্বারোহীর রাগ বেশি। বর্গিরা লুটপাটের সময় কোনও সুন্দর চেহারার বাচ্চা ছেলে বা মেয়েকে দেখলে তাকে মারে না, তার হাত-পা বেঁধে ঘোড়ায় তুলে নেয়। ওই বাচ্চদের বিক্রি করলে ভাল দাম পাওয়া যায়। সেই শিশুদের তারা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী বানায়।

আড়াল থেকে লক্ষ রাখে সেই লাল অশ্বারোহী। যে বর্গির কাছে ওরকম কোনও শিশু আছে, তার ওপরে একটা বাজপাখির মতন সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বর্গিটিকে হত্যা করে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়!

দিনের বেলায় সেই অশ্বারোহীকে কেউ দেখতে পায় না। শুধু দেখা যায় সন্ধের আলো-আঁধারিতে। একসঙ্গে অনেক বর্গি তাকে আক্রমণ করতে গেলে সে অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারে।

এতদিনের চেষ্টাতেও সেই লাল অশ্বারোহীকে বন্দি করা যায়নি বলে এখন বর্গিদের মধ্যে তার সম্পর্কে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে। তারা ভাবে, ওই অশ্বারোহী কোনও সাধারণ মানুষ হতে পারে না, নিশ্চয় ওর অলৌকিক শক্তি আছে, কিংবা কোনও অপদেবতা।

এখন আর ওই লাল অশ্বারোহীকে দেখলে বর্গিরা তাড়া করে আসে না, নিজেরাই ভয়ে পালায়। বর্গিরা তার নাম দিয়েছে অন্ধকারের শয়তান। আর বাংলার গ্রামের মানুষ তাকে বলে 'অন্ধকারের বন্ধু।'

সারা বাংলাদেশে বর্গিরা এখন একমাত্র ওই বন্ধু গুপ্তকেই ভয় পায়।

বর্গিদের সেনাপতি ভাস্কররাম কোলহাতকরের কানেও ওই লাল কাপড়ে মোড়া অশ্বারোহীর খবর পৌঁছেছে। ভাস্কররাম কোলহাতকরকে সবাই 'ভাস্কর পণ্ডিত' বলে ডাকে। সে যেমন দারুণ সাহসী যোদ্ধা, তেমনই নিষ্ঠুর আর লোভী! সুদূর মারাঠা দেশ থেকে হাজার-হাজার বর্গি সৈন্যকে সঙ্গে এনে সে বাংলাদেশটাকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিতে চায়।

ভাস্কর পণ্ডিত যখন শুনল যে, তার সৈন্যরা এই বাংলার একজন মাত্র অশ্বারোহীকে ভয় পাচ্ছে, তখন সে ক্রোধে জ্বলে উঠল। সে ঘোষণা করে দিল, যে ওই লাল কাপড় পরা অশ্বারোহীকে জীবন্ত ধরে আনতে পারবে, তাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

সেই পুরস্কারের লোভেও কোনও বর্গি আর বন্ধু গুপ্তকে দেখলে তাঁর দিকে এগয় না। পেছন ফিরে পালায়। ভাস্কর পণ্ডিত নিজেই কয়েকবার এই রহস্যময় অশ্বারোহীকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু দু'জনে এখনও মুখোমুখি হয়নি।

বাঁকা চৌধুরীরা যেদিন বনের মধ্যে লুকিয়েছিল সেদিন গভীর রাত্রে ফিরে এলেন বন্ধু গুপ্ত। তাঁর সঙ্গে একটি পাঁচ বছরের ফুটফুটে ছেলে। তাঁর সাদা ঘোড়াটার গায়ে রক্তের ছিটে লেগে আছে। ঘোড়াটা আহত হয়নি, যে বর্গিদের বন্ধু গুপ্ত মেরেছেন, তাদের গায়ের রক্ত ছিটকে এসে লেগেছে।

জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা বাড়িটার কাছে বন্ধু গুপ্ত ঘোড়া থেকে নামলেন। শান্তি নামে একটি মেয়েকে ডেকে বললেন, 'এই শিশুটিকে আজ উদ্ধার করেছি। একে তোমার হাতে দিলাম।'

অশ্ব আর অশ্বারোহী দু'জনেই ক্লান্ত।

একজন সাদা ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল দলাইমলাই করতে। রাকা এসে বলল, 'বন্ধু গুপ্ত, আপনি স্নান করে নিন। আপনার জন্য গরম ভাত ফুটছে। খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করুন।'

বন্ধু গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা সবাই খেয়েছ?'

রাকা বলল, 'হ্যাঁ, খেয়েছি। আমাদের সঙ্গে চাল ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাই এই জঙ্গলে দুটো হরিণ মারা হয়েছে।'

বন্ধু গুপ্ত আর কিছু বললেন না। তাঁর মুখখানা গম্ভীর।

একটু পরে তিনি স্নান করতে গেলেন নদীতে। চারজন পাহারাদার ছাড়া আর সবাই শুয়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকে। বন্ধু গুপ্ত মধ্যরাত্রের অন্ধকারেই স্নান করেন রোজ, তখন তাঁর মুখের কাপড় খোলা থাকে। এই অবস্থায় তাঁকে দেখা অন্যদের নিষেধ। শুধু অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন তাঁর মুখ দেখে।

স্নান করে বন্ধু গুপ্ত ভাঙা বাড়ির একটা কুঠুরির মধ্যে খেতে বসলেন। সেখানে একটা মশাল জ্বালা রয়েছে। কলাপাতায় করে ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত বেড়ে দিয়েছে রাকা। সঙ্গে একটু ঘি আর কাঁচা লঙ্কা। আর কয়েক টুকরো ঝলসানো হরিণের মাংস।

খেতে খেতে বন্ধু গুপ্ত রাকাকে বললেন, 'আশিক, বলরাম, রঘুনাথ আর ফিরোজকে ডাকো। জরুরি কথা আছে।'

রাকা তক্ষুনি ঘরের বাইরে গিয়ে একজন প্রহরীকে নির্দেশ দিল। সে ডেকে আনল ওই চারজনকে।

এই চারজনই দারুণ স্বাস্থ্য বান যুবক। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, খালি গা, কিন্তু কোমরে ঝুলছে তলোয়ার।

বন্ধু গুপ্ত তাদের ইশারা করলেন সামনে বসবার জন্য। তারপর বললেন, 'রাকা, আমাকে তো খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। এবার তুমি যাও।'

রাকা বলল, 'না, আমি যাব না। আমি আপনাদের কথা শুনব।'

বন্ধু গুপ্ত হেসে বললেন, 'তুমি বিশ্রাম নেবে না? আবার তো সকালবেলা উঠেই কাজে লাগতে হবে। এখানে আমাদের থাকা হবে না, এখান থেকে সরে গিয়ে আরও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে হবে।'

রাকা বলল, 'আপনি সারাদিন যুদ্ধ করে এলেন। আপনি যতক্ষণ না বিশ্রাম নিচ্ছেন, ততক্ষণ আমিও শুতে যাব না।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'আমাদের যে এখন গোপন পরামর্শ আছে?'

রাকা ফস করে রেগে উঠে বলল, 'আমার কাছেও গোপন ? তা হলে আমি এক্ষুনি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরব !'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'নাঃ, এ মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা যায় না । আচ্ছা, তুমি থাক।'

তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বললেন, 'খুব খারাপ খবর আছে !'

সেই চারজন কোনও কথা না বলে আরও কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ।

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'আজ আমি বর্গিদের এক জুমলাদারকে ধরেছিলাম । ভেবেছিলাম তাকে এখানে বন্দি করে আনব । কিন্তু সে আত্মহত্যা করল । বর্গিরা কিছুতেই ধরা দিতে চায় না । বন্দি হওয়ার বদলে তারা নিজেদের গলায় তলোয়ার চালিয়ে আত্মহত্যা করে । যাই হোক, এই জুমলাদারটিকে ধরার পর আমি কয়েকটা খবর আদায় করেছি । তার মধ্যে একটা খবরই সাঙঘাতিক ।'

একটুক্ষণ চুপ করে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বন্ধু গুপ্ত আবার বললেন, 'তোমরা জান, আমাদের নবার আলিবর্দি ওড়িশায় গিয়েছিলেন । তিনি ফিরে এসে বর্গিদের মোকাবিলা করবেন, এই রকমই আমাদের আশা ছিল । তিনি ফিরছিলেন । বর্ধমান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন, সেখানে বর্গিদের হাতে ধরা পড়েছেন ।'

ওরা চারজন সবিস্ময়ে বলল, 'অ্যাঁ ? নবাব ধরা পড়েছেন ?'

রাকা সাঙঘাতিক নিরাশ গলায় বলল, 'নবাব বর্গিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে গেছেন ?'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'না যুদ্ধে হারেননি । বর্গিরা কৌশলে তাঁকে বন্দি করেছে । নবাব জানতেন না যে, বর্গিরা বর্ধমানে লুকিয়ে আছে, ভাস্কর পন্ডিত অতর্কিতে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে ।'

রাকা জিজ্ঞেস করল, 'নবাবের সৈন্যরা কি করছে ?' তারা লড়াই করে নবাবকে উদ্ধার করতে পারে না '?'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'বর্গিরা অতি ধূর্ত । তারা সরাসরি যুদ্ধের মধ্যে যেতে চায় না । তারা নবাবকে ধরে রেখেছে । তাঁর সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে এলেই আগে নবাবকে হত্যা করবে !'

'আর নবাব আলিবর্দির সেই নাতিটা কোথায় ? সিরাজ ! সে নাকি সব সময়ে নবাবের সঙ্গেই থাকে !'

'সিরাজ কোথায় জানি না । সে তো একটা ছোট ছেলে । সে তো আর লড়াই করতে পারবে না ! নবাব বন্দি হলে সে-ও বন্দি হবে নিশ্চয়ই ।'

'কী সর্বনাশ ! বর্গিরা যদি নবাব আলিবর্দি আর সিরাজ এই দু'জনকেই খুন করে, তা হলে যে আমাদের আশা-ভরসা সব যাবে। এই বাংলাকে আর কে বাঁচাবে ?'

'সর্বনাশ তো বটেই । তা বলে কি আমরা আশা ছেড়ে দেব ?'

বন্ধু গুপ্তর সহকারী আশিক বলল, 'বন্ধু, যে-কোনও উপায়েই হোক, নবাবকে উদ্ধার করতেই হবে !'

'কোন উপায়ে উদ্ধার করবে, আগে সেটা ঠিক কর !'

আমাদের এক্ষুনি বর্ধমানে যেতে হবে । আমরা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করব।'

'আমাদের দলে আছে দুশো সাতচল্লিশজন । বাঙালিরা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, তবু বর্গিদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারছে না । আমাদের দলে এ-পর্যন্ত মাত্র এই দুশো সাতচল্লিশজনকে পেয়েছি । তার মধ্যেও কয়েকজন আবার বৃদ্ধ এবং নারী । এই শক্তি নিয়ে আমরা বর্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে যাব ? বর্গিদের সংখ্যা কত জান ? বর্ধমানে রয়েছে পঁচিশ হাজার । ওরা ঘুরে দাঁড়ালে আমরা ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতন উড়ে যাব !'

বলরাম জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে কি কোনও উপায় নেই !'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'একটা মাত্র উপায় আমি ভেবে রেখেছি । আমাদের এই দলটাকে অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে । বর্ধমানে যাব শুধু আমরা পাঁচজন । লড়াই করে আমরা জয়ী হতে পারব না । ভাস্কর পন্ডিত যেমন কৌশলে নবাবকে বন্দি করেছে, আমরাও সেইরকম কোনও কৌশলে নবাবকে উদ্ধার করব ।'

বলরাম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন তবে । আর দেরি করে লাভ কী ! আমরা এক্ষুনি রওনা দিই । বর্ধমান বেশি দূর নয় !'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'তার আগে আর-একটা কথা ভেবে রাখ । আমরা সফল নাও হতে পারি । পঁচিশ হাজার বর্গি, আমরা ঢুকতে যাচ্ছি বাঘের গুহায় ! যদি ধরা পড়ি, দারুণ নির্যাতন করে ওরা আমাদের খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে মারবে ! মৃত্যুর জন্য তৈরি আছ তো ?'

ফিরোজ বলল, 'বন্ধু, আমাদের প্রত্যেকের বাবা-মাকে বর্গিরা হত্যা করেছে । আমাদের কি প্রাণের কোনও মূল্য আছে ? দেশের জন্য যদি প্রাণ দিতে পারি, তাতেই ধন্য হব ।'

রঘুনাথ তার ডান হাতের মুষ্টি তুলে বলল, 'আমার চোখের সামনে আমার ছোট ভাইটাকে ওরা মেরেছে । অন্তত দু-দশটা বর্গিকেও যদি শেষ করতে পারি, তা হলে মরেও আমি শান্তি পাব !'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'তা হলে তৈরি হয়ে নাও । আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে । এটাই হয়তো জীবনের শেষ খাওয়া।'

রাকা বলল, 'আমিও যাব !'

সবাই চমকে উঠল ।

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'পাগল নাকি ? এইজন্যই তোমার সামনে এইসব কথা বলতে চাইনি !'

রাকা বলল, 'আমার বাবা-মাকে, বাড়ির সবাইকে বর্গিরা খুন করেনি ? আমার প্রাণে বুঝি প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে না ?'

আশিক বলল, 'তোমার হয়ে আমরা প্রতিশোধ নেব । তুমি যে মেয়ে ! তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কি করবে ?'

রাকা বলল, 'মেয়েরা বুঝি যুদ্ধ করতে পারে না ? তোমরা আমাকে নিতে না চাইলেও আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব । তারপর আসল সময়ে দেখবে আমি কোনও কাজে লাগতে পারি কি না !'

এই সময়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন বাঁকা চৌধুরী । হাত জোড় করে বললেন, 'আমারও একটা নিবেদন আছে ।'

৯

বাঁকা চৌধুরী একটা জানলার আড়াল থেকে শুনছিলেন সব কথা ।

অন্য সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও তিনি ঘুমোতে পারেননি । বর্গিদের সঙ্গে লড়াই করে বন্ধু গুপ্ত ফেরবার পর তাঁকে একবার দেখার কৌতূহলও দমন করতে পারছিলেন না।

স্নান করার পর বন্ধু গুপ্ত লাল কাপড়টা খুলে ফেলেছেন । এই প্রথম বাঁকা চৌধুরী দেখতে পেলেন তাঁর মুখ । রাজপুত্রের মতন সুন্দর চেহারা বন্ধু গুপ্তর । গৌর বর্ণ, তীক্ষ্ণ নাক, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল । শুধু তাঁর কপালে একটা কাটা দাগ । পুরনো ক্ষত, কোনও এক সময়ে যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন বোঝা যায় । এত সুন্দর চেহারা, তবু বন্ধু গুপ্ত কেন মুখটা ঢেকে রাখেন , কে জানে !

বন্ধু গুপ্ত মাত্র চারজন সঙ্গী নিয়ে বর্ধমানে বর্গিদের শিবিরের দিকে যাবেন শুনে বাঁকা চৌধুরী আর স্থির থাকতে পারলেন না । ঢুকে পড়লেন সেই ঘরের মধ্যে ।

সঙ্গে সঙ্গে বলরাম এক লাফ দিয়ে উঠে বাঁকা চৌধুরীর ঘাড় চেপে ধরল ।

রাকা কোমরের খাপ থেকে বের করল ধারাল ছুরি ।

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'আরে, আরে কি করছ ? এর তো বিচার হয়ে গেছে একবার । নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে গেছে ।'

বলরাম বলল, 'তবু আমাদের গোপন আলোচনার মধ্যে এ কেন ঢুকে পড়বে ?'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'আপনাদের কথার মধ্যে এসে পড়ে হয়তো অন্যায় করেছি । কিন্তু বাংলার নবাব আলিবর্দি বর্গিদের হাতে বন্দি, এ-খবর শুনে আর স্থির থাকতে পারিনি । আপনারা তাকে উদ্ধার করতে চলেছেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন ।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'আমরা নবাবকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি, না প্রাণ দিতে যাচ্ছি, তার ঠিক নেই । আপনি সেখানে গিয়ে কি করবেন ?'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'আমি বুঝি প্রাণ দিতে পারি না ? আমার প্রাণের এমন কি দাম আছে ?'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'শুধু প্রাণ দিলেই তো হল না। আপনাকে নিয়ে আমাদের যদি ঝামেলায় পড়তে হয় !'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'কিছু ঝামেলা হবে না। আমি কিছু-না-কিছু কাজে লেগে যাব।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'তা হলে চলুন।'

একটু পরে বেরিয়ে পড়ল ছ' জনের একটি দল। ছ'টি ঘোড়া চলে গেল গভীর জঙ্গলের দিকে।

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন বন্ধু গুপ্ত। জঙ্গলের মধ্যে অনেক গোপন পথ তাঁর নখদর্পণে।

প্রায় ভোর রাত্রে এরা পৌঁছল বর্ধমানে।

রানীবাঁধের কাছে দেখা গেল শত-শত তাঁবু। ভেতরে সবাই ঘুমন্ত। কিছু-কিছু সৈন্য বাইরে পাহারা দিচ্ছে। তাদের হাতে লম্বা-লম্বা বর্শা।

বন্ধু গুপ্ত কয়েকটা গাছের আড়ালে ঘোড়ার রাশ টানলেন।

তাঁর পেছনে অন্য সবাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'এবার কি হবে ?'

কেউ কোনও উত্তর দিতে পারল না।

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'কোন তাঁবুতে নবাব আলিবর্দিকে বন্দি করে রাখা হয়েছে, সেটা আগে জানা দরকার। কোনওরকমে সেই তাঁবুটা আক্রমণ করে নবাবকে উদ্ধার করা যেতে পারে। একটা তাঁবুর প্রহরীদের সঙ্গে আমরা লড়তে পারি। কিন্তু সবাই যদি জেগে যায়, তা হলেই মুশকিল।'

আশিক বলল, 'কোন তাঁবুতে নবাব রয়েছেন, সেটা বুঝব কি করে ?'

রাকা বলল, 'সেই তাঁবুর চারদিকে নিশ্চয়ই অনেক বেশি পাহারা থাকবে।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'তা তো থাকবেই !'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'আমি একটা কথা বলব ? নবাব আলিবর্দি কোন তাঁবুতে আছেন, আমি খোঁজ নিয়ে আসতে পারি।'

'আপনি কি করে খোঁজ আনবেন ?'

'ভোর হয়ে এসেছে। আমি ঝাড়ুদার সেজে তাঁবুগুলো ঝাঁট দিতে যেতে পারি। একটার-পর-একটা তাঁবু দেখতে দেখতে যাব। নবাব আলিবর্দি কোন তাঁবুতে আছেন, ঠিক দেখে নেব।'

'আপনার ঘি-দুধ-খাওয়া চেহারা। আপনি ঝাড়ুদার সাজলে কে বিশ্বাস করবে? দেখলেই সন্দেহ করবে প্রহরীরা।'

'বন্ধু, ছদ্মবেশ ধরতে কতক্ষণ লাগবে ? মাথার চুলে ধুলো মাখব। খুলে ফেলব জামা। ঝুঁকে-ঝুঁকে হাঁটব, কেউ মুখ দেখতে পাবে না।

'সত্যি-সত্যি পারবেন ?'

রাকা এগিয়ে এসে বলল, 'বন্ধু, এটা কিন্তু একটা ভাল উপায় । ঝাড়ুদার সাজলে কেউ সন্দেহ করবে না । আমিও যাব ওর সঙ্গে ।'

আশিক বলল, 'তুমি গিয়ে কী করবে, রাকা ?'

রাকা বলল, 'ঝাড়ুদারদের সঙ্গে একজন ঝাড়ুদারনি থাকে । দু'জনে একসঙ্গে গেলে ভাল করে দেখতে পারব ।'

রাকা নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে ।

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'আগে ঝাড়ু যোগাড় করতে হবে । কোথায় সেগুলো রাখে খুঁজে বার করতে হবে !'

রাকা বলল, 'না, আগে ছদ্মবেশ ধরতে হবে ।'

মাটি থেকে দু' হাতে ধুলো কুড়িয়ে রাকা মাখতে লাগল চুলে । তার লম্বা চুল জড়িয়ে আলগা খোঁপা বেঁধে নিল, আঁচলটা জড়িয়ে নিল কোমরে । বাঁকা চৌধুরীও সাজ বদলালেন । তারপর দু'জনে এগিয়ে গেলেন নিঃশব্দে ।

খানিকটা খোঁজাখুঁজির পরেই পাওয়া গেল লম্বা-লম্বা ঝাঁটা । একটা তাঁবুর পেছনের দিকে সেরকম অনেক ঝাঁটা রাখা আছে । বোধ হয় এই তাঁবুতেই ঝাড়ুদাররা থাকে ।

দুটো ঝাঁটা তুলে নিয়ে বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'রাকা, তুমিও কখনও ঘর ঝাঁট দাওনি, আমি কখনও হাতে ঝাঁটা ধরিনি আগে । কারও সামনে পড়লেই ধরা পড়ে যাব !'

রাকা বলল, 'আমার একটা পুতুল খেলার ঘর ছিল, সেই ঘরটা আমি নিজে ঝাঁট দিতাম, পরিষ্কার করতাম । সে-ঘরে কাউকে ঢুকতে দিতাম না !'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'সে আর কতটুকু ঘর !'

রাকা বলল, 'বর্গিরা আমাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে । আমার সেই পুতুলগুলো সব পুড়ে গেছে !'

বাঁকা চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কত লোকের কত কী পুড়ে গেছে !'

তারপর আবার বললেন, 'সব তাঁবু ঝাঁট দেওয়ার দরকার নেই । তা হলে হাঁপিয়ে যাব । এমনই চল, দেখতে-দেখতে যাই । প্রহরীদের দেখতে পেলে ঝাড়ু চালিয়ে এমন ধুলো ওড়াব যে, ওরা আমাদের ভাল করে দেখতেই পাবে না ।'

দোয়াতের কালিতে কেউ যেন অনেকখানি জল মিশিয়েছে, আকাশের অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে । সূর্যের এখনও দেখা নেই । শুরু হয়েছে পাখির কিচিরমিচির ।

গাছের তলা দিয়ে-দিয়ে এগোল ওরা দু'জন ।

যেসব তাঁবুর সামনে একজন-দু'জন প্রহরী, সেখানে ওরা দাঁড়াল না । নবাব আলিবর্দি সেখানে থাকবেন না । কিছু-কিছু প্রহরী ঘুমোচ্ছে, আবার অনেকে জেগেও আছে । প্রহরী দেখলেই ওরা ঝাঁটা চালাচ্ছে । জোরে-জোরে । কেউ এখনও ওদের সন্দেহ করেনি ।

একটা তাঁবুর কাছাকাছি এসে ওরা থমকে গেল। সেটা বেশ বড় তাঁবু, দেখলেই মনে হয় সেনাপতি বা সেরকম বড় কেউ থাকেন। চার কোণে দাউ-দাউ করে জ্বলছে মশাল। প্রায় দশ-বারোজন প্রহরী অনবরত চারদিকে ঘুরছে,-একজনও ঘুমোয়নি।

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'এইটাই মনে হচ্ছে, তাই না?'

রাকা বলল, 'তা হলে বন্ধুকে গিয়ে খবর দিই!'

'দাঁড়াও, আগে নিশ্চিন্ত হতে হবে তো!'

'কী করে নিশ্চিন্ত হবেন?'

'ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে। রাকা, তুমি এইবার দাঁড়াও, আমি কোনও ছুতোয় ঢুকে পড়ি তাঁবুর মধ্যে। নবাব আলিবর্দিকে আমি একবার মুর্শিদাবাদে দেখেছিলাম দূর থেকে। দেখলেই চিনতে পারব।'

'আপনাকে ভেতরে ঢুকতে হবে না। আমি যাব। ভেতরে ঢুকলে ধরা পড়ার ভয় আছে।'

'ধরা পড়ার ভয় আছে বলেই তো বলছি। আমিই যাব।'

'না। আমি যাব।'

'পাগলামি কোর না, রাকা। তোমার জীবনের দাম আমার চেয়ে বেশি। তা ছাড়া নবাবকে আমি চিনি। শোন, ভেতরে ঢুকে আমি যদি ধরা পড়ি, তার আগে যদি নবাবকে দেখতে পাই, তা হলে ধরা পড়লেই আমি দু'বার খুব জোরে কেঁদে উঠব। সেই কান্না শুনলেই তুমি চুপিচুপি দৌড় মারবে। সোজা গিয়ে বন্ধু গুপ্তকে খবর দেবে।'

বাঁকা চৌধুরী তাঁবুর ধার ঘেঁসে-ঘেঁষে দরজার দিকে ঝাড়ু হাতে চলে গেলেন প্রহরীরা একটু সরে যেতেই তিনি ঝাড়ু দিতে-দিতে ঢুকে গেলেন ভেতরে।

কিন্তু দূর থেকে একজন প্রহরী দেখতে পেয়ে গেল ঠিক। সে সঙ্গে-সঙ্গে তাড়া করে এল।

একটু পরেই রাকা শুনতে পেল তাঁবুর মধ্যে বাঁকা চৌধুরীর গলায় দু'বার কান্নার আর্তনাদ। এই কান্না কি শুধু সঙ্কেত, না বাঁকা চৌধুরীকে মেরেই ফেলল ওরা?

১০

রাকা পেছন ফিরেই দৌড় লাগাল। ঝাঁটাটা ফেলে দিল ছুঁড়ে।

বেশিদূর যেতে পারল না। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে তার সামনে যমদূতের মতন দাঁড়াল এক প্রহরী। কী যেন এক দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করল।

হাতে ঝাঁটা নেই, এখন আর ঝাড়ুদারনি হিসাবে পরিচয়টা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। চট করে ভেবে নিয়ে রাকা পাগলি সেজে গেল। সে মুখ দিয়ে শব্দ করল, 'উলু, উলু, উলু, উলু ....'

প্রহরীটির মারাঠি ভাষা, যেমন বুঝতে পারেনি, তেমনই রাকার ভাষাও বুঝতে পারল না প্রহরীটি।

সে আবার জিজ্ঞেস করল 'তু কৌন?'

রাকা বলল, 'আনি মানি জানি না! আনি মানি জানি না!'

প্রহরীটি খপ করে রাকার হাত চেপে ধরল।

অমনই রাকা তার হাত কামড়ে ধরল। কামড়ে রক্ত বের করে দিল।

কিন্তু কত যুদ্ধ পার হয়ে এসেছে যে বর্গি, সে অত সহজে ছেড়ে দেবে কেন? রাকা দৌড় শুরু করলেও প্রহরীটি তাকে তাড়া করে গেল।

রাকা ছুটতে পারে খুব জোরে। প্রহরীটি তাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু ছুটতে-ছুটতেই রাকা অন্য একটা বিপদের কথা ভাবল। বন্ধু গুপ্তকে এক্ষুনি খবর দিতেই হবে। জানাতে হবে বাঁকা চৌধুরীর বিপদের কথা। কিন্তু বন্ধু গুপ্তর কাছে যেতে হলে এই বদমাশ প্রহরীটা তো তাঁকে দেখে ফেলবে!

রাকা ছুটতে লাগল এঁকেবেঁকে।

প্রহরীটাও কিছুতেই তার পিছু ছাড়ছে না। প্রায় ধরে ফেলে ফেলে এরকম অবস্থা।

হঠাৎ রাকা শুনতে পেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। তারপর দেখলে সাদা ঘোড়ায় চড়া বন্ধু গুপ্তকে। সারা মুখে ও গায়ে লাল কাপড় জড়ানো।

তলোয়ার তুলে বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'সাবধান!'

প্রহরীটি থমকে গেল। বন্ধু গুপ্তকে দেখে ভয়ে, বিস্ময়ে যেন ফেটে পড়তে চাইল তার চোখ। সে চিৎকার করে বলল, 'শয়তান! অন্ধকারের শয়তান!'

আর বেশি কিছু বলতে পারল না সে, ধপাস করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে!

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'ভয় নেই রাকা।'

রাকা বলল, 'আমি মোটেই ভয় পাইনি, বন্ধু। কিন্তু চৌধুরীমশাইয়ের খুব বিপদ! উনি ধরা পড়েছেন। সেই তাঁবুতেই আছেন নবাব আলিবর্দি। তাঁর খোঁজ পাওয়া গেছে।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'বাঃ! আগে এই লোকটাকে বাঁধতে হবে। জ্ঞান ফিরলেই ও ষাঁড়ের মতো চেঁচাবে।'

অন্য চারজনও এসে গেল এই সময়। তাদের একজন মাথার পাগড়ি খুলে প্রহরীটিকে হাত-পা বেঁধে ফেলে, পাগড়িটার খানিকটা অংশ ভরে দিল তার মুখে। যাতে জ্ঞান ফিরলেও চিৎকার করতে না পারে।

এবার তাকে ধরাধরি করে লুকিয়ে রাখল একটা ঝোপের মধ্যে।

রাকা বলল, 'আর দেরি করা যাবে না। চলুন, চলুন, এক্ষুনি সেই তাঁবুটায় চলুন!'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'দাঁড়াও ! সকলের যাওয়া তো চলবে না । আমি একা যাব ।'

ফিরোজ, বলরামরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'না, বন্ধু, না । আমরা সবাই যাব ।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'সবাই গেলে লাভ হবে না । সেখানে অনেক প্রহরী । তাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে আমরা জিততে পারব না ।'

বলরাম বলল, 'তা হলে আপনি একা কেন যাবেন !'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'আমি একা গেলে বেশি কাজ হবে । অনেকদিন ধরে আমি লাল কাপড়ে কেন মুখে ঢেকে থাকি ? এইজন্যই তো ! সাধারণত বর্গিরা আমাকে দেখলেই ভয় পায় । ওরা মহাদেবের ভক্ত, তা জান তো ? 'হর হর মহাদেও' বলে চিৎকার করে শোননি। ওরা বোধহয় আমাকে দেখে মহাদেবের অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গী কিছু মনে করে । মহাদেবের যারা ভক্ত, তারা কিন্তু মহাদেবের অনুচরদের দেখে ভয় পায় ।'

ফিরোজ বলল, 'যদি অনেকে মিলে আপনাকে ঘিরে ধরে ?'

বন্ধু গুপ্ত হেসে বললেন, 'দেখা যাক !'

রাকা বলল, 'আপনি চিনবেন কী করে কোন তাঁবুতে নবাব রয়েছেন ?'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'রাকা, তুমি আমাকে শুধু দিকটা দেখিয়ে দাও । তারপর আমি ঠিক খুঁজে নেব ।'

বর্গিদের সেনাপতি নিজের তাঁবুতে বন্দি করে রেখেছিলেন নবাব আলিবর্দি আর তাঁর নাতি সিরাজকে । সুন্দর খাটে নরম বিছানায় তাঁদের শুতে দিয়েছেন, শুধু দু'জনেরই একটা পায়ে শিকল আর তালা দেওয়া । উলটো দিকের একটা খাটে শুয়ে আছে স্বয়ং ভাস্কর পন্ডিত ।

এখন সবাই ঘুমন্ত ।

বাঁকা চৌধুরী সেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ায় কয়েকজন প্রহরী তাঁকে ধরে ফেলেছিল । সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিত এবং নবাবের যাতে ঘুম না ভাঙে সেইজন্য তাড়াতাড়ি তারা তাঁকে নিয়ে এসেছে বাইরে ।

এর পর তলোয়ারের খোঁচা মেরে-মেরে জিজ্ঞেস করছে, 'বল, তুই কোথা থেকে এসেছিস ? তুই কাদের গুপ্তচর ?'

বাঁকা চৌধুরী সেই প্রথমই একবার ভয়ে কেঁদে ওঠার ভান করেছিলেন । তারপর থেকে একেবারে চুপ । ওদের শত প্রশ্নেরও একটা উত্তর দিচ্ছেন না । ওরা তাঁর গালে চড় মারছে । তিনি হাসছেন ।

হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে সেই এক লাল কাপড় পরা মূর্তি । বন্ধু গুপ্ত হুঙ্কার দিলেন, 'সাবধান !'

ভোরের অল্প আলোয় বন্ধু গুপ্তের চেহারাটা আরও অস্বাভাবিক মনে হল । তাঁর কণ্ঠস্বর মনে হল বজ্রের মতন ।

দশজনের মধ্যে আটজন প্রহরীই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাল । দু'জনে তাঁকে বাধা দিতে এল । বঙ্কু গুপ্ত বিদ্যুদ্বেগে তলোয়ার চালিয়ে চোখের নিমেষে ধরাশায়ী করলেন সে দু'জনকে ।

তারপর বঙ্কু গুপ্ত ঘোড়া সমেত ঢুকে গেলেন তাঁবুর মধ্যে ।

তলোয়ার চালিয়ে ছিন্নভিন্ন করলেন । মশারি । নবাব ও তাঁর নাতি জেগে উঠে ভয় পেয়ে গেলেন । তাঁরা ভাবলেন, কোনও শয়তান এসেছে তাঁদের শেষ করে দিতে ।

বঙ্কু গুপ্ত নবাবকে বললেন, 'ভয় নেই। আমি আপনাদের বন্ধু।'

শিকল খোলা গেল না। তলোয়ারের ঘায়ে বঙ্কু গুপ্ত কেটে ফেললেন পালঙ্ক। একটা করে কাঠের টুকরো আর শিকল নবাবদের পায়ে ঝুলতে লাগল, কিন্তু এখন হাঁটতে কোনও বাধা নেই।

বঙ্কু গুপ্ত নবাবকে বললেন, 'এক্ষুনি আপনারা বাইরে চলে যান ।'

অন্য খাট থেকে নেমে এল ভাস্কর পণ্ডিত । বিশাল পাহাড়ের মতন তার চেহারা, নাকের নিচে গোঁফ, মাথার বাবরি চুল ।

শিয়রের কাছে রাখা থাকে তার তলোয়ার । সেটা খপ করে তুলে নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত বলল, 'ও, তুইই সেই অন্ধকারের শয়তান ? আজ আর তোর নিষ্কৃতি নেই । তোর মুণ্ডু এখানে ধুলোয় গড়াবে।'

বঙ্কু গুপ্ত বললেন, 'তাই নাকি ? দেখা যাক !'

দু'জনের তলোয়ারের ঠোকাঠুকিতে আগুনের ফুল্‌কি উঠল ।

১১

নবাব আলিবর্দির তখনও ঘুমের ঘোর কাটেনি । হঠাৎ লাল কাপড়ে মুখ ঢাকা একজন লোক ঘোড়াসুদ্ধু তাঁবুতে ঢুকে পড়ে তাঁকে মুক্ত করে দিল । এ লোকটি কে? এর মুখ ঢাকা কেন ? এত প্রহরীবেষ্টিত বর্গিদের তাঁবুতে সে ঢুকলই বা কি করে ?

এখন বর্গিদের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সেই লোকটির লড়াই লেগে গেছে ।

নবাবের নাতি কিশোর সিরাজ দাদুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই লোকটা কে ? ও কি আমাদের পক্ষে ?'

নবাব আলিবর্দি বললেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে ।'

সিরাজ আবার জিজ্ঞেস করল, 'কে জিতবে ?'

নবাব বললেন, 'আমাদের পক্ষের লোকটির জেতা উচিত ।'

কিন্তু লড়াইটা অত সহজ হচ্ছে না। বন্ধু গুপ্তের তলোয়ারের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিতও মহাবীর। বন্ধু গুপ্ত ঘোড়া থেকে নেমে ক্ষিপ্রভাবে অস্ত্র চালাচ্ছেন, প্রত্যেকবার ভাস্কর পণ্ডিত সেই আঘাত প্রতিহত করছে। ভাস্কর পণ্ডিতের বিশাল চেহারা, হাত দুটো লম্বা-লম্বা, তার তলোয়ারটাও অনেক বড়। বন্ধু গুপ্তকে পিছু হটে যেতে হচ্ছে বারবার।

এ যেন জীবন-মরণের লড়াই। একজন প্রাণ না দিলে এ-লড়াই থামবে না। ভাস্কর পণ্ডিতেরই সুবিধা বেশি।

বন্ধু গুপ্ত প্রথমেই আলিবর্দি ও সিরাজকে পালাতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা পালাতে ভুলে গিয়ে দেখছেন এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

ভাস্কর পণ্ডিত বন্ধু গুপ্তর মাথা লক্ষ্য করে একটা জোর আঘাত হানতে হানতে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, 'মুখ ঢেকে রেখেছিস কেন, কাপুরুষ ?'

বন্ধু গুপ্ত দ্রুত একপাশে সরে গিয়ে সেই আঘাত আটকে বললেন, 'সবাইকে আমি আমার মুখ দেখাবার যোগ্য মনে করি না!'

ভাস্কর পণ্ডিত বলল, 'তুই ওই লাল কাপড় মুড়ি দিয়ে আমার লোকদের ভয় দেখাতে চাস। তারা তোকে মনে করে অন্ধকারের শয়তান। আজ তোর শয়তানি ঘুচে যাবে।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'আমি দুর্জনের শয়তান, সুজনের বন্ধু। বাংলার মানুষের কাছে তোমরা সবাই দুর্জন। তোমাদের শাস্তি পেতেই হবে।'

ভাস্কর পণ্ডিত হা-হা করে হেসে বলল, 'কে আমাদের শাস্তি দেবে ? বাঙালির বাহুবল আছে ? বাঙালি শুধু দূর থেকে চ্যাঁচাতে জানে, আর কাছে এলেই ভয় পেয়ে কাঁদে।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'ভাস্কর পণ্ডিত, এতদিন তুমি প্রকৃত বাঙালির দেখা পাওনি ! বাঙালি কাঁদে বটে, কিন্তু ভয় পেয়ে নয়। বাঙালি পরের দুঃখ দেখলে কাঁদে। তোমাদের সে বোধ নেই। বাঙালি যেমন কাঁদতে জানে, তেমনই প্রাণ দিতেও জানে।'

'আজ তুই প্রাণ দিবি !'

'আমি প্রাণ দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নই, ভাস্কর পণ্ডিত। আপাতত কিছু প্রাণ বাঁচাতে চাই। বাংলার বুকে বর্গিদের আর অত্যাচার করতে দেব না। তোমাকে হত্যা করে আমি সব অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব !'

'তুই একটা কীট ! তোর এত স্পর্ধা ! তোর হাত-পা টুকরো টুকরো করে কুকুরকে খাওয়াব !'

'তোমার মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। কুকুরের বদলে নিজেই আমার হাত-পা চিবিয়ে খেলে আরও খুশি হবে মনে হচ্ছে !'

এই সময় রাকা ঢুকে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। ভাস্কর পণ্ডিত ও বন্ধু গুপ্তের লড়াই সে এক পলক দেখল মাত্র। তারপর নবাব আলিবর্দির সামনে এসে কুর্নিশ করে বলল, 'নবাব, আর দেরি করবেন না। শিগগির বাইরে চলুন।'

নবাব একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, 'তুমি আবার কে ! তুমি আমাদের বন্ধু, না শত্রু !'

রাকা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'বন্ধু ! বন্ধু !'

নবাব বললেন, 'তুমি নারী হয়ে এই শত্রুর তাঁবুতে ঢুকলে কি করে ?'

রাকা বলল, 'এখন অত কথা বলার সময় নেই ।'

নবাব তবু বন্ধু গুপ্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের পক্ষের ওই লোকটি ...... ওকে একা ফেলে যাব ? আঃ, আমার কাছে যদি একটা অস্ত্র থাকত, ওকে সাহায্য করতে পারতাম !'

রাকা বলল, 'ওঁকে সাহায্য করার দরকার হবে না । আপনারা এখানে থাকলে বিপদ আরও বাড়বে !'

রাকা কিশোর সিরাজের হাত ধরে টেনে বলল, 'এস আমার সঙ্গে !'

যুদ্ধ করতে করতেই বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'রাকা, ওঁদের দিঘির ওপারের তাঁবুর দিকে নিয়ে যাও !'

বন্দিরা পালাচ্ছে দেখে ভাস্কর পন্ডিত এক লাফ দিয়ে শিবিরের দ্বারের দিকে আসবার চেষ্টা করল, বন্ধু গুপ্ত বিদ্যুতের মতন তাঁর চোখের সামনে তলোয়ার ঘুরিয়ে তাকে আটকালেন ।

ভাস্কর পন্ডিত চিৎকার করে উঠল, 'ওরে কে কোথায় আছিস ! নবাবকে আটকে রাখ ! নবাবকে যেতে দিবি না !'

কেউ সাড়া দিল না । রাকা নবাব ও সিরাজকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ।

এবার শিবিরের মধ্যে দু'জন । আর কোনও শব্দ নেই, শুধু তলোয়ারের ঝনঝনানি! বন্ধু গুপ্তর সাদা ঘোড়াটা একপাশে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছে ।

বন্ধু গুপ্ত ভেবেছিলেন, খুব দ্রুত কাজ সেরে তিনি এখান থেকে চলে যাবেন । বর্গি প্রহরীরা তাঁকে দেখে ভয় পেলেও তাদের সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিতকে একেবারে অরক্ষিত তো রাখবে না । বড় দল নিয়ে ফিরে আসবে । এখনও তারা আসছে না কেন ?

ভাস্কর পন্ডিতকে পরাজিত করা মোটেই সহজ হবে না । কতক্ষণ সময় লাগবে কে জানে । ভাস্কর পন্ডিত এত জোরে-জোরে তলোয়ার চালাচ্ছে যে, বন্ধু গুপ্ত সব বার রুখতে পারছেন না । তিনি আঘাত এড়িয়ে সরে-সরে যাচ্ছেন । ভাস্কর পন্ডিতের বিশাল বপুর তুলনায় তাঁর ছিপছিপে পাতলা শরীর, তিনি খুব তাড়াতাড়ি এদিক-ওদিক যেতে পারেন । কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ আটকানো যাবে না ।

হঠাৎ খুব কাছেই দু'বার কামান গর্জন হল ।

বন্ধু গুপ্ত ভাবলেন, বর্গিরা কামান দাগতে-দাগতে এগিয়ে আসছে । তবে কি নবাবের সৈন্যদের সঙ্গে তাদের লড়াই লেগে গেছে ? আর এখানে দেরি করা চলে না ।

বন্ধু গুপ্ত এইসব চিন্তা করতে-করতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেতেই ভাস্কর পণ্ডিত একবার তাঁকে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করল। বন্ধু গুপ্তর হাত থেকে তলোয়ারটা ছিটকে পড়ে গেল দূরে।

ভাস্কর পণ্ডিত এক দানবের মতন খুশির অট্টহাসি দিয়ে বলল, 'এবার? গর্তের ইঁদুর, এখন তুই কোথায় পালাবি?'

আঘাতের ঝোঁকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন বন্ধু গুপ্ত, ভাস্কর পণ্ডিত তাঁর মুন্ডু কেটে ফেলার জন্য কোপ মারতেই তিনি কোনওক্রমে গড়িয়ে সরে গেলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন তড়াক করে। তাঁর হাতে কোনও অস্ত্র নেই, ভাস্কর পণ্ডিত তাঁকে মারার জন্য তাড়া করল। বন্ধু গুপ্ত ছুটে-ছুটে ঘুরতে লাগলেন শিবিরের মধ্যে। ভাস্কর পণ্ডিত এক-একবার কোপ মারতে-মারতে বলছে, 'এইবার, এইবার তুই মর!' বন্ধু গুপ্ত প্রত্যেকবারই পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছেন।

একসময় তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন শিবিরের এক কোণে একটা বর্শা ঝোলানো রয়েছে। সুদীর্ঘ বর্শা, চকচকে ফলা, হাতলের অনেকখানি রুপোয় মোড়া।

সেই বর্শাটি তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন বন্ধু গুপ্ত।

তবু কিছু সুবিধা হল না। ভাস্কর পণ্ডিতের গায়ের জোর অবিশ্বাস্য রকমের। নিজের তলোয়ার দিয়ে সে সেই বর্শাটার ওপর এত জোরে আঘাত করল যে, সেটা দু'টুকরো হয়ে গেল। আবার হেসে উঠল ভাস্কর পণ্ডিত।

এই সময় আবার শিবিরের মধ্যে ঢুকে এল রাকা।

বন্ধু গুপ্ত প্রমাদ গুনলেন : বিপদের ওপর বিপদ। তাঁর হাতে অস্ত্র নেই, তিনি কোনওরকমে ছুটে-ছুটে ভাস্কর পণ্ডিতের তলোয়ার এড়াচ্ছেন, কিন্তু রাকাকে তিনি বাঁচাবেন কি করে!

রাকার চুল খোলা, শাড়ি ছিঁড়ে গেছে, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। তাকে দেখাচ্ছে পাগলিনীর মতন।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'এই লোকটা! আমি চিনেছি! এই লোকটা আমার বাবাকে মেরেছে। আমার চোখের সামনে!'

বন্ধু গুপ্ত ধমক দিয়ে বললেন, 'রাকা, শিগগির চলে যাও! এখানে থেক না!'

রাকা বলল, 'বন্ধু, আমি নবাব আর তাঁর নাতিকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। আমি ফিরে এসেছি প্রতিশোধ নিতে!'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'রাকা, যাও! যাও!'

ভাস্কর পণ্ডিত এবার বন্ধু গুপ্তকে ছেড়ে ধেয়ে গেল রাকার দিকে। রাকার হাতে একটা ছোট্ট ছুরি। সেটা সে তোলার আগেই ভাস্কর পণ্ডিত এক হাতে চেপে ধরল তার চুলের মুঠো! সেই চুল ধরে রাকাকে শূন্যে তুলে ফেলল।

এই সুযোগে বন্ধু গুপ্ত মাটি থেকে তুলে নিলেন নিজের তলোয়ার। এক লাফে ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে গিয়ে যে-হাতে সে রাকার চুল ধরেছিল, সেই হাতে আঘাত করলেন।

ভাস্কর পন্ডিত ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিঘাত করতে গিয়েও পারল না। তার বাঁ হাত দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে, রাকার চুল-ধরা মুঠি খুলে গেছে। ভারী শরীর নিয়ে দ্রুত ঘুরতে গিয়েই টলে পড়ে গেল। আলিবর্দি যে খাটে শুয়েছিলেন, সেই খাটের কোনায় খুব জোরে ঠুকে গেল তার মাথা।

ভাস্কর পন্ডিত মাটিতে পড়ে যেতেই বন্ধু গুপ্ত তার তলোয়ার চেপে ধরলেন পা দিয়ে।

ভাস্কর পন্ডিত বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল বন্ধু গুপ্তর দিকে। নিজের পরাজয়ও যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। এর আগে কারও কাছে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হারেনি!

ফিসফিস করে সে বলল, 'তা হলে আমিই হারলাম? নিয়তি! ঠিক আছে, আমি সেনাপতি, আমাকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে মেরো না। এক কোপে আমার গলাটা কেটে দাও!'

বন্ধু গুপ্ত শিবিরের পাশেই দু'বার জোরে শিসের শব্দ শুনতে পেলেন।

তিনি পায়ের চাপ দিয়ে ভাস্কর পন্ডিতের মুঠি থেকে তলোয়ারটা খুলে নিয়ে ঠেলে দিলেন অনেক দূরে।

তারপর ধীর স্বরে বললেন, 'মাটিতে পড়ে-যাওয়া নিরস্ত্র শত্রুকে আমি কখনও হত্যা করি না। তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ শেষ হয়নি! কিন্তু এখন আর আমার সময় নেই! পরে আবার দেখা হবে!'

বন্ধু গুপ্ত এবার এক লাফে তাঁর সাদা ঘোড়ায় চড়ে বসে রাকাকেও তুলে নিলেন।

শিবিরের বাইরে এসে দেখলেন, ফিরোজ আর বলরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা কামানের পাশে। খানিকটা দূরে একদল বর্গি।

ফিরোজ ব্যাকুলভাবে বলল, 'বন্ধু, বন্ধু, আর দেরি করা যাবে না। আমরা কামানটা দখল করে ওদের আটকাচ্ছিলাম। কিন্তু আর গোলা নেই। ওরা এখনও বুঝতে পারেনি। ওরা আবার এগিয়ে এলে আমরা আর রুখতে পারব না।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'নবাব তাঁর শিবিরে পৌঁছে গেছেন তো? তোমরা ঘোড়া নাও। আমাদের আর এখানে থাকার দরকার নেই!'

বর্গিরা এবার 'হর হর বোম বোম' বলে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু তারা এ-পর্যন্ত আসবার আগেই বন্ধু গুপ্ত সদলবলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন পেছনের আমবাগানে।

তারপর তাঁরা একসঙ্গে অনেক কামানের গর্জন শুনতে পেলেন।

বলরাম বলল, 'দিঘির ওপার থেকে নবাবের সেনা তোপ দাগছে!'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'নবাব মুক্তি পেয়েছেন, সেটাই বড় কথা। বাংলার মসনদ খালি হয়ে গেলে বিপদ আরও বাড়ত। বর্গিরা নবাবের বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করার সাহস পাবে না!'

রাকা মূর্ছিত হয়ে গেছে। ঘোড়া থেকে নামিয়ে তার চোখে-মুখে জল দেওয়া হল।

বন্ধু গুপ্তর ডান দিকের পাঁজরের কাছটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে । কোন সময় যে ওখানে ভাস্কর পন্ডিতের তলোয়ারের একটা খোঁচা লেগেছে, তা তিনি টেরও পাননি। তাঁর সাদা শরীরে লাল রঙের কাপড় জড়ান বলে রক্তের দাগ টের পাওয়া যাচ্ছে না ।

বাঁকা চৌধুরীরও মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে । প্রহরীরা মারতে-মারতে তাঁর চারখানা দাঁত ভেঙে দিয়েছে । তবু তিনি মাটিতে বসে রাকার মাথাটা কোলে নিয়ে জল ছিটিয়ে যাচ্ছেন খুব যত্নের সঙ্গে ।

একটু পরে রাকার জ্ঞান ফিরে এল ।

প্রথমেই সে বন্ধু গুপ্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মরেছে ? ওই অসুরটা মরেছে !'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'না ।'

রাকা হতাশ হয়ে বলল, 'মারলে না ? বন্ধু, তুমি শেষ পর্যন্ত মারলে না অসুরটাকে!'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'ওর হাতে আঘাত করেছি ! ও মাটিতে পড়ে গেল ! সেই অবস্থায়, অসহায়, শত্রুকেও মারার শিক্ষা যে আমি পাইনি রাকা ! আমার লড়াই করার সময় ছিল না !'

রাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল । তারপর আস্তে-আস্তে হেঁটে একটু দূরের একটা জলাশয়ের কাছে চলে গেল ।'

কিন্তু সেখানে বিশ্রাম করা গেল না বেশিক্ষণ ।

একদল অশ্বারোহীকে আসতে দেখা গেল সেদিকে । বলরাম, ফিরোজরা খাপ থেকে তলোয়ার খুলে প্রস্তুত হল ।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'ওদের সঙ্গে লড়াই করে লাভ নেই । কত জন আছে, কে জানে । তোমরা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাও, যে. যেদিকে পার, পালাও । একজন কেউ রাকাকে তুলে নাও । ওরা আমাকেই তাড়া করবে প্রথমে । আমি ওদের খানিকক্ষণ খেলিয়ে তারপর চোখে ধুলো দেব । আমার জন্য চিন্তা কোর না ।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওদের ঘোড়াগুলো ছুটে গেল বিভিন্ন দিকে । দামোদর নদীর ধারে সেই ভাঙা বাড়ির গুপ্ত আশ্রয়ে সবাই মিলিত হল দু'দিন পরে । সবাই এসেছে, শুধু আসেনি বলরাম আর রাকা । বলরাম রাকাকে নিজের ঘোড়ার তুলে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাকা তা মানতে চায়নি। সে উঠেছিল আলাদা একটা ঘোড়ায় । কিছুক্ষণ পরেই রাকা শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে যায় । বলরাম তা দেখতে পেয়ে রাকাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল । শত্রুদের হাতে সে প্রাণ দিয়েছে ।

রাকার আর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না ।

১২

বর্ধমানের রানীদিঘির ধারে বর্গিদের হাত থেকে কোনওক্রমে উদ্ধার পেয়ে নবাব আলিবর্দি চলে গেলেন কাটোয়ায় । হাত থেকে শিকার ফসকে যাওয়ায় ক্ষুধার্ত বাঘের

মতন ছটফট করতে লাগল সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিত। সে ভেবেছিল, বন্দি নবাবের মুক্তিপণ হিসাবে বহু লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। কোথা থেকে লাল কাপড়ে মুখঢাকা একটা লোক এসে সব নষ্ট করে দিল!

প্রথমে বঙ্কু গুপ্ত এবং তাঁর দলবলকে ধরার জন্য বর্গিরা চেষ্টা করল অনেক। কিন্তু কোনও লাভ হল না। বঙ্কু গুপ্ত যেন তাদের চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তখন ক্রুদ্ধ বর্গিরা ধেয়ে গেল রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে।

ভাস্কর পন্ডিতের অধীনে পঁচিশ হাজারেরও বেশি বর্গি সৈন্য, তারা প্রত্যেকেই নিপুণ সৈন্য। তাই ভাস্কর পন্ডিতের তেজেরও শেষ নেই। নবাব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ভাস্কর পন্ডিত ঠিক করল রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করবে।

অশ্বারোহী বর্গিরা ঝড়ের মতন আসে, ঝড়ের মতন চলে যায়। শুধু নদী পার হতে অসুবিধা হয় তাদের। কিন্তু মুর্শিদাবাদে ঢুকতে গেলে গঙ্গা পার হতেই হবে। এখন গ্রীষ্মকাল। গঙ্গায় খুব বেশি জল নেই। তবু ঘোড়া সমেত এত চওড়া নদী পার হওয়া যায় না। বর্গিরা তখন নদীর ধারে ধারে ছুটে ছুটে সমস্ত নৌকো আটক করল। জমা হল শত শত নৌকো। তারপর একটার পর একটা নৌকো সাজিয়ে সাজিয়ে বানিয়ে ফেলল সেতু। সেই নৌকোর সেতুর ওপর দিয়ে তারা গঙ্গা পার হতে লাগল।

রাজধানী মুর্শিদাবাদ তখন প্রায় অরক্ষিত। নিজের সৈন্যদের নিয়ে আলিবর্দি তখন বিশ্রাম নিচ্ছেন কাটোয়ায়। রাজধানীতে এমন কেউ নেই, যে বর্গিদের বাধা দিতে পারে।

এই সময়কার অবস্থা নিয়ে কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন :

"লুঠি বাঙলার লোক করিল কাঙ্গাল
গঙ্গাপার হইলো বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল।........"

মুর্শিদাবাদে ঢুকেই লুটতরাজ শুরু করে দিল বর্গিরা।

ইংরেজদের দেশ ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন শহরের চেয়েও বাংলা-বিহার-ওড়িশার রাজধানী মুর্শিদাবাদ তখন অনেক বড় শহর। মুর্শিদাবাদের ধন-দৌলত আর ঐশ্বর্যের জাঁকজমক দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়! বড়-বড় রাস্তার দু'ধারে বিশাল-বিশাল প্রাসাদ। ভারতের নানান অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা এসে মুর্শিদাবাদে জড় হয়েছে। সেইরকমই এক প্রধান ব্যবসায়ীর নাম জগৎ শেঠ। তার তুল্য ধনী সারা ভারতে খুব কমই আছে। নবাব-আমিররাও তার পরামর্শ শুনে চলে।

বর্গিরা মনের সাধ মিটিয়ে রাজধানী লুণ্ঠন করতে লাগল।

সমস্ত শহর জুড়ে শোনা যেতে লাগল শুধু তলোয়ারের ঝনঝনানি আর ভয়ার্ত চিতকার।

নবাব নেই, নবাবের সৈন্যরা নেই, সামান্য যে প্রহরীরা ছিল তারাও বর্গিদের তেজের সামনে দাঁড়াতেই পারল না। বাড়ি-ঘর ছেড়ে সবাই ছুটে পালাতে লাগল দিগ্বিদিক।

জগৎ শেঠের নিজস্ব কিছু প্রহরী বর্গিদের আটকাতে গিয়েও কচুকাটা হল। জগৎ শেঠ সপরিবারে আগেই প্রাসাদ ছেড়ে গ্রামের দিকে আশ্রয় নিয়েছিল, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল প্রচুর সোনাদানা, হিরে-জহরত। কিন্তু তার এক কর্মচারী এক সিন্দুক-ভর্তি মোহর নিয়ে যেতে গিয়েও ধরা পড়ে গেল ভাস্কর পণ্ডিতের হাতে। সেই কর্মচারীটির পোশাকের মধ্যেও লুকনো ছিল প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা, সেগুলো ঝনঝন করে গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়।

বর্গিরা উল্লাসে হিংস্র গলায় জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

নবাব আলিবর্দি যখন খবর পেলেন যে তাঁর রাজধানী তছনছ হয়ে গেছে, তখনই তিনি সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন কাটোয়া থেকে।

বর্গিরা রাজধানী লুণ্ঠন করার জন্য সময় পেয়েছিল মাত্র একদিন। নবাবের সৈন্যবাহিনীকে আসতে দেখে তারা কিন্তু লড়াই করার জন্য রুখে দাঁড়াল না। বর্গিরা সম্মুখ-যুদ্ধ করে না। তা ছাড়া, বাংলার রাজধানী দখল করে এখানে রাজত্ব করার ইচ্ছেও তাদের নেই। ধনসম্পদ লুঠ করার দিকেই তাদের আগ্রহ।

সুচতুর ভাস্কর পণ্ডিত লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে সদলবলে অন্য পথ দিয়ে ছেড়ে চলে গেল মর্শিদাবাদ।

নবাব আলিবর্দি ফিরে এসেছেন শুনে পলাতক নাগরিকরাও রাজধানীতে ফিরে আসতে লাগল। কারও বাড়ি-ঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, কারও বা পুত্র নিহত হয়েছে, অনেকেরই সারা জীবনের সঞ্চয় চলে গেছে। নবাবের দরবারে এসে হাহাকার করতে লাগল তারা।

জগৎ শেঠের টাকাপয়সার অন্ত নেই। তার কিছু আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বটে কিন্তু তার চেয়েও বেশি অপমানিত হয়েছে সে। বর্গিদের ভয়ে তাকে নিজের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। নবাবের কাছে এসে বলল, যেমন করেই হোক বর্গিদের তাড়াতেই হবে। যত টাকা লাগে লাগুক। আরও সৈন্যসামন্ত জোগাড় করতে হবে, তার জন্য যদি রাজ-কোষাগারে যথেষ্ট অর্থ না থাকে, তা হলে প্রয়োজনীয় টাকা জগৎ শেঠই ধার দেবে।

নবাব আলিবর্দি অন্য সব কাজ ফেলে বর্গি-দমনে মন দিলেন যেখানে তিনি বর্গিদের হানা দেওয়ার খবর শোনেন, সেখানেই তিনি ছুটে যান। তবু বর্গিদের জব্দ করা যায় না। লড়াই করে তাদের হারাবার সুযোগই পাওয়া যায় না, তারা চোখের নিমেষে পালিয়ে যায়, আবার চুপিচুপি ফিরে আসে।

একবার নবাব জানতে পারলেন যে, কাটোয়ার কাছে দাঁইহাট নামে একটা জায়গায় বর্গিরা দুর্গাপুজা করছে। পুজোর সময় সাধারণত কেউ অস্ত্রশস্ত্র ধরে না। বর্গিরা

অপ্রস্তুত থাকবে। নবাব আলিবর্দি একটা বড় বাহিনী নিয়ে এসে নবমী পূজার দিন আচমকা হানা দিলেন সেখানে।

এবার বর্গিরা সত্যিই বেকায়দায় পড়ল। বেশ কিছু বর্গি মারা পড়ল নবাব-বাহিনীর হাতে। সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিত তখন নামাবলী গায়ে দিয়ে পুজোয় বসেছিল, সে তলোয়ার হাতে নেওয়ার সময় পেল না। প্রায় ধরা পড়ে যেতে-যেতেও সে কোনওক্রমে শেষ মুহূর্তে একটা ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠে পালাল।

নবাবের বাহিনী বর্গিদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল ওড়িশার চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত।

সবাই ভাবল, এবার বুঝি বাংলায় শান্তি আসবে।

হায় রে দুরাশা। বাংলা যে তখন সোনার বাংলা। এই বাংলায় খাদ্যের অভাব নেই। এখানকার রেশম বস্ত্রের খুব সুনাম। বড়-বড় জমিদারদের হাতে প্রচুর টাকা। এই সব কিছুর লোভে বারবার ছুটে আসে দস্যুরা। এমন কী, সুদূর ইউরোপ থেকে জাহাজে চেপে ইংরেজ-ফরাসি-পর্তুগিজরাও এসে গেছে সেই একই লোভে।

মারাঠা বর্গিরাও ফিরে এল। এবার তাদের সঙ্গে এল স্বয়ং রঘুজি ভোঁসলে। যার সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিত। রঘুজি ভোঁসলে সঙ্গে নিয়ে এল অনেক বেশি বর্গিসৈন্য।

এত বড় এক দুর্ধর্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নেই নবাব আলিবর্দির। এবার বুঝি সোনার বাংলা একেবারে ছারখার হয়ে যায়।

এতদিনে দিল্লির বাদশাহের টনক নড়ল। কিন্তু বাদশাহেরও আর যুদ্ধ করবার শক্তি নেই। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর মুঘল বাদশাহরা শক্তিহীন হয়ে গেছেন, মারাঠাদের আক্রমণে দিল্লিই বিপর্যস্ত।

বাদশা তখন পেশোয়া বালাজি বাজিরাওকে অনুরোধ করলেন বর্গিদের সামলাতে। রঘুজি ভোঁসলের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র বালাজি বাজিরাওয়েরই আছে।

বাংলার বুকে শুরু হয়ে গেল ধুন্ধুমার কান্ড।

ওদিকে বর্ধমানের সেই ঘটনার পর নিজের লোকজনদের নিয়ে এক গোপন সভা করলেন বঙ্কু গুপ্ত। সেখানে রাকা নেই। আরও কয়েকজন আহত বা নিহত হয়েছে বর্গিদের হাতে। যদিও নবাব আলিবর্দিকে উদ্ধার করার জন্য তাদের আনন্দ করার কথা, কিন্তু কিছু কিছু সঙ্গীদের হারাবার দুঃখে সকলেরই মুখ ম্লান। রাকার কথা ভেবে অনেকেরই চোখ জলে ভিজে আসছে। বাঁকা চৌধুরী বারবার চোখ মুছছেন ধুতির খুঁট দিয়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বঙ্কু গুপ্ত বললেন, 'রাকা, বদরুদ্দিন, কামাল, বলরাম এরা হারিয়ে গেছে, এরা প্রাণ দিয়েছে দেশের জন্যে, এইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা। শোন, আমি ঠিক করেছি, এর পর আর আমাদের দল রাখার প্রয়োজন নেই। এবার তোমরা সবাই যে-যার বাড়ি ফিরে যাও!'

শোক ভুলে সবাই চমকে উঠল ।
বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'সে কী, বন্ধু ! দল ভাঙার কথা বলছেন কেন ? বর্গির হাঙামা কি শেষ হয়ে গেছে ? আমাদের এখনও লড়তে হবে না ?'
বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'এমন ছোট-ছোট দল নিয়ে লড়াই করে কোনও লাভ হবে না। এতদিন নবাব আলিবর্দি বাংলায় ছিলেন না। বর্গিরা যেমন খুশি অত্যাচার করছিল । তারা ভেবেছিল, সাধারণ বাঙালিরা ভীরু, কাপুরুষ । তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সেইজন্যই আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যথাসাধ্য বর্গিদের আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করেছি । অসহায় নারী ও শিশুদের বাঁচিয়েছি । কিন্তু এখন নবাব রাজধানীতে ফিরেছেন । বর্গিদের দমন করবার উদ্যোগ নিয়েছেন ।'
অন্য একজন বলল, 'তা বলে আমরা আমাদের দল ভাঙব কেন ? আমরাও যতটা পারি বর্গিদের রুখবার চেষ্টা করব ।'
বন্ধু গুপ্ত হেসে বললেন, 'নিজেদের শক্তি বুঝবার চেষ্টা করতে হয় । আমাদের কতটুকু শক্তি ? নবাব এখন সৈন্য বাড়াবেন, বর্গিরাও দল বাড়াবে । এসপার-ওসপার যুদ্ধ হবে । এরকম বড় আকারের যুদ্ধের মধ্যে আমরা পেছন থেকে খোঁচাখুঁচি করতে গেলে আমরাই নিঃশেষ হয়ে যাব ।'
আর-একজন বলল, 'আমরাও বড় দল গড়ব । গ্রামে-গ্রামে ঘুরে আরও ছেলেদের জোগাড় করে আমাদেরও একটা সৈন্যবাহিনী হবে ।'
বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'শুধু গ্রাম থেকে ছেলেদের জোগাড় করলেই তো সৈন্যবাহিনী গড়া যায় না । তার জন্য অনেক খরচ লাগে । সকলকে খাওয়াতে হয় । অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হয় । সে-টাকা আমাদের কে দেবে ? এতদিন আমরা গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে চাল-ডাল চেয়ে-চেয়ে এনেছি । কিন্তু ভিক্ষে চেয়ে-চেয়ে তো সৈন্যবাহিনী চালানো যায় না । খাদ্য না থাকলে, অস্ত্র না থাকলে আমাদের মনোবল নষ্ট হয়ে যাবে। সেইজন্যই আমি বলছি, তোমরা যে-যার গ্রামে ফিরে যাও । নিজের গ্রাম রক্ষা করার চেষ্টা কর । আর কারও যদি যুদ্ধ করার সাধ থাকে, তা হলে নবাবের বাহিনীতে যোগ দিতে পার । মুর্শিদাবাদে গেলেই এখন সৈন্যবাহিনীতে ঢোকার সুযোগ পেয়ে যাবে । আমি এবার তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব ।'
একজন বলল, 'এতদিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম । এখন ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে খারাপ লাগছে ।'
অন্য একজন বলল, 'বন্ধু, তোমার কাছ থেকেই আমরা লড়াই করা শিখেছি । তোমার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না ?'
বন্ধু গুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে একে-একে সবাইকে আলিঙ্গন করলেন । তারপর বললেন, 'যদি কখনও বুঝি যে, আবার আমাদের দল গড়ার দরকার, তোমাদের ঠিক ডাক দেব। তখন আবার দেখা হবে ।'
একটি কিশোর ছলছল চোখে বলল, 'বন্ধু, রাকাদিদি কোথায় গেল ?'

বন্ধু গুপ্ত ছেলেটির কাঁধে হাত রাখলেন । কোনও উত্তর দিতে পারলেন না । তাঁরও চোখ ভিজে আসছে ।

সহসা তিনি তাঁর সাদা ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে উঠে জোরে ছুটিয়ে দিলেন । কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি মিলিয়ে গেলেন অন্ধকারে ।

পরের দিন জঙ্গল ছেড়ে একে-একে চলে গেল সবাই । বাঁকা চৌধুরীও ফিরলেন নিজের গ্রামে । সে-গ্রামের কেমন যেন নিরানন্দ চেহারা । অনেকেই চলে গেছে ইংরেজদের নতুন শহর কলকাতায় । জমিদার বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে ।

বাঁকা চৌধুরীর স্ত্রী-পুত্র ছিল না । চেনাশোনারাও অনেকে গ্রামে নেই ।

গ্রামে তাঁর মন টিকল না ।

বাংলার এই সব গ্রামে বাইরের কোনও খবরই প্রায় আসে না । বর্গিদের সঙ্গে নবাব-বাহিনীর কোথায় লড়াই হচ্ছে, তা কেউ জানে না । শুধু আশেপাশের গ্রামে বর্গির হামলা হয়েছে কি না, সেইটুকু সম্পর্কেই লোকের কৌতূহল ।

বাঁকা চৌধুরী গ্রামের বাইরের জগৎটাকে একবার জেনেছেন, তাই তিনি এত ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আর আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন না । তাঁর বাড়ির উঠোনে, অনেকটা মাটির তলায় একটা বাক্সে বেশ কিছু মোহর লুকিয়ে রাখা ছিল, একদিন রাত্তিরে সেইগুলো তুলে নিলেন । তারপর যাত্রা করলেন মুর্শিদাবাদের দিকে ।

বাঁকা চৌধুরীর কোমরটা বাঁকা, বয়েসও হয়েছে, তাঁকে সৈন্য বাহিনীতে নেবে না। তিনি মুর্শিদাবাদে এসে একটা ঘর ভাড়া নিলেন । গঙ্গার ধারে ছোট একটা বাড়ি । পাশ দিয়েই একটা রাস্তা গেছে, সেখান দিয়ে বহু রকমের মানুষ ও গাড়ি-ঘোড়া চলাচল করে, অনেকরকম কথা শোনা যায় । নবাব-বাড়ি এখান থেকে খুব দূর নয় । এই পথ দিয়েই নবাব বাড়ির লোকেরা কাটরার মসজিদের দিকে যায় ।

বালাজি বাজিরাও আর নবাব আলিবর্দির মিলিত সৈন্যদের সঙ্গে বর্গিদের জোর লড়াই চলছে । মাঝে-মাঝে যখন কোনও একটা যুদ্ধে বর্গিদের পরাজয়ের খবর আসে, তখন রাজধানীতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায় । আবার কখনও বর্গিরা জেতে ।

বাঁকা চৌধুরী এখানে এসে রাকার খোঁজ করতে লাগলেন ।

একজন খোঁড়া সিপাহি রোজ বিকেলবেলা গঙ্গার ধারে বসে গল্প জমায়, অনেকে ভিড় করে শোনে । সিপাহিটির একটা পা খোঁড়া তো বটেই, তা ছাড়াও সারা গায়ে অনেক অস্ত্রের দাগ । সে যে কত বীরত্বের সঙ্গে কত জায়গায় লড়াই করেছে, সেইসব গল্প শোনায় । তার গল্প শুনলে মনে হয়, একা এই সিপাহিটির জন্যেই নবাব আলিবর্দি অনেক যুদ্ধ জিতেছেন । বাঁকা চৌধুরী তার গল্প শোনার জন্য একপাশে বসে থাকেন ।

একদিন সিপাহিটি বলল, 'এই তো সেদিন বর্ধমানের রানীদিঘির ধারে নবাব আলিবর্দিকে বর্গিরা বন্দি করেছিল, আমিই তো তাঁকে উদ্ধার করলাম । আমি একা তলোয়ার চালাতে-চালাতে বর্গিদের শিবিরে ঢুকে গেলাম .... ।'

বাঁকা চৌধুরী মজা পেয়ে বললেন, 'তাই নাকি, সিপাহিজি ! তবে তো আপনার খুব সাহস ! কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম, লাল কাপড়ে মুখ ঢাকা কে একজন নাকি ভাস্কর পণ্ডিতকে জব্দ করেছিল ?'

সিপাহিটি বলল, 'হ্যাঁ, লাল কাপড়ের মুখোশপরা একটা দস্যু এসেছিল বটে। সে বর্গিদের দলে না গিয়ে নবাবের দলেই ছিল । তবে, নবাব আর তাঁর নাতিকে আমিই দিঘির অন্য পাড়ে নিয়ে গেছি !'

বাঁকা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই মুখোশপরা দস্যুটা কোথায় গেল ? সে নবাবের সঙ্গে আসেনি ?'

সিপাহিটি বলল, 'নাঃ, দস্যুরা তো বনে-জঙ্গলে থাকে। তারা কি রাজধানীতে আসে ?'

বাঁকা চৌধুরী তবু বললেন, 'দস্যুটা কে, কোথায় গেল, তাও জানেন না ?'

সিপাহিটি বলল, 'আমি শুনেছি, ওই লোকটার নাম কেউ জানে না । অনেকে ওকে বলে 'অন্ধকারের বন্ধু' । তার মানে কী, কে জানে ! ওই দস্যুটা দলবল নিয়ে বর্গিদের শিবিরে ঢুকে পরেছিল । তারপর একদল বর্গি ওদের তাড়া করে যায় ।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'তারপর ? তারপর ?'

সিপাহিটি বলল, 'নবাব আলিবর্দি নিরাপদ জায়গায় পৌঁছবার পরেই বললেন, 'লাল কাপড়ে মুখ ঢাকা লোকটি কোথায় গেল ? তাকে নিয়ে এস আমার কাছে । দেখ, যেন সে কিছুতেই বর্গিদের হাতে ধরা না পড়ে ।' তখন আমরা প্রায় একশোজন সৈন্য ছুটে গেলাম সেই লোকটাকে খুঁজতে ।'

'তারপর ? তারপর ?'

'এক জায়গায় দেখি, বর্গিরা কয়েকজনকে তাড়া করে যাচ্ছে । আমরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাদের ওপরে । খুব লড়াই হল । কতজন মারা পড়ল । কয়েকজনকে আমরা বন্দি করে নিয়ে এলাম । তাদের মধ্যে সেই লাল মুখোশ-পরা লোকটা অবশ্য ছিল না ।'

'সিপাহিজি, যাদের বন্দী করে আনলে, তাদের মধ্যে কি একটি মেয়ে ছিল ?'

'মেয়ে ? না, কোনও মেয়ে-টেয়ে তো ছিল না ।'

'তোমার ঠিক মনে আছে ?'

'তুমি বাপু কী বাজে কথা বকছ । রণক্ষেত্রে আবার মেয়ে আসবে কি করে ?'

বাঁকা চৌধুরী একটা নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন । তাঁর ক্ষীণ আশা ছিল যে, রাকা হয়তো বর্গিদের হাতে কিংবা নবাবের সৈন্যদের হাতে বন্দি হয়েও থাকতে পারে । তাও নেই ? তবে কি সে মরেই গেল !

প্রায়ই নানারকম যুদ্ধের খবর আসে । ফকির-দরবেশ-বাউলরাও অনেক খবর আনে । তার মধ্যে একটা অদ্ভুত কাহিনীও শোনা যায় । কোথাও কোনও শিশু কিংবা নারীর ওপর যখন সৈন্যরা অত্যাচার করতে চায়, তখনই যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে

এক অশ্বারোহী, লাল কাপড়ে তার সারা শরীর ঢাকা। তাকে দেখলেই অত্যাচারীরা অজ্ঞান হয়ে যায়।

বাঁকা চৌধুরী বুঝতে পারেন, এই সব কাহিনীর কিছুটা নিশ্চয়ই সত্য। অর্থাৎ বন্ধু গুপ্ত চুপচাপ বসে নেই। তিনি এখনও নারী ও শিশুদের উদ্ধার করে চলেছেন।

নবাবের প্রাসাদ থেকে মাঝে-মাঝে দল বেঁধে অনেকে আসে নদীতে সাঁতার কাটতে। তাদের মধ্যে বাঁকা চৌধুরী দেখতে পান আলিবর্দির নাতি সিরাজকে। সিরাজ সাঁতার জানে না। দু-তিনজন মিলে তাকে শেখায়। সিরাজের একজন অনুচর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনও জলে নামে না। তার পরনে মখমলের পোশাক, নাকের নিচে বাঁকা তলোয়ারের মতন গোঁফ, থুতনিতে নুর, মাথায় পালক বসানো টুপি।

এক-একদিন রাস্তার মাঝখানেই শখের তলোয়ার খেলা শুরু হয়। সিরাজের সঙ্গে সেই অনুচরটি তলোয়ার-যুদ্ধ শুরু করে। সিরাজ এখনও ভাল করে শেখেনি, সেই তরুণ অনুচরটি ক্ষিপ্রভাবে তলোয়ার নিয়ে সিরাজের চারদিকে ঘোরে আর চেচিয়ে-চেঁচিয়ে বলে, 'আঘাত করো! জোরে! আমার তলোয়ার ছুঁতে পারছ না কেন?'

সেই তরুণ অনুচরটির নাম আজাদ। অনেকে বলে, ভবিষ্যতে সিরাজ যখন হবে নবাব, তখন এই আজাদই হবে তার সেনাপতি!

বাংলার বুকে বালাজি বাজিরাও আর রঘুজি ভোঁসলের ঘোর যুদ্ধ হতে লাগল। বালাজি বাজিরাও এমনি-এমনি বাংলাকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ করছেন না অবশ্য। যুদ্ধের খরচ চালাবার জন্য তিনি নবাব আলিবর্দির কাছ থেকে লক্ষ-লক্ষ টাকা নিচ্ছেন। ক্রমশ রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে এল। জগৎ শেঠও আর টাকা জোগাতে পারছেন না। প্রজাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে লাগলেন নবাব।

কিছুদিন পর বর্গিরা পিছু হটতে লাগত। সম্মুখ যুদ্ধে তারা আর এঁটে উঠল না, তাদের দলে অনেকে হতাহত হল। শেষ পর্যন্ত রঘুজি ভোঁসলে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল।

ভবিষ্যতে যাতে আর অশান্তি না হয়, সেইজন্য মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করলেন নবাব আলিবর্দি। প্রচুর টাকা খেসারত দিলেন। বাজিরাওকেও আরও অনেক টাকা দিয়ে খুশি করলেন।

সকলের ধারণা হল, এবার বুঝি মিটল বর্গির উৎপাত। তাও মিটল না।

রঘুজি ভোঁসলে পালিয়ে গেলে কী হবে, তার সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিত লুকিয়ে রইল এক জায়গায়। এই অতি দুঃসাহসী মানুষটি যেন হার মানতে জানেই না। বাংলাকে সে লুটেপুটে শেষ করবেই।

সকলেই যখন ভাবল যে শান্তি এসে গেছে, তখনই আবার শুরু হল ভাস্কর পন্ডিতের ঝটিকা আক্রমণ। একদল অকুতোভয় বর্গি সৈন্য রয়ে গেছে তার সঙ্গে,

তারা ভাস্কর পন্ডিতের হুকুম তামিল করা ছাড়া আর কিছুই জানে না। ভাস্কর পন্ডিতের কথায় তারা যখন-তখন প্রাণ দিতে পারে।

ভাস্কর পন্ডিত ও তার দলবলের অত্যাচারে আবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠল বাংলার মানুষ। বাজিরাওয়ের সৈন্যরা বাংলা ছেড়ে চলে গেছে, নবাব আলিবর্দি নিজের বাহিনী নিয়ে শত চেষ্টা করেও ভাস্কর পন্ডিতকে শায়েস্তা করতে পারলেন না।

তখন আলিবর্দি ভাবলেন, যুদ্ধে যাকে জয় করা যায় না, তাকে জয় করতে হবে কৌশলে। টাকা-পয়সা লুটপাট করার দিকেই ভাস্কর পন্ডিতের ঝোঁক। ওকে যদি একসঙ্গে অনেক টাকা দিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে কি লুটপাট বন্ধ করবে? কিংবা, ওকে যদি বলা যায়, অন্য যারা এসে বাংলা আক্রমণ করবে, তুমি তাদের আটকাবে, এর জন্য তুমি কত টাকা চাও, বল!

এই সব প্রস্তাব আলোচনা করার জন্য আলিবর্দি তাঁর এক দূতকে পাঠালেন ভাস্কর পন্ডিতের কাছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ভাস্কর পন্ডিত রাজিও হয়ে গেল।

মুর্শিদাবাদ থেকে খানিকটা দূরে মানকরা নামে একটা জায়গায় স্থাপিত হল শিবির। কয়েকজন মাত্র সহচরকে নিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় ভাস্কর পন্ডিত আসবে সেই শিবিরে। আলিবর্দি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কোনও ক্রমেই তিনি ভাস্কর পন্ডিতকে বন্দি করবেন না। সেখানে শুধু দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হবে।

সেই খবর শুনে খুব দুঃখিত হলেন বাঁকা চৌধুরী। একজন নিষ্ঠুর, খুনি অত্যাচারী ডাকাতের সঙ্গে আলোচনা? বাংলার নবাব এত দুর্বল হয়ে গেছেন? কী লজ্জা, কী লজ্জা!

আলোচনার ফল কী হয়, তা জানার জন্য বাঁকা চৌধুরী রওনা দিলেন মানকরার দিকে।

একটা বিশাল শিবির স্থাপিত হয়েছে সেখানে। নানারকম জরির কাজ দিয়ে সাজান। চারদিকে প্রহরী, অন্য মানুষজনকে কাছে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। নবাব আলিবর্দি তাঁর প্রিয় নাতি সিরাজকে নিয়ে আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছেন।

ঠিক বেলা বারোটার সময়ে তিনজন সঙ্গী নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হল ভাস্কর পন্ডিত। কারোর কোমরবন্ধে তলোয়ার নেই, অন্য কোনও অস্ত্রও নেই। তবু নবাবের এক সেনাপতি তাদের পোশাকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল।

সুন্দর আসন সাজান রয়েছে তাদের জন্য। সেই আসনে বসবাব পর প্রত্যেককে দেওয়া হল বাংলার মিষ্টি ও মোগলাই শরবত। একটু পরে আলিবর্দি তাঁর নাতিকে নিয়ে প্রবেশ করে বিপরীত দিকে আসন গ্রহণ করলেন।

নবাব আলিবর্দি তাকালেন ভাস্কর পন্ডিতের দিকে। এরা পরস্পরের ঘোর শত্রু, বহুকালের প্রতিদ্বন্দ্বী। তবু দু'জনেই হাসলেন। আলিবর্দির লম্বা, রোগা চেহারা, চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। আর ভাস্কর পন্ডিত যেন এক বিশালকায় দৈত্য, ঠোঁটের কোণে অহঙ্কারের হাসি। ভাস্কর পন্ডিত একজন সেনাপতি মাত্র। আর আলিবর্দি

বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব, কত তাঁর সম্মান, তবু তিনি ভাস্কর পন্ডিতকে নিজের সমান মর্যাদা দিয়ে আলোচনায় ডাকতে বাধ্য হয়েছেন ।

একটি কথাও শুরু করার আগে এক অত্যাশ্চার্য কান্ড হল ।

শিবিরের একপাশের বনাত ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল একজন মানুষ । শুধু চোখ দুটি ছাড়া তার মুখ টকটকে লাল কাপড়ে ঢাকা । পরনেও ওইরকম লাল কাপড় । সে প্রথমেই নবাব আলিবর্দির দিকে ফিরে কুর্নিশ করল ।

আলিবর্দি বললেন, 'এ কি ? তুমি ? তুমি তো সেই ? বর্ধমানে .....'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'আমায় চিনতে পেরেছেন । সেই তো আমার সৌভাগ্য ! আমি ধন্য হয়েছি !'

আলিবর্দি বললেন, 'কিন্তু তুমি .... তুমি এসময়ে এখানে কি করে এলে ?'

ভাস্কর পন্ডিত ক্রুদ্ধভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আলোচনা সভায় এই দস্যুটাকেও আমন্ত্রণ জানান হয়েছে ! তা হলে আমি এখানে থাকব না !'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'বোস, বোস হে ভাস্কররাম কোলহাতকার পন্ডিত ! অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ! না, আমাকে কেউ আমন্ত্রণ জানায়নি । আমি এমনিই এসেছি ।'

তারপর তিনি নবাবের দিকে ফিরে বললেন, 'এ আপনি কী করেছেন ! এই অত্যাচারী, খুনি ভাস্কর পন্ডিতের সঙ্গে আলোচনার কি কোনও মূল্য আছে ? এর প্রতিশ্রুতির কি কোনও দাম আছে ? আজ আপনি কয়েক লক্ষ মুদ্রা দিয়ে সন্ধি করবেন, এক মাস পরেই এই ভাস্কর পন্ডিত আবার বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আপনার কাছ থেকে টাকা নেবে, আবার বাংলার গ্রামও লুন্ঠন করবে । ওই পাপীটাকে আপনি বিশ্বাস করেন !'

ভাস্কর পন্ডিত বলল, 'তা হলে আলোচনার কোনও দরকার নেই। আমি চললাম ।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'বোস, বোস, অত ব্যস্ততা কিসের ?'

নবাবের দিকে ফিরে বললেন, 'এই ভাস্কর পন্ডিত আপনার সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে কেন জানেন ? যুদ্ধ করতে-করতে ওর বর্গিসৈন্যরা এখন ক্লান্ত । অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে গেছে । এই মুহূর্তে বড়রকম আক্রমণ করার ক্ষমতাই ওদের নেই । এই সময় আপনি ওদের ডাকলেন সন্ধির জন্য ? ওরা রাজি হয়ে যাবে । তারপর একমাস-দু'মাস সময় পেয়ে আবার চাঙা হয়ে উঠে আক্রমণ করবে !'

নবাব আলিবর্দি হতবাক হয়ে গেলেন । তিনি বুঝতে পারলেন না, এই ছদ্মবেশী লোকটি যা বলছে, তার মধ্যে সত্যতা আছে ।

ভাস্কর পন্ডিত ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'দস্যু, তুই তোদের নবাবকে যা খুশি বোঝা । আমি চললাম ! আবার রণক্ষেত্রে দেখা হবে !'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'রণক্ষেত্রের দরকার কি ? তোমার সঙ্গে আমার একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ অসমাপ্ত রয়েছে, মনে নেই ?সেটা এখানেই হোক না । আমি যদি হারি, তা হলে তুমি নবাবের সঙ্গে যেমন খুশি সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে পারবে ! কী, রাজি ?'

ভাস্কর পন্ডিত নিজের বাম বাহুতে ডান হাত ছোঁয়াল। আগেরবার বন্ধু গুপ্ত সেখানে আঘাত করেছিল, এখনও ক্ষতচিহ্ন আছে। সেই ক্ষতচিহ্ন স্পর্শ করে ভাস্কর পন্ডিত ক্রোধে জ্বলে উঠল।

রক্তবর্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ রাজি! কিন্তু আমার অস্ত্র কই?'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'অস্ত্র অবশ্যই দেওয়া হবে। আমি কি কখনও নিরস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করি? যে-কোনও অস্ত্র তুমি বেছে নাও!'

বন্ধু গুপ্ত এবার একটা হাততালি দিতেই একজন লোক সাতখানা তলোয়ার নিয়ে এল। ছোট-বড় নানারকমের আকৃতি। ভাস্কর পন্ডিত তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টাই তুলে নিল নিজের হাতে।

ভাস্কর পন্ডিতের সহচররা বলল, 'আমাদেরও অস্ত্র দিতে হবে।'

নবাব আলিবর্দি বললেন 'না, তা হতে পারে না। এটা তো দু'পক্ষের যুদ্ধ নয়। একজনের সঙ্গে আর-একজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমরা নিরপেক্ষ বিচারক হব।'

ভাস্কর পন্ডিত নিজের বেছে-নেওয়া তলোয়ারটা ধার পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে সেই তলোয়ারে একটা চুম্বন করল। তারপর মুখ তুলে বন্ধু গুপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয় দস্যু, আজ তোর যুদ্ধসাধ চিরতরে মিটিয়ে দেব!'

বন্ধু গুপ্ত হেসে বললেন, 'ভাল কথা! এ শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। আজ জীবন-মরণ খেলা। একজনের জয়, অন্যজনের মৃত্যু। আমি মরলে কিছুই আসবে-যাবে না। আমি একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তুমি, ভাস্কর পন্ডিত, বর্গিদের সেনাপতি। আমি জানি, তুমি মরলে আর কোনও বর্গিসৈন্য এ-দেশে থাকতে সাহস পাবে না।'

বন্ধু গুপ্তর কথা শেষ হতে-না-হতেই ভাস্কর পন্ডিত লাফিয়ে এসে বন্ধু গুপ্তর তলোয়ারের ওপর আঘাত করল। এতই জোর সেই আঘাত যে, বন্ধু গুপ্ত পিছিয়ে গেলেন অনেকটা। তারপরেই যেন তাঁর মুখে একটা আগুন জ্বলে উঠল। প্রতিহিংসার আগুন! সমগ্র বাংলার বর্গিরা যে অত্যাচার করেছে, তার বিরুদ্ধে একক প্রতিবাদ।

পরের মুহূর্ত থেকেই বন্ধু গুপ্ত কোণঠাসা করতে লাগলেন ভাস্কর পন্ডিতকে। যেন এক অলৌকিক শক্তি ভর করেছে বন্ধু গুপ্তর বাহুতে। তিনি নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী। ভাস্কর পন্ডিত লোভী এবং ক্রূর। বন্ধু গুপ্তকে ঘিরে আছে বহু বঞ্চিত মানুষের ভালবাসা আর ভাস্কর পন্ডিতের চোখে শুধুই স্বার্থপরতা।

বেশি সময় লাগল না বন্ধু গুপ্তর চকিত আঘাতে ভাস্কর পন্ডিতের হাতের তলোয়ার পড়ে গেল অনেকটা দূরে। ভাস্কর পন্ডিত একদিকের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দু'হাত তুলল। তার আর নিস্তার নেই।

এই সময়ে ভাস্কর পন্ডিতের বুকে বন্ধু গুপ্তের তলোয়ারটা আমূল বিদ্ধ করে দেওয়াটাই ছিল খুব স্বাভাবিক। কিন্তু বন্ধু গুপ্ত তা করলেন না।

তিনি বললেন, 'ওহে ভাস্কর পন্ডিত, তুমি কত বড় বীর, তা তো বোঝা গেল। তবু, তোমার হাতে অস্ত্র নেই বলে তোমাকে মারতে পারছি না। তোমাকে আর-

একটা সুযোগ দিতে চাই । তুমি অন্য কোনও অস্ত্র নিয়ে কিংবা যে-কোনও উপায়ে আমার সঙ্গে আবার লড়তে চাও ?'

ভাস্কর পণ্ডিতের চোখ জ্বলে উঠল ।

যেন মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসে সে বলল, 'অবশ্যই । তুমি মল্লযুদ্ধ করতে রাজি আছ ?'

বন্ধু গুপ্ত নিজের তলোয়ারটা ফেলে দিয়ে বললেন, 'বেশ, তবে তাই-ই হোক !'

কিন্তু এবার আর-একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল ।

শিবিরের একপ্রান্ত থেকে ছুটে এল এক তরুণ যুবক । সে সিরাজের সহচর আজাদ ।

সে বন্ধু গুপ্তর দিকে তাকিয়ে তীব্র ভৎর্সনার স্বরে বলল, 'ছিঃ ! তুমি এমন পাপীকেও মারতে দ্বিধা কর ?'

তারপর ভাস্কর পণ্ডিতের দিকে ফিরে বলল, 'নরকের কীট, তুমি আর কোনও সুযোগ পাবে না ! তুমি আমাকে চিনতে পার ?'

একটানে খুলে ফেলল মাথার পালক-বসানো টুপি । বেরিয়ে পড়ল গুচ্ছ-গুচ্ছ কোঁকড়ানো চুল । তুলে ফেলল গোঁফ, নুর ।

বন্ধু গুপ্ত অস্ফুটভাবে বললেন, 'রাকা ?'

আর কিছু বোঝবার আগেই রাকা একটা লম্বা ছুরি বের করল তার পোশাকের ভেতর থেকে । সেটা যেন লকলক করছে প্রতিহিংসায় ।

সেটা সে ভাস্কর পণ্ডিতের বুকে আমূল বিঁধিয়ে দিল । অত বড় চেহারা নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে । কয়েকবার হাত-পা ছুঁড়েই—নিঃস্পন্দ হয়ে গেল, স্থির হয়ে গেল দু'চোখ ।

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'এ কী করলে, রাকা ?'

রাকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই লোকটি আমার বাবা-মাকে আমার চোখের সামনে হত্যা করেছে । বর্ধমানে আমার চুল ধরে টেনে তুলেছিল, মনে নেই ? একে আমি নিজের হাতে শাস্তি না দিলে সারা জীবনেও আমার মনের জ্বালা জুড়োত না !'

নবাব আলিবর্দি এতক্ষণে যেন স্তম্ভিত হয়েছিলেন । এবার উঠে এসে বললেন, 'এই মেয়েটি ঠিকই করেছে । একে শেষ না করলে এ-দেশে শান্তি আসত না । কিন্তু তুমি কে, যুবক ? কী তোমার পরিচয় ? বর্ধমানে তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছিলে । আবার এখানে ঠিক সময়ে উপস্থিত হলে । ভাস্কর পণ্ডিতকে তুমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে হারিয়ে আমার মান রক্ষা করেছ । আমি তোমার পরিচয় জানতে চাই । তোমার নাম কি ?'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'আমি একজন সাধারণ মানুষ মাত্র । আমার নাম মোহনলাল । দেশের শত্রুকে বিনাশ করার জন্য আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ।'

আলিবর্দি এগিয়ে এসে বন্ধু গুপ্তর কাঁধে হাত রেখে আবেগের সঙ্গে বললেন, 'তোমায় কী পুরস্কার দেব, বল ? কোনও পুরস্কারই তোমার এই কীর্তির যোগ্য নয় । তবু তুমি কি চাও, বলো ।'

সিরাজ বলল, 'দাদু, ওকে আমাদের সেনাপতি করে নাও !'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'আমি কিছুই চাই না । আমি সেনাপতিও হতে চাই না । আবার যদি এ-দেশে সঙ্কট আসে, বড়রকম কোনও বিপদ ঘটে, আমি এসে দাঁড়াব আপনাদের পাশে । এই অধিকারটুকু আমাকে দিন ।'

বন্ধু গুপ্ত এবার মাটি থেকে ভাস্কর পন্ডিতের নিথর দেহটা দু'হাতে তুলে নিলেন । ভাস্কর পন্ডিতের সহচররা এই ভয়াবহ ঘটনা দেখে আগেই পালিয়েছিল । বন্ধু গুপ্ত ভাস্কর পন্ডিতের দেহটা নিয়ে চলে এলেন শিবিরের বাইরে ।

খানিক দূরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন বর্গি তাদের দিকে ভাস্কর পন্ডিতের দেহটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'এই নে তোদের সেনাপতিকে । মনে রাখিস, ও আমার কাছে যুদ্ধে হারার পর মরেছে !'

শিবিরের এক পাশে অপেক্ষা করছিলেন বাঁকা চৌধুরী । এবার ছুটে এসে বন্ধু গুপ্তকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বন্ধু, বন্ধু তুমি ও কী দারুণ কান্ড করলে ? ভাস্কর পন্ডিত শেষ । রাকা, রাকা বেঁচে আছে ! আজ আমার কী আনন্দের দিন !'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'চৌধুরীমশাই, এবার আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন । সেনাপতিহীন বর্গিরা হামলা করতে সাহস পাবে না । ওই ভাস্কর পন্ডিতই ছিল যত নষ্টের গোড়া ।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'তুমি এবার কোথায় যাবে, বন্ধু !'

বন্ধু গুপ্ত হেসে বললেন, 'আমি অন্ধকারের বন্ধু, অন্ধকারে মিলিয়ে যাব ।'

বাঁকা চৌধুরী জোর দিয়ে বলে উঠলেন, 'না, না, তুমি মোটেই অন্ধকারের মানুষ নও ! তুমি তো অন্ধকার দুঃসময়ে মানুষের বন্ধু । তুমি আলোর মানুষ !'

তারপর তিনি রাকার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাকা, তুমি কোথায় যাবে ?'

রাকা বলল, 'এ-দুনিয়ায় আমার কেউ নেই । এতদিন নবাবের বাড়িতে পুরুষের ছদ্মবেশে ছিলাম । এখন সবাই জেনে গেল যে, আমি মেয়ে । এখন আর ওখানে থাকা সম্ভব নয় ।'

বন্ধু গুপ্ত বললেন, 'চৌধুরীমশাই, আপনি রাকার দেখাশোনা করবেন ।'

বাঁকা চৌধুরী বললেন, 'তা হয় না । আমার বয়স হয়েছে । আমি আর কত দিন বাঁচব, ঠিক নেই । বন্ধু, তুমি রাকাকে সঙ্গে নিয়ে যাও । এমন এক তেজস্বিনী মেয়েকে হারিয়ে যেতে দিও না ।'

বন্ধু গুপ্ত রাকার দিকে তাকালেন । রাকা কোনও কথা বলল না । খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধু গুপ্তর সাদা ঘোড়া রাকা সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ঘোড়াটায় চড়ে বসল ।

বন্ধু গুপ্ত এক লাফে সেই ঘোড়ায় চেপে হাত তুলে বললেন, 'আবার দেখা হবে !'

ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করল । একটু পরেই রাকা আর বন্ধু গুপ্তকে নিয়ে সেই সাদা ঘোড়া মিলিয়ে গেল দিগন্তে ।

জঙ্গলগড়ের চাবি

১

মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে আজ সকালে। রাস্তা থেকে হকার খবরের কাগজটা ছুড়ে দিয়ে গেছে একটু আগে, সেটা পড়ে আছে দোতলার বারান্দার কোণে।

সন্তু কিন্তু ঘুমিয়ে আছে এখনও। আজ যার রেজাল্ট বেরুবার কথা, তার কি এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা উচিত? একটু চিন্তা-ভাবনা নেই?

আসলে সন্তু সারারাত প্রায় ঘুমতেই পারেনি। ছট্‌ফট্ করেছে বিছানায় শুয়ে। মাঝে-মাঝে উঠে জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখছে ভোর হল কিনা। বুকের মধ্যে টিপ-টিপ শব্দ। ভয়ে সে সত্যি সত্যি কাঁপছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, পরীক্ষা দেবার সময় সন্তুর একটুও ভয় হয়নি, তারপর যে তিন মাস কেটে গেল তখনও একদিনের জন্য কোনও ভয়ের চিন্তা মনে আসেনি। কাল সন্ধেবেলা সুমন্ত যেই বলল, 'জানিস্, আজই রেজাল্ট আউট হতে পারে!' তারপর থেকেই সন্তুর বুক-কাঁপা শুরু হয়ে গেল। যদি সে ফেল করে!

সব কটা পরীক্ষায় মোটামুটি ভালই সব প্রশ্নের উত্তর লিখেছে সন্তু। কিন্তু কাল রাত্তিরেই শুধু তার মনে হল, যদি উত্তরগুলো উল্টোপাল্টা হয়ে যায়? অঙ্কগুলো যদি সব ভুল হয়? অঙ্কের পেপারের সব উত্তর সন্তু মিলিয়ে দেখেছে বটে, কিন্তু মাঝখানের প্রসেসে যদি কিছু লিখতে ভুল হয়ে থাকে?

ফেল করলে যে কি লজ্জার ব্যাপার হবে, তা সন্তু ভাবতেই পারছিল না। বন্ধুরা সব এগারো-বারোর কোর্স পড়তে চলে যাবে। আর সে পড়ে থাকবে পুরনো ক্লাসে! নিচু ক্লাসের বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে পড়তে হবে তাকে? সন্তু ফেল করলে মা-বাবা-কাকাবাবু-ছোড়দিরা সবাই সন্তুর দিকে এমন অবহেলার চোখে তাকাবেন, যেন সন্তু একটা মানুষই নয়!

ফেল করার সবচেয়ে খারাপ দিক হল, তা হলে আর কাকাবাবু নিশ্চয়ই তাকে অন্য কোনও অভিযানে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না! বাবা বলবেন, পড়াশুনো নষ্ট করে পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান? কক্ষনও চলবে না।

এই সব ভাবতে ভাবতে, সারা রাত ছট্‌ফটিয়ে, শেষ পর্যন্ত এই ভোরের একটু আগে সন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাকাবাবু ছাড়া এ বাড়িতে সবাই একটু দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে। তাছাড়া ভূপাল থেকে ছোড়দি বেড়াতে এসেছে বলে কাল অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হয়েছে। আজ

আবার রবিবার। কারুর উঠবার তাড়াও নেই। সন্তু কাল রাত্তিরে কারুকে বলেওনি যে আজ তার রেজাল্ট বেরুবে।

কাকাবাবু ভোরবেলা উঠে বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন।

প্রথমে ঘুম ভাঙল ছোড়দির।

বিয়ের আগে ছোড়দিই সকালবেলা চা তৈরি করে বাবা আর মাকে ঘুম থেকে তুলত। আজও ছোড়দিই চা বানিয়ে এনে ঠিক সেই আগের মতন বাবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'চা কিন্তু রেডি!'

বাবা চায়ের টেবিলে এসেই অভ্যাস মতন বললেন, 'খবরের কাগজটা কই রে?'

ছোড়দি বারান্দাটা ঘুরে দেখে এসে বলল, 'এখনও কাগজ দেয়নি!'

আসলে হয়েছে কী, বারান্দায় কয়েকটা ফুলগাছের টব আছে তো। তারই একটা টবের পেছনে গোল করে বাঁধা কাগজটা লুকিয়ে আছে।

চা পানের সময় কাগজ পড়তে না পারলে বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তিনি বিরক্তভাবে বললেন, 'কি যে হয়েছে আজকাল সব ব্যবস্থা, ঠিক সময়ে কাগজ আসে না। আর এক কাপ চা কর!'

মা বললেন, 'সন্তু এখনও ওঠেনি? ওকে ডাক্।'

ছোড়দি বলল, 'ডাকছি। সন্তু কি এখনও সকালে দুধ খায়, না অন্য কিছু খায়?'

মা বললেন, 'পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে ওরও এখন ওর কাকার মতন খুব চা খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। শুধু দুধ খেতে চায় না!'

ছোড়দি আবার চায়ের জল চাপিয়ে ডাকতে গেল সন্তুকে।

বাড়িতে বেশি লোকজন এলে সন্তুর পড়াশুনোর অসুবিধে হয়। সেই জন্য এখন সন্তুকে ছাদের ঘরটা একলা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানেই সে রাত্তিরে ঘুমায়।

ডাকতে এসে ছোড়দি দেখল সন্তুর চোখ দুটো বোজা থাকলেও দুটো জলের রেখা নেমে আসছে চোখের তলা দিয়ে। বুকটা মুচড়ে উঠল ছোড়দির। আহা রে, ছেলেটা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কোনও দুঃখের স্বপ্ন দেখছে।

সন্তুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে ছোড়দি ডাকল, 'এই সন্তু, সন্তু! ওঠ্!'

দু'বার ডাকতেই, সন্তু চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু কোনও কথা বলল না।

ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে রে? মুখখানা এমন কেন? কি স্বপ্ন দেখছিলি?

এবারেও সন্তু কোনও উত্তর দিল না। মনে মনে বলল, আজকের সকালের পর আর তাকে কেউ ভালবাসবে না।

ছোড়দি আদর করে সন্তুর হাত ধরে উঠিয়ে দিয়ে বলল, 'অমন শুকনো মুখ করে আছিস কেন? চল্ নিচে চল।'

হঠাৎ সন্তুর মনে পড়ল, আজ রবিবার। আজ তো স্কুল খোলা থাকবে না। রেজাল্ট তো আনতে হবে স্কুল থেকে। তা হলে আর একটা দিন সময় পাওয়া গেল। কালকের আগে তার রেজাল্ট জানা যাবে না।

দ্বিতীয় কাপ চা পেয়ে বাবা বললেন, 'আঃ এখনও কাগজ এল না?'

ছোড়দি বলল, 'দেখছি আর একবার।'

ছোড়দি ছুটে গেল বারান্দায়।

সন্তুর জন্য মা স্পেশাল চা বসিয়ে দিয়েছেন। অনেকখানি দুধের মধ্যে একটুখানি চা। তাও কাপে নয়, বড় গেলাসে। সেই গেলাসটা ধরে সন্তু গোঁজ হয়ে বসে আছে।

এবারে ছোড়দি টবের আড়াল থেকে কাগজটা পেয়ে গেল। সুতো খুলে প্রথম পাতাটা পড়তে-পড়তে এগিয়ে এসে বলল, 'আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে!'

সন্তু যেন পাথর হয়ে গেছে, তার নিঃশ্বাস বন্ধ।

মা বললেন, 'তাই নাকি? এই সন্তু, তোদের আজ রেজাল্ট বেরুবে, তুই জানতিস না?'

সন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে থেকে এমনভাবে একটু আস্তে মাথা নাড়ল যার মানে হ্যাঁ-ও হয় না-ও হয়।

বাবা বললেন, 'তোর রেজাল্ট তো স্কুলে আসবে! এক্ষুনি স্কুলে চলে যা!'

সন্তু খসখসে গলায় বলল, 'আজ রবিবার!'

ছোড়দি বলল, 'আমাদের সময় তো কলেজ স্ট্রিটে রেজাল্ট ছাপা বই বিক্রি হত। এখন হয় না?

বাবা বললেন, 'কী জানি! কিন্তু রবিবার হলেও আজ ইস্কুল খোলা রাখবে নিশ্চয়ই। ছেলেরা রেজাল্ট আনতে যাবে না?'

ছোড়দি বলল, 'এই তো ফার্স্ট বয় আর ফার্স্ট গার্লের ছবি বেরিয়েছে। ফার্স্ট হয়েছে সৌমিত্র বসু, নরেন্দ্রপুর। আর মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে কাকলি ভট্টাচার্য, বীরভূম। সেকেন্ডেরও নাম দিয়েছে। ওমা, এক সঙ্গে দু'জন সেকেন্ড হয়েছে, ব্র্যাকেটে, অভিজিৎ দত্ত আর সিদ্ধার্থ ঘোষ। সন্তু, তুই এদের কারুকে চিনিস নাকি রে?'

সন্তুর উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। এক্ষুনি যেন তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে। ক্রমশই তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যাচ্ছে যে, সে ফেল করেছে!

কান্না লুকোবার জন্য সন্তু বাথরুমে ছুটে চলে গেল।

ছোড়দির কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে নিলেন বাবা। অন্য খবরের বদলে তিনি রেজাল্টের খবরটাই পড়তে লাগলেন মন দিয়ে। খবরের কাগজের লোকেরা কি করে আগে থেকে খবর পেয়ে যায়? কালকের রাত্তিরের মধ্যেই ফার্স্ট হওয়া ছেলেমেয়েদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে হাজির হয়েছে, ছবি তুলেছে, তাদের বাবা-মায়ের ইন্টারভিউ নিয়েছে। কাকলি ভট্টাচার্যের মা বলেছেন, তাঁর মেয়ে লেখাপড়াতেও যত ভাল, খেলাধুলোতেও তত। অনেক মেডেল পেয়েছে।

কাগজ পড়তে-পড়তে বাবা হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, 'এঃ রাম!'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল?'

বাবা বললেন, 'দেখেছ কান্ড! আমাদের সন্তুটা ফিফ্থ হয়েছে।'

মা আর ছোড়দি দু'জনেই এক সঙ্গে চমকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ? কি বললে?'

বাবা বললেন, 'এই তো প্রথম দশজনের নাম দিয়েছে। তার মধ্যে দেখছি সন্তুর নাম।'

মা আর ছোড়দি ততক্ষণে দু'পাশ দিয়ে কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

মা বললেন, 'কই কই?'

ছোড়দি বলল, 'এই তো, সুনন্দ রায়চৌধুরী। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল!'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ আমাদের সন্তুই তো?'

মা বললেন, 'তবে আবার কে হবে! ওর নাম রয়েছে, স্কুলের নাম রয়েছে ... সন্তু, এই সন্তু, কোথায় গেলি?'

বাবা বললেন, 'ওদের স্কুলে ওই নামে অন্য কোনও ছেলে নেই তো?'

মা বললেন, 'আহা-হা! অদ্ভুত কথা তোমার। ওদের ক্লাসে ঠিক ওই নামে আর কেউ থাকলে সন্তু আমাদের এতদিন বলত না? সন্তু, কোথায় গেল! এই সন্তু —'

বাবা কাগজটা সরিয়ে রেখে দিয়ে বললেন, 'ছি ছি!'

মা দারুণ অবাক হয়ে গেলেন। চোখ বড় বড় করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তার মানে? ছেলে এত ভাল রেজাল্ট করেছে। আর তুমি বলছ ছি ছি?'

বাবা বললেন, 'ফিফ্থ হল। ফার্স্ট হতে পারল না?'

মা বললেন, 'ফিফ্থ হওয়াই কি কম নাকি? যথেষ্ট ভাল করেছে। আমি তো আশাই করিনি —'

বাবা বললেন, 'যে ফিফ্থ হতে পারে, সে আর একটু মন দিয়ে পড়লে ফার্স্টও হতে পারত।'

ছোড়দি বলল, 'ভাল হয়েছে সন্তু ফার্স্ট হয়নি। ও ফার্স্ট হলে সৌমিত্র বসু সেকেন্ড হত! তা হলে তার বাবার মনে দুঃখ হত না?'

মা বললেন, 'ছেলেটা বাথরুমে ঢুকে বসে রইল, নিশ্চয়ই এখনও কিছুই জানে না! এই মুন্নি, ওকে ডাক না।'

ছোড়দি ছুটে গিয়ে, 'বাথরুমের দরজায় দুম্-দুম্ করে কিল মেরে বলল, 'এই সন্তু, সন্তু!'

সন্তু কোনও সাড়া দিল না।

ছোড়দি বলল, 'শিগ্‌গির বের! কি বোকার মতন এতক্ষণ বাথরুমে বসে আছিস!'

সন্তুর ইচ্ছে, সে আজ, সারাদিন আর বাথরুম থেকে বেরুবে না। এইখানেই বসে থাকবে।

'দরজা খোল না। কি হয়েছে জানিস? কাগজে বেরিয়েছে, তুই ফিফ্থ হয়েছিস!'

একটা পিংপং বল্ যেন সন্তুর বুকের মধ্যে নাচানাচি করতে লাগল। কি বলল ছোড়দি? সে ভুল শোনেনি তো।

খটাস্ করে বাথরুমের দরজা খুলে সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে?'

'তুই ফিফ্থ হয়েছিস!'

'ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে?'

'কাগজে নাম ছাপা হয়েছে তোর। দেখবি আয় বোকারাম!'

ফিফ্থ হওয়ার ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দিল না সন্তু। তার মানে সে পাশ করেছে? সত্যি সত্যি পাশ! ইস্কুলের পড়া শেষ!

সন্তু ছুটে গেল কাগজ দেখতে।

সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠল। সন্তুর এক মামা ফোন করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাগজে মাধ্যমিকের রেজাল্টে এক সুনন্দ রায়চৌধুরীর নাম দেখছি। ওকি আমাদের সন্তু নাকি?'

ছোড়দি বলল, 'হ্যাঁ! বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের নামও তো রয়েছে পাশে।'

মামা বললেন, 'কোথায় সন্তু, দে না তাকে ফোনটা। তাকে কন্‌গ্রাচুলেশান্‌স জানাই।'

মায়ের মুখখানা আনন্দে ঝলমল করছে। বাবার মুখখানা কিন্তু দুঃখী-দুঃখী। তিনি বললেন, 'যাই বল, ফিফ্থ হওয়ার কোনও মানে হয় না। ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে পারলে তবু একটা কথা। নইলে ফিফ্থই হও আর টুলেফ্থই হও, একই কথা!'

ছোড়দি বলল, 'মোটেই এক কথা নয়! দশ জনের মধ্যে নাম থাকা মানে তো সন্তু স্কলারশিপ পাবে।'

মা বললেন, 'পাবেই তো! তাও তো এ-বছর ওর কতগুলো দিন সেই নষ্ট হয়েছে নেপালে! পড়ার বইয়ের চেয়ে গল্পের বই ও বেশি পড়ে —!'

সন্তু ফোন ছেড়ে দিতেই মা ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুই ফার্স্ট ডিভিশন পেলেই আমরা খুশি হতুম রে সন্তু! তুই যে এতখানি ভাল করবি ...! যা, বাবাকে প্রণাম কর!'

ছোড়দি বলল, 'মা, দারুণ একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু। সন্তুর সব বন্ধুদের ডেকে —'

সন্তু এখনও ভাল করে কথা বলতে পারছে না। সে এতই অবাক হয়ে গেছে! পাশ করা সম্পর্কেই তার সন্দেহ ছিল, আর সে কিনা স্কলারশিপ পেয়ে গেল!

বাবা বললেন,'ফার্স্ট হলে কাগজে ওর ছবি ছাপা হত!'

মা বললেন, 'ফের তুমি ওরকম কথা বলছ? নেপালে সেবার ওই রকম কাণ্ড করবার পর প্রত্যেকটা কাগজে সন্তুর ছবি বেরিয়েছিল তোমার মনে নেই? এর চেয়ে অনেক বড় ছবি।'

এই সময় কাকাবাবু ফিরলেন বাইরে থেকে। ঘরে ঢুকে বললেন, 'কি ব্যাপার? এত গোলমাল কিসের?'

২

কাকাবাবুর চেয়ে সন্তুর বাবা মাত্র দু'বছরের বড়। কিন্তু দু'জনের চেহারার অনেক তফাত। কাকাবাবু যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া কাঁধ, চওড়া কব্জি। আর পুরুষ্টু গোঁফটার জন্য কাকাবাবুকে মিলিটারি অফিসারের মতন দেখায়। সন্তুর বাবাও বেশ লম্বা হলেও রোগা-পাতলা চেহারা, কোনদিন গোঁফ রাখেননি, মাথার চুলও একটু-একটু পাতলা হয়ে এসেছে। কাকাবাবু যেমন অল্প বয়েস থেকেই পাহাড়-পর্বতে আর দেশ-বিদেশে ঘোরাঘুরি করতে ভালবাসেন, বাবার স্বভাব ঠিক তার উল্টো। উনি বাড়ি থেকে বেরুতেই চান না, অফিসের সময়টুকু ছাড়া। জীবনবীমা সংস্থায় উনি অ্যাকচুয়ারির কাজ করেন, খুব দায়িত্বপূর্ণ পদ, দারুণ অঙ্কের জ্ঞান লাগে।

দুই ভাইয়ের সম্পর্ক ঠিক বন্ধুর মতন। সব রকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেন দু'জনে।

কাকাবাবুর ডাকনাম খোকা!

সন্তুদের কাছে অভ্যেস হয়ে গেছে বটে, কিন্তু বাইরের কেউ এসে এই নাম শুনে অবাক হয়ে যায়। অনেকে হেসে ফেলে। অতবড় একজন জাঁদরেল চেহারার মানুষের নাম খোকা হতে পারে? কিন্তু কাকাবাবুও তো একদিন ছোট্ট ছিলেন, তখন ওই নাম তাকে মানাত। বড় হলেও তো আর ডাকনাম বদলায় না।

সন্তুর রেজাল্টের খবর শুনে কাকাবাবু বললেন, 'অ্যাঁ, পাশ করেছে? কি আশ্চর্য কথা! সন্তু তো তাহলে খুব গুণের ছেলে। কখন পড়াশুনো করে দেখতেই পাই না!'

বাবা বললেন, 'যা-ই বল। ফার্স্ট হলে আমি খুশি হতুম। পাশ তো সবাই করে!'

মা কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে দুঃখ করে বললেন, 'দেখেছ, দেখেছ! বছরের মধ্যে ক'মাস বাইরে কাটিয়ে এসেও সন্তু যে এত ভাল রেজাল্ট করেছে, তাতে ওর বাবার আনন্দ নেই!'

বাবা বললেন, 'তুই-ই বল খোকা, যখন ফিফ্থই হল, তখন চেষ্টা করলে ফার্স্ট হতে পারত না? ফার্স্ট আর ফিফ্থের মধ্যে হয়তো বড় জোর কুড়ি-পঁচিশ নম্বরের তফাত!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি তো জীবনে কোনদিন স্ট্যান্ড করিনি! সন্তুর তবু কাগজে নাম উঠেছে ...অবশ্য দাদা তুমিও ... বলে দেব, দাদা, বলে দেব সেই কথাটা?'

বাবা অমনি কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, সন্তু যা করেছে যথেষ্ট। এখন কোন্ কলেজে ভর্তি হবে সেটা ঠিক কর।'

মা জিজ্ঞেস করলেন, ' কি কি? কি বলবে বলছিলে? চেপে যাচ্ছ কেন?'

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'দাদা, বলে দিই?'
বাবা বললেন, 'আঃ খোকা , তুই কি যে করিস! ওসব পুরনো কথা--'
কাকাবাবু তবু বললেন, 'জান বৌদি, দাদা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিল।'
মা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'অ্যাঁ?'
সন্তু এতক্ষণ লজ্জায় মুখ গুঁজে বসেছিল, সে-ও মুখ তুলে তাকাল। ছোড়দিও অবাক হয়ে যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।
মা বললেন, 'সত্যি? এ-কথা তো আমি কোনদিন শুনিনি!'
কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি! আমাদের সময় তো স্কুল ফাইনাল ছিল না। তখন ছিল ম্যাট্রিক। দাদাকে সবাই এখন পন্ডিত মানুষ হিসেবে জানে, শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না, দাদা কিন্তু সত্যিই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিল।'
ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, 'তখন দাদু কি করেছিলেন? দাদু তো খুব রাগী ছিলেন, মেরেছিলেন বাবাকে?'
দাদু অর্থাৎ ঠাকুর্দাকে সন্তু চোখেই দেখেনি, তিনি মারা গেছেন সন্তুর জন্মের আগে। দাদু সম্পর্কে অনেক গল্প সে শুনেছে! বাবা আর দাদুর এই নতুন কাহিনীটি শোনবার জন্য সে উদগ্রীব হল।
কাকাবাবু বললেন, 'আমাদের বাবা খুব রাগী ছিলেন ঠিকই। আমরা কেউ পড়াশুনোয় একটু অমনোযোগী হলেই উনি বলতেন, আর কি হবে, বড় হয়ে চায়ের দোকানে বেয়ারার চাকরি করবি। আমার খেলাধুলোয় বেশি ঝোঁক ছিল বলে পড়াশুনোয় মাঝে-মাঝে ফাঁকি দিতুম, সেইজন্য বাবার কাছে খুব বকুনি খেতুম, কিন্তু ..'
বাবা অ-খুশি মুখ করে কাকাবাবুর কথা শুনছিলেন , এবার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তুই অনেক মারও খেয়েছিস বাবার হাতে। সে-কথা বলছিস না কেন?'
কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমি মারও খেয়েছি অনেকবার। কিন্তু দাদা বরাবরই পড়াশুনোয় খুব ভাল। সেই দাদা যে ম্যাট্রিক ফেল করবে, তা কেউ ভাবেইনি। আসলে হয়েছিল কি, অঙ্ক পরীক্ষার দিন দাদা আইনস্টাইনের মতন নতুন থিয়োরি দিয়ে সব কটা অঙ্ক করেছিল। প্রত্যেকটা অঙ্কের উত্তর লিখে ছিল প্রথমে, তারপর প্রসেস দেখিয়েছে -- একজামিনার রেগে-মেগে জিরো দিয়ে দিয়েছে। রেজাল্ট বেরুবার দিন মা আর আমাদের এক পিসি দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। ওঁরা ভাবলেন, বাবা রেগে-মেগে বোধহয় রক্তারক্তি কান্ড বাধাবেন! সেই জন্য দাদাকে লুকিয়ে রাখা হল ঠাকুর ঘরে। বাবা কিন্তু দাদাকে খুঁজলেনও না। সারাদিন মন খারাপ করে শুয়ে রইলেন। তারপর সন্ধেবেলা মাকে বললেন, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমার খরচ বেঁচে গেল। ও ছেলেকে আর আমি পড়াব না। ওকে চায়ের দোকানের চাকরি খুঁজে নিতে বল তোমরা! বাবা সাঙঘাতিক জেদি আর এক-কথার মানুষ। কিছুতেই

আর তাঁর মত ফেরান গেল না। আমাদের ইস্কুলে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন যে তাঁর ওই ছেলেকে আর ফেরত নেবার দরকার নেই।'

ছোড়দি জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কি হল?'

'দাদা তখন ঠিক করল মনুমেন্টের ওপর থেকে ঝাঁপ দেবে!'

বাবা বললেন, ' কি বাজে কথা বলছিস,খোকা? মোটেই আমি ওরকম ...'

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ দাদা, আমার আজও মনে আছে। তুমি আমাকে ওই কথা বলেছিলে। আমি তো বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। ভাবছিলুম মাকে জানিয়ে দেব। যাই হোক, দাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল চন্দননগরে আমাদের মামাবাড়িতে। সেইখান থেকেই পরের বছর পরীক্ষা দেয়। পরের বছর কি হয়েছিল বল তো!'

ছোড়দি বললে, 'জানি। বাবা ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিল!'

মা বললেন, 'আমরা এতদিন জেনে এসেছি যে , তুমি সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া ছাত্র। কিন্তু তোমারও যে এসব কলঙ্ক আছে তা তো আমাদের কোনদিন বলনি!'

কাকাবাবু বললেন, 'একবার ফেল করে ভালই হয়েছিল দাদার পক্ষে। দাদা ভাল ছাত্র ছিল বটে, কিন্তু ফার্স্ট হবার মতন ছিল না! ফেল করে অভিমান হল বলেই —'

বাবা বললেন, 'না। মোটেই না। প্রথমবারই আমার ফার্স্ট হওয়া উচিত ছিল. এক্‌জামিনার আমার অঙ্ক বুঝতে পারেননি!'

ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, 'পরের বার বাবা যে ফার্স্ট হলেন, সে খবর পেয়ে দাদু কি বললেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'তোমার বাবা ফার্স্ট হওয়ায় আমার বাবা হঠাৎ উল্টে আমার ওপর চোটপাট শুরু করে দিলেন। আমায় ডেকে বললেন, 'পারবি? তুই তোর দাদার মতন পারবি? তোর দাদার পা-ধোওয়া জল খা, তবে যদি পাশ করতে পারিস!'

সবাই হেসে উঠল এক সঙ্গে।

এই রকমভাবে আড্ডায় সকালটা কেটে গেল। সন্ধেবেলা সন্তুর নেমন্তন্ন এক বন্ধুর বাড়িতে।

সন্তুর বন্ধু আজিজের বোন রেশমা গত মাসে জলে ডুবে গিয়েছিল। সে এক সাঙঘাতিক ব্যাপার।

আজিজরা কলকাতায় পার্ক সার্কাসে থাকলেও ওরা প্রায়ই যায় জলপাইগুড়িতে। সেখানে ওদের একটা চা-বাগান আছে। গত মাসে সেই চা-বাগান থেকে ওরা অনেকে মিলে গিয়েছিল ডায়না নদীর ধারে পিকনিক করতে। রেশমার বয়েস মাত্র সাত বছর, সে যে কখন চুপিচুপি খেলা করতে করতে জলে নেমেছে, তা কেউ লক্ষও করেনি। ডায়না নদীতে যখন জল থাকে, তখন বড় সাঙঘাতিক নদী, খুব স্রোত। রেশমা সেই স্রোতে ভেসে যাবার পর আজিজের মামা প্রথমে দেখতে পান। তিনি চেঁচামেচি করে উঠলেন, সবাই তখন নদীর ধার দিয়ে দৌড়োতে লাগলেন। কাছেই একটা জেলে

দাঁড়িয়ে মাছ ধরছিল, সে রেশমাকে দেখে জাল ছুঁড়ে আটকে ফেলে। আর একটু দূরেই ছিল একটা বড় পাথর। সেখানে ধাক্কা লাগলেই রেশমার মাথা একেবারে ছাতু হয়ে যেত।

প্রায় অলৌকিকভাবেই বেঁচে গেছে রেশমা। সেইজন্যই এবারে তার জন্মদিন করা হচ্ছে খুব ধূমধামের সঙ্গে।

খুব ফুর্তির সঙ্গেই সন্তু গেল নেমন্তন্ন খেতে!

আজিজদের বাড়িটা মস্ত বড়। আর ওদের আত্মীয়-স্বজনও প্রচুর। তারা অনেকেই সন্তুকে চেনেন। সন্তুর কয়েকজন বন্ধুও এসেছে! আজিজের বাড়ির লোকেরা কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করলেন, সন্তু, কি রকম রেজাল্ট হল? সন্তুকে নিজের মুখে কিছুই বলতে হয় না। আজিজ কিংবা অন্য কোনও বন্ধু আগে থেকেই বলে ওঠে, জান না, ও ফিফ্‌থ হয়েছে! কাগজে আমাদের ইস্কুলের নাম বেরিয়েছে এই সন্তুর জন্য।

তখন তাঁরা সবাই 'বাঃ বাঃ' বলে পিঠ চাপ্‌ড়ে দিচ্ছেন সন্তুর।

সন্তুর একটু-একটু গর্ব হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু লজ্জাও হচ্ছে খুব। যেন এই বিষয়টা নিয়ে কেউ আলোচনা না করলেই ভাল হয়। ফিফ্‌থ হওয়াটাই বা এমন কি ব্যাপার!

কালকের সন্ধের সঙ্গে আজকের সন্ধের কত তফাত। আজ কত আনন্দ আর হৈ হৈ, আর কালকে সে ফেল করার দুশ্চিন্তায় একেবারে চুপ্‌সে কাচু হয়েছিল। মানুষের জীবনের পর পর দুটো দিন যে ঠিক এক রকম হবেই, তা কেউ বলতে পারে না।

এক সময় সন্তু ভাবল, কেন মিছিমিছি অত ভয় পাচ্ছিল কাল? ফেল করলেই বা কি হত? তার বাবাও তো ফেল করেছিলেন। ফেল করলেই জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায় না। মনের জোর রাখাটাই আসল ব্যাপার।

আজিজদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার আগে অনেক রকম খেলা হল। তার মধ্যে শেষ খেলাটা হল বন্দুক ফাটান।

অন্তত দুশটা বেলুন দিয়ে সাজান হয়েছে সারা বাড়িটা। লাল টুকটুকে ভেলভেটের ফ্রক্ পরা রেশমাকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা পরীর মতন। জন্মদিনের কেক কাটার পর ফুঁ দিয়ে যখন মোমবাতিগুলো নেভান হচ্ছে, ঠিক সেই সময় আপনা-আপনি একটা বেলুন খসে পড়ল সেখানে। জলন্ত মোমবাতির কাছাকাছি আসতেই দুম্ করে ফেটে গেল সেটা।

রেশমা হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'কী মজা! কী মজা!'

তারপরই সে আবদার ধরল, 'কী মজা! কী মজা! আরও বেলুন ফাটিয়ে দাও! সব কটা বেলুন ফাটিয়ে দাও!'

রেশমার বাবা সুলেমান সাহেব বললেন, 'না, না এখন ফাটিও না, সুন্দর সাজান হয়েছে, কাল সকালে ...'

রেশমা তবু বলল, 'না, ফাটিয়ে দাও! সব কটা ফাটিয়ে দাও!'

আজকের দিনে রেশমার আবদার মানতেই হয়। সেইজন্য অন্যরা যে যে-কটা বেলুন পেল, ফটাস ফটাস করে ফাটাতে শুরু করে দিল।

কিন্তু বেশির ভাগ বেলুনই ওপরে ঝোলান, হাতের নাগাল পাওয়া যায় না। অনেকে লাফিয়ে লাফিয়ে সেগুলো ধরার চেষ্টা করতে লাগল আর খিল্‌খিল্‌ করে হাসতে লাগল রেশমা।

আজিজ টুক করে নিয়ে এল ওর এয়ারগানটা। সেটা উঁচিয়ে তুলে বলল, 'এবার দ্যাখ্‌ রেশমা, সব কটা কি রকম ফাটিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু আজিজের অত ভাল টিপ নেই। সে চার-পাঁচটা গুলি ছুড়লে একটা বেলুন ফাটে।

তখন শুরু হয়ে গেল কমপিটিশন। পর পর দশটা গুলি ছুঁড়ে কে সবচেয়ে বেশি বেলুন ফাটাতে পারে। কেউই তিন চারটের বেশি পারল না। আজিজের মামা ফাটালেন পাঁচটা।

সন্তু এয়ারগানটা হাতে নিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, 'সবাই এক এক করে গুনুক! আমি দশটায় ঠিক দশটা ফাটাব!'

এ-ব্যাপারে গর্ব করতে সন্তুর কোনও লজ্জা নেই। সে আসল রিভলভারে গুলি ছুড়েছে। এ তো সামান্য একটা এয়ারগান!

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, এক!

সন্তু সত্যি-সত্যি পরপর দশটা বেলুন ফাটাতে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল একসঙ্গে। সন্তু বীরের মতন এয়ারগানটা তুলে দিল পাশের বন্ধুর হাতে।

খুব মজা হল অনেক রাত পর্যন্ত।

পরদিন সকালটা আবার একেবারে অন্য রকম।

সন্তু সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। কাকাবাবু এখনও মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরেননি। বাবা যথারীতি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খবরের কাগজের অপেক্ষায় বারান্দায় পায়চারি করছেন।

এই সময় পাড়ার দুটি ছেলে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে পাগলের মত দুম্‌ দুম্‌ করে ধাক্কা দিতে লাগল সন্তুদের বাড়ির দরজায়।

বাবা বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ' কি ব্যাপার? এই যে, তোমরা ওরকম করছ্‌ কেন!'

ছেলে দুটি বলল, 'শিগ্‌গির আসুন! পার্কে কে যেন কাকাবাবুকে গুলি করেছে!'

৩

বাবা ওপরের বারান্দা থেকে শুনতে পেয়ে বললেন, 'অ্যাঁ? কি বললে? কী সর্বনাশ! সন্তু কোথায়?'

সন্তু ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে তীরের মতন ছুটতে আরম্ভ করেছে।

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা, তারপর ডান দিক বেঁকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই পার্কটায় পৌঁছান যায়। সন্তু সেখানে পৌঁছে গেল দেড় মিনিটে।

পার্কটা খুব বড় নয়, কিন্তু তার একপাশে একটা কবরখানা। আর একদিকে একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, একটা বারোতলা বাড়ির লোহার কঙ্কাল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে রাশি-রাশি ইঁট।

সেই ইটের স্তূপের কাছে এক দঙ্গল মানুষের ভিড় দেখেই বোঝা গেল যে, ঘটনাটা সেইখানেই ঘটেছে। সেখানে শোনা যাচ্ছে একটা কুকুরের অবিশ্রান্ত ডাক।

সন্তু ভিড়ের মধ্যে গোঁত্তা মেরে ভেতরে ঢুকে পড়ে দেখল একটা ইটের পাঁজার কাছে কাকাবাবু উপুর হয়ে শুয়ে আছেন। গুলি লেগেছে কাঁধের বাঁ দিকে, পাতলা সাদা জামাটায় পাশাপাশি দুটো কালো গোল দাগ, তার চারপাশে রক্ত।

কাকাবাবু সন্তুর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে আসেন রোজ। সেই কুকুর কাকাবাবুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ডেকে চলেছে, সন্তুকে দেখতে পেয়েই সে পাগলের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সন্তু কাকাবাবুর গায়ে হাত দিল না, কান্নাকাটিও শুরু করল না। তাকে এখন এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করলে চলবে না।

সে কুকুরের গলায় চাপড় মেরে বলল, 'তুই এখানে থাক। দেখিস, কেউ যেন কাকাবাবুর গায়ে হাত না ছোঁয়ায়।'

কুকুর সন্তুর সব কথা বোঝে। সে আবার গিয়ে দাঁড়াল কাকাবাবুর মাথার কাছে। সন্তু আবার ভিড় ভেদ করে বেরিয়ে ছুটল।

ডঃ সুবীর রায় তখন চেম্বারে বেরুবার জন্য সবে মাত্র আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছেন, সন্তু ঝড়ের মতন ঢুকে এল তাঁর ঘরে। এক হাতে তাঁর যন্ত্রপাতির বাক্সটা টপ্ করে তুলে নিয়ে অন্য হাতে ডঃ সুবীর রায়কে ধরে টানতে টানতে বলল, 'শিগ্‌গির চলুন! ডাক্তার মামা, এক্ষুনি ..'

ডঃ সুবীর রায় অবাক হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

'কিছু বলবার সময় নেই। কাকাবাবু —'

'কাকাবাবু? কোথায় ... দাঁড়া জুতোটা পরে নিই।'

'না, জুতো পরতে হবে না!'

খালি পায়েই ডঃ সুবীর রায় ছুটতে লাগলেন সন্তুর সঙ্গে। তাঁর বাড়িও পার্কের কাছেই।

ততক্ষণে সন্তুর বাবা আর মা পৌঁছে গেছেন। আর এসেছে একজন পুলিশের কনস্টেবল।

ডঃ সুবীর রায় হাঁটু গেড়ে বসলেন কাকাবাবুর দেহের পাশে। আস্তে আস্তে উল্টে দিলেন কাকাবাবুকে। কাকাবাবুর মুখে একটা দারুণ অবাক হবার ভাব।

যে-সমস্ত লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা অনেকেই কাকাবাবুকে চেনে। অনেকেই এখানে সকালে বেড়াতে আসে। সবাই নানান কথা বলাবলি করছে। কিন্তু আগেই যে একজন ডাক্তারকে খবর দেওয়া উচিত সে-কথা কারুর মনে পড়েনি।

দু'তিনজন নাকি স্বচক্ষে দেখেছে কাকাবাবুকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে। গুলির আওয়াজ হয়েছিল তিনবার, অর্থাৎ একটা গুলি ফস্‌কে গেছে। কিন্তু কেউ গুলি করেছে, তা বোঝা যায়নি। কাছাকাছি তো কেউ ছি না, কিংবা কারুকে পালাতেও দেখা যায়নি।

একজন বলল, 'নিশ্চয়ই কেউ কবরখানায় লুকিয়ে থেকে গুলি করেছে।'

সন্তু বুঝতে পারল না, কাকাবাবু পার্কে বেড়াতে এসে এই ইটের পাঁজার কাছে কেন এসেছিলেন? এখানে বালি আর খোয়া ছড়ান, এই জায়গাটা তো হাঁটার পক্ষেও ভাল নয়।

ডঃ সুবীর রায় এর মধ্যে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে বললেন, 'সন্তু এক্ষুনি ওঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করাতে হবে। এখনো বেঁচে আছেন ... আমার ড্রাইভার বোধহয় এতক্ষণে এসে গেছে ... তুই গিয়ে ডেকে আন বরং!'

সন্তু বলল, 'ওই যে দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে ... যদি ট্যাক্সি করে নিয়ে যাই ...'

বাবা বললেন, 'সেই ভাল, সময় বাঁচবে!'

সবাই মিলে ধরাধরি করে কাকাবাবুকে তোলা হল ট্যাক্সিতে। কুকুরটা কি যেন বুঝে আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে, সেও সঙ্গে যেতে চায়।

কুকুরকে জোর করে মায়ের সঙ্গে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

নার্সিং হোমে প্রায় দু'ঘন্টা ধরে অপারেশনের পর জানা গেল একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

ডঃ সুবীর রায় ছাড়া আরও দু'জন বড় ডাক্তারও ছিলেন অপারেশনের সময়। তাঁরা কেউ কখনও এরকম কাণ্ড দেখেননি।

কাকাবাবুর শরীরে যে গুলি দুটো ঢুকেছে, সেগুলি মানুষ মারবার জন্য নয়। বাঘ-সিংহের মতন বিশাল শক্তিশালী প্রাণীদের এই রকম গুলি মেরে ঘুম পাড়ান হয়।

তিনজন ডাক্তারই দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এর জন্য তো সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিডোট দেবার কথা, নইলে বাঁচান যায় না। অথচ অনেক সময় কেটে গেছে।

যদিও ভরসার কথা এই যে কাকাবাবুর এখনও নিঃশ্বাস পড়ছে।

সুন্দরবনে দু'একটা বাঘকে গুলি করে ঘুম পাড়াবার কথা অনেকেই শুনেছে, কিন্তু কলকাতা শহরে সকালবেলা পার্কে কোনও মানুষকে এরকমভাবে গুলি করবে কে? কেন?

ডঃ তিমির বরাট একবার সুন্দরবনের একটা বাঘকে এই রকম গুলি মেরে অজ্ঞান করার সময় সেখানে ছিলেন। তাঁর পরামর্শ জানবার জন্য তাঁকে ফোন করা হল পি জি হাসপাতালে।

ডঃ তিমির বরাট তো ঘটনাটা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান না। তারপর বলতে লাগলেন, 'পেশেন্ট এখনও বেঁচে আছে? কি বলছেন আপনারা? এ যে অসম্ভব! ঠিক আছে; আমি এক্ষুনি আসছি। আপনারা ততক্ষণে চিফ্ কন্জারভেটার অব ফরেস্ট মিঃ সুকুমার দত্তগুপ্তকেও একটা খবর দিন। তাঁর এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে।'

সুকুমার দত্তগুপ্তও টেলিফোনে ওই একই কথা বলতে লাগলেন।' ঘুমের গুলি? আপনাদের ভুল হয়নি তো? সেই গুলি শরীরে গেলে তো কোনও মানুষের পক্ষে এতক্ষণ বেঁচে থাকা একেবারেই অসম্ভব! মিঃ রায়চৌধুরীকে আমি চিনি, ওঁকে এইরকমভাবে ...'

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছে গেলেন ওঁরা দু'জনে। আর বারবার বলতে লাগলেন, 'কি আশ্চর্য ! কি আশ্চর্য !'

সুকুমার দত্তগুপ্ত বললেন. 'এই রকম গুলি বিদেশ থেকে আসে, এ তো কোনও সাধারণ লোকের পাবার কথা নয়।'

ডঃ সুবীর রায় বললেন, 'যারা পার্কের মধ্যে সকালবেলা কারুকে গুলি করে, তারা কী সাধারণ লোক?'

সমস্ত ডাক্তারকে অবাক করে কাকাবাবু এর পরেও তিন দিন বেঁচে রইলেন অজ্ঞান অবস্থায়।

চতুর্থ দিনে তিনি চোখ মেলে চাইলেন।

তবু আরও দু'দিন তাঁর ঘুম-ঘুম ভাব রইল, ভাল করে কথা বলতে পারেন না, কথা বলতে গেলে জিব জড়িয়ে যায়।

আস্তে-আস্তে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু তাঁর হাত দুটো অবশ হয়ে রইল। হাতেকোনও জোর পান না। কোনও জিনিস শক্ত করে ধরতে পারেন না।

অনেক ওষুধপত্র দিয়েও আর হাতদুটো ঠিক করা গেল না। ডাক্তাররা বললেন,'আর কিছু করবার নেই। এখন ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে হবে, যদি আস্তে-আস্তে ঠিক হয়ে যায়।'

এতদিন পর সন্তু রাত্তিরবেলা তার ছাদের ঘরে শুয়ে-শুয়ে খুব কাঁদল।

কাকাবাবুর হাত দুটো নষ্ট হয়ে যাওয়া তো তাঁর মৃত্যুর চেয়েও খারাপ!

কাকাবাবুর একটা পা খোঁড়া, শুধু মনের জোরে আর ওই লোহার মতন শক্ত হাত দু'খানার জোরে তিনি কত পাহাড়ে-পর্বতে পর্যন্ত উঠেছেন। কিন্তু এখন? আর তিনি কোনও অভিযানে যেতে পারবেন না। তিনি এখন অথর্ব।

এর মধ্যে কলকাতার পুলিশের বড় বড় কর্তারা আর দিল্লি থেকে সি. বি. আই-এর লোকেরাও-কাকাবাবুর কাছে এসে অনেক খোঁজখবর নিয়ে গেছেন।

কাকাবাবু সবাইকে বলেছেন যে, কে তাঁকে ওই রকম অদ্ভুত গুলি দিয়ে মারার চেষ্টা করতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণাই নেই। আততায়ী একজন না কয়েকজন তাও তিনি জানেন না, কারণ কারুকেই তিনি দেখতে পাননি। তাঁকে গুলি করা হয়েছে পেছন দিক থেকে।

সকলেরই অবশ্য ধারণা হল, যে, ঘুমের গুলি মারার কারণ একটাই হতে পারে। কাকাবাবুকে কেউ বা কারা অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নিশ্চয়ই।

তবে তারা নিয়ে গেল না কেন? সকালবেলা পার্কে কিছু নিরীহ লোক ঘুরে বেড়ায়। তাদের চোখের সামনে দিয়েই যদি তারা কাকাবাবুকে তুলে নিয়ে যেত, কেউই বাধা দিতে সাহস করত না।

মিঃ ভার্গব নামে সি.বি. আই-এর একজন অফিসার কাকাবাবুর কাছে রোজই যাতায়াত করছিলেন। তিনিই বললেন যে স্বাস্থ্য সারাবার জন্য কাকাবাবুর কোন ভাল জায়গায় গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করা দরকার।

সন্তুর বাবা এবং মা দু'জনেই এতে খুব রাজি।

ঠিক হল যে সবাই মিলে যাওয়া হবে পুরীতে। সন্তুর মামাদের একটা বাড়ি আছে সেখানে। সুতরাং কোনও অসুবিধে নেই। বাবা ছুটি নিয়ে নিলেন অফিস থেকে। ছোড়দিরও খুব যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ছোড়দিকে ফিরে যেতে হল ভূপালে।

শনিবার দিন রাত ন'টায় ট্রেন। একটু আগেই বেরুন হল বাড়ি থেকে।

ট্যাক্সিটা যখন রেড রোড ছাড়িয়ে রেডিও স্টেশনের পাশ দিয়ে বেঁকছে, সেই সময় একটা সাদা রঙের জিপ গাড়ি তীব্র বেগে এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একজন লোক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হুকুম দিল, 'গাড়িটা বাঁয়ে দাঁড় করাও।'

সেই জিপ থেকে নামলেন মিঃ ভার্গব।

তিনি বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাদের প্ল্যানটা একটু বদল করতে হবে। আপনার পুরী যাওয়া হবে না।'

কাকাবাবু কোনও কথা না বলে শুধু চেয়ে রইলেন মিঃ ভার্গবের দিকে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, কি ব্যাপার!'

মিঃ ভার্গব বললেন, 'আমরা খবর পেয়েছি, পুরীতে কয়েকজন সন্দেহজনক লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। তাদের সঙ্গে মিঃ রায়চৌধুরীর এই ঘটনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে কিনা ঠিক বলা না গেলেও তারা ঠিক এই সময় পুরীতে গেল কেন, তা আমাদের জানতে হবে। যদি ওরা মিঃ রায়চৌধুরীর কোনও ক্ষতি করে ... সেই জন্য আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে পারি না।'

বাবা বললেন, 'তা হলে কি আমরা ফিরে যাব।'

মিঃ ভার্গব বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরীর জন্য আমরা অন্য বাবস্থা করেছি। আপনারা ইচ্ছে করলে পুরী যেতে পারেন।'

সন্তু বলল, 'আমি কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গেই যাব!'

মিঃ ভার্গব হেসে বললেন, 'তা জানি! সেরকম ব্যবস্থাই হয়েছে। মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আর-একজন যাবেন এঁর নাম প্রকাশ সরকার, ইনি একজন তরুণ ডাক্তার। সদ্য পাশ করেছেন ...'

একটুক্ষণ কথা বলেই কাকাবাবুকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে তোলা হল জিপটায়। সন্তু ভাগ্যিস আলাদা একটা ছোট সুটকেসে নিজের জামা-প্যান্ট গুছিয়ে নিয়েছিল, তাই কোনও অসুবিধে হল না।

জিপটা ছুটল অন্যদিকে। সোজা একেবারে এয়ারপোর্ট।

সেখানে আর্মির একটা স্পেশাল প্লেনে উঠল ওরা। তখনও কোথায় যাচ্ছে, সন্তু জানে না। নামবার পর দেখল যে, জায়গাটা গৌহাটি।

প্রকাশ সরকার আর সন্তু দু'জনে দু'দিক থেকে ধরে নামাল কাকাবাবুকে। এবার উঠতে হবে আর একটা জিপে।

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু হেসে বললেন, 'আমি একেবারে বাচ্চা ছেলের মতন হয়ে গেছি, না রে? হাঁটতে পারি না, একটা চায়ের কাপ পর্যন্ত ধরতে পারি না। আমায় নিয়ে কি করবি তোরা?'

৪

প্লেনের সিঁড়ি থেকে কাকাবাবুকে ধরাধরি করে নামিয়ে আনা হল।

কাছেই টারম্যাকের ওপর অপেক্ষা করছে একটা বেশ বড় জিপ। তার পেছন দিকে দুই সিটের মাঝখানে বিছানা পাতা। প্রকাশ সরকার আর সন্তু দু'জনে মিলে কাকাবাবুকে সেখানে শুইয়ে দিল খুব সাবধানে। সন্তু সেখানেই বসল। আর প্রকাশ সরকার গিয়ে বসল সামনের দিকে। সেখানে ড্রাইভারের পাশে আর একজন লোক বসেছিল।

সেই লোকটি প্রকাশ সরকারকে নিচু গলায় কিছু বলবার পরই চলতে শুরু করল গাড়ি।

সন্তু এর আগে কখনও আসামে আসেনি। কিন্তু আসামের পাহাড় আর জঙ্গল সম্পর্কে অনেক গল্পের বই পড়েছে। হাতি, গন্ডার, বাঘ ... কী নেই আসামে! সেইজন্য আসামের নাম শুনলেই তার রোমাঞ্চ হয়।

সে কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। কিন্তু চারপাশে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

সন্তু ভেবেছিল, এয়ারপোর্টে যখন নেমেছে, তখন নিশ্চয়ই কাছাকাছি শহর থাকবে। আলো দেখা যাবে।

কিন্তু গাড়িটা শহরের দিকে গেল না। মাঝে-মাঝে দুটো একটা আলো দেখা গেলেও বোঝা যায়, গাড়িটা চলে যাচ্ছে লোকালয়ের বাইরে। একটা ব্রিজ পেরিয়ে গাড়িটা আবার ছুটল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে।

ঘন্টাখানেক পরে সন্তু অবাক হয়ে দেখল, তাদের গাড়ি আবার একটা এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে ট্যারম্যাকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

কাকাবাবু ঘুমোননি, চুপচাপ শুয়েছিলেন।

এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার কোথায় এলুম, বল্ তো সন্তু?'

সন্তু বলল, 'আর একটা এয়ারপোর্ট .. নামটা পড়তে পারিনি!'

কাকাবাবু বললেন, 'বুঝতে পারলি না? আবার সেই আগের এয়ারপোর্টে ফিরে এলুম! ওই যে পাশাপাশি দুটো আলো, তার মধ্যে একটা দপ্‌দপ্ করছে!'

সন্তু দেখল, তাই তো! ঠিকই। অসুস্থ, শোয়া অবস্থাতেও কাকাবাবু এটা লক্ষ্য করেছেন ঠিক।

প্রকাশ সরকার এদিকে এসে বিনীতভাবে বলল, 'স্যার, আপনাকে আবার একটু কষ্ট করে নামতে হবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'ব্যাপার কি? এত সাবধানতা কিসের? আমি তো একেবারে অথর্ব হয়ে গেছি, হাঁটতে পারি না, কোনও কিছু ধরতে পারি না, আমায় নিয়ে আর কার মাথা ব্যথা থাকবে?'

প্রকাশ সরকার বলল, 'আমাদের দেশের পক্ষে আপনার জীবন খুবই মূল্যবান। আপনার যদি কোনও বিপদ হয় ... সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার বলত সন্তু?'

সন্তুও তো কিছুই বুঝতে পারছে না। অন্য-অন্য বার কাকাবাবু নিজেই প্রথম দিকে সন্তুর কাছে অনেক কথা গোপন করে যান। এবার কাকাবাবু নিজেই জানেন না কি হচ্ছে! একই এয়ারপোর্টে দু'বার তাঁকে কেন আনা হল? কারুর চোখে ধুলো দেবার জন্য? কিন্তু তারা যে প্লেনে আসামে চলে আসবে, সে-কথা তো সন্ধের আগে কেউ জানতই না।

কাকাবাবুকে আবার নামান হল জিপ থেকে।

সেই সেনাবাহিনীর বিমানটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। সেটাতেই আবার উঠতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, 'দাঁড়াও, একটু টাটকা হাওয়া খেয়ে নিই। আসামের হাওয়া খুবই ভাল।'

সত্যি-সত্যি তিনি মুখটা হাঁ করে হাওয়া খেতে লাগলেন।

একদিকে প্রকাশ সরকার, আর একদিকে সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। সন্তু একটু লম্বায় ছোট বলে কাকাবাবুকে একদিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছে।

সেই অবস্থায় প্রায় প্রকাশ সরকারকে শুনিয়ে শুনিয়েই কাকাবাবু সন্তুকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'মনে কর, এরাই যদি গুন্ডা হয়, এবাই হয়তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাদের কোথাও গুম্ করতে নিয়ে যাচ্ছে, তা হলে কি করবি?

সন্তু আড়চোখে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকাল।

প্রকাশ সরকার ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলল, 'এ কি বলছেন স্যার? এরা সব আর্মির লোক, এটা আর্মির জিপ, ওইটা আর্মির জেট .. দিল্লি থেকে স্পেশাল অর্ডার এসেছে বলেই আপনাকে ...'

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁঃ ! কিছুই বলা যায় না!'

প্রকাশ সরকার এবার রীতিমত আহত হয়ে বলল, 'স্যার, আপনার এখনও অবিশ্বাস হচ্ছে? মিঃ ভার্মার চিঠি আছে আমার কাছে। যদি দেখতে চান ...'

'যাব! চল!'

আবার ওঠা হল সেই ছোট বিমানের মধ্যে। কাকাবাবুকে তাঁর সিটে বসাবার পর তিনি চোখ বুজে রইলেন।

প্রকাশ সরকার সন্তুর পাশে বসে পড়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার ভাল আলাপ হয়নি। কিন্তু আমি তোমাদের সব কটা অ্যাডভেঞ্চারের কথা পড়েছি। সেই আন্দামানে .. কিংবা নেপালে, এভারেস্টের কাছে, আর একবার সেই কাশ্মীরে ... তুমি তো দারুণ সাহসী ছেলে!'

এই রকম কথা শুনলে সন্তু লাজুক লাজুক মুখ করে থাকে। কি যে উত্তর দেবে বুঝতে পারে না।

প্রকাশ আবার বলল, 'আর তোমার কাকাবাবু, উনি তো জিনিয়াস! একটা পা নেই বলতে গেলে .... তবু শুধু মনের জোরে উনি কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন! উনি কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করেন না!'

সন্তু এবার বলল, 'কিন্তু কাকাবাবুর এখন হাতেও জোর নেই।'

'ও ঠিক হয়ে যাবে। আমি ডাক্তার, আমি সঙ্গে রয়েছি, কোনও চিন্তা নেই। আমার ওপর নির্দেশ আছে, উনি যখন যা চাইবেন, তক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অন্তত এক মাস যদি বিশ্রাম নিতে পারেন ..'

'এক মাস?'

'তা তো লাগবেই। আরও বেশি হলে ভাল হয়। কেন, তুমি সঙ্গে থাকতে পারবে না?'

'আমার যে কলেজ খুলে যাবে।'

'তুমি কলেজে পড় বুঝি?'

সন্তু আবার লজ্জা পেয়ে গেল। সে এখনও ঠিক কলেজের ছাত্র হয়নি। তবু 'কলেজ' কথাটা উচ্চারণ করতে তার বেশ লাগে।

এই সময় কাকাবাবু চোখ খুলে বললেন, 'এই যে বৈজনাথ শোন!'

প্রকাশ একবার এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'স্যার আমাকে ডাকছেন?'

হ্যাঁ!'

'আসছি, স্যার! ইয়ে মানে স্যার, আমার নাম তো বৈজনাথ নয়, এখানে বৈজনাথ বলে কেউ নেই। আমার নাম প্রকাশ, প্রকাশ সরকার।'

কাকাবাবু খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'তুমি বৈজনাথ নও! ঠিক বলছ? ভারি আশ্চর্য তো!'

'বৈজনাথ কে স্যার? সন্তু তুমি ওই নামে কারুকে চেন?'

সন্তু দুদিকে ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু আবার বললেন, 'ঠিক আছে। তোমার কি নাম বললে যেন? প্রকাশ? শোন প্রকাশ, আমার তেষ্টা পেয়েছে। আমি একটু ডাবের জল খাব।'

'ডাবের জল? এখানে কি ডাবের জল পাওয়া যাবে? কোল্ড ড্রিংক্স আছে বোধহয়।'

'আমি ডাবের জল ছাড়া অন্য কিছু খাই না!'

'কিন্তু স্যার, রাত্তিরবেলা ডাবের জল খাওয়াটা বোধহয় ঠিক নয়!'

'কেন, কি হয়?'

'কেউ খায় না। খেলে গলা ভেঙে যায়!'

'তোমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন কথা লেখা আছে? যাই হোক, আমি রাত্তিরেও ডাবের জল খাই, আমার গলা ভাঙে না।'

'প্লেনের মধ্যে তো ডাবের জল দেবার উপায় নেই।'

'তা হলে সামনের স্টেশনে থামাও! সেখান থেকে ডাবের জল জোগার কর। এই যে বললে, 'আমি যখন যা চাইব,তুমি তা-ই দেবার ব্যবস্থা করবে!'

প্রকাশ অসহায়ভাবে সন্তুর দিকে তাকাল।

সন্তুও প্রায় নির্বাক হয়ে গেছে। কাকাবাবু এ কি রকম ব্যবহার করছেন? কাকাবাবু কোনদিন কারুর নাম ভুলে যান না। অথচ প্রকাশকে ডাকলেন বৈজনাথ বলে। ডাবের জল খাওয়ার জন্য আবদার, এ তো কাকাবাবুর চরিত্রের সঙ্গে একদম মানায় না! তারপর উনি বললেন, 'সামনের স্টেশন'! উনি কি প্লেনটাকে ট্রেন ভেবেছেন নাকি?

প্রকাশ বলল,'স্যার, আমরা আর আধঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। সেখানে খুব চেষ্টা করব যদি ডাবের জল পাওয়া যায়। তার আগে কি একটা কিছু কোল্ড ড্রিংক্ কিংবা এমনি জল খাবেন?'

'না।'

কাকাবাবু আবার চোখ বুজলেন।

একটু পরে সন্তু ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমারা কোথায় যাচ্ছি?'

প্রকাশ বলল, 'একটু বাদেই তো নামব। তখন দেখতে পাবে।'

চোখ না খুলেই কাকাবাবু বলেন, 'আগরতলা, তাই না? একে বলে ঘুরিয়ে নাক দেখানো!'

প্রকাশ দারুণ চমকে উঠল। কোথায় যাওয়া হবে,তা একজন আর্মি অফিসার শুধু তার কানে-কানে বলেছে। কাকাবাবুর তো কোন ক্রমেই জানবার কথা নয়। উনি কি হিপ্‌নোটিজ্‌ম জানেন নাকি! তাও তো চোখ বুজে আছেন।

'আসাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে শুনে সন্তু একটু নিরাশই হল। সে আরও ভাবতে লাগল, কাকাবাবু ঘুরিয়ে নাক দেখানর কথা বললেন কেন? কে কাকে ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছে?

প্লেনের আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়, তখন সেটা নামবার জন্য তৈরি হচ্ছে। একটু পরেই প্লেনটি একটি ঝাঁকুনি খেয়ে মাটি ছুঁল।

নামবার সময় এবারে আর কাকাবাবু কোনও কথা বললেন না। প্রকাশ খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে ফিরে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'স্যার, এত রাত্রে তো এখানে ডাব কোথাও নেই, কিছুতেই পেলুম না!'

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে।'

এবারে জিপ নয় একটা সাদা রঙের গাড়ি। প্রত্যেকবারই কাকাবাবুকে ধরে-ধরে নিয়ে গিয়ে বসাতে হচ্ছে। অথচ, কাকাবাবু কক্ষনও পরের সাহায্য নেওয়া পছন্দ করেন না। খোঁড়া পায়েই ক্রাচ্‌ বগলে নিয়ে উনি একা পাহাড়ে পর্যন্ত উঠতে পারেন। কিন্তু এখন হাতেও জোর নেই, ক্রাচও ধরতে পারছেন না।

গাড়ি এসে থামল আগরতলার সার্কিট হাউসে।

খুবই সুন্দর ব্যবস্থা। পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘর কাকাবাবুর জন্য, অন্য ঘরটিতে প্রকাশ আর সন্তু থাকবে।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও তৈরিই ছিল। প্রকাশ বলল, 'আজ অনেক ধকল গেছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া যাক।'

কাকাবাবু এখন নিজে খেতেও পারেন না, তাঁকে খাইয়ে দিতে হয়। চামচে করে যে খাবার তুলবেন, হাতে সেই জোরটুকুও নেই। এই ক'দিন বাড়িতে ছোড়দিই খাইয়ে দিয়েছে কাকাবাবুকে। আজ সন্তু বসল কাকাবাবুকে খাওয়াতে।

কিন্তু তার তো অভ্যেস নেই, সে ঠিকঠাক পারবে কেন? ভাত তুলে কাকাবাবুর মুখে তুলে দিতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে।

প্রকাশ বলল, 'তুমি সর, সন্তু, আমি দিচ্ছি। আমরা তো নার্সিং করতে জানি।'

কাকাবাবু দু'তিনবার ঠিকঠাক খেলেন। তারপর একবার কট্ করে চামচেটাকেই কামড়ে ধরে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলেন প্রকাশের হাত থেকে। তারপর সেই চামচটাকে চিবুতে লাগলেন কচর-মচর করে।

প্রকাশ আঁতকে উঠে বলল, 'স্যার, স্যার, ও কি করছেন? ও কি?'

কাকাবাবু কট্মট্ করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন,'আমায় স্যার স্যার বলছ কেন! আমার নাম রামনরেশ যাদব। আমি বিহারের একজন গোয়ালা। আমার একশ সাতান্নটা গোরু আছে। তুমি কি তারই একটা গোরু?'

সন্তুর বুকের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ হতে লাগল।

৫

প্রকাশ সরকার কাকাবাবুকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর সন্তুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে নিজেদের ঘরে এসে বসল।

সন্তুর মুখখানা শুকিয়ে গেছে একেবারে। সে যেন বুঝতে পারছে কাকাবাবুর একটা ভীষণ বিপদ আসছে। এই অবস্থায় বাড়ি থেকে এতদূরে থাকা কি ঠিক?

প্রকাশ জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার হল বল তো, সন্তু? উনি একবার বৈজনাথ বলে ডাকলেন আমাকে। তারপর নিজের নাম বললেন রামনরেশ যাদব। এরা কারা?'

সন্তু বলল, 'কোনদিন আমি এই সব নাম শুনিনি!'

'তুমি তো ওঁর সঙ্গে সবকটা অভিযানেই গেছ, তাই না? সুতরাং যে-সব ব্যাড ক্যারেকটারদের উনি দেখেছেন, তুমিও তাদের দেখেছ?'

'তার কোনও মানে নেই। আমি তো মোটে চার-পাঁচ বার গেছি কাকাবাবুর সঙ্গে। তার আগে কাকাবাবু আরও কত জায়গায় গেছেন। পা'টা ভেঙে যাবার আগে তো উনি আমাকে সঙ্গে নিতেন না।'

'আগেকার কথা বাদ দাও। গত পাঁচ-ছ বছর ধরে তো তুমি ওঁর সঙ্গেই থেকেছ —'

একটু চিন্তা করে সন্তু বলল, 'না, তাও ঠিক বলা যায় না। গত বছর আমার যখন পরীক্ষা ছিল, সেই সময় কাকাবাবু একাই যেন কোথায় গিয়েছিলেন ...'

'কোথায়?'

'তা আমি ঠিক জানি না। তবে মনে হয় যেন আসামের দিকেই।'

'কেন তোমার আসামের কথা মনে হল? উনি কি তোমায় কিছু বলেছিলেন?'

'না। তা বলেননি। তবে, উনি মা'র জন্য একটা বেশ সুন্দর নানা রঙের কম্বলের মতন জিনিস এনেছিলেন, তার নাম খেস্। মা বলেছিলেন, ওই জিনিস আসামেই ভাল পাওয়া যায়।'

'কিন্তু আসামে এসে বৈজনাথ কিংবা রামনরেশ যাদব টাইপের নামের ক্যারেকটারদের উনি মিট করবেন, এটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। বিহার, উত্তরপ্রদেশেই এই ধরনের নামের লোক থাকে।'

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু—'

'আমায় ডাক্তারবাবু বলার দরকার নেই। আমায় তুমি প্রকাশদা বলতে পার।'

'আপনার কি মনে হয়, কাকাবাবুর স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?'

'কিছু একটা গন্ডগোল যে হয়েছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। উনি নিজেকেও অন্য মানুষ ভাবছেন। অবশ্য এটা খুব টেমপোরারিও হতে পারে। দেখা যাক্, কাল সকালে কেমন থাকেন!'

'আপনি সত্যি করে বলুন, কাকাবাবু আবার ভাল হয়ে যাবেন তো?'

নিশ্চয়ই। যে-কোনও ভাবেই হোক, ওঁকে ভাল করে তুলতেই হবে। ওঁর মাথাটাই তো একটা অ্যাসেট! তা হলে এবার শুয়ে পড়া যাক?'

পাশাপাশি দুটো খাটে ওদের বিছানা। মাঝখানে একটা টেবল্ ল্যাম্প। প্রকাশ সরকার সেই আলো নিবিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু সন্তুর ঘুম আসছে না। সে আকাশ-পাতাল ভাবছে শুধু। কাকাবাবুর কথা মনে করলেই তার কান্না এসে যাচ্ছে। কাকাবাবু যদি পাগল হয়ে যান? না, না, তা হতেই পারে না! কাকাবাবুর মতন সাহসী মানুষ এরকমভাবে নষ্ট হয়ে যাবেন?

যদি সত্যি-সত্যি কাকাবাবুর কিছু হয়, তা হলে সন্তু ছাড়বে না। যারা কাকাবাবুকে ঘুমের গুলি দিয়ে মেরেছে, তাদের সন্তু দেখে নেবে, যদি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েও লুকোয়, তাহলেও সন্তু প্রতিশোধ নেবেই।

কিন্তু তারা কারা?

কাপুরুষের মতন তার কাকাবাবুকে পেছন থেকে গুলি করে পালিয়েছে। কাকাবাবুকে তারা পুরোপুরি মেরে ফেলতেও চায়নি, শুধু তাঁর মাথাটাকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। এটা তো মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

এই সব ভাবতে-ভাবতে কত রাত হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। একটু বোধহয় তন্দ্রার মতন এসেছিল, হঠাৎ একটা আওয়াজে চমকে উঠল সন্তু।

একটা গাড়ি ঢুকেছে কম্পাউন্ডের মধ্যে। ইঞ্জিনের শব্দ খুব জোর। কয়েকজন লোকের কথাও শোনা গেল এর পরে।

সন্তু তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে দাঁড়াল জানলার পাশে।

সার্কিট হাউসের বারান্দার আলো সারা রাত জ্বালাই থাকে। সেই আলোয় দেখা গেল, একটা জোঙ্গা জিপ এসে দাঁড়িয়েছে, তার থেকে দু'তিনজন লোক নেমে কথা বলছে নাইট গার্ডের সঙ্গে।

তাদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এল এদিকে। ঠিক যেন সন্তুর সঙ্গে কথা বলতেই আসছে। সোজা এসে তারপর লোকটি কিন্তু চলে গেল পাশের ঘরের দিকে।

সন্তুর তক্ষুনি মনে পড়ল কাকাবাবুর ঘরের দরজা খোলা আছে। কারণ, কাকাবাবু তো নিজে দরজা বন্ধ করতে পারবেন না, দরজাটা ভেজিয়ে রাখা হয়েছিল। ওই লোকটা কাকাবাবুর ঘরের দিকেই গেল ।

প্রকাশ সরকারকে ডাকবারও সময় পেল না সন্তু। সে অন্ধকারেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ঠিক যা ভেবেছিল তাই। লোকটা নেই। কাকাবাবুর ঘরের একটা পাল্লা খোলা।

সন্তু সেই দরজার কাছে আসতেই তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল সন্তু। তার ধারণা হল, এইবার কেউ তাকে গুলি করবে।

কিন্তু সেরকম গুলি ছুটে এল না।

তার বদলে একজন কেউ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

মানুষের গলার আওয়াজ শুনে অনেকটা ভয় কেটে যায়। সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি কে? আমাদের ঘরে ঢুকেছেন কেন?'

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ফেলল খাটের ওপর কাকাবাবুর মুখের ওপর।

ততক্ষণে সন্তু দরজার পাশের সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ফেলেছে।

কালো রঙের প্যান্ট ও কালো ফুল শার্ট পরা একজন ঢ্যাঙা লোক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা বড় টর্চ। সন্তু আগে কোনও লোককে এরকম টর্চ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেনি।

লোকটা বলল, 'এই চার নম্বর ঘর আমাদের নামে বুক করা ছিল। নাইট গার্ড বলল, 'আমাদের রিজার্ভেশান ক্যানসেল্ড হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস হয়নি। এখন দেখছি, সত্যি এখানে একজন লোক শুয়ে আছে।'

প্রকাশ সরকারও এর মধ্যে উঠে এসেছে।

সে বলল, 'আপনি কে? কিছু জিজ্ঞেস না-করে হুট করে এ-ঘরে ঢুকে এসেছেন কেন?'

লোকটি বলল, 'কেন, তাতে কি হয়েছে? এ ঘর আমাদের নামে বুকিং ...'

প্রকাশ বলল, 'তা হতেই পারে না। একই ঘর কখনও দু'জনের নামে বুক হয়? আপনার বুকিং আছে কি না তা আপনি অফিসে গিয়ে খোঁজ করুন।'

লোকটি বলল, 'আপনারা যখন শুয়ে পড়েছেন, তখন আপনাদের এখন এখান থেকে তুলে দেব না নিশ্চয়ই। দেখি অন্য কি ব্যবস্থা করা যায়।'

সন্তু আর প্রকাশকে পাশ কাটিয়ে লোকটা চলে গেল বাইরে।

প্রকাশ কাকাবাবুর কাছে এসে একটা চোখের পাতায় সামান্য আঙুল ছুঁয়ে বলল, 'উনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, কিছুই টের পাননি। তা হলেও ... এত রাত্রে একটা লোক হুট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে ...'

সন্তু বলল, 'ওরা দেখে গেল।'

প্রকাশ বলল, 'ওরা মানে?'

সন্তু বলল, 'যাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য প্রথমে গৌহাটি যাওয়া হল, তারপর আগরতলায় — সেই তারাই এসে দেখে গেল কাকাবাবু এখানেই এসেছে কি না!'

প্রকাশ হেসে বলল, 'আরে না, না। ও লোকটা একটা উট্‌কো লোক। ওদের বুকিংয়ে বোধহয় কিছু গোলমাল হয়েছে। তাছাড়া, আমরা তো ঠিক কারোর চোখে ধুলো দিতে চাইনি, এমনিই সাবধানতার জন্য ... '

'কিন্তু যে লোকটা এই ঘরে ঢুকেছিল, সেই লোকটা মোটেই ভাল না।'

'তুমি কি করে বুঝলে?'

'ও কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরেছিল। আমি কালো রঙের জামা পরা লোক আগে দেখিনি।'

'ওঃ হো! এই জন্য । ঠিক কালো নয় তো, খুব গাঢ় খয়েরি। এক রঙের প্যান্ট-শার্ট পরা আজকাল ফ্যাশান হয়েছে।'

'ওই রকম চৌকো টর্চ ...'

'গোল আর লম্বা টর্চ হাতে থাকলেই লোকটা ভাল হয়ে যেত?'

'লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে।'

'তোমার দেখছি বড্ড বেশি বেশি সন্দেহ। শোন, আমরা যে আজ আগরতলা এসেছি, তা বাইরের কারুর পক্ষে জানা অসম্ভব।'

'কেন, আমরা কি এখানে মিথ্যে নাম লিখিয়েছি? সার্কিট হাউসের লোকেরা তো জানে। যাই বলুন, ওই লোকটার মুখ দেখে মনে হল, ও কাকাবাবুকে চিনতে পেরেছে।'

'যাঃ, কি যে বল! কাল সকালেই আমি খবর নেব ওরা কারা। এখন চল, শুয়ে পড়া যাক।'

'আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এ-ঘরেই শোব। প্রথম থেকেই আমার তাই করা উচিত ছিল। আপনি বললেন বলে পাশের ঘরে চলে গেলুম।'

'বেশ তো, থাক না।'

সন্তু চট করে পাশের ঘর থেকে জামা কাপড় নিয়ে এল। এঘরেও দুটো খাট। কাকাবাবুর পাশের খাটে কিছু জিনিসপত্র রাখা ছিল। সেগুলো নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল সন্তু।

এবারেও তার ঘুম আসতে অনেক দেরি হল। তার বারবার মনে হচ্ছে, ওই লম্বা লোকটা জোরাল টর্চ নিয়ে কাকাবাবুকে দেখতেই এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু এসে পড়ায় কাকাবাবুর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।

সার্কিট হাউসে জায়গা না পেয়ে ওদের জোঙ্গা জিপটা একটু আগেই চলে গেছে। তা যাক। ওরা যদি শত্রু পক্ষের লোক হয়, তা হলে একজনের চেহারা তো সন্তুর

জানা রইল। কাকাবাবুর কোনও ক্ষতি হলে ওই লোকটাকে সন্তু ঠিক খুঁজে বার করবেই।

পরদিন সন্তুর ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। দরজায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছে।

সন্তু ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, উঠে দরজা খুলে দিল। একজন বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে।

কাকাবাবু জেগে উঠেছেন এর মধ্যেই। চোখ মেলে ঘরের ছাদ দেখছেন।

সন্তু কাছে গিয়ে বলল, 'কাকাবাবু, চা খাবেন?'

কাকাবাবু কোনও উত্তর না দিয়ে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টি।

সন্তু কাকাবাবুর মাথার পেছনে হাত দিয়ে তাঁকে আস্তে-আস্তে বসিয়ে দিল। তারপর কাপে চা ঢেলে নিয়ে এল কাকাবাবুর মুখের সামনে।

কাকাবাবু একটা চুমুক দিলেন।

তারপর খস্‌খসে গলায় বললেন, 'এটা চা নয়। ষাঁড়ের রক্ত। এ জিনিস বাঘে খায়। মানুষে খায় না।'

সন্তু বলল, 'চা-টা ভাল হয়নি বুঝি। আচ্ছা, আমি আবার অন্য চা দিতে বলছি।'

তখন ফিরে সন্তু সেই চায়ের কাপে নিজে একটা চুমুক দিয়ে দেখল। তার তো কিছু খারাপ লাগল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, 'আজ কি ফেব্রুয়ারি মাসের তিন তারিখ?'

সন্তু বলল, 'না তো! এখন তো জুন মাস, আজ আট তারিখ।'

কাকাবাবু বললেন, 'এলতলা বেলতলা, কে এল আগরতলা?'

সন্তু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল 'কি বললেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা, হরিণ বলে কোথায় যাই!'

সন্তুর আবার ভয় করতে লাগল। কাকাবাবু ভুল বকতে শুরু করেছেন। এক্ষুনি প্রকাশ সরকারকে ডাকা দরকার।

সে চলে গেল পাশের ঘরে। সে-ঘর ফাঁকা। প্রকাশ নেই। বাথরুমেও নেই। বাইরে উঁকি দিয়েও দেখা গেল না। সকালবেলা সে কোথায় চলে গেল?

অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না প্রকাশ সরকারকে।

৬

সন্তু এখন ঠিক কি করবে, তা প্রথমে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না।

এখন সে কি প্রকাশ সরকারকে ভাল করে খুঁজে দেখতে যাবে? কিন্তু তা হলে কাকাবাবুর কাছে কে থাকবে? কাকাবাবুকে একা ফেলে রাখা যায় না।

প্রকাশ সরকার এত সকালে কোথায় গেল? সন্তুকে কিছু না বলে সে সার্কিট হাউসের বাইরে চলে যাবে, এটা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। নিশ্চয়ই ওর কোনও বিপদ হয়েছে।

দরজার সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্তু একটুক্ষণ ভাবতে লাগল।

এই জায়গাটায় কারুকেই সে চেনে না। এখানে থাকবার ব্যবস্থা করেছে প্রকাশ সরকার। সে যদি আর না ফেরে, তা হলে তো সন্তু মহা মুশকিলে পড়ে যাবে। কাকাবাবুর চিকিৎসার জন্য এক্ষুনি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।

কপালে হাত দিয়ে সন্তু নিজের ভুরু দুটো সোজা করল। ভুরু কুঁচকে থাকলে চলবে না। কেউ যেন বুঝতেনা পারে সে ঘাবড়ে গেছে। হয়তো শত্রুপক্ষের লোক নজর রাখছে তার দিকে।

কিন্তু কারা শত্রুপক্ষ?

প্রকাশ সরকার যদি সত্যিই আর না ফেরে, তা হলে এখানে সন্তু কতদিন থাকবে কাকাবাবুকে নিয়ে? ফিরবেই বা কি করে?

সন্তু একবার ভাবল, বাড়িতে বাবার কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে।

তারপরই ভাবল, এর আগে যতবার সে কাকাবাবুর সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছে, কোনবারই সে বাড়িতে কোনও বিপদের কথা জানায়নি। মা-বাবা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু এবারে তা ছাড়া উপায়ই বা কি?

এই সময় ঘরের ভেতর থেকে কাকাবাবু গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'ব্রজেশ্বর! সাহেব সিং!'

সন্তু ভেতরে এসে বলল, 'কি কাকাবাবু? কাকে ডাকছেন?

কাকাবাবু গভীর মর্মভেদী দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে।

তারপর বললেন, 'চেনা চেনা লাগছে! তোমার নাম কি খোকা? তুমি কাদের বাড়ির ছেলে?'

'সত্যি করে বল তো, অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ মানে কি? অশ্বত্থামা নামে সত্যিই কি কোন হাতি ছিল? কই, আগে তো কোনদিন ওই নাম শুনিনি!'

সন্তু এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে তা বুঝতে পারল না। তার বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। কাকাবাবু তাকে চিনতে পারছেন না!

প্রচন্ড ধমক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, 'চুপ করে আছ কেন? ঠিক করে বল, 'কাচ্চু মিঞা কোথায়?'

'কাচ্চু মিঞা কে?'

'কাচ্চু মিঞা হল রাবণের ছোট ভাই। রাবণ ছিল লঙ্কার রাজা, আর কাচ্চু মিঞা গোলমরিচের ব্যবসা করে।'

'আমি কোনদিন কাচ্চু মিঞার নাম শুনিনি।'

'কাচ্চু মিঞা জঙ্গলগড় থেকে পালিয়েছে। সে এখন লুকিয়ে আছে কোনও জায়গায়।'

'জঙ্গলগড়? জঙ্গলগড় কোথায়?'

কাকাবাবু শুকনো গলায় হেসে উঠলেন হাঃ হাঃ হাঃ করে। তারপর বললেন, 'অত সহজে কি জানা যায়? তুমি কোন্ দলের স্পাই?'

'কাকাবাবু, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি সন্তু!'

'আমি সবাইকেই চিনি। আমি কুম্ভকর্ণকেও চিনি, আবার বেলগাছতলায় যে বসে থাকে তাকেও চিনি।'

দরজার কাছে একটা ছায়া পড়তেই সন্তু চোখ তুলে তাকাল।

খাঁকি প্যান্ট-শার্ট পরা একজন লোক।

লোকটি বলল, 'প্রকাশ সরকার কে আছে?'

সন্তু বলল, 'আমাদের সঙ্গে এসেছেন। এখন এখানে নেই। কেন?'

লোকটি বলল, 'এখানে নেই? ঠিক আছে!'

সন্তু বলল, 'কেন? কে প্রকাশ সরকারকে খুঁজছে?'

'টেলিফোন আছে।'

সন্তু যেন হাতে স্বর্গ পেল। টেলিফোনে প্রকাশ সরকারকে এখানে কে ডাকবে? নিশ্চয়ই মিলিটারির লোক? কিংবা কলকাতার সেই মিঃ ভার্মা।

সন্তু বলল, 'আমি টেলিফোন ধরছি। আপনি যান। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

সন্তু দেখল কাকাবাবু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

কাকাবাবুকে এক মুহূর্তের জন্যও একা ফেলে রেখে যেতে চায় না সন্তু। কিন্তু টেলিফোনটাও ধরা দরকার।

টেবিলের ওপর তালা-চাবি পড়েছিল, সন্তু সেটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজা টেনে তালা লাগিয়ে দিল। তারপর চাবিটা পকেটে ভরে সে দৌড় লাগাল অফিস-ঘরের দিকে।

ফোন তুলে সন্তু শুধু 'হ্যালো' বলতেই একটি ভারী কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল, 'প্রকাশ সরকার? ইয়োর শেড নাম্বার প্লিজ।'

'সন্তু বলল, 'প্রকাশ সরকার এখানে নেই, কোথায় যেন গেছে। আমি —'

কট্ করে লাইনটা কেটে গেল।

সন্তু পাগলের মতন হ্যালো হ্যালো বলে চিৎকার করলেও আর কোনও শব্দ শোনা গেল না।

সন্তু দারুণ দমে গেল। আসল দরকারি কথাটাই বলা হল না। প্রকাশ সরকারকে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা জানান খুব দরকার ছিল। ওরা তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করত।

হতাশভাবে সন্তু ফিরে এল আবার। চাবি দিয়ে ঘরের দরজা খুলল।

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে মনে হল, উনি দারুণ রেগে গেছেন। কাকাবাবুকে ঘরে তালা বন্ধ করে যাওয়াটা উনি নিশ্চয়ই পছন্দ করেননি। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি?

সকাল থেকে কাকাবাবুর চা-ও খাওয়া হয়নি। সন্তুরও খিদে পেয়েছে।

সে বেয়ারাকে ডাকবার জন্য বেল বাজাল। বেয়ারা খাবার তো দিয়ে যাবে, কিন্তু তারপর পয়সা দেবে কে? কাকাবাবুর কাছে কি টাকাকড়ি আছে? সে না-হয় দেখা যাবে এখন।

বেয়ারা আসতে সন্তু তাকে দুটো ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল। আর বলে দিল, চা যেন খুব ভাল হয়। বাজে চা হলে ফেরত দেওয়া হবে।

কাকাবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ফোন করেছিল?'

সন্তু বলল, 'জানি না! প্রকাশ সরকার নেই শুনেই লাইন কেটে দিল। আমার কোনও কথা শুনলই না। কোড্ নাম্বার জিজ্ঞেস করছিল।'

কাকাবাবু বললেন, 'কালো কোট না সাদা কোট?'

'কোট না, কাকাবাবু, কোড নাম্বার।'

'নাম্বার, প্লাম্বার, স্লাম্বার,কিউকাম্বার ...'

সন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাকাবাবুর কাছ থেকে সাহায্য পাবার কোনও আশাই নেই। প্রকাশ ডাক্তার যে এই সময় কোথায় গেল!

চুপ করে বসে রইল সন্তু। কাকাবাবু আপন মনে অনেক কথা বলে যেতে লাগলেন। সে-সব কোনও কথারই কোনও মানে নেই।

সন্তু ঠিক করে ফেলল, আজ বিকেলের মধ্যে যদি কোনও সাহায্য না আসে, তাহলে বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠাতেই হবে!

বেয়ারা খাবার নিয়ে এল, সঙ্গে এল একজন বেশ সুন্দরী মহিলা। এই পঁচিশ - ছাব্বিশ বছর বয়েস।

মহিলাটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ, সন্তু? ওমা, তুমি কত বড় হয়ে গেছ!'

মহিলাকে সন্তু চেনেই না। জীবনে কখনও দেখেছে বলে মনে হয় না।

মহিলাটি ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, 'কাকাবাবু কোথায়? ও, এই তো কাকাবাবু!'

ঝুঁকে পড়ে মহিলাটি কাকাবাবুর পায়ের ধুলো নিল। তারপর বলল, 'আপনার শরীর এখন ভাল আছে নিশ্চয়ই?'

কাকাবাবু তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন মহিলাটিকে।

সে এবার সন্তুর দিকে ফিরে বলল, 'আমায় তুমি চিনতে পারনি মনে হচ্ছে? আমার নাম ডলি। আমি তোমার মাসতুতো বোন হই। তুমি তোমার বেলি মাসিকে চেন তো? আমি তোমার সেই বেলি মাসির মেয়ে।'

সন্তু ডলি কিংবা বেলি মাসির নাম তো কোনদিন শোনেইনি, এমন কি, আগরতলায় তার যে কোনও মাসি থাকে তাও সে জানে না!

ডলি বলল, 'আমরা আগে শিলচরে থাকতুম। এই তো গত মাসেই বাবা এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জানলেন কি করে যে আমরা ... মানে কাকাবাবু এখানে এসেছেন?'

ডলি বলল, 'বাঃ! জানাটা এমন কি শক্ত! আমার ভাই এয়ারপোর্টে কাজ করে। কাল রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে এসে সে বলল, কাকাবাবু আর সন্তুকে দেখলুম এয়ার ফোর্সের একটা প্লেন থেকে নামতে। কাকাবাবুর মতন লোক এখানে এলে সার্কিট হাউসেই উঠবেন, সেটা খুব স্বাভাবিক। তারপর বল, তোমাদের বাড়ির সবাই কেমন আছেন? আর তোমার কুকুরটা?'

সন্তু ক্রমশই অবাক হচ্ছে। আর এই মাসতুতো দিদি তার কুকুরটার পর্যন্ত খবর রাখে, অথচ সে নিজে ওঁদের সম্পর্কে কিছুই জানে না? মা তো কোনদিন এই বেলি মাসির কথা বলেননি।

ডলি বলল, 'কাকাবাবু, আপনারা আগরতলায় এসে সার্কিট হাউসে থাকবেন, এর কোনও মানে হয় না। আমাদের বাড়িতে যেতেই হবে। আমাদের মস্ত বড় কোয়ার্টার ... মা বললেন, যা ডলি, যেমন করে পারিস কাকাবাবু আর সন্তুকে নিয়ে আয়।'

সন্তু বলল, 'কাকাবাবু এখন নিজে নিজে হাঁটতে পারেন না।'

ডলি বলল, 'জানি, সে খবরও পেয়েছি। তুমি আর আমি ধরে-ধরে নিয়ে যাব। আমি একটা গাড়ি এনেছি সঙ্গে।'

সন্তু বলল, 'আমাদের এখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়া বারণ। এখানেই থাকতে হবে।'

ডলি বলল, 'বারণ? কে বারণ করেছে?'

সন্তু বলল, 'না, মানে, আমাদের সঙ্গে আর একজন ছিলেন, তিনি এখন নেই। সেইজন্যই এখন অন্য কোথাও যাওয়া মুশকিল।'

ডলি বলল, 'তাতে কি হয়েছে? এখানে আমাদের ঠিকানা রেখে যাব। তিনিও পরে যাবেন। নাও, খাবার ঠান্ডা করছ কেন, আগে খেয়ে নাও! কাকাবাবুকে খাইয়ে দিতে হবে তো? আমি দিচ্ছি।'

সন্তু দেখতে চাইল, ডলি নামের এই মেয়েটি খাইয়ে দেওয়ায় কাকাবাবু কোনও আপত্তি করবেন কি না।

কিন্তু কাকাবাবু একটুও আপত্তি করলেন না। লক্ষ্মীছেলের মতন সব খেয়ে নিতে লাগলেন।

খেতে-খেতে একবার মুখ তুলে ছেলেমানুষের মতন গলা করে বলে উঠলেন, 'মাসির বাড়ি দারুণ মজা কিল-চড় নাই!'

৭

ডলি নামের মেয়েটি খুব যত্ন করে খাইয়ে দিল কাকাবাবুকে। তারপর মুখ ধুইয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল। তারপর বলল, 'এবার চলুন, কাকাবাবু।'

সন্তুর দিকে ফিরে বলল, 'সন্তু, তুমি সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে-টুছিয়ে নাও।'

সন্তু পড়েছে মহা মুশকিলে। সে বুঝতে পারছে যে, এখন এই সার্কিট হাউস ছেড়ে অচেনা কোনও মাসির বাড়িতে যাওয়া তাদের উচিত নয়। চারিদিকে যেন বিপদের গন্ধ। সার্কিট হাউসে তবু অনেক লোকজন আছে, পাহারা দেবার ব্যবস্থা আছে। আর্মির লোকেরাও নিশ্চয়ই এখানে একবার খোঁজ-খবর নিতে আসবে। অথচ এই মহিলাটি এমন জোর করছে, যেন যেতেই হবে।

অবশ্য আরও একটা ব্যাপার আছে। কাকাবাবু সন্তুর হাতে খেতে চান না। সন্তুর সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেন না। বোধহয় তিনি আর সন্তুকে চিনতেই পারছেন না। এই অবস্থায় কাকাবাবুর দেখাশুনো করা তো একা সন্তুর পক্ষে সম্ভব নয়। আর একজন কারুর সাহায্য দরকার।

তবু সন্তু আমতা আমতা করে বলল, 'এখন না গিয়ে বিকেলে গেলে হয় না?'

ডলি বলল, 'কেন, বিকেলে কেন? এখন গাড়ি এনেছি, বিকেলে গাড়ি পাব না। তা ছাড়া মা তোমাদের জন্য ইলিশ আর গল্‌দা চিংড়ি আনতে দিয়েছেন।'

কাকাবাবু যোগীপুরুষদের মতন হাত দুটো ওপর দিকে তুলে বললেন, 'এই যে! শিগগির!'

সন্তু ওই ভঙ্গিটার মানে বোঝে। কাকাবাবু গেঞ্জি পরে আছেন, এখন তিনি জামা পরতে চান। তাঁকে জামা পরিয়ে দিতে হয়। হাত উঁচু করতেও কাকাবাবুর কষ্ট হয়। ওই ভাবে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না।

অর্থাৎ কাকাবাবু যেতে চাইছেন!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তু চটপট জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলল। কিন্তু তারপরই তার মনে পড়ল, সার্কিট হাউস ছেড়ে গেলে এখানকার বিল মেটাবে কে? সন্তুর কাছে মোটে দশ টাকা আছে। কাল রাত্তিরে প্রকাশ সরকার বলেছিল, কাকাবাবুর জন্য যা খরচপত্তর হবে সব ভারত সরকার দিয়ে দেবে! কিন্তু সে-সব ব্যবস্থা করবার ভার প্রকাশ সরকারের ওপর। সেই প্রকাশ সরকারই তো নেই।

ডলি বলল, 'চল, চল, আর দেরি করছ কেন?'

সন্তু বলল, 'আমাদের তো যাওয়া হবে না। সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলে আমাদের বিল মেটাবে কে?'

ডলি তক্ষুনি এ সমস্যার সমাধান করে দিল।

সে বলল, 'তা হলে জিনিসপত্তর এখন নেবার দরকার নেই, সব এখানেই থাক। ঘরে তালা দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। পরে আমার বাবা এসে টাকাপয়সা দিয়ে বিল মিটিয়ে সব জিনিসপত্তর নিয়ে যাবেন।'

আর আপত্তি করা যায় না, এবার যেতেই হবে।

সন্তু আর ডলি কাকাবাবুর দু'দিকে গিয়ে দাঁড়াল, কাকাবাবু ওদের দু'জনের কাঁধে হাত রাখলেন, সেইভাবে তিনজনে বার হল ঘর থেকে।

দরজায় তালা লাগাবার সময় সন্তুর মনে পড়ল, কাকাবাবুর কাছে এমন কয়েকটা দরকারি জিনিস থাকে, যা তিনি কখনো হাতছাড়া করতে চান না। তিনি যেখানেই যান, একটা কালো হ্যান্ডব্যাগ তাঁর সঙ্গে থাকে। এবারে কাকাবাবু সেই ব্যাগটা নিয়ে যাবার কথা কিছুই বললেন না। ব্যাগটা নিয়ে যাওয়া উচিত, না এখানেই রেখে গেলে ভাল হয়, তা সন্তু বুঝতে পারল না।

তবু সন্তু জিজ্ঞেস করল,'কাকাবাবু, কালো ব্যাগটা —'

কাকাবাবু বললেন, কার ব্যাগ? কিসের ব্যাগ? কেন ব্যাগ? আমি ব্যাগ-ট্যাগের কথা কিছু জানি না।'

সন্তু আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

হাঁটা শুরু করার পর কাকাবাবু ডলিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা লক্ষ্মী তুমি আগে আমাকে কতবার দেখেছ?'

ডলি বলল, 'অনেকবার। এই তো শেষবার দেখা হল, বছর চারেক আগে, আমরা পুজোর সময় কলকাতায় গিয়েছিলুম, তখন আপনার সঙ্গে দেখা হল .... আপনার অবশ্য মনে থাকবার কথা নয়, আপনি ব্যস্ত লোক।'

কাকাবাবু বললেন, 'কেন মনে থাকবে না? খুব মনে আছে। সেবার রাস্তায় খুব জল জমেছিল, তুমি জলে ভাসতে ভাসতে এসে থামলে আমাদের বাড়ির সামনে।'

ডলি একটু চমকে গিয়ে বলল, 'জলে ভাসতে ভাসতে? হ্যাঁ, রাস্তায় জল জমেছিল বটে. তবে হাঁটু পর্যন্ত। আমি তো জলে ভাসিনি।'

কাকাবাবু বললেন. 'ভাসোনি? বাঃ. বললেই হল! তুমি একবার ডুবলে, একবার ভাসলে। একবার ডুবলে. একবার ভাসলে, একবার ডুবলে .....'

কাকাবাবু ওই একই কথা বলে যেতে লাগলেন বারবার।

সার্কিট হাউসের সামনে দিয়ে একটা লম্বা টানা বারান্দা। সেই বারান্দার অন্য দিক দিয়ে দু'জন লম্বামতন লোক জুতোর শব্দ করে হেঁটে আসছে এদিকে।

ডলি বলল, 'চল সন্তু, আমরা উঠোন দিয়ে নেমে যাই। আমাদের গাড়িটা ওই দিকেই আছে।'

সন্তুর কেন যেন মনে হল, 'ওই লোক দুটি তাদের খোঁজেই আসছে । শত্রু, না মিত্র? শত্রু হলেও এখন পালাবার কোনও উপায় নেই। সুতরাং দেখাই যাক না। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোক দুটি ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল একজন, 'আপনিই তো মিঃ রায়চৌধুরী?'

কাকাবাবু যদি কিছু উল্টো-পাল্টা বলেন এই ভয়ে সন্তু আগে থেকেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনিই।'

প্রথমজন বলল, 'নমস্কার। আমার নাম শিশির দত্তগুপ্ত। আমি এখানকার ডি এস পি। আর ইনি অরিজিৎ দেববর্মন, এখানকার হোম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি। কাল রাত্তিরে আমরা দিল্লি থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি যে, আপনি এখানে এসেছেন। তাই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছি।'

কাকাবাবু লোক দুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, কোনও কথা বললেন না।

শিশির দত্তগুপ্তর মাথার চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া, বেশ বড় একটা গোঁফ আছে, সেটাও কোঁকড়া মনে হয়। আর অরিজিৎ দেববর্মনের মাথার ঠিক মাঝখানটায় একটা ছোট্ট গোলমতন টাক। তাঁর গোঁফ নেই।

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন,'ডঃ প্রকাশ সরকার কোথায়? তাঁরও তো আপনাদের সঙ্গে থাকবার কথা। আপনারা কি বাইরে কোথাও যাচ্ছিলেন?'

সন্তু বলল, 'প্রকাশ সরকারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? তার মানে?'

সন্তু বলল, 'সকালবেলায় উনি আমাদের কিছু না বলে কোথায় চলে গেছেন। এতক্ষণেও ফেরেননি!'

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! এ রকম তো হওয়া উচিত না। মিঃ রায়চৌধুরীকে ফেলে রেখে উনি চলে গেলেন? চলুন, ঘরে বসা যাক, পুরো ব্যাপারটা শুনি।'

ডলি কাকাবাবুর হাতটা নিজের কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, 'তা হলে আমি চলে যাই?'

শিশির দত্তগুপ্ত একদৃষ্টিতে ডলিকে দেখছিলেন, এবার ভুরু কুঁচকে বললেন, তোমার নাম চামেলি না? তুমি এর মধ্যেই আবার কাজ শুরু করে দিয়েছ? আপনারা একে চেনেন? আগে দেখেছেন কখনও?'

সন্তু আমতা আমতা করে বলল, 'মানে, ঠিক চিনি না, তবে ইনি বললেন, ইনি আমার এক মাসির মেয়ে .... মানে, মাসতুতো বোন, আমাদের যেতে বললেন ওঁর সঙ্গে ...'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'মাসতুতো বোন?' তারপরই হেসে উঠলেন হা— হা করে।

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু চামেলি ওরফে ডলির দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'একবার ভাসলে, একবার ডুবলে!'

সঙ্গে-সঙ্গে চামেলি ওরফে ডলি কেঁদে উঠল হাউহাউ করে।

কাকাবাবুকে ছেড়ে শিশির দত্তগুপ্তর একটা হাত চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'স্যার, আমায় বাঁচান। আপনি আমায় বাঁচান। ওরা আমায় মেরে ফেলবে।'

শিশির দত্তগুপ্ত বাঁকাভাবে বললেন, 'আবার নাটক করছ? তোমার অভিনয় আমি ঢের দেখেছি।'

চামেলি ওরফে ডলি বলল, 'সত্যি বলছি স্যার। আমি বাইরে বেরুলেই ওরা মেরে ফেলবে আমায়। আপনি আমাকে বাঁচান।'

'ওরা মানে কারা?'

'তাদের চিনি না। কয়েকজন গুন্ডামতন লোক, তারা বলেছে, যদি কাজ উদ্ধার করতে না পারি, তা হলে তারা আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে।'

'কাজ মানে, কি কাজ?'

'কাকাবাবুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোন রকমে এখান থেকে নিয়ে যেতে বলেছিল। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

'কোথায় গাড়ি? কি রঙের গাড়ি? কত নম্বর?'

'নম্বর জানি না। কালো রঙের অ্যাম্বাসাডর।'

শিশির দত্তগুপ্ত তক্ষুনি পেছন ফিরে দৌড়ে চলে গেলেন গেটের দিকে।

চামেলি ওরফে ডলির কান্নাকাটি শুনে আরও কয়েকজন লোক ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্যি-সত্যি চোখের জলে চামেলির গাল ভেসে যাচ্ছে।

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, 'আপনাদের ঘর কোনটা? চলুন ভেতরে গিয়ে বসা যাক।'

সন্তু বলল, 'আপনি একটু কাকাবাবুকে ধরুন, উনি নিজে নিজে হাঁটতে পারেন না। আমি ঘরের তালা খুলছি।'

চামেলি তখনও ফুঁসে ফুঁসে কাঁদছে। অরিজিৎ দেববর্মন কড়া গলায় বলল, 'কান্না থামাও! তুমি রায়চৌধুরীকে অন্যদিকে ধর।

ওরা কাকাবাবুকে ধরে ধরে ফিরিয়ে আনতে লাগল। সন্তু যখন চাবি দিয়ে তালা খুলছে, সেই সময়ে একটা অদ্ভুত কান্ড করল চামেলি। সে কাকাবাবুকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল অরিজিৎ দেববর্মনের গায়ে। টাল সামলাতে না পেরে দু'জনেই পড়ে গেলেন মাটিতে।

সন্তু অবাক হয়ে পেছন ফিরে ব্যাপারটা দেখে চামেলিকে তাড়া করতে যাচ্ছিল, অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, 'থাক, ছেড়ে দাও। বোকা মেয়ে, এইভাবে কেউ পালাতে পারে! ঠিক ধরা পড়ে যাবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'চিংড়ি মাছের মালাইকারি, ইলিশ মাছে সর্ষে বাটা ... ফসকে গেল, ফসকে গেল!'

৮

সন্তু ঘরের দরজা খুলে প্রথমে কাকাবাবুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। তারপর অরিজিৎ দেববর্মনকে বলল, 'আপনি একটু এখানে থাকবেন, আমি একটু বাইরেটা দেখে আসব?'

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই! শিশিরবাবু ঠিক চামেলিকে ধরে নিয়ে আসবেন।'

সন্তু তবু দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বলল, 'উনি আমাদের কাছে ওঁর নাম বলেছিলেন ডলি। বললেন যে, আমার মাসতুতো বোন, আমাদের বাড়িতে অনেকবার গেছেন।'

অরিজিৎবাবু বললেন, 'ওর যে কত নাম তার ঠিক নেই। ওর কাজই হল কলকাতা-আগরতলা প্লেনে উঠে অন্য যাত্রীদের হ্যান্ডব্যাগ চুরি করা। এই তো মাত্র কয়েকদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে!'

সন্তুর কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। সে আগে কখনও কোনও মেয়ে-চোর দেখেনি। ডলি ওরফে চামেলির কথাবার্তাগুলো যেন তার প্রথম থেকেই কেমন অদ্ভুত লাগছিল, তা বলে ও যে চুরি করে, তা সে ধারণাই করতে পারেনি।'

অরিজিৎবাবুর কথাই ঠিক হল। চামেলি ধরা পড়ে গেছে। সন্তু দেখল, শিশির দত্তগুপ্ত তার এক হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে আসছেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে আসছে একদঙ্গল লোক!

শিশিরবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বার পরেও লোকগুলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। শিশিরবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, 'এই যে ভাই, আপনারা সব যান তো! এখানে ভিড় করবেন না!'

সন্তু গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

চামেলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নকল কান্না নয়, জলের ধারা গড়াচ্ছে তার দু'গাল বেয়ে।

শিশিরবাবু কড়া গলায় বললেন, 'কান্না থামাও! হঠাৎ এরকম নাটক শুরু করে দিলে কেন? এখানে এসেছিলে কি মতলবে?'

কাঁদতে কাঁদতে চামেলি বলল, 'ওরা পাঠিয়েছিল। ওরা বলেছিল, এ কাজ ঠিকঠিক না করতে পারলে ওরা আমায় মেরে ফেলবে।'

'ওরা মানে কারা? তাদের নাম বল।'

'নাম আমি জানি না। তাদের ভয়ংকর চেহারা, দেখলেই মনে হয় মানুষ খুন করতে পারে। তারা বলল, কাকাবাবুকে যে-কোনও উপায়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে গাড়িতে নিয়ে এস। নইলে তুমি প্রাণে বাঁচবে না!'

অরিজিৎবাবু বললেন, 'ভাগ্যিস আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম। প্রায় তো নিয়েই যাচ্ছিল মেয়েটা!'

শিশিরবাবু বললেন, 'না, না, এ মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে। এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে। আমি বাইরে গিয়ে কোনও কালো অ্যামবাসাডার দেখতে পাইনি। কাল রাত্তিরে দিল্লি থেকে খবর পাওয়ার পর আজ ভোর থেকেই আমি সার্কিট হাউসের বাইরে দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। তারা বলল, অন্তত এক ঘন্টার মধ্যে ওরকম কোনও কালো গাড়ি এখানে আসেনি। চামেলিকে তারা ঢুকতে দেখেছে, চামেলি এসেছে সাইকেল রিকশা করে।'

চামেলি তবু হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'স্যার বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কথা বলছি। কালো গাড়িটা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল, একবারে কাছে আসতে চায়নি।'

শিশিরবাবু বললেন, 'কতটা দূরে গাড়িটা রেখেছিল?'

'প্রায় আধমাইল।'

'এতদূরে তুমি মিঃ রায়চৌধুরীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে?'

'না না, সাইকেল রিকশায়।'

শিশিরবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমায় কি বলেছিল? সার্কিট হাউসের বাইরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, না?'

সন্তু আমতা-আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ .. মানে, সেইরকমই বলেছিলেন।'

কাকাবাবু ঘরে ঢোকার পর থেকেই চোখ বুজে আছেন। যেন তিনি কিছুই শুনছেন না; এ-সব ব্যাপারে তাঁর কোনও আগ্রহই নেই।

চামেলি আবার বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমার কোনও দোষ নেই? ওরা আমায় ভয় দেখিয়ে সব করিয়েছে।'

অরিজিৎবাবু বললেন, 'কাজ হাসিল তো তুমি করতে পারনি। তবু তুমি পালাবার চেষ্টা করলে কেন? তোমার সেই 'ওরা' না হয় তোমাকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল, তা বলে আমরা কি তোমায় খুন করতাম?'

'কি জানি স্যার, আপনাদের দেখেই আমার মাথাটা হঠাৎ কেমন গোলমাল হয়ে গেল।'

তারপর সে হঠাৎ কাকাবাবুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'কাকাবাবু, আপনি আমায় মাপ করুন। আমি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি... ছি ছি ছি ছি, আমি কি অন্যায় করেছি! আমার মাথার ঠিক ছিল না ... বলুন, কাকাবাবু, আপনি আমায় ক্ষমা করবেন বলুন!'

সন্তু একেবারে শিউরে উঠল। কাকাবাবুর একটা পা ভাঙা বলেই কেউ তাঁর পায়ে হাত দিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। এমন কি কারুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও দেন না। নিশ্চয়ই কাকাবাবু এবার খুব রেগে উঠবেন।

কিন্তু কাকাবাবু চোখ মেলে খুব শান্তভাবে বললেন, 'একে ছেড়ে দিন। এই *মেয়েটি এখানে রয়েছে কেন?'*

অরিজিৎবাবু ও শিশিরবাবু দু'জনেই চমকে উঠলেন।

শিশিরবাবু বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি একে ছেড়ে দিতে বলছেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, মেয়েটি এখন বাড়ি যাক্।'

শিশিরবাবু বললেন, 'এই মেয়েটি দাগী আসামী। ওকে জেরা করলে অনেক কিছু জানা যেতে পারে। আচ্ছা মিঃ রায়চৌধুরী, কারা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে চাইছিল, সে সম্পর্কে আপনার কোনও আইডিয়া আছে? আগরতলায় আপনার কোন শত্রু আছে।'

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'দারা-পুত্র-পরিবার তুমি কার কে তোমার? হায়, হায়, হায়, হায়! সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়! হায়, হায়, হায় , হায়!'

শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। শিশিরবাবুর মুখখানা গোমড়া হয়ে গেল। অরিজিৎবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তো খুব সিরিয়াস। দিল্লি থেকে যা খবর এসেছে ...'

কাকাবাবু বললেন, 'রামনরেশ ইয়াদব কভি নেহি দিল্লি গিয়া!'

সন্তু ফিসফিস করে শিশিরবাবুকে বলল, 'শুনুন, আমার কাকাবাবুর মাথায় কিরকম যেন গোলমাল হয়ে গেছে। ওঁর এক্ষুনি চিকিৎসা করা দরকার।'

শিশিরবাবু বললেন, 'ইজ দ্যাট সো?'

কাকাবাবু সন্তুর দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, 'এই খোকা, বড়দের সামনে ফিসফিস করে কানে কানে কথা বলতে নেই, জান না? ব্যাড ম্যানার্স'! যাও, তোমার দিদির সঙ্গে বাড়ি চলে যাও।'

সন্তুর যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে! কাকাবাবু তাকে আর একদম চিনতে পারছেন না।

এমন কি চামেলি পর্যন্ত কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে আছে কাকাবাবুর দিকে।

অরিজিঁৎবাবু বললেন, 'তা হলে তো এঁর এক্ষুনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। ডক্টর প্রকাশ সরকারই বা কোথায় গেলেন?'

শিশিরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি চামেলিকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে ওকে আপাতত আটকে রাখুক। মিঃ রায়চৌধুরীর চিকিৎসার ব্যবস্থা কি এখানে সুবিধে হবে, না হাসপাতালে পাঠাবেন?'

অরিজিৎবাবু বললেন, 'এখানে নানা লোকের ভিড়। মহারাজার গেস্ট হাউস খালি আছে, আমি ভাবছিলাম মিঃ রায়চৌধুরীকে সেখানে রাখলে কেমন হয়। সেখানে চিকিৎসার কোনও অসুবিধা হবে না। একজন নার্স রেখে দিলেই হবে।'

চামেলি বলে উঠল, 'আমায় নার্স রাখুন। আমি নার্সিং খুব ভাল জানি। আমি কাকাবাবুর সেবা করব!'

অরিজিৎবাবু বললেন, 'এ মেয়ের আবদার তো কম নয়। একটু আগে মেয়েটা ভদ্রলোককে ডাকাতদের হাতে তুলে দিচ্ছিল, এখন আবার বলে কি না সেবা করব!'

চামেলি বলল, 'একবার ভুল করেছি বলে বুঝি ক্ষমা করা যায় না?' আমি কাছাকাছি থাকলে ওরা আর কাকাবাবুকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে না।'

শিশিরবাবু বললেন, 'এবার সত্যি করে বল তো, ওরা মানে কারা?'

'আপনি আমায় ঠিক বাঁচিয়ে দেবেন বলুন? আমি ওদের মধ্যে একজনকে চিনি। সে হচ্ছে জগদীপ!'

'জগদীপ!'

'হ্যাঁ, জগদীপই তো একটা রিভলভার আমার কপালে ঠেকিয়ে বলল....'

'ওঃ, এই মেয়েটা কি অসহ্য মিথ্যেবাদী! জগদীপ গত ছ'মাস ধরে জেল খাটছে, আর সে কিনা ওর কপালের সামনে রিভলভার তুলতে এসেছে?'

'হ্যাঁ স্যার, সত্যি বলছি, জগদীপই আমায় ভয় দেখিয়েছে। জগদীপ জেল থেকে পালিয়ে গেছে, জানেন না?'

'একদম বাজে কথা!'

ঠিক তখনই ঠকঠক করে শব্দ হল দরজায়।

সন্তু দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখল, 'একজন বেশ লম্বা আর বলিষ্ঠ লোক, সাদা ধুতি আর সাদা হাফশার্ট পরা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। দেখলেই বোঝা যায় লোকটি পুলিশ। কেন যে এদের সাদা পোশাকের পুলিশ বলে, তা কে জানে। একবার তাকালেই তো পুলিশ বলে চেনা যায়।

লোকটি প্রথমে শিশিরবাবুর দিকে তাকিয়ে লম্বা স্যালুট দিল। তারপর অরিজিৎবাবুকে।

শিশিরবাবু ওকে দেখেই বললেন, 'এই তো ভজনলাল! তুমি বল তো, জগদীপ এখন কোথায়? সে জেলে আছে না?'

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ স্যার!'

'সে কি জেল ভেঙে পালিয়েছে এর মধ্যে?'

'না স্যার!'

শিশিরবাবু অন্যদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'দেখলেন, মেয়েটা কি রকম মিথ্যে কথা বলে?'

চামেলি একটুও লজ্জা না পেয়ে বলল, 'তা হলে বোধহয় জগদীপ নয়। তা হলে বোধহয় ওর নাম রাজাধিপ।'

শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু দু'জনেই দারুণ চমকে উঠলেন এই নামটা শুনে।

অরিজিৎবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, 'প্রিপস্টারাস! এ তো সাংঘাতিক মেয়ে।'

শিশিরবাবু বললেন, 'একে আবার জেলে না দিয়ে উপায় নেই।'

বাইরের সাদা পোশাকের পুলিশটি এবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'স্যার!'

শিশিরবাবু বললেন, 'ও! কি ব্যাপার, ভজনলাল?'

সেই লোকটি বলল, 'স্যার, গেটের কাছে একটা সাইকেল রিকশা একজন লোককে নিয়ে এসেছে। লোকটা অজ্ঞান!

শিশিরবাবুর সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুও ছুটল গেটের দিকে।

৯

সন্তুর ধারণা হল বাইরে গিয়ে সে ডক্টর প্রকাশ সরকারকে দেখতে পাবে। কারণ ভোর থেকে প্রকাশ সরকারের উধাও হয়ে যাবার সে কোনও যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু বাইরে এসে দেখল, একটা সাইকেল-রিকশার ওপর একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোক গা এলিয়ে শুয়ে আছে। দেখলে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। লোকটির গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি, পায়ের চটিও বেশ দামি। কিন্তু লোকটির চেহারার সঙ্গে এই পোশাক যেন একেবারেই বেমানান। লোকটির গায়ের রং পোড়া-পোড়া, মুখে পাঁচ-ছ'দিনের খোঁচাখোঁচা দাড়ি, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো।

শিশির দত্তগুপ্ত আর অরিজিৎ দেববর্মনও লোকটিকে চিনতে পারলেন না।

সাইকেল-রিকশা-চালকটি হতভম্ব মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শিশিরবাবু প্রথমে শুয়ে-থাকা লোকটির হাত ও বুক পরীক্ষা করে দেখলেন যে সে বেঁচে আছে কি না। তারপর রিকশা-চালককে জিজ্ঞেস করলেন , কী ব্যাপার, একে কোথায় পেলে?'

রিকশাচালক বলল, 'বাবু, আমি তো কিছুই বুঝতে পারতেছি না। ফিসারি অফিসের ধার থেকে দুটি বাবু কাঁধ ধরাধরি করে উঠলেন। আমারে হেঁকে বললেন, সার্কিট হাউস চল! খানিকবাদে আমি একবার পিছু ফিরে দেখি এক বাবু নেই। আর-এক বাবু এরকম ধারা এলিয়ে পড়ে আছেন।'

'একজন মাঝপথ থেকে নেমে গেল, 'তুমি টেরও পেলে না?'

'না বাবু! আমি তো আগে আর পেছুন ফিরে তাকাইনি!'

'কিন্তু গাড়ি তো হালকা হয়ে গেল। তা ছাড়া একজন লোক নেমে গেলে গাড়িতে একটা ঝাঁকুনিও তো লাগবে?'

'মাঝখানে এক জায়গায় রাস্তা খারাপ ছিল, সেখানে এমনিতেই তো গাড়ি লাফাচ্ছিল!'

'যে লোকটি নেমে গেছে, তাকে দেখতে কেমন মনে আছে?'

'জামা আর প্যান্টুলুন পরা এমনি সাধারণ ভদ্দরলোকের মতন!'

'আর এই লোকটি কি তখন নিজে থেকেই তোমার রিকশায় উঠেছিল?'

'অন্য বাবুটির কাঁধ ধরাধরি করে এল। আমি ভাবলুম বুঝি শরীর খারাপ।'

সন্তু বলল, 'চামেলি এই লোকটিকে চেনে কিনা একবার দেখলে হয়।'

শিশিরবাবু বললেন, 'এমনও হতে পারে, এই লোকটির সঙ্গে মিঃ রায়চৌধুরীর কেসের কোনও সম্বন্ধই নেই। এ হয়তো সার্কিট হাউসের অন্য ঘরে থাকে। যাই হোক, দেখা যাক।'

ধরাধরি করে লোকটিকে নিয়ে আসা হল সার্কিট হাউসের অফিস ঘরে। ম্যানেজার কিংবা দারোয়ানরা কেউই লোকটিকে চেনে না।

সন্তু গিয়ে চামেলিকে ডেকে আনল। অরিজিৎবাবু রইলেন কাকাবাবুর কাছে।

চামেলি লোকটিকে দেখে বলল, 'ও মা, এ আবার কে? একে তো কখনও দেখিনি।'

শিশিরবাবু সার্কিট হাউসের ম্যানেজারকে বললেন, লোকটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে। একজন পুলিশ সেখানে রেখে দিলেন লোকটিকে পাহারা দেবার জন্য।

কাকাবাবুর ঘরে ফিরে এসে সন্তু জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলল। তাদেরও সার্কিট হাউস ছেড়ে চলে যেতে হবে। শিশিরবাবু এখানকার মহারাজার একটি গেস্ট হাউসে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

চামেলি এই সময় বলল, 'স্যার, আমি তাহলে এবারে যাই?'

অরিজিৎবাবু বললেন,'তুমি যাবে? কোথায় যাবে?

'বাড়ি যাব। আমি আর এখানে থেকে কি করব?'

'তোমার আবার আগরতলায় বাড়ি আছে নাকি? আমি তো যতদূর জানি তোমার বাড়ি ধর্মনগরে।'

'না, মানে, এখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে।'

'তোমার বন্ধু কে, তার নামটা তো জানতে হচ্ছে। সে-ও নিশ্চয় তোমারই মতন।'

শিশিরবাবু বললেন, 'একটু আগে তুমি বললে, তুমি কাজ হাসিল না করতে পারলে ওরা তোমায় মেরে ফেলবে। তারপর একটু বাদে বললে, তুমি আগের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কাকাবাবুর সেবা করবে। আবার এখন বলছ বন্ধুর বাড়ি যাবে। তুমি দেখছি পাগল করে দেবে আমাদের!'

অরিজিৎবাবু বললেন, 'তোমায় আর ছাড়া হবে না। জেলখানাই তোমার পক্ষে ভাল জায়গা।'

চামেলি যেন খুব ভয় পেয়ে গেছে, এই ভাবে বলল, 'না, না, আমায় আর জেলে পাঠাবেন না। আমার জেলের মধ্যে থাকতে একদম ভাল লাগে না!'

কাকাবাবু আগাগোড়া চুপ করে চোখ বুজে বসে আছেন। এসব কথা শুনছেন কি না কে জানে!

শিশিরবাবু এবার বললেন,'মিঃ রায়চৌধুরী, উঠুন, এখন আমাদের যেতে হবে।'

সন্তু বলল, 'ওঁকে ধরে-ধরে তুলতে হবে। উনি নিজে হাঁটতে পারেন না।'

শিশিরবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো! চল তুমি আর আমি ও কে ধরে নিয়ে যাই।'

কাকাবাবু এবারেও কোনও কথা বললেন না, ওদের বাধাও দিলেন না।

সার্কিট হাউস ছেড়ে বাইরে যাবার সময় সন্তুর মনে পড়ল ডাক্তার প্রকাশ সরকারের কথা। ভদ্রলোক কোথায় যে গেলেন? এরপর তিনি ফিরে এলেও সন্তুদের খুঁজে পাবেন কি না কে জানে!

শিশিরবাবু একটা স্টেশন ওয়াগান আনিয়েছিলেন। সেটার পেছন দিকে শুইয়ে দেওয়া হল কাকাবাবুকে। তারপর গাড়িটা ছেড়ে দিল।

ত্রিপুরার রাজাদের অনেকগুলো বাড়ি। তার মধ্যেই কয়েকটি বাড়িকে অতিথিশালা করা হয়েছে। সন্তুরা যে বাড়িটাতে এসে পৌঁছল, সেটা দেখলে রাজার বাড়ি মনে হয় না। বাড়িটা এমনিতে বেশ সুন্দর, ছোটখাটো দোতলা। সাদা রঙের। সামনে অনেকখানি বাগান। মনে হয় কোনও সাহেবের বাড়ি। হয়তো এক সময় কোনও সাহেবেরই ছিল।

সবাই মিলে উঠে এল ওপরে। দোতলায় মাত্র তিনখানা ঘর আর বেশ চওড়া বারান্দা। এর মধ্যে মাঝখানের ঘরটা সন্তুদের জন্য খুলে রাখা হয়েছে।

অরিজিৎবাবু বললেন, 'নিচে রান্নার লোক আছে, কেয়ারটেকার আছে, যখন যা চাইবে দেবে। তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। একজন নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে সারাক্ষণ থাকবে। আর একজন ডাক্তারও এসে দেখে যাবেন একটু বাদে।'

শিশিরবাবু বললেন, 'একতলার ঘরে দুজন পুলিশও থাকবে। অচেনা কোনও লোককে ওরা ওপরে আসতে দেবে না। তোমরাও কোনও অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা কোর না। তোমার কাকাবাবুর এখন একদম চুপচাপ নিরিবিলিতে থাকা উচিত।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'এখানে টেলিফোন আছে? হঠাৎ কোনও দরকার পড়লে খবর দেব কি করে?

শিশিরবাবু বললেন, হ্যাঁ একতলায় টেলিফোন আছে। তাছাড়া কোনও দরকার হলে আমার পুলিশদের বোল, ওরাই সব ব্যবস্থা করবে।'

অরিজিৎবাবু বললেন, 'আমায় এক্ষুনি অফিসে যেতে হবে দিল্লিতে সব খবর জানান দরকার। সন্তু কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে কোনও খবর পাঠাতে হবে?'

একটু চিন্তা করে সন্তু বলল, ' না, থাক।'

শিশিরবাবুও কাজ আছে, তাঁকেও এখন যেতে হবে। দুজনেই 'আবার বিকেলে আসব' বলে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে।

বারান্দার এটা ইজিচেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কাকাবাবুকে। অনেকক্ষণ থেকে তিনি একেবারে চুপ করে আছেন। শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু এর মধ্যে কাকাবাবুর সঙ্গে দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কাকাবাবু কোনও উত্তর দেননি। এখন তিনি একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আকাশের দিকে।

কাকাবাবুর বেশ কয়েক কাপ কফি খাওয়ার অভ্যেস সকালবেলা। আজ উনি মোটে এক কাপ চা খেয়েছেন। বেলা এখন প্রায় এগারোটা। সেইজন্য সন্তু কাকাবাবুর কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'কাকাবাবু, কফি খাবেন? আমাদের সঙ্গে কফি আছে, নিচের লোকদের বানিয়ে দিতে বলতে পারি।'

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে মুখ ফেরালেন সন্তুর দিকে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তারপর বললেন, 'তুমি .. তুই সন্তু না?'

সন্তু ব্যগ্রভাবে বলল, 'হ্যাঁ, কাকাবাবু!'

'একবার মনে হচ্ছে সন্তু, আর একবার মনে হচ্ছে সিংমা। আমি কিছুই মনে রাখতে পারছি না রে। মাথার মধ্যে সব যেন কিরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

এ-কথা শুনেও সন্তু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কাল রাত্তির থেকে সে কাকাবাবুর মুখে এত স্বাভাবিক কথা আর শোনেনি।

সে বলল, 'কাকাবাবু, আপনি কয়েকদিন একটু বিশ্রাম নিন, তা হলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমরা কোথায় এসেছি রে? এই জায়গাটা কোথায়?'

'এটা ত্রিপুরার আগরতলা।'

'আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত আমাকে এখানেই নিয়ে এল!'

'কেন কাকাবাবু? এখানে আপনার অসুবিধে হবে।'

'কি জানি! আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না!'

কাকাবাবু আবার চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। সন্তু আর কফি খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলনা।

প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে সন্তু একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে নিল। তারপর ঘুরে দেখতে গেল সারা বাড়িটা।

অন্য দু'খানা ঘরের মধ্যে একটা ঘরে তালা বন্ধ, অন্য ঘরটি খোলা। সেটার দরজা ঠেলে সন্তু দেখল, ঘরটি বেশ বড়, এক পাশে একটা খাওয়ার টেবিল আর অন্য পাশে কয়েকটা সোফা-কৌচ সাজান। একটা বেশ বড় রেডিও রয়েছে সেখানে। সে-ঘরের দু'দিকের দেওয়ালে দুটো ছবি। একটা ত্রিপুরার আগেকার কোন মহারাজার, আর একটা রবীন্দ্রনাথের।

তিনতলার একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে সন্তু দেখল ছাদের দরজার তালাবন্ধ। সন্তু একটু নিরাশ হয়েই নেমে এল। যে-কোনও বাড়িতে গেলেই তার ছাদটা দেখতে ইচ্ছে করে।

সন্তু নেমে গেল একতলায়।

সিঁড়ির পাশের ঘরটার সামনেই টুল পেতে দুজন সাদা-পোশাকের ষণ্ডামার্কা পুলিশ বসে আছে। সন্তুকে দেখেই একজন জিজ্ঞেস করল, 'কি, কিছু লাগবে?'

সন্তু বলল, 'না, বাগানটা একটু দেখতে এসেছি।'

বাগানটি বেশ যত্ন করে সাজান। নিশ্চয়ই মালি আছে। গোলাপ আর জুঁই ফুলই বেশি। সন্তু কক্ষনও ফুল ছেঁড়ে না, ফুল গাছে থাকলেই তার দেখতে ভাল লাগে। সে মুখ নিচু করে এক-একটা ফুলের গন্ধ নিতে লাগল।

বাগানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সন্তু অনেক কথা চিন্তা করতে লাগল। সকাল থেকে কত ঘটনাই না ঘটে গেল!

একটা ব্যাপার সন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। প্রথমে তাদের থাকবার কথা ছিল পুরী। তারপর হঠাৎ সেই প্ল্যান বদল করে তাকে আর কাকাবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল গৌহাটিতে; সেখান থেকে আবার তাদের আনা হল এই আগরতলায়। এক রাত্তিরের মধ্যে এসব ঘটেছে। তবু আগরতলায় এত লোক তাদের কথা জানল কি করে? আর এখানে তাদের এত শত্রুই বা হল কেন?

সন্তু এইসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল, হঠাৎ এটা বিশ্রী শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। কি রকম যেন স্প্রে করার মতন ফিঁস্‌স ফিঁস্‌স শব্দ। সন্তু সামনে তাকিয়ে দেখল একটা সাপ ফণা তুলে আছে তার দিকে।

১০

সন্তু তো আর সাধারণ শহরের ছেলেদের মতন নয় যে, সাপ দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠবে! সে কত দুর্গম পাহাড় আর কত গভীর জঙ্গলে গেছে, সাপ-টাপ দেখার অভিজ্ঞতা তার অনেক আছে।

সাপটার চোখের দিকে তাকিয়ে সন্তু একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফুল দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে আর একটু হলেই সে সাপটাকে মাড়িয়ে দিত। তা হলেই হয়েছিল আর কি!

সেবার আন্দামানে যাবার পথে কাকাবাবু সন্তুকে সাপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সন্তু জানে, যে সাপ ফণা তুলতে পারে, সে সাপের বিষ থাকে। তা হলেও বিষাক্ত সাপ চট করে মানুষকে কামড়ায় না। মানুষ তো আর সাপের খাদ্য নয়! চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে সাপ নিজে থেকেই চলে যায়।

কিন্তু এই সাপটা তো যাচ্ছে না। সন্তুর দিকেই ফণাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু একটু দুলছে। চিড়িক চিড়িক করে বেরিয়ে আসছে তার লম্বা জিবটা। এবার সন্তুর গায়ে ঘাম দেখা গেল।

সাপটার দিকে চোখ রেখে সন্তু খুব সাবধানে আস্তে আস্তে তার পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলতে লাগল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলেই ছুঁড়ে মারল সাপটার গায়ে। সাপটা অমনি পাঞ্জাবিটার মধ্যে পাক খেতে-খেতে ছোবল মারতে লাগল বারবার।

সন্তু এই সুযোগে সরে গেল অনেকটা দূরে। এই কায়দাটাও কাকাবাবুর কাছ থেকে শেখা। ছোটখাটো লাঠি কিংবা পাথর ছুঁড়ে সাপ মারার চেষ্টা না করে গায়ের জামা ছুঁড়ে মারলে অনেক বেশি কাজ হয়। সাপটার যত রাগ পড়েছে ওই পাঞ্জাবিটার ওপরে, ওটার মধ্যে কুন্ডলি পাকিয়ে ছোবল মেরে যাচ্ছে বারবার।

সন্তুর ভাবভঙ্গি দেখে বারান্দায় বসে-থাকা পুলিশ দু'জনের কি যেন সন্দেহ হল। একজন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে, খোকাবাবু?'

এই খোকাবাবু ডাকটা শুনলে সন্তুর গা জ্বলে যায়।

আর ক'দিন বাদেসে কলেজে পড়তে যাবে! এখনও সে খোকাবাবু!

যেন কিছুই না, একটা আরশোলা বা গুবরে পোকা, এইরকম তাচ্ছিল্য দেখিয়ে সন্তু বলল, 'কুছ্ নেহি, একঠো সাপ হ্যায়!'

ত্রিপুরায় সবাই বাংলায় কথা বলে, তবু সন্তু হিন্দিতে কেন জবাব দিল কে জানে! বোধহয় পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আপনিই হিন্দি এসে যায়!

'সাপ!' একজন পুলিশ খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বাগানের মধ্যে নেমে এসে বলল, 'কোথায়?'

সন্তু আঙুল দিয়ে পাঞ্জাবিটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ঐ যে!'

এবারে পুলিশটি চমকে উঠে বলল, 'বাপ রে! সত্যিই তো সাপ! লাঠি, লাঠি কোথায়। এই শিবু, লাঠি আন!'

তখনি অনেকে দৌড়ে এল।

সাপেরা এমনিতে কানে কিছুই শুনতে পায় না। কিন্তু লোকজন চলার সময় মাটিতে আর হাওয়ায় যে তরঙ্গ হয়, সেটা ঠিক শরীর দিয়ে টের পায়। এক সঙ্গে অনেক লোকের পায়ের ধুপধাপে সাপটা বুঝে গেল যে বিপদ আসছে। এবারে সে পাঞ্জাবিটা ছেড়ে সরসর করে ঢুকে পড়ল পাশের একটা ঝোপে।

পুলিশ দু'জন আর রান্নার লোকটি সেই ঝোপটায় লাঠিপেটা করতে লাগল। সেই লাঠির চোটে আহত হল কয়েকটা ফুলগাছ, সাপের গায়ে লাগল না। সন্তু দেখতে পেয়েছে সাপটা একটা গর্তে ঢুকে পড়েছে। সাপেরা কিন্তু বেশ বোকা হয়। গর্তের মধ্যে প্রথমে ঢুকিয়ে দেয় মুখটা, লেজের দিকটা অনেকক্ষণ বাইরে থাকে। যে-কেউ তো লেজটা ধরে টেনে তুলতে পারে।

পুলিশরা ফুলের ঝোপে তখনও লাঠি পিটিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় হৈ-হৈ করে ছুটে এল বাগানের মালি। সাপের ব্যাপারটায় সে কোনও গুরুত্বই দিল না, ফুলগাছ নষ্ট

হচ্ছে বলে সে খুব রাগারাগি করতে লাগল। ওটা নাকি বাস্তুসাপ, কারুকে কামড়ায় না।

সন্তু অবশ্য বাস্তুসাপের ব্যাপারটা বিশ্বাস করল না। গায়ে পা পড়লেও সাপটা কামড়াত না? তা কখনও হয়! তাহলে তার জামার ওপর অত ছোবল মারল কেন? আর তার বাগানে আসার শখ নেই।

মালি সন্তুর পাঞ্জাবিটা মাটি থেকে তুলতে যেতেই সন্তু বলল, 'ছোঁবেন না, ওটা ছোঁবেন না, ওতে সাপের বিষ আছে!'

মালি কিন্তু বিষের কথা শুনেও ঘাবড়াল না। বলল, 'আপনার জামা? ও কিছু হবে না, একটু ধুয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

সন্তু অবশ্য আগেই ঠিক করে ফেলেছে যে, ও জামা সে আর গায়ে দেবে না। সাপের বিষ-মাখা জামা কেউ গায়ে দেয়? সে ওটা আর ছুঁয়েই দেখবে না।

মালি জামাটা তার দিকে এগিয়ে দিতেই সন্তু বলল, 'ওটা আমার চাইনা।'

তারপরই সে দৌড়ে চলে গেল ওপরে। এতবড় একটা খবর কাকাবাবুকে না জানালে চলে!

কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলেই তার উৎসাহ চুপসে গেল। কাকাবাবুর যেন এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহই নেই!

সন্তু বলল, 'কাকাবাবু, সাপ! এই অ্যাত্ত বড়!'

ইচ্ছে করেই সন্তু সাপের সাইজটা একটু বাড়িয়ে দেখাল, কিন্তু কাকাবাবু শুকনো মুখে তাকিয়ে রইলেন। সন্তু আবার বলল, 'ঠিক আমার পায়ের কাছে, আর একটু হলেই কামড়ে দিত!'

কাকাবাবু তবু কোনও কথা বললেন না। যেন শুনতেই পাচ্ছন না। মনে হল, কোন কারণে কাকাবাবুর খুব মন খারাপ।

সন্তুরও মন খারাপ হয়ে গেল। সাপটা যদি তাকে কামড়ে দিত। তা হলে কি হত? সন্তু মরেও যেতে পারত। সাপে কামড়ালেই অবশ্য সব সময় মানুষ মরে না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা করালে সেরে যায়। কিন্তু হাসপাতাল-টাসপাতাল সন্তুর খুব বিচ্ছিরি লাগে। সে মরে গেলে কিংবা হাসপাতালে শুয়ে থাকলে কাকাবাবুর দেখাশুনো করত কে? কাকাবাবুর মাথার একেবারে ঠিক নেই!

সন্তু বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দেখল রিকশা করে একজন মহিলা এসে নামল গেটের কাছে। একটু বাদেই একজন পুলিশ সেই মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল ওপরে।

সেই মহিলা একজন নার্স। দেববর্মনবাবু এঁকে পাঠিয়েছেন। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা মহিলার, কাজে বেশ পটু মনে হয়। সন্তু তাকে কাকাবাবুর অসুবিধেগুলো বুঝিয়ে দিল। কাকাবাবুও বেশ শান্তভাবে মেনে নিলেন এই নার্সের ব্যবস্থা। সন্তু অনেকটা নিশ্চিত হল।

দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে সন্তুর মনে হল, এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। কাকাবাবুকে নিয়ে এখন কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভাল। কাকাবাবু যদি নিজেই কোনও নির্দেশ না দেন, কখন কী করতে হবে বলে না দেন, তাহলে আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। এবং কলকাতায় গিয়ে কাকাবাবুর চিকিৎসা করানো দরকার। বিকেলবেলা গর্ভমেন্টের লোকেরা এলেই সন্তু এই কথা বলবে।

বিকেলবেলা ওঁরা আসবার আগেই আর এরজন এলেন, যাঁকে দেখে সন্তু খুব খুশি হয়ে উঠল। এঁর নাম নরেন্দ্র ভার্মা, দিল্লির বড় অফিসার, কাকাবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। নরেন্দ্র ভার্মা এসে গেছেন, আর সন্তুর কোনও চিন্তা নেই।

ভার্মাকে জিপ থেকে নামতে দেখেই সন্তু ওঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য নিচে নেমে গেল। ভার্মা কলকাতায় পড়াশুনো করেছেন বলে বাংলাও মোটামুটি বলতে পারেন।

সন্তুকে দেখে ভার্মা বললেন, 'আরে আরে সনটুবাবু, কেমন আছ? সব ভাল তো?'

ভার্মা সন্তুকে জড়িয়ে নিজের কাছে টেনে নিলেন। ভার্মা খুবই লম্বা মানুষ, নস্যি-রঙের সাফারি সুট পরে আছেন, তাঁর চোখ দুটো খুব তীক্ষ্ম।

সন্তু অভিমান ভরা গলায় বলল, 'না নরেনকাকা, এবারে কিছুই ভাল লাগছে না। সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।'

ভার্মা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি কিছু কিছু শুনেছি। আমি দুপুরে এসে পৌঁছেই সার্কিট হাউসে, গেলাম তোমাদের ঢুঁড়তে। তোমাদের না পেয়ে ফোন করলাম দেববর্মনকে। তার কাছে শুনলাম কি এর মধ্যেই রায়চৌধুরীকে স্ন্যাচ্ করার অ্যাটেম্প্ট হয়ে গেছে। বড় তাজ্জব কথা। আগরতলায় আমিই তোমাদের পাঠাতে বলেছি, এখানকার কোনও লোকের তো জানবার কথা নয়!'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'এত জায়গা থাকতে আমাদের এই আগরতলাতেই পাঠালেন কেন?'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভার্মা বললেন,'ত্রিপুরার কথা তোমার কাকাবাবু খুব বলাবলি করছিলেন এখন । মানে ত্রিপুরাতে উনি কী যেন একটা ধান্দা করেছিলেন। তাই আমরা ভাবলাম কী, উনি ত্রিপুরাতে হাজির হয়ে শরীরটা সারিয়ে নিন্ আর এখানে কিছু খোঁজ-খবরও নিন। একটা গুড্ নিউজ দিই সনটুবাবু তোমাকে, যে বদমাশটা তোমার কাকাবাবুকে গুলি করেছিল, সে ধরা পড়ে গেছে।

'ধরা পড়েছে? সে কি বলল? কেন গুলি করেছিল?'

'লোকটা গুংগা .. মানে কি যেন বলে, হ্যাঁ, বোবা!'

'বোবা? যাঃ!'

'তাতে কোনও অসুবিধা নেই। ওকে কে পাঠিয়েছিল সে কানেকশন আমরা ঠিক বার করে নিব।'

'নরেনকাকা, এখানে কাকাবাবুর কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। এখন আমাদের কলকাতায় ফিরে গেলে ভাল হয় না?'

'কলকাতার জন্য মন ছটফট করছে? কেন, ঘুড়ি উড়াবার সিজন বুঝি? আচ্ছা রায়চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করে দেখি!'

কাকাবাবু পিঠের নিচে দুটো বালিশ দিয়ে আধ-বসা হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ঘরের মধ্যে পা দিয়ে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'এই যে রাজা, কেমন আছ? তবিয়ত তো বেশ ভালই দেখছি।'

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'এ আবার কে? এই লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা লোকটা কোথা থেকে এল?'

ভার্মা যেন বুকে একটা ঘুসি খেয়ে থমকে গেলেন। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিস্ময়। তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, 'রাজা, আমি নরেন্দ্র, আমায় চিনতে পারছ না?'

কাকবাবু বললেন, 'নরঃ নরৌ নরাঃ আর ফলম্ ফলে ফলানি! আর একটা আছে, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, গানের আমি কি জানি! আসলে কিন্তু আমি সব জানি! আমায় কেউ ঠকাতে পারবে না।'

নরেন্দ্র ভার্মা হতভম্ব মুখে বললেন, 'এটা, কি ব্যাপার! তুমি কি বলছ, রাজা!'

সন্তু ম্লান গলায় বলল, 'কাকবাবু কোনও কথা বুঝতে পারছে না। ওই গুলি খাওয়ার জন্য বোধহয় মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে।'

'সর্বনাশ!'

কাকাবাবু আবার ঠাট্টা করে বললেন, 'কি সর্বনাশ? কেন সর্বনাশ? কার সর্বনাশ? তুমি সর্বনাশের কি বোঝ হে ছোকরা!'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'এ যে খুব খারাপ কেস।'

কাকাবাবু কটমট করে তাকিয়ে রইলেন ওঁর দিকে।

নরেন্দ্র ভার্মা জাদুকরের ভঙ্গিতে একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি হিপনোটিজম্ জানি। দেখি তাতে কোনও কাজ হয় কি না! রাজা আমার চোখের দিকে তাকাও! এবার মনে করার চেষ্টা কর, তুমি কে? মনে কর দিল্লির কথা .. তুমি দিল্লিতে গত মাসে আমায় কি বলেছিলে ... ডিফেন্স কলোনিতে আমার বাড়িতে ... সেদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল ...'

উনি এক পা এক পা করে এগিয়ে কাকাবাবুর চোখের সামনে হাতটা নাড়তে লাগলেন।

কাকাবাবু একবারও চোখের পলক না ফেলে একই রকম গলায় বললেন, 'বাঃ বেশ নাচতে জান দেখছি। এবার ধেইধেই করে নাচ তো ছোকরা!'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'আশ্চর্য, কোনও কাজ হচ্ছে না কেন? আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, ঘর অন্ধকার করতে হবে। সন্টু জানলা-দরোজা বন্ধ করে দাও, আর তোমরাও বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর।'

নার্সকে সঙ্গে নিয়ে সন্তু চলে গেল বাইরে। নরেন্দ্র ভার্মা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

১১

প্রায় আধঘন্টা বাদে নিরাশ হয়ে বেরিয়ে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'নাঃ, কিচ্ছু হল না! মাথা একদম গড়বড় হয়ে গেছে। আমার কোনও কথাই বুঝতে পারছেন না।'

সন্তু উদগ্রীবভাবে দাঁড়িয়েছিল দরজার বাইরে। সে বলল, 'তা হলে এখন কি হবে?'

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কোনও ডক্টর কি তোমার আংকেলকে দেখেছিলেন, সন্টু?'

সন্তু বলল, 'না, মানে, আমাদের সঙ্গেই তো একজন ডাক্তার এসেছিলেন কলকাতা থেকে। ডাক্তার প্রকাশ সরকার। কিন্তু তাঁকে আজ সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

নরেন্দ্র ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'প্রকাশ সরকার .... তাকে পাওয়া যাচ্ছে না? কেন?'

'ভোর থেকেই তাঁকে আর দেখতে পাইনি।'

'এসব কি কারবার চলছে এখানে? তবে তো আর এখানে থাকাই চলেনা।'

আমার মনে হচ্ছে এবার কলকাতা ফিরে যাওয়াই ভাল। ওখানে আমাদের চেনা ভাল ডাক্তার আছে।'

'তা ঠিকই বলেছ। লেকিন তোমার আংকেল ফিরে যাবেন কী এখানে থাকা পছন্দ করবেন, সেটা তো জানা যাচ্ছে না। উনি তো কোনও কথাই ঠিক ঠিক বুঝছেন না।'

'সে-কথা আমিও ভেবেছি, নরেনকাকা। কাকাবাবু কোনও ব্যাপারেই শেষ না দেখে কখনও ফিরে যেতে চান না। কিন্তু এখানে আর তো উপায় নেই। এবার আমাদের ডিফিট, মানে হার স্বীকার করতেই হবে।'

'ডিফিট? কিন্তু লড়াইটা কার সঙ্গে সন্টুবাবু? সেটাই তো এখনও বোঝা গেল না। ঠিক আছে, এবার কলকাতাতেই চলে যাওয়া যাক। আজ রাত সাবধানে থাক। কাল মর্নিং ফ্লাইটে কলকাতা ব্যাক করব। আমি এখন সার্কিট হাউসে ওয়াপস্ যাচ্ছি।'

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'রাজা, আমি তবে এখন যাচ্ছি!'

কাকাবাবু হুংকার দিয়ে বললেন, 'গেট আউট! যত সব রাস্কেল এসে গোলমাল করছে এখানে!'

নরেন্দ্র ভার্মার মুখখানা কালো হয়ে গেল। সন্তুরই খুব লজ্জা করতে লাগল কাকাবাবুর ব্যবহারে।

একটু পরেই নরেন্দ্র ভার্মা আবার হাসলেন। জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বললেন, 'ইশ, এমন গুণী মানুষটা একেবারে বেখেয়াল হয়ে গেছে! ভাল করে ট্রিটমেন্ট করাতে হবে। আমি চলি সন্টুবাবু!'

নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর কাকাবাবু আবার চিৎকার করে বললেন, 'কফি! কেউ আমায় এক কাপ কফি খাওয়াতে পারে না?'

সন্তু দৌড়ে নিচে চলে গেল কফির অর্ডার দিতে।

কফি আনবার আগেই নার্সটি গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে কাকাবাবুর মুখ-টুখ মুছিয়ে দিয়েছেন আর জামাও পাল্টে দিয়েছেন।

কাকাবাবু কফি খাওয়ার সময় কোনও কথা বললেন না। শুধু মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখতে লাগলেন সন্তুকে। সন্তুর খুব আশা হল কাকাবাবু তাকে কিছু বলবেন।

কিন্তু কফি খাওয়া শেষ করার পর কাকাবাবু নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি চামেলির দিদি?'

নার্স অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চামেলি? চামেলি কে? আমি তো তাকে চিনি না।'

কাকাবাবু তবু জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি চামেলির দিদি। তোমার নাম কি?'

নার্স বললেন, 'আমার নাম সুনীতি দত্ত।'

কাকাবাবু বললেন, 'মোটেই তোমার নাম সুনীতি নয়। তোমার নাম পারুল। সাত ভাই চম্পা জাগ রে, কেন বোন পারুল ডাক রে? এবার বল তো, আমি কে?'

নার্সটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সন্তুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমায় চিনতে পারলে না তো? সিংহের মামা আমি নরহরি দাস, পঞ্চাশটি বাঘ আমার এক এক গেরাস! হালুম!'

নার্স বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি আমায় খুব ছেলেমানুষ ভাবছেন, কিন্তু আমার বয়েস চল্লিশ।'

কাকাবাবু আর কিছু না বলে চোখ বুজলেন।

নার্সটি বাইরে চলে এসে সন্তুকেও হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

দু'জনে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াবার পর নার্স জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ভাই, তোমার কাকাবাবুর এই রকম অবস্থা কতদিন ধরে?'

সন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'বেশি দিন নয়। কারা ওকে বাঘ-মারা গুলি মেরে পালিয়ে গেল—'

'বাঘ-মারা গুলি? বাঘ মারতে আলাদা গুলি লাগে বুঝি?'

'ভুল বলেছি, বাঘ-মারা গুলি নয়। বাঘকে ঘুম-পাড়ান গুলি। তারপর থেকেই ওঁর গায়ের জোর সব চলে গেল, আর মাথাতেও গোলমাল দেখা দিল।'

'উনি কিছু মনে করতে পারেন না?'

'না। আমাকেই চিনতে পারছেন না!'

'উনি খুব নাম-করা লোক বুঝি? ওঁর জন্য এখানকার পুলিশ আর গভর্মেন্টের বড় বড় অফিসাররা সব ব্যস্ত দেখছি।'

'হ্যাঁ উনি খুবই নাম করা লোক।'

'আহা, এমন লোকের এই দশা! জান না, এই রকম পাগলরা আর কোনদিন ভাল হয় না।'

সন্তু নার্সের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাগের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই ভাল হয়। কলকাতায় অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে!'

নার্সটি সমবেদনার সুরে বলল, 'আমি তো ভাই এরকম কেস অনেক দেখেছি, সেইজন্য বলছি। যারা চেনা মানুষ দেখলে চিনতে পারে না, তারা আর কখনও ভাল হয় না! দ্যাখ কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে।'

সন্তুর আর নার্সের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল না। সে সেখান থেকে সরে গেল।

সন্ধে হয়ে এসেছে। আকাশটা লাল। সামনের বাগানটা সেই লাল আভায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু সন্তুর আর বাগানে যাবার শখ নেই। বাস্তু সাপ হোক আর যাই হোক, অত বড় সাপের কাছাকাছি সে আর যেতে চায় না।

সন্ধেবেলা দেববর্মন এলেন খবর নিতে।

কাকাবাবু সেই একভাবে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। সেইজন্য দেববর্মন আর ওঁকে বিরক্ত করলেন না। সন্তুর সঙ্গে একটুক্ষণ গল্প করার পর বললেন, 'আমি তা হলে নরেন্দ্র ভার্মার কাছেই যাই। তোমরা যদি কাল চলে যাও, তা হলে সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। রাত্তিরটা তাহলে ঘুমিয়ে নাও ভাল করে। মর্নিং ফ্লাইটে গেলে খুব ভোরে উঠতে হবে। এই নার্স সারারাতই থাকবে এখানে।'

ন'টার মধ্যে রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা শুয়ে পড়ল। কাকাবাবু আর এর মধ্যে একটাও কথা বলেননি। সন্তু অনেকবার ভেবেছিল, কাল কলকাতায় ফিরে যাবার কথা কাকাবাবুকে জানাবে কি না। শেষ পর্যন্ত আর বলতে ভরসা পায়নি। কাকাবাবু হয়তো কিছুই বুঝতে পারবেন না, শুধু শুধু আবার উল্টোপাল্টা কথা শুনতে হবে। কাকাবাবুর মুখে ছেলেমানুষি কথা শুনতে সন্তুর একটুও ভাল লাগে না।

কিছুক্ষণ বারান্দার আলো জ্বেলে সন্তু ওডহাউসের লেখা 'আংকল ডিনামাইট' নামে একটা মজার বই পড়ার চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। কিন্তু এই পরিবেশে সে মজার বইতে মন বসাতে পারছে না। এক সময় সে এসে শুয়ে পড়ল কাকাবাবুর পাশের খাটে। নার্স বসে রইলেন চেয়ারে, ওই ভাবেই উনি সারারাত জেগে থাকবেন।

মাঝরাত্রে একটা চেঁচামেচির শব্দ শুনে সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল। সামনের বাগানে কে যেন কাঁদছে।

সন্তু মাথার কাছে টর্চ নিয়েই শুয়েছিল। তাড়াতাড়ি সেই টর্চটা নিয়ে ছুটে গেল বারান্দায়। আলো ফেলে দেখল, একটা লোক কাঁপা কাঁপা গলায় বলছে , 'বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলল!'

তক্ষুনি সন্তু বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী। একটা কোনও চোর এসে বাগানে লুকিয়েছিল। সে পড়েছে ওই বাস্তু সাপের পাল্লায়। চোর, না শত্রুপক্ষের কোনও লোক?

সাদা পোশাকের পুলিশ দুজনও ঘুমিয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই। তাদের নজর এড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল লোকটা। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে সাপটার কাছে।

এইবারে পুলিশ দু'জনের সাড়া পাওয়া গেল। সন্তুও নেমে গেল নিচে।

পুলিশ দু'জন টর্চের আলো ফেলে জিজ্ঞেস করছে, 'কে? তুমি কে? বাগানে ঢুকেছ কেন?'

ভয়ে পুলিশ দু'জনও রাত্তিরে বাগানে ঢুকতে চাইছে না। সেই লোকটার গলা নেতিয়ে আসছে, বোধহয় এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

আলো ফেলে সন্তু দেখল সাপটা ওই লোকটার একটা পা জড়িয়ে আছে। কিন্তু কামড়ায়নি। ফণাটা লকলক করছে বাইরে। বাস্তু সাপের গুণ আছে বলতে হবে।

দু'তিনটে টর্চের আলো পড়ায় সাপটা আস্তে আস্তে লোকটাকে ছেড়ে পাশের ঝোপের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল। লোকটা টলতে টলতে ছুটে এল এদিকে।

একজন পুলিশ লোকটার কাঁধ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল,'তুই কে?'

কিন্তু লোকটা উত্তর দেবার অবসরও পেল না। ঠিক সেই সময় প্রচন্ড শব্দ করে একটা ট্রেকার ঢুকল গেট পেরিয়ে। গেট কি করে খোলা ছিল তা বোঝা গেল না।

সন্তু ভাবল, 'নিশ্চয়ই নরেন্দ্র ভার্মা কিংবা দেববর্মনরা কেউ এসেছেন জরুরি কোনও খবর দিতে।

ট্রেকারটা বাড়ির সামনে এসে যাবার আগেই তার থেকে টপাটপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল পাঁচ-ছ'জন লোক। প্রত্যেকের মুখে সরু মুখোশ আঁটা। তাতে তাদের চোখ দেখা যায় না। সবাইকে এক রকম দেখায়। একজনের হাতে একটা মেশিনগান, অন্য দু'জনের হাতে রিভলভার। পুলিশ দু'জনের বুকের কাছে রিভলভার ঠেকিয়ে ওদের দু'জন বলল, 'মরতে যদি না চাস তো চুপ করে থাক্।'

সন্তু এরই মধ্যে তীরের মতন ছুটে উঠে গেল দোতলায়। কাকাবাবুর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে হাঁফাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল দুম দুম করে।

নার্সটি নিজেই খুলে দিল দরজার ছিটকিনি। তিনজন লোক একসঙ্গে ঢুকে পড়ল, তাদের একজনের হাতে মেসিনগান। একজন সন্তুর মুখ চেপে ধরল। মেসিনগানধারী বলল, 'চলুন মিঃ রায়চৌধুরী।'

গোলমালে কাকাবাবু জেগে উঠে চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন, এবারে বললেন, 'রাত দুপুরে ভূতের উপদ্রব!'

আগন্তুকদের একজন বলল, 'নার্স, তোমার পেশেন্টকে তৈরি করে নাও, এক্ষুনি যেতে হবে।'

নার্স বললেন, 'সব তৈরিই আছে। আমি চট করে ইঞ্জেকশনটা দিয়ে দিচ্ছি।'

নার্স একটা সিরিঞ্জ বার করে কাকাবাবুর ডান হাতে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া মাত্র তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ওরা দু'জনে কাকাবাবুকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল। সন্তুকেও অন্য লোকটি ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে এল বাইরে।

মাত্র দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ট্রেকার গাড়িটি ওদের তুলে নিয়ে আবার স্টার্ট দিল।

১২

গাড়িটা গেস্ট হাউসের গেট ছাড়িয়ে বাইরে পড়বার পর লোকগুলো দুটো কালো কাপড় দিয়ে কাকাবাবু আর সন্তুর চোখ বেঁধে দিল। কাকাবাবুর তো বাধা দেবার কোনও ক্ষমতাই নেই, সন্তুও বুঝল বাধা দেবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই।

নার্স সুনীতি দত্ত ওদের সঙ্গেই এসেছে আর লোকগুলোর সঙ্গে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছে। এই নার্স তাহলে শত্রুপক্ষেরই লোক। কাকাবাবুর মাথার গোলমাল হলেও এটা তো ঠিকই বুঝেছিলেন। এই জন্যই তিনি বলেছিলেন যে, এই নার্স হচ্ছে চামেলির দিদি।

সন্তু কাকাবাবুকে কোনদিন গান গাইতে শোনেনি। কিন্তু এখন এই চলন্ত গাড়িতে কাকাবাবু গুনগুন করে গান ধরেছেন। মেশিনগান ও রিভলভারধারী কয়েকজন দস্যুর সঙ্গে যে তিনি বসে আছেন সে-ব্যাপারে যেন তাঁর কোনও দুশ্চিন্তাই নেই। অথচ সন্তুর বুকের মধ্যে ধকধক করছে। কাকাবাবু যে গান গাইছেন, তার সুরও যেমন বেসুরো, কথাগুলোও অদ্ভুত।

কাকাবাবু গাইছেন ঃ

যদি যাও বঙ্গে
কপাল তোমার সঙ্গে।
ত্রিপুরায় যারা যায়
তারা খুব কাঁঠাল খায়।
ধর্মনগর উদয়পুর
কোনদিকে আর কতদূর ...

এই রকম আরও কী সব যেন কাকাবাবু একটানা গেয়ে যেতে লাগলেন, সন্তু বুঝতে পারল না গাড়ির আওয়াজে। গাড়িটা যে খুব জোরে ছুটছে, তা বোঝা যায়। সন্তু মনে মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। ঘন্টায় কত মাইল? পঞ্চাশ? ষাট? রাত্তিরবেলা রাস্তা ফাঁকা, আরও বেশি হতে পারে।

এই রকম বিপদের মধ্যেও মানুষের ঘুম পায়? কাকাবাবু অনেকক্ষণ চুপচাপ। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সন্তুরও ঝিমুনি এসেছিল খানিকটা, হঠাৎ আবার ধড়ফড় করে উঠে বসল।

আর অমনি একজন কেউ তার মাথায় একটা চাপড় মেরে বলল,'চুপ করে বসে থাক্। অত ছটফটানি কিসের?'

অন্যান্যবারে সন্তু এর চেয়েও বেশি বিপদের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু আগে সব সময়ই মনে হয়েছে, কাকাবাবু কিছু না কিছু একটা উপায় বার করবেনই। কিন্তু এবারে কাকাবাবুরই তো মাথার ঠিক নেই। এবারে আর উদ্ধার পাওয়া যাবে কি করে?

কাকাবাবুর মতন একজন অসুস্থ লোককে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এই লোকগুলো এত ব্যস্ত কেন, তাও সন্তু বুঝতে পারছে না। পুরনো কোনও শত্রুতা?

গাড়ির গতি কমে এল আস্তে-আস্তে। তারপর থামল এক জায়গায়। সন্তুর চোখ বাঁধা। তাকে এখন কি করতে হবে সে জানে না।

একজন লোক সন্তুর হাত ধরে ট্রেকার থেকে নিচে নামাল।

একজন কেউ হুকুমের সুরে বলল, 'ছেলেটার চোখ খুলে দাও; কিন্তু হাত বেঁধে রাখ ওর। খেয়াল রেখ, ও কিন্তু মহা বিচ্ছু ছেলে!'

সন্তুর চোখের বাঁধন খুলে দেবার পর সে দেখল অনেক গাছপালার মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির সামনে থেমেছে তাদের গাড়ি। সেই বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেশ লম্বামতন লোক, নস্যি রঙের স্যুট পরা, চোখে কালো চশমা। অন্ধ ছাড়া আর কেউ যে রাত্তিরে কালো চশমা পরে, তা সন্তু আগে জানত না।

একজন লোক কাকাবাবুরও এক হাত ধরে নিচে নামাতে গেল। কাকাবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। বেশ জোরেই পড়েছেন, কারণ সন্তু ঠকাস করে ওঁর মাথা ঠুকে যাবার শব্দ পেল।

কালো-চশমা পরা লম্বা লোকটি ধমক দিয়ে বলল, 'ইডিয়েট! সাবধানে! জান না, ওর এক পায়ে চোট আছে। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না! একজন ওর মাথার কাছে রিভলভার ধরে থাক, কখন যে কি করবে ঠিক নেই। ওকে সার্চ করেছ?'

দু'জন লোক কাকাবাবুকে সাবধানে দাঁড় করিয়ে দিল। একজন বলল, 'হ্যাঁ, সার্চ করে দেখেছি, কাছে কোনও ওয়েপন্ 'নেই।'

কাকাবাবুর গায়ে স্লিপিং সুট। খালি পা। আছাড় খাবার সময় নিশ্চয়ই খুব ব্যথা লেগেছে। কিন্তু তাঁর যেন সে বোধই নেই। তিনি আবার গুনগুন করে গান ধরলেন ঃ

যদি যাও বঙ্গে

কপাল তোমার সঙ্গে
যারা যায় ত্রিপুরায়
যখন-তখন আছাড় খায় ...।

লম্বা, কালো-চশমা পরা লোকটি বিস্ময়ে একটা শিস দিয়ে উঠল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, 'গান গাইছ, অ্যাঁ? কী রায়চৌধুরী, নেশা-টেশা করেছ নাকি?'

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'পি লে, পি লে, হরিনাম কা পেয়ালা ... ঠুন ঠুন ঠুন। মাতোয়ালা, মাতোয়ালা, হরিনাম কা পেয়ালা!'

লোকটি এক হাত বাড়িয়ে কাকাবাবুর থুতনি ধরে উঁচু করে বললেন, 'ওসব নকশা ছাড়। কী রায়চৌধুরী , আমায় চিনতে পার?'

কাকাবাবু একদৃষ্টে লোকটির মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'চেনা চেনা লাগছে। তুমি পান্ত ভূতের জ্যান্ত ছানা না?'

লোকটি ঠাস করে এত জোরে চড় মারল কাকাবাবুর গালে যে, কাকাবাবুর মুখটা ঘুরে গেল। তারপর অন্য গালে ঠিক তত জোরে আবার একটা চড় মেরে লোকটা বলল, 'এবার নেশা কেটেছে? এবার ভাল করে দ্যাখ তো চিনতে পার কিনা?'

কাকাবাবু আবার লোকটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। সেই একই রকম গলায় বললেন, 'হুঁ, আগের বারে ভুল হয়েছিল। তুমি আসলে রামগঢুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা, হাসির কথা শুনলে বলে হাসব, না না না না !'

লোকটি আবার মারবার জন্য হাত তুলতেই পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'মারবেন না, মারবেন না। উনি সাংঘাতিক অসুস্থ।'

সন্তু দারুণ চমকে উঠল। এ তো ডাক্তার প্রকাশ সরকারের গলা!

কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে সন্তু তাকে দেখতে পেল না। বেশি খুঁজবারও সময় নেই। সন্তু আবার এদিকে তাকাল।

কালো-চশমা পরা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'রায়চৌধুরী অতি ধুরন্ধর! ওসব ভেক আমি জানি। ওর পেটের কথা আমি ঠিক বার করবই। দেখি ও কত মার সহ্য করতে পারে।'

লোকটি আবার এক চড় কষাতে গেল কাকাবাবুকে। তার আগেই সন্তু ছুটে গিয়ে এক ঢুঁ মারল লোকটার পেটে। আচমকা আঘাত পেয়ে লোকটা তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য দু'জন লোক এসে চেপে ধরল সন্তুকে। একজন তার কপালের ওপর রিভলভারের নল চেপে ধরল।

লম্বা লোকটি উঠে পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'বলেছিলুম না, এটা একটা শয়তানের বাচ্চা। ওর ব্যবস্থা আমি পরে করছি। আগে বুড়োটাকে টিট করি।'

কাকাবাবু এইসব কোনও ব্যাপারেই একটুও বিচলিত হননি। মুখে এখনও মৃদু-মৃদু হাসি। লম্বা লোকটি তাঁর মুখোমুখি হতেই তিনি বললেন, 'তা হলে কি ঠিক হল? তুমি পান্তভূতের ছানা, না রামগড়ুড়ের ছানা?'

লম্বা লোকটি অতি কষ্টে রাগ দমন করে বলল, 'রায়চৌধুরী, তোমার সঙ্গে আমি এক তাঁবুতে কাটিয়েছি সাত দিন। তুমি আমায় চিনতে ঠিকই পারছ। তুমি ভালয় ভালয় জঙ্গলগড়ের সন্ধানটা দিয়ে দাও। তারপর তোমায় ছেড়ে দেব। নইলে এখান থেকে তোমার বেঁচে ফেরার কোনও আশাই নেই।'

কাকাবাবু বললেন, 'জঙ্গলগড়? সে আবার কি? এর কথা তো সুকুমার রায় লিখে যাননি? জঙ্গলগড়ের বদলে তুমি চণ্ডীগড়ে যেতে চাও? কিংবা গড়মান্দারনপুর?'

লম্বা লোকটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, এদের ওপরে নিয়ে চল। হাত-পা বেঁধে রাখবে। তারপর আমি দেখছি।'

১৩

কাকাবাবু হাঁটতে পারেন না জেনেও দু'জন লোক দু'দিক থেকে কাকাবাবুর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। কাকাবাবুর খুবই ব্যথা লাগছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি কিছুই বলছেন না। সন্তুও যে কিছু করবে তার উপায় নেই। আর দু'জন লোক তার জামার কলার ও চুলের মুঠি ধরে আছে। তার নড়বার উপায় নেই।

মুখোশধারীরা দোতলায় একটা হলঘরে নিয়ে এল ওদের। হল-ঘরটায় একটি মাত্র চেয়ার ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। কাকাবাবুকে এনে বসিয়ে দেওয়া হল সেই চেয়ারে। হাত-বাঁধা অবস্থায় সন্তুকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হল তাঁর পায়ের কাছে।

বাকি লোকগুলো ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে শুধু টিমটিম করে একটা কম-পাওয়ারের আলো জ্বলছে। মনে হয়, এ বাড়িতে অন্য সময় কোনও মানুষজন থাকে না।

নস্যি রঙের সুট পরা লোকটি ঘরে ঢুকল সবার শেষে। হুকুমের সুরে বলল, সর! সরে যাও, সামনে থেকে!'

অমনি অন্যরা সরে গিয়ে সামনে জায়গা করে দিল।

লোকটি কাকাবাবুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল কোমরে দু'হাত দিয়ে। ঠিক সিনেমার ভিলেনের মতন। চোখ থেকে এখনও কালো চশমাটা খোলেনি। একটুক্ষণ কাকাবাবুর দিকে চেয়ে থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করল, 'রাজা রায়চৌধুরী,

তুমি আমার সামনে ভড়ং করে থেক না। তাতে কোনও লাভ হবে না। শোন, তোমার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। আমি যা চাই, তুমি যদি ভালয় ভালয় —'

কাকাবাবু মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, 'ডাবের জল! আমি একটু ডাবের জল খাব!'

লম্বা লোকটি হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'ডাবের জল?'

পাশ থেকে তার এক অনুচর বলল, 'এদিকে তো ডাব পাওয়া যায় না।'

লম্বা লোকটি ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ কর। ডাবের জল কেন, এখন কোনও জলই ওকে দেওয়া হবে না।'

কাকাবাবু বললেন, 'জল দেবে না তাহলে জলপাই দাও? এখানে ডাব পাওয়া যায় না, কিন্তু জলপাই তো পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে একটু নুন দিও।'

লম্বা লোকটি ফস্ করে একটা সিগারেট ধরাল। রাগে তার হাত কাঁপছে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, 'তোমার সঙ্গে মশকরা করবার জন্য আমি রাতদুপুরে ধরে এনেছি? আমার কথার সোজাসুজি উত্তর দাও, আমি তোমাদের ছেড়ে দেব। নইলে —'

কাকাবাবু বললেন, 'তুমি কে বাপু? নইলে বলে থেমে রইলে? কালো চশমায় চক্ষু ঢাকা, গোঁফখানি তো ফড়িং-পাখা!'

লোকটি এগিয়ে এসে কাকাবাবুর বাঁ হাতখানা তুলে তার তালুতে জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরল।

কাকাবাবুর হাত অসাড়, তাই তিনি কোনও ব্যথা পেলেন না, মুখে টুঁ শব্দও করলেন না। কিন্তু সন্তু ওই কান্ড দেখে শিউরে উঠল।

তখন মুখোশধারীদের পেছন থেকে ঠেলে সামনে এসে প্রকাশ সরকার বলল, 'দেখুন, রাজকুমার, আমি একজন ডাক্তার। আমি ওঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, ওঁর মাথায় সতিই গোলমাল হয়েছে। উনি কিছুই মনে করতে পারছেন না। ওঁর ওপর অত্যাচার করে কোনও লাভ হবে না।'

'তাহলে তোমার মতে কি করা উচিত এখন?'

'এখন ওঁর চিকিৎসা করান উচিত। পরপর কয়েকদিন টানা ঘুমোলে উনি একটু সুস্থ হতে পারেন।'

'সে সময় আমার নেই!'

'কিন্তু অত্যাচার করলে ফল খারাপ হবে।'

নার্স সুনীতি দত্ত বললেন, 'দেখুন, আমিও তো আজ সারাদিন ধরে ওঁকে ওয়াচ করেছি। উনি সত্যিই এখন মানসিক রুগী। নিজের ভাইপোকেও চিনতে পারেন না। দিল্লি থেকে ওঁর এক বন্ধু এসেছিলেন, তাঁকেও কিসব গালমন্দ করলেন।'

লম্বা লোকটি আরও রেগে গিয়ে বলল, 'মাথা খারাপ হয়েছে? বললেই হল? জান, জঙ্গলগড়ের চাবি কোথায় আছে? আর কোথাও নেই, আছে ওর মাথার মধ্যে! কর্নেল!'

মুখোশধারীদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, 'স্যার?'

'শোন, যে-করেই হোক ওর কাছ থেকে কথা বার করতে হবে।'

যে-লোকটিকে কর্নেল বলে ডাকা হল, তার অবশ্য মিলিটারিদের মতন পোশাকও নয়, তার মিলিটারি গোঁফও নেই। এমনই সাধারণ চেহারার একটা লোক।

সে বলল, 'স্যার, জঙ্গলগড় জায়গাটা আসলে কোথায়? আমরা তো এদিকে জঙ্গলগড় বলে কোনও কিছুর নাম শুনিনি।'

লম্বা লোকটি ভেংচি কেটে বলল, 'সে কথা আমিতোমায় বলে দি, আর তুমি তারপর আমায় পেছন থেকে ছুরি মার, তাই না? তখন নিজেই তার লোভে পাগল হয়ে উঠবে। শোন, জঙ্গলগড়ের ভেতরের জিনিসের ওপর একমাত্র আমারই বংশগত অধিকার আছে। আর কারুর নেই। এই লোকটা বাগড়া না দিলে এতদিনে আমি সব-কিছু পেয়ে যেতাম।'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'জঙ্গলগড় নয়, জঙ্গলগড় নয়, বোম্বাগড়! এতক্ষণে চিনলাম, তুমি হলে বোম্বাগড়ের রাজা। আর তুমি খাও আমসত্ত্ব ভাজা!'

লম্বা লোকটি ঝট করে কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আর তুমি কি খাও, তা মনে আছে? তুমি ছাগলের মতন কাগজ খাও! তুমি আমাদের ম্যাপটা খেয়ে ফেলেছিলে।'

কর্নেল নামের লোকটা বলল, 'ম্যাপ খেয়ে ফেলেছিল?'

হ্যাঁ। বলতে গেলে আমারই চোখের সামনে। অ্যাত্ত বড় একটা তুলোট কাগজের ম্যাপ। আমি সেটা গায়েব করার আগেই ও সেটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে মুখে পুরে দিল। ম্যাপটা আগেই ও মুখস্থ করে ফেলেছিল। এখন ও ছাড়া আর কেউ সে পথের হদিস দিতে পারবে না।'

'হয়তো এই বুড়োটা সেই ম্যাপ আবার অন্য কোনও জায়গায় এঁকে রেখেছে।'

'না। ও অতি শয়তান। সে সুযোগ ও দেবার পাত্র নয়। ওরা আগরতলায় চলে আসবার পর আমার লোকেরা ওদের কলকাতার বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। সেখানে কিছু নেই। দিল্লিতেও পাঠায়নি, সেখানেও আমাদের লোক রেখেছি। সুতরাং ম্যাপটা ওকে দিয়েই আঁকাতে হবে। কিংবা ও নিজেই যদি গাইড হয়ে আমাদের পথের সন্ধান দিতে রাজি হয় —'

তারপর সে কাকাবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কী রায়চৌধুরী, রাজি?'

কাকাবাবু বললেন, 'এক থালা সুপারি, গুনতে নারে ব্যাপারি, বল তো কি? কিংবা এইটা পারবে? চক্ষু আছে মাথা নাই,রস খায়, পয়সা কোথা পাই?'

কালো চশমা হুংকার দিয়ে বলল, 'কর্নেল! তোমার ছুরিটা বার কর।

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ফোল্ডিং ছুরি বার করল। তার স্প্রিং টিপতেই চকচকে ফলাটা বেরিয়ে এল।

কালো-চশমা বলল, 'ওই ছুরি দিয়ে ওর বুক চিরে দাও, দেখি তাতে ওর মুখ খোলে কি না।'

কাকাবাবুর জামার বোতামগুলো খুলে বুকটা ফাঁক করে ফেলল কর্নেল। ছুরিটা খুব আস্তে আস্তে নিয়ে গিয়ে বুকে ঠেকাল।

সন্তু সেই সময় ছটফট করে উঠতেই লম্বা লোকটির ইশারায় দু'জনে গিয়ে চেপে ধরে রইল তাকে।'

কর্নেল জিজ্ঞেস করল, 'কতটা ঢোকাব ছুরি?'

'রক্ত বার করো!'

কর্নেল হালকাভাবে একটা টান দিতেই লম্বা রেখায় রক্ত ফুটে উঠল কাকাবাবুর বুকে।

কাকাবাবু যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। অবাক হয়ে দেখছেন এই সব কান্ড-কারখানা। তাঁর মুখে কোনরকম যন্ত্রণার চিহ্নই নেই।

প্রকাশ সরকার আবার এগিয়ে এসে ব্যাকুলভাবে বলল, 'আমি ডাক্তার, আমার কথাটা শুনুন। এভাবে কথা আদায় করা যাবে না। ওঁর মাথায় কিছুই ঢুকছে না।'

লম্বা লোকটি বলল, 'হুঁ, তোমার যে দেখছি খুব দরদ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমিও থাক এখানে। কী করে পাগল জব্দ করতে হয় আমি জানি। কর্নেল উঠে এস। এই তিনটেকে এখানেই আটকে রেখে দাও! এদের খাবার দেবে না, জল দেবে না, এমন কি ডাকলে সাড়াও দেবে না। শুধু বাইরে থেকে পাহারা দেবে। দেখি কতক্ষণ লাগে শিরদাঁড়া ভাঙতে!'

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল একে একে। কালো-চশমা পরা লোকটা দরজার কাছ থেকেও ফিরে এল আবার।

কাকাবাবুর মুখের কাছে মুখ এনে চরম বিদ্রূপের সুরে বলল, 'রায়চৌধুরী, আমি বাজি ফেলতে পারি, তুমি চব্বিশ ঘন্টাও তোমার জেদ বজায় রাখতে পারবে না। আর যদি সত্যিই তুমি পাগল হয়ে থাকো তবে সেই দোষে এই দু'জনও খিদে তেষ্টায় ছটফট করে মরবে! আমার কোনও দয়ামায়া নেই।'

কাকাবাবুর নড়বড়ে অবশ হাত দুটি এবারে বিদ্যুতের মতন উঠে এল ওপরে! তিনি বজ্রমুষ্টিতে লম্বা লোকটির গলা চেপে ধরে প্রকাশ সরকারকে বললেন, 'শিগগির দরজাটা বন্ধ করে দাও ভেতর থেকে।'

১৪

কাকাবাবু বজ্রমুষ্টিতে গলা চেপে ধরায় লম্বা লোকটা দু'বার মাত্র আঁ আঁ শব্দ করল। একটা হাত কোটের পকেটে ভরে কিছু একটা বার করে আনবার চেষ্টা করেও পারল না। তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

কাকাবাবু ওর অচৈতন্য দেহটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে প্রকাশ সরকারকে বললেন, 'বললুম যে, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এস! এক্ষুনি ওর দলের লোকেরা ফিরে আসবে!'

প্রকাশ সরকার এতই আবাক হয়ে গেছে যে, নড়তেই পারছে না যেন। সন্তুরও সেই অবস্থা।

এবার প্রকাশ সরকার দৌড়ে গেল দরজা বন্ধ করতে। কাকাবাবু নিচু হয়ে সন্তুর হাতের বাঁধন খুলে দিতে লাগলেন।

সন্তুর এমন অবস্থা যে, সে যেন কথাই বলতে পারছে না। কথা বলতে গেলেই যেন তবু ফুঁপিয়ে কান্না এসে যাবে। তার এত আনন্দ হচ্ছে।

প্রকাশ সরকার দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে বলল, 'স্যার, আপনি ভাল হয়ে গেছেন? মিরাকুলাস ব্যাপার! শুনেছি, সাড্‌ন শক্ পেলে এরকম হতে পারে!'

কাকাবাবু বললেন, 'এই লোকটার কোটের পকেটে রিভলভার আছে। সেটা বার করে আমায় দাও!'

প্রকাশ সরকার বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে এমনই উল্টোপাল্টা করতে লাগল যে, উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটার কোটের পকেটই সে খুঁজে পেল না।

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'শিগগির! যে-কোনও মুহূর্তে ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।'

শেষ পর্যন্ত প্রকাশ সরকার রিভলভার খুঁজে পেল। কাকাবাবু সেটা হাতে নিয়ে তাতে গুলি ভরা আছে কি না চেক করে দেখলেন।

এবার সন্তু বলল, 'কাকাবাবু, আসলে আপনার কিছুই হয়নি, তাই না?'

প্রকাশ সরকার বলল, 'অভিনয়? মানুষ এরকম অভিনয় করতে পারে?'

কাকাবাবু মুচকি হাসলেন।

প্রকাশ সরকার বলল, 'সত্যিই স্যার, আপনার কিছু হয়নি? আপনি আমাদের পর্যন্ত ঠকিয়েছেন?'

সন্তু বলল, 'কাকাবাবু, আপনি ইচ্ছে করে এরকম সেজেছিলেন, নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য ছিল!'

কাকাবাবু বললেন, 'হাত দু'টো ক'দিনের জন্যে সত্যিই অসাড় হয়ে গিয়েছিল রে! পরশু থেকে হঠাৎ আবার ঠিক হয়ে গেল, তখন ভাবলুম, কিছুদিন ওই রকম সেজে থাকা যাক।'

প্রকাশ সরকার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার মাথাতেও তাহলে কোনও গোলমাল হয়নি?'

কাকাবাবু নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'মাথাটায় খুব ব্যথা করত মাঝে মাঝে। এক এক সময় ভাবতুম, পাগলই হয়ে যাব নাকি! তা সত্যি সত্যি কি আমি পাগল হয়েছি? তোমাদের কি মনে হয়?'

'স্যার, আপনার হাতের তালুতে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরল, তবু আপনি একটুও মুখ বিকৃত করলেন না। এটা কি করে সম্ভব?'

কাকাবাবু বললেন, 'ইচ্ছে করলে সবই পারা যায়।'

বাঁ হাতটা দেখলেন তিনি। সেখানে একটা বড় ফোসকা পড়ে গেছে এর মধ্যেই।

এই সময় দরজায় দুমদুম করে ধাক্কা পড়ল। বাইরে থেকে সেই 'কর্নেল' উত্তেজিতভাবে ডাকল, 'রাজকুমার! রাজকুমার!'

প্রকাশ সরকার বিবর্ণ মুখে বলল, 'সাড়া না পেলে ওরা তো দরজা ভেঙে ফেলবে ওদের দলে অনেক লোক!'

কাকাবাবু বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। নরেন্দ্র ভার্মা পুলিশ নিয়ে এক্ষুনি এসে পড়বে!'

সন্তু বলল, 'নরেনকাকা? তিনি কি করে জানবেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'তাকে বলা আছে, আমাকে ধরে নিয়ে আসার পর ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে যেন না আসে। এদের পালের গোদাটা কে, তা জানা দরকার। আধঘন্টার মধ্যেই ভার্মা আসবে।'

প্রকাশ সরকার বলল, 'কিন্তু, কিন্তু, আপনি এত বড় ঝুঁকি নিলেন? এরা অতি সাংঘাতিক লোক। আগেই যদি আপনাকে মেরে ফেলত?'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'আমাকে ওরা মারবে কেন? আমি মরে গেলেই তো ওদের দারুণ ক্ষতি! জঙ্গলগড়ের চাবি কোথায় আছে জান? আর কোথাও নেই, আছে আমার মাথার মধ্যে। আমাকে মারলে ওদের এত কান্ড করা সব ব্যর্থ হয়ে যেত। জঙ্গলগড়ের সন্ধান আর কেউ পেত না!'

দরজায় আবার জোরে জোরে ধাক্কা পড়ল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'এই রাজকুমার কে? ওকে আপনি আগে চিনতেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'রাজকুমার না ছাই! এখানে এরকম গন্ডায় গন্ডায় রাজকুমার আছে। অনেক রাম-শ্যাম-যদুও নিজেকে রাজকুমার বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ-ও ঠিক পালের গোদা নয়। আর একজন কেউ আছে। আমারই ভুল হল, আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলুম না।'

দরজায় দমাস-দমাস শব্দ হচ্ছে। ওরা কোনও ভারি জিনিস দিয়ে দরজায় আঘাত করছে। কিন্তু পুরনো আমলের শক্ত কাঠের উঁচু দরজা। ভাঙা সহজ নয়।

কাকাবাবু বললেন, 'ওই লোকটাকে টেনে আমার কাছে নিয়ে এস।'

সন্তু আর প্রকাশ সরকার লোকটিকে ধরাধরি করে কাকাবাবুর পায়ের কাছে নিয়ে আসতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে তাঁর চুলের মুঠি ধরে অন্য হাতে রিভলভারের ডগাটা তার ঘাড়ে ঠেকালেন। তারপর বললেন, 'এই যে রাজকুমার, ঘুম ভেঙেছে?'

লোকটি হাত তুলে নিজের গলায় ঝুলোতে যেতেই কাকাবাবু বললেন, 'উঁহু, নড়াচড়া একদম চলবে না। পট্ করে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। আমি দেখে নিয়েছি, ছ'খানা গুলি ভরা আছে।'

লোকটি বলল, 'রাজা রায়চৌধুরী, তা হলে তুমি পাগল হওনি! যাক, সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু তুমি কি এরকমভাবে জিততে পারবে? আমার লোক এক্ষুনি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আসুক না, তাতে কোনও চিন্তা নেই। শোন, আমি সিগারেট খাই না। না হলে তোমার হাতে আমারও সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া উচিত ছিল।'

প্রকাশ সরকার বলল, 'স্যার, আমার কাছে সিগারেট আছে। ধরাব?'

লোকটি কটমট করে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার আমি সর্বনাশ করে দেব।'

প্রকাশ সরকার বলল, 'আপনি যা খুশি করতে পারেন, আর আমি ভয় পাই না।'

তারপর সে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে কাঁচুমাচুভাবে বলল, 'দেখুন, আমি কিন্তু ওদের দলের নই। সেদিন সকালবেলা আমার এক বন্ধুর নাম করে এদের লোক আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর এখানে ধরে নিয়ে আসে। আমার একটা গোপন ব্যাপার এরা জানে, সে-কথা বলে ওরা আমাকে ভয় দেখিয়েছে। সব কথা আপনাকে আমি পরে খুলে বলব।'

দরজার খিলটা এবার মড়মড় করে খানিকটা ভেঙে গেল। এবার ওরা ভেতরে ঢুকে আসবে।

সন্তু বলল, 'আমি আর প্রকাশদা দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াব?'

কাকাবাবু বললেন, 'কোনও দরকার নেই তোরা দুজনে বরং দেওয়ালের দিকে সরে দাঁড়া। হঠাৎ গুলি ছুঁড়লে তোদের গায়ে লাগতে পারে।'

দরজা ভেঙে প্রথমেই এক হাতে ছুরি আর অন্য হাতে রিভলভার নিয়ে ঢুকল 'কর্নেল', তারপর আরও চার-পাঁচজন লোক।

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'আর এক পা-ও এগিও না। তাহলে তোমাদের রাজকুমারের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। ওহে রাজকুমার, তোমার লোকদের বল পিছিয়ে যেতে!'

রাজকুমার নামের লোকটি হেসে উঠল হো-হো করে। তারপর বলল, 'রায়চৌধুরী, তুমি আমার গলা টিপে অজ্ঞান করে রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছ বলেই জিততে পারবে? কর্নেল, এগিয়ে এস!'

কাকাবাবু বললেন, 'সাবধান! আমি সত্যি গুলি করব। প্রথমে তোমাকে, তারপর ওদের!'

রাজকুমার অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'মিথ্যে ভয় দেখালেই আমি ভয় পাব? রাজা রায়চৌধুরীকে আমি ভাল করেই জানি, সে কখনো কোনও মানুষ খুন করতে পারবে

না। তুমি আমায় কেমন মারতে পার দেখি তো! কর্নেল, এ যদি আমায় মেরেও ফেলে, তবু তোমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের ধরে ফেল!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি ঠিক তিন গুনব। তারপর ....'

রাজকুমার বলল, 'কর্নেল, ওর কথায় বিশ্বাস কোর না! ও গুলি করে আমায় কিছুতেই মারবে না আমি জানি। তোমরা এগিয়ে এস!'

১৫

সন্তুর বুকের মধ্যে যেন কালবৈশাখীর ঝড় বইছে! এক্ষুনি একটা কিছু সাংঘাতিক কান্ড ঘটবে। কাকাবাবু কি ঠান্ডা মাথায় একটা লোককে সত্যিই গুলি করে মেরে ফেলতে পারবেন? কাকাবাবু যে ভয় দেখাচ্ছেন, তা কি ওই 'কর্নেল' নামের লোকটা বিশ্বাস করবে?

একবার সে চট করে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকাল। প্রকাশ সরকারও সন্তুর মতন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন সে একটু-একটু সরে যাবার চেষ্টা করছে পাশের বারান্দার দিকে। বারান্দার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে প্রকাশ সরকারের। সন্তুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে সন্তুকে ইশারা করল এদিকে সরে আসবার জন্য।

কর্নেল আর তার পেছনে তিনজন লোক একটু ঝুঁকে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন যে-কোন সময় তারা বাঘের মতন কাকাবাবুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রাজকুমারের ঘাড়ে রিভলভারের নলটা ঠুসে ধরে কাকাবাবু বললেন, 'আমি শেষবার বলছি, আর এক পা-ও এগোবে না। আমি ঠিক তিন পর্যন্ত গুনব, তারপরই গুলি করব!'

রাজকুমার বলল, 'ওর কথা গ্রাহ্য কোর না কর্নেল। এগিয়ে এসে ওকে ধর!'

কাকাবাবু বললেন, 'এক!'

কর্নেল তবু এক পা এগিয়ে এল।

কাকাবাবু বললেন, 'দুই।'

রাজকুমার বলল, 'কর্নেল, তুমি শুধুশুধু দেরি করছ কেন? ভয় পাচ্ছ নাকি? আমি তো বলছি, ভয় নেই!'

কাকাবাবু বললেন, 'তোমরা আমায় চেন না! আমি কখনও স্বেচ্ছায় ধরা দিই না। আর আমার ওপর কেউ অত্যাচার করলে তার প্রতিশোধ আমি না নিয়ে ছাড়ি না। রাজকুমার, তুমি আমার গালে চড় মেরেছ, আমার হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছ। এর শাস্তি তোমায় পেতেই হবে। শাস্তি আমি নিজে হাতে দিতে চাই না, পুলিশের

হাতে তোমায় তুলে দেব। তোমার ভালর জন্যই বলছি, এই লোকগুলোকে চলে যেতে বল। ওরা যদি আর এগিয়ে আসে, তা হলে তোমাকে আমি শেষ করে দিতে বাধ্য হব।'

এবার কর্নেল বলল, শুনুন মশাই। আপনি তো অনেক কথা বললেন, এবারে আমি একটা কথা বলি। আপনি যদি বাই চান্স রাজকুমারকে গুলি করেন, তা হলে তারপর আপনাকে তো মারবই, এই বাচ্চা ছোঁড়াটাকে আর ডাক্তারটাকেও গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব! আমি মশাই এক কথার মানুষ। রাজকুমারকে আপনি ছেড়ে দিন। তা হলে আপনাদেরও আমি মারব না। কাটান-কুটিন হয়ে যাবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আগে তোমরা সবাই ঘরের বাইরে চলে যাও – হাতের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখ, তারপর —।'

রাজকুমার চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার, এর কথা বিশ্বাস করবে না। বলছি তো, এ লোকটা ফাঁকা আওয়াজ করছে। আমাকে মারবার হিম্মত ওর নেই! এরা মিড্‌ল ক্লাস ভদ্দরলোক, এরা গুলি করে মানুষ মারতে পারে না। তোরা সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড় আমার ওপরে --।'

সন্তু দেখল, কাকাবাবুর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে গেছে।

রাজকুমার নিজেকে ছাড়াবার জন্য শরীর মোচড়াতেই কাকাবাবু এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিলেন 'কর্নেল'-এর পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা তুলে ঠেকালেন নিজের কপালে।

অন্যরা রাজকুমারকে চটপট তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। একজনের হাত থেকে একটা রিভলভার নিয়ে রাজকুমার এদিকে ফিরতেই দেখল কাকাবাবু কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

কাকাবাবু বললেন, 'এবার? অন্য লোককে গুলি করতে পারি না বটে, কিন্তু নিজেকে গুলি করতে আমার একটুও হাত কাঁপবে না। আমাকে ধরবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। আর আমি যদি এখন মরে যাই তা হলে, রাজকুমার, তোমার কি অবস্থা হবে বুঝতেই পারছ? যে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সে তোমায় আর আস্ত রাখবে? জঙ্গলগড়ের চাবি আছে আমার মাথার মধ্যে। তোমার হাতে ধরা দেবার আগে আমি আমার এই মাথাটাই উড়িয়ে দেব। জঙ্গলগড়ের চাবি চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে।

রাজকুমার ঝট করে মুখ ফিরিয়ে দেখল সন্তুকে।

কাকাবাবু বললেন, 'শোন! আমি মরলে তোমার কোনও লাভ নেই, ক্ষতিই বেশি। আমারও আপাতত মরবার ইচ্ছে নেই। সুতরাং, এস একটা মাঝামাঝি রফা করা যাক। জঙ্গলগড়ের সন্ধান যদি আমি দিই, তা হলে তোমরা তার বদলে আমায় কত টাকা দেবে?'

রাজকুমার বলল, 'টাকা? এর আগে তোমাকে দশ লাখ টাকা দেবার প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল।'

'উহুঃ! অত কমে হবে না। তোমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

'আমায় কেউ পাঠায়নি! কে পাঠাবে? জঙ্গলগড়ের যা কিছু সবই আমার পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি। এর ওপর সব দাবি আমার। যা কিছু বলার সব আমার সঙ্গেই বলতে হবে।'

'বেশ তো! ঠান্ডা মাথায় অনেক কিছু আলোচনা করা দরকার। তোমার এখানে চা কিংবা কফির কিছু ব্যবস্থা নেই? এখন সন্তু আর প্রকাশকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দাও। ওরা বিশ্রাম নিক।'

রাজকুমার এবারে হা-হা করে হেসে উঠল। যেন কয়েক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল কাকাবাবুর মুখের দিকে। তারপর বলল, 'রায়চৌধুরী, তুমি নিজেকে খুব চালাক ভাব, তাই না? আর আমরা সব বোকা, কিছু বুঝি না?'

লম্বা হাত বাড়িয়ে সে সন্তুর কাঁধটা ধরে এক ঝটকায় টেনে আনল নিজের কাছে। তারপর সন্তুর ডান দিকের কানের ফুটোর মধ্যে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বলল। 'নাউ হোয়াট? তুমি নিজে মরতে ভয় পাও না জানি, কিন্তু তোমার ভাইপোকে যদি মেরে ফেলি? এই জন্যই তুমি ওকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিতে চাইছিলে!'

কাকাবাবু বললেন, 'আর, এসব নাটকের কি দরকার? বললুম তো তোমার সঙ্গে আমি আলোচনায় বসতে রাজি আছি। আমি কত কষ্ট করে জঙ্গলগড়ের সন্ধান বার করেছি, সে জন্য কিছু পাব না?'

রাজকুমার বলল, 'তোমায় কিছু দেব না। তুমি আমাদের যথেষ্ট ভুগিয়েছ! এবারে তুমি এক্ষুনি জঙ্গলগড়ের সব সন্ধান দিয়ে দাও, নইলে এই ছেলেটাকে এক্ষুনি শেষ করব!'

এর মধ্যে টকাং করে একটা শব্দ হল। প্রকাশ সরকার এই সব কথাবার্তার সুযোগে বারান্দার দরজার ছিটকিনিটা খুলে ফেলেছে।

কিছু একটা করবার জন্য কর্নেল' -এর হাত নিশপিশ করছিল। এবারে সে লাফিয়ে গিয়ে তার রিভলভারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারল প্রকাশ সরকারের মাথায়। প্রকাশ সরকার একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে ঢলে পড়ল।

সেদিকে একবার মাত্র তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল রাজকুমার। এমন একটা ভাব করল যেন কিছুই হয়নি।

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এবার চটপট বলে ফেল। শোন রায়চৌধুরী, আমরা রাজপরিবারের লোক। দরকার হলে দু-চারটে লোক মেরে ফেলতে আমাদের একটুও ভুরু কাঁপে না।'

সন্তু বলল, 'আপনি আমায় মেরে ফেললেও কাকাবাবু কোনও অন্যায় মেনে নেবেন না!'

রাজকুমার বলল, 'চোপ্!'

কাকাবাবু বললেন, 'ওকে তুমি মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছ, রাজকুমার। তোমাদের এত সব চেষ্টাই পন্ডশ্রম। জঙ্গলগড়ে আসলে কিছুই নেই। হয়তো কিছু ছিল একসময় ঠিকই, কিন্তু আগেই কেউ তা সাফ করে নিয়ে গেছে!'

'সেটা আমরা বুঝব কিছু আছে কি নেই। আমরা সেখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখতে চাই!'

'ওকে ছেড়ে না দিলে আমি কিছুই বলব না!'

'বলবে না? তবে দ্যাখ, আমি প্রথমে এক গুলিতে এর পা খোঁড়া করে দিচ্ছি। তারপর এক এক করে ...'

এমন সময় একটা লোক দৌড়ে এসে বলল, 'রাজকুমার! রাজকুমার! এক দল লোক আসছে এদিকে। বোধহয় মিলিটারি!'

অমনি 'কর্নেল' আর অন্যরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

রাজকুমার জিজ্ঞেস করল, 'কটা গাড়ি?'

লোকটি বলল, 'গাড়ি, নেই, দৌড়ে দৌড়ে আসছে!'

রাজকুমার কাকাবাবুর দিকে ফিরে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'মিলিটারি এলেও তুমি নিস্তার পাবে না রায়চৌধুরী। আমরা তোমার ভাইপোকে নিয়ে চললুম। যদি একে প্রাণে বাঁচাতে চাও,তাহলে আমাদের কাছে তোমাকে নিজে থেকেই আসতে হবে। কর্নেল ওকে কভার করে থাক!'

সন্তুকে নিয়ে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল রাজকুমার। কাকাবাবু কিছুই করতে পারলেন না। অসহায়ভাবে বসে রইলেন।

১৬

হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলেন প্রকাশ সরকারের কাছে। মাথার এক জায়গা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, প্রকাশ সরকার অজ্ঞান। কাকাবাবু পরে আছেন রাত-পোশাক, সঙ্গে একটা রুমাল পর্যন্ত নেই। ফ্যাঁস করে তিনি নিজের জামাটা ছিঁড়ে ফেললেন, তারপর সেটা দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধলেন ওর মাথাটা। নাকের কাছে হাত নিয়ে নিঃশ্বাসটা অনুভব করে দেখলেন। এখন আর কিছু করার নেই তার।

লাফিয়ে লাফিয়ে দরজার কাছে চলে এলেন কাকাবাবু। রাগে-দুঃখে তাঁর মুখটা অদ্ভুত হয়ে গেছে। তাঁর হাতে রিভলভার, অথচ তিনি কিছুই করতে পারলেন না, ওরা সন্তুকে ধরে নিয়ে চলে গেল!

এবারে বাড়ির বাইরে শোনা গেল ভারি ভারি জুতোর শব্দ। কারা যেন ছুটে ছুটে আসছে।

সিঁড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর ইউ সেইফ, রায়চৌধুরী? নো হার্ম ডান?'

কাকাবাবু একেবারে ফেটে পড়লেন।

'অপদার্থ! ওয়ার্থলেস! তোমাদের সামান্য সেন্‌স অফ রেসপনসিবিলিটি নেই!'

'আরে শুনো, শুনো। পহ্‌লে তো শুনো!'

'কি শুনব, আমার মাথা আর মুন্ডু? যা হবার তা তো হয়েই গেছে! তোমাদের আরও আধঘন্টা আগে আসবার কথা ছিল –'

গাড়ির অ্যাকসিলেটরের তার কেটে গেল যে! এমন বেওকুফ, সঙ্গে একটা একস্ট্রা তার পর্যন্ত রাখে না। ব্যস, গাড়ি বন্ধ!'

'গাড়ি বন্ধ? সি আর পি'র গাড়ি খারাপ? এমন গাড়ি রাখে কেন?'

বাইরে তো দেখতে নতুন, ভিতরে একদম ঝরঝরে। নদীর ধারে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল, সেখান থেকে আমরা ডাবল্ মার্চ করে চলে এলাম!'

'আর এসে লাভটা কি হল? ওরা সন্তুকে ধরে নিয়ে গেছে!'

'কোন দিকে গেল?'

'এখন তুমি দৌড়ে দৌড়ে ওদের পেছনে তাড়া করবে? ওদের সঙ্গে ভাল গাড়ি আছে। শোন, এই লোকটি আহত হয়েছে, ওর এক্ষুনি চিকিৎসা করা দরকার।'

প্রকাশ সরকারের জ্ঞান ফিরে এসেছে এর মধ্যে। আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল,'কি হল? সবাই পালিয়ে গেল?'

কাকাবাবু আবার বললেন, 'ওরা সন্তুকে নিয়ে গেছে। ডেঞ্জারাস লোক ওরা, সন্তু ওদের কাছে একটু চালাকি করতে গেলেই মহাবিপদ হবে। ওদের মায়াদয়া নেই।'

নরেন্দ্র ভার্মা খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু রাজা। তোমার হাতে রিভলভার, তবু ওই লোকগুলো সন্তুকে ধরে নিল কি করে? তুমি রেজিস্ট করলে না?'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি কি করব? লোকগুলোকে গুলি করে মারব! আজ খুব একটা শিক্ষা হল। সাধারণ গুন্ডা – বদমাশরা অনায়াসে মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু আমরা পারি না। আমরা কি ঠান্ডা মাথায় গুলি করতে পারি?'

'ওদের কাছেও আর্মস ছিল?'

'এটাও তো ওদেরই। আমি এটা কেড়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা দলে ভারি, তাই কোনও লাভ হল না। আমি কথা দিয়ে ওদের ভুলিয়ে রাখবার অনেক চেষ্টা করলাম, খালি ভাবছি তোমরা এসে পড়বে, আর তোমাদের পাত্তাই নেই!'

গাড়িটা যে এমন বিট্রে করবে, তা কি করে বুঝব বল! আই অ্যাম ভেরি সরি! ওদের সর্দার কে? চিনতে পারলে?'

'সে সব কথা পরে হবে! এখন এখান থেকে যাব কি করে? পায়ে হেঁটে?'

'এক জনকে ফেরত পাঠিয়েছি। আর একটা গাড়ি নিয়ে আসবে।'

'সে গাড়ি আসতে আসতে রাত ভোর হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমি হাঁটব কি করে? আমার ক্রাচ্ নেই তোমাকে ক্রাচ আনতে বলেছিলাম, এনেছ?'

'সেও তো গাড়িতে রয়ে গেছে!'

'বাঃ!'

'রাজা, আর দিমাগ খারাপ কোর না। কোনও উপায় তো নেই। একটু ঠান্ডা মাথা করে বোস!'

এমন সময় নিচ থেকে উঠে এলেন দেববর্মন। কাকাবাবুকে দেখে দারুণ অবাক হয়ে বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী,আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনাদের যা ব্যবস্থার ধাক্কা, তাতে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ব মনে হচ্ছে।'

'আপনার মাথার গোলমাল ...মানে ...সেটা সত্যি নয়? একবারও বুঝতে পারিনি!'

'আমার আবার মাথার গোলমাল শুরু হবে এক্ষুনি। সন্তুকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে! আপনারা ওই ছেলেটাকে চেনেন না, ওর দারুণ সাহস। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে,এখানে বেশি সাহস দেখাতে গেলে কি যে হবে ঠিক নেই। ওদের মধ্যে কর্নেল বলে একটা লোক আছে সে দারুণ গোঁয়ার। ওই দেখুন না, প্রকাশ সরকারের মাথা কি রকম জখম করে দিয়েছে।'

দেববর্মন বললেন, 'কর্নেল? একজন তো কর্নেল আছে নাম করা ক্রিমিনাল। জেল ভেঙে পলিয়েছে?'

'আর রাজকুমার বলে কারুকে চেনেন?'

'দেখুন, আমাদের এখানে অনেকেই রাজকুমার। আমি নিজেই তো অন্তত কুড়িজন রাজকুমারকে চিনি।'

নরেন্দ্র ভার্মা চেয়ারটা নিয়ে এসে কাকাবাবুর কাছে রেখে বললেন, 'রাজা, তুমি এখানে বোস। আর কতক্ষণ এক ঠ্যাংকা উপার খাড়া হয়ে থাকবে?'

কাকাবাবু বললেন, 'একটা গাড়ি। একটা গাড়ির জন্য সব নষ্ট হয়ে গেল।'

দেববর্মন বললেন, 'আমাদের আর একটু তৈরি হয়ে আসা উচিত ছিল। দুটো গাড়ি আনলে কোনও গণ্ডগোল ছিল না। ওদের সঙ্গে দুটো গাড়ি ছিল। চাকার দাগ দেখে বুঝতে পারছি। ওরা ডান দিকে গেছে। জঙ্গলের দিকে।'

কাকাবাবু বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগরতলায় ফিরে যাওয়া দরকার। কাল সকালেই একটা মিটিং ডাকতে হবে।'

এমন সময় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। নরেন্দ্র ভার্মা উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'ওই তো আমাদের গাড়ি এসে গেল বোধ হয়!'

দেববর্মন বললেন, 'আমাদের গাড়ি? এত তাড়াতাড়ি কি করে আসবে? একজন লোক আগরতলায় যাবে আবার ফিরে আসবে, এত কম টাইমে তো হবার কথা নয়?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'তা হলে কি ওরাই আবার ফিরে আসছে? ওদের দলে কতজন লোক আছে?'

নরেন্দ্র ভার্মা তাকালেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু কোনও উত্তর দিলেন না।

১৭

একটা গাড়ি এসে থামল বাড়িটার সামনে। তার থেকে নামলেন পুলিশের কর্তা শিশির দত্তগুপ্ত।

নরেন্দ্র ভার্মা দোতলার সিঁড়ির কাছে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শিশির দত্তগুপ্তকে দেখে বললেন, 'আমাদেরই লোক! কী আশ্চর্য আপনি?'

টকটক করে জুতোর শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে আসতে শিশিরবাবু বললেন, 'আপনাদের গাড়িটা মাঝরাস্তায় খারাপ হয়ে আছে দেখলাম। আপনারা ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছিলেন? ওরা ধরা পড়েছে তো?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'না, আমরা বহুত দেরি করে ফেলেছি। সব ব্যাটারা ভেগেছে। সন্তুকে পাকাড়কে লিয়ে গেছে। কিন্তু আপনার তো শরীর খুব খারাপ। একশো পাঁচ ফিভার হয়েছে শুনলাম!'

দেববর্মন বললেন, 'আপনার স্ত্রী বললেন, আপনার ম্যালেরিয়া হয়েছে —'

শিশিরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমার হাই ফিভার হয়েছিল, তাই আপনাদের সঙ্গে আসতে পারিনি। কিন্তু থাকতে পারলাম না। এখনও জ্বর আছে, যাক গে, সে এমন কিছু নয়, এখানে কি হল বলুন!'

কাকাবাবু দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'সেসব কথা পরে হবে। এখানে একজন ইনজিওরড হয়ে আছে, আগে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।'

শিশির দত্তগুপ্তও কাকাবাবুকে সুস্থ মানুষের মতন কথা বলতে শুনে দেববর্মনের মতন খুব অবাক হয়ে গেলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি তা হলে —'

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, এখন সুস্থ হয়ে গেছি। চলুন, আগরতলায় ফেরা যাক্।'

প্রকাশ সরকার এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার ইনজুরি মারাত্মক কিছু না।'

কাকাবাবু বললেন, 'এখানে আর থাকবার কোনও দরকার নেই।'

কাকাবাবু সিঁড়ির রেলিং ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে শুরু করলেন।

শিশিরবাবু তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললেন, 'আমি ধরছি। আপনি আমার কাঁধে ভর দিন।'

কাকাবাবু বললেন, 'কোনও দরকার নেই। আমার অসুবিধে হচ্ছে না।'

শিশিরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ভাইপোকে ধরে নিয়ে গেল? ওরা কতজন এসেছিল বলুন তো?'

'পাঁচ-ছ'জন হবে। তার মধ্যে একজনের নাম রাজকুমার, বেশ লম্বা, মজবুত স্বাস্থ্য, নস্যিরঙের সুট পরা। আর একজনকে ওরা কর্নেল বলে ডাকছিল।'

'কর্নেল? ওর চেহারাটা কি রকম বলুন তো? মুখখানা বুলডগের মতন?'

'তা খানিকটা মিল আছে বটে। নাকটা থ্যাবড়া। মনে হয় নাকের ওপর দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেছে!'

'সে তো একজন সাংঘাতিক খুনি! টাকা নিয়ে মানুষ খুন করে। কিন্তু ... কিন্তু ... ওই রকম একজন ভাড়াটে খুনি আপনাকে মারতে আসবে কেন? আপনার ওপর কার এত রাগ থাকতে পারে?'

'কার রাগ আছে, তা আমি জানি না। তবে মনে হচ্ছে কারুর কারুর কাছে আমি খুব দামি হয়ে গেছি। যে-কোনও উপায়ে তারা আমার মাথাটা চায়।'

'আপনার মাথা?'

'হ্যাঁ। কাটা মুণ্ডু নয়। জ্যান্ত মাথা। কেন জানেন। আমি কিছুদিন আগে ত্রিপুরায় এসে এক জায়গায় একটা খুব পুরনো মুদ্রা খুঁজে পেয়েছিলাম। রাজা মুকুট-মাণিক্যের মুদ্রা, তাতে একটা ঈগল পাখির ছবি আঁকা। ত্রিপুরার রাজাদের মুদ্রায় সিংহের মূর্তি থাকত, শুধু ওই একজনের মুদ্রাতেই ঈগলের ছবি ছিল। সেই জন্যই ওই মুদ্রা খুব দুর্লভ আর দামি।'

'হ্যাঁ এরকম একটা মুদ্রা আবিষ্কারের কথা কাগজে বেরিয়েছিল বটে। আপনিই সেই লোক? আপনি আগে ত্রিপুরায় এসেছিলেন?'

'অনেকবার। তবে বেসরকারিভাবে। সেইজন্যই আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনি কি ত্রিপুরার লোক?'

'আমাদের পূর্বপুরুষরা ত্রিপুরাতেই ছিলেন বটে, তবে আমার জন্ম কুমিল্লায়। সেইখানেই পড়াশুনা করেছি।'

'অমরমাণিক্যের গুপ্তধনের কথা শুনেছেন?'

'রাজা অমরমাণিক্যের গুপ্তধন? সে তো একটা গুজব! সে-রকম কিছু আবার আছে নাকি?'

'আছে কি না তা আমিও জানি না। না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তবে কারুর কারুর বোধহয় ধারণা হয়েছে, আমি অমরমাণিক্যের জঙ্গলগড়ের সন্ধান জেনে ফেলেছি।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'গুপ্তধন, মানে হিড্‌ন ট্রেজার? এই যুগে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'

শিশিরবাবুও হেসে বললেন, 'আমারও ধারণা, এসব একবারে বাজে কথা। ওই গুপ্তধনের গুজব এখানে অনেকদিন ধরেই চালু আছে! এ-সম্পর্কে দেববর্মন ভাল বলতে পারবেন।'

দেববর্মন বললেন, 'রাজা অমরমাণিক্য সম্পর্কে অনেক রকম গল্প আছে, গান আছে। তাঁর ওই গুপ্তধনের কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করে। এখনও কেউ কেউ ওই গুপ্তধনের খোঁজে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।'

প্রকাশ সরকার বললেন, 'ত্রিপুরায় আমার মামার বাড়ি। ছোটবেলায় আমিও এই গুজবের কথা শুনেছি।'

কথা বলতে বলতে বাড়ির বাইরে চলে এসেছেন ওঁরা। শিশিরবাবুর জিপগাড়িটার হেডলাইট দুটো জ্বালানো হয়েছে। রাত্রির অন্ধকার চিরে সেই আলোর রেখা চলে গেছে অনেক দূরে।

দেববর্মন শিশিরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ড্রাইভার কোথায়?'

শিশিরবাবু বললেন, 'ড্রাইভার আনিনি। আমার অসুখ বলে আমার ড্রাইভার রাত্রে বাড়ি চলে গিয়েছিল। আমি নিজেই চালিয়ে নিয়ে এলাম।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'এত হাই ফিভার নিয়ে, এই রাত্তিরে জঙ্গলের রাস্তায় একা একা এলেন, না না, এটা আপনার বিলকুল অন্যায় হয়েছে।'

শিশিরবাবু বললেন, 'কি করব! মিঃ রায়চৌধুরীকে ধরে নিয়ে গেছে শুনে বিছানায় ছটফট করছিলাম। আমারই এরিয়ার মধ্যে এইরকম কাণ্ড। তাই আর থাকতে পারলাম না।'

কাকাবাবুর দিকে ফিরে দৃঢ় স্বরে শিশিরবাবু বললেন, 'আপনার ভাইপোকে আমি কালকের মধ্যেই খুঁজে বার করব। ত্রিপুরা ছোট জায়গা। যাবে কোথায়!'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'এই কোঠিটা কার? জঙ্গলের মধ্যে এ-রকম ফাঁকা কোঠি পড়ে আছে?'

দেববর্মন বললেন, 'সেটা জানা শক্ত হবে না। সকালেই বার করে ফেলব। তবে ত্রিপুরায় এ-রকম বাড়ি অনেক পাবেন। রাজপরিবারের লোকরা জঙ্গলের মধ্যে এ-রকম বাড়ি বানিয়ে রেখেছেন অনেক জায়গায়।'

কাকাবাবু বললেন, 'আমাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করতে হবে।'

নরেন্দ্র ভার্মা আর দেববর্মন দু'দিক থেকে ধরে কাকাবাবুকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

সবাই গাড়িতে ওঠবার পর স্টার্ট দিলেন শিশিরবাবু।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'আমি ত্রিপুরার হিস্ট্রি ঠিক জানি না। এই রাজা অমরমাণিক কোন্ টাইমের? ইনি কোথায় গুপ্তধন রেখেছিলেন?'

দেববর্মন বললেন, 'অমরমাণিক নয়, অমরমাণিক্য। ত্রিপুরায় সব রাজাদের নামই মাণিক্য দিয়ে হত। এমন কি অন্য কোনও লোক রাজাকে মেরে রাজা হয়ে বসলেও তিনি কিছু একটা মাণিক্য হয়ে যেতেন।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'রাজা, এই অমরমাণিক্যের হিস্ট্রিটা আমায় একটু শোনাবে?'

কাকাবাবু বললেন, 'আজ নয়, কাল। এখন আমি একটু ঘুমোতে চাই। সারা রাত জেগে থাকলে সকালে আর কিছু চিন্তা করতে পারব না!'

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'কি জানি সন্তুকে নিয়ে ওরা কি করছে!'

১৮

চায়ে চুমুক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, 'গুপ্তধনে আমার আগ্রহ নেই। এই বিংশ শতাব্দীতেও কোথাও কোথাও হঠাৎ গুপ্তধন পাওয়া যায় বটে। কিন্তু সে সবই গভর্নমেন্টের সম্পত্তি হওয়া উচিত। আমি ত্রিপুরায় কয়েকবার এসেছি মুদ্রার খোঁজে। আপনারা সবাই জানেন, ইতিহাস চর্চার জন্য প্রাচীনকালের মুদ্রার দাম। এই দাম মানে বাজারের দাম নয়। ইতিহাসের দাম। ত্রিপুরার ইতিহাসে রাজা রত্নমাণিক্যের আগেকার কোনও রাজার নামের কয়েন পাওয়া যায়নি। আমি খুঁজছিলাম তাঁর আগেকার কোনও রাজার, অর্থাৎ ফিফটিন্থ সেনচুরির আগেকার কোনও রাজার কয়েন উদ্ধার করতে।'

কাকাবাবুর ঘরে সকালবেলাতেই এসে উপস্থিত হয়েছেন নরেন্দ্র ভার্মা আর শিশির দত্তগুপ্ত। শিশিরবাবুর চোখ লাল, গায়ে এখনো জ্বর আছে, তবু তিনি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেননি।

শিশিরবাবু বললেন, 'কিন্তু আপনি যে ঈগল আঁকা মুদ্রা খুঁজে পেয়েছেন। সেটা কোন সময়কার?'

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক ঈগল কি না বলা যায় না। তবে ওই রকমই একটা পাখি আঁকা। সেটা মুকুটমাণিক্য নামে এক রাজার সময়কার। তাঁর মুদ্রায় সিংহের বদলে ঈগল পাখির ছবি, সেটা একটা রহস্য। অবশ্য সেই সময় ত্রিপুরার ইতিহাসে খুব খুনোখুনির পালা চলেছিল। প্রায়ই একজন রাজাকে তার সেনাপতি খুন করে নিজে রাজা হয়ে বসত। আবার আগেকার সেই রাজার কোনও ভাই বা ছেলে সেই সেনাপতিকে খুন করে সিংহাসন ফিরিয়ে আনত। ঈগল পাখি আঁকা মুদ্রা ছাড়া আমি

আরও কয়েকটা মুদ্রাও পেয়েছি। সেগুলো কোন্ সময়কার তা এখনও জানা যায়নি। যাই হোক, আমার ওই মুদ্রা আবিষ্কারের কথা খবরের কাগজে ছাপা হয়ে যায়। যদিও এ কথা প্রকাশ করার ইচ্ছে আমার ছিল না। সেই খবর পড়েই কাদের ধারণা হয়েছে যে, আমি অমরমাণিক্যের গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেছি।'

শিশিরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই মুদ্রা আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'পেয়েছিলাম জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা বাড়িতে। লোকে সেটাকেই জঙ্গলগড় বলে।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'অমরমাণিক্যের গুপ্তধনের কাহিনীটা কি আমি একটু শুনতে চাই।'

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে একটু আগে থেকে শুরু করি। দিল্লিতে যখন আকবর বাদশা রাজত্ব করছেন, তখন ত্রিপুরায় রাজা ছিলেন বিজয়মাণিক্য। তাঁর ছেলের নাম অনন্তমাণিক্য। রাজা বিজয়মাণিক্য তাঁর বিশ্বাসী সেনাপতি গোপীপ্রসাদের মেয়ে রত্নাবতীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। বিশ্বাসী সেনাপতিটি কিন্তু চমৎকার বিশ্বাসের পরিচয় দিলেন। অনন্তমাণিক্য রাজা হবার দু'বছরের মধ্যেই গোপীপ্রসাদ তাকে খুন করে নিজে রাজা হয়ে বসল।'

শিশিরবাবু বললেন, 'সেনাপতিকে আপনি দোষ দিতে পারেন না! জোর যার সিংহাসন তার, এই ছিল তখনকার নিয়ম।'

কাকাবাবু বললেন, 'তা বলে নিজের জামাইকে খুন করে, নিজের মেয়েকে বিধবা করে রাজা হওয়াটাকে ভাল বলব? বলুন?'

শিশিরবাবু আর কিছু না বলে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন।

কাকাবাবু বললেন, 'এই গোপীপ্রসাদ রাজা হয়েই নাম নিয়ে নিল উদয়মাণিক্য। তার রাজধানী রাঙামাটির নাম বদলে দিয়ে নিজের নামে নাম রাখল উদয়পুর। এই উদয়মাণিক্য আর তার রানী হিরা দাপটে রাজত্ব করতে লাগল কিছুদিন। কিন্তু বেশিদিন সুখ ভোগ করতে পারল না। কোনও একটি মেয়ে ওই রাজা উদয়মাণিক্যকে বিষ খাইয়ে দেয়। অনেকে বলে তার বিধবা মেয়েই নাকি বাবাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। তখন রাজা হল উদয়মাণিক্যের ছেলে জয়মাণিক্য।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,'তা হলে রয়াল থ্রোন সেনাপতিদের ফ্যামিলিতেই চলে গেল?'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তবে বেশিদিনের জন্য নয়। আগেকার রাজা বিজয়মাণিক্যের এক ভাই ছিলেন অমরমাণিক্য নামে। গোপীপ্রসাদের অত্যাচারে তিনি রাজবাড়ি ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। জয়মাণিক্য রাজা হবার পর সেই অমরমাণিক্য এসে চ্যালেঞ্জ জানালেন তাকে। লড়াইতে তিনি জয়মাণিক্যকে পরাজিত ও নিহত করলেন। আবার সিংহাসন এসে গেল রাজপরিবারে। এই অমরমাণিক্য ছিলেন সেকালের ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'লেকিন রাজা হয়ে তিনি গুপ্তধন রাখবেন কেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'বলছি, সে কথা বলছি। রাজা অমরমাণিক্য অনেকদিন গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন, প্রজাদের খুব প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যেও সুখ সইল না বেশি দিন।'

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার সেনাপতি এসে মারল তাকে?'

কাকাবাবু বললেন, 'না, না, তা নয়। অমরমাণিক্য সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর সেনাপতিকে তিনি বেশি বিশ্বাস করতেন না, তাকে বেশি ক্ষমতাও দেননি। কিন্তু তার ফলও ভালও হয়নি। হঠাৎ আরাকানের রাজা সিকান্দর শাহ্ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল ত্রিপুরা। অমরমাণিক্য এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সৈন্যবাহিনী তেমন শক্তিশালী ছিল না তখন। তিনি যুদ্ধে হারতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আরাকানের মগ সৈন্যরা যখন এসে পড়ল রাজধানী উদয়পুরের দোরগোড়ায়, তখন অমরমাণিক্য ধরা না দিয়ে পালিয়ে গেলেন সপরিবারে। মগ সৈন্য এসে উদয়পুরে লুঠতরাজ করে একেবারে তছ্নছ্ করে দিল।'

নরেন্দ্র ভার্মা শুনতে শুনতেবেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। এবার বললেন, 'তারপর? রাজা ধরা পড়ে গেল?'

কাকাবাবু বললেন, ' না। রাজা অমরমাণিক্য লুকিয়ে রইলেন তিতাইয়ার জঙ্গলে। সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচরও গিয়েছিল। সেই জঙ্গলের মধ্যে চারিদিকে দেওয়াল গেঁথে একটা ছোট দুর্গের মতনও বানিয়ে ফেললেন।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'ওহি হ্যায় জঙ্গলগড়?'

'লোকে তাই বলে। এখন আর গড়ের চিহ্ন বিশেষ নেই, কয়েকটা দেওয়াল আর দু'একটা ভাঙা ঘর মাত্র রয়েছে। আরাকান রাজার সৈন্যরা ওদের সন্ধান পায়নি, কিন্তু রাজা অমরমাণিক্য হঠাৎ একটা কান্ড করে ফেললেন।'

শিশির দত্তগুপ্ত মুখ তুলে বললেন, 'রাজা কাপুরুষের মতন আত্মহত্যা করে বসলেন!'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনি এই ইতিহাস জানেন দেখছি!'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'এই ঘটনা সবাই জানে। রাজা অমরমাণিক্য বিষ খেয়েছিলেন। ত্রিপুরার আর কোনও রাজা এরকম কাপুরুষের মতন আত্মহত্যা করেননি।'

কাকাবাবু বললেন, 'এটা ঠিক কাপুরুষতা বলা যায় না। রাজা অমরমাণিক্যের আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল খুব বেশি। তিনি তো দুর্বল রাজা ছিলেন না। নিজের ক্ষমতায় সিংহাসন দখল করেছিলেন। আরাকান রাজার কাছে হেরে গিয়ে তাঁকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, এই অপমান তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই হঠাৎ একদিন আত্মহত্যা করলেন।'

'ওর ধনসম্পদ সব ওই জঙ্গলগড়েই রয়ে গেল?'

'অনেকে তাই বিশ্বাস করে। রাজধানী থেকে পালিয়ে আসবার সময় তিনি নিশ্চয়ই অনেক ধনসম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। সেসব গেল কোথায়? অমরমাণিক্য হঠাৎ মারা যান, তাঁর ধনসম্পদ কোথায় লুকনো আছে, সে কথা কারুকে বলে যাননি। সেই থেকেই গুপ্তধনের গুজবের জন্ম। এই গুপ্তধনের দাবিদার শুধু রাজপরিবার নয়। সেনাপতি গোপীপ্রসাদের বংশধররাও মনে করে সেই গুপ্তধনে তাদেরও ভাগ আছে। এই নিয়ে দুই পরিবারের মারামারিও হয়েছে অনেকবার। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই কিছু খুঁজে পায়নি।'

নরেন্দ্র ভার্মা হেসে বললেন, 'আভি তো কই রাজাও নেই, সেনাপতিও নেই। এখন আর কে লড়ালড়ি করবে?'

কাকাবাবু বললেন, 'রাজা নেই, সেনাপতি নেই বটে, কিন্তু তাদের বংশধররা আছেন। সে সব বংশের অনেক শাখা-প্রশাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে কার মনের ভাব কি তা কে জানে? যে লোকটি কাল রাতে নিজেকে রাজকুমার বলে পরিচয় দিচ্ছিল! সে তো বলল, ওই গুপ্তধনের ওপরে তারই সম্পূর্ণ অধিকার।'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'ওই রকম রাজকুমার অনেক আছে! সাত্যিকারের রাজবংশের কোনও ছেলে কি সাধারণ গুণ্ডার মতন ব্যবহার করতে পারে? কক্ষনও না।'

কাকাবাবু বললেন, 'আর একটা ব্যাপার আছে। কাল নরেন্দ্র ভার্মার আসতে যখন দেরি হচ্ছিল, তখন সময় নেবার জন্য আমি বলেছিলুম, ঠিক আছে, জঙ্গলগড়ের সন্ধান আমি দিতে পারি, কিন্তু আমায় কত টাকা বখরা দেবে বল। তখন রাজকুমার বললে, 'রায়চৌধুরী, তোমাকে আগেই অনেক টাকা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে, তুমি রাজি হওনি!' কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই, এর আগে তো আমায় কেউ এ ব্যাপারে কোনও টাকা দেবার প্রস্তাব করেনি! তার মানে, ওই রাজকুমার ঠিক জানে না। সে প্রধান দলপতি নয়। আর কেউ আছে।

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'ধরে ফেলব, সবাইকেই ধরে ফেলব। ওই রাজকুমার আর কর্নেল, ওদের সবাইকেই কালকের মধ্যে আপনার সামনে হাজির করে দেব!'

কাকাবাবু বললেন, 'তার আগে সন্তুকে উদ্ধার করার কি ব্যবস্থা করবেন?'

এই সময়ে সিঁড়িতে একটা গোলমাল শোনা গেল। শিশির দত্তগুপ্ত আর নরেন্দ্র ভার্মা সেই শব্দ শুনে উঠে দাঁড়াতেই সাদা পোশাকের পুলিশ দু'জন একটা লোককে টানতে টানতে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে।'

ওদের একজন বলল, 'স্যার, এই লোকটা একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। ওকে আমরা ছাড়িনি।'

১৯

রাজকুমার বজ্রমুষ্টিতে সন্তুর ঘাড় চেপে ধরে প্রায় ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে এনে তুলল একটা জিপ গাড়িতে। নিজে ড্রাইভারের সিটে বসে মাঝখানে বসাল সন্তুকে। আর পাশে খোলা রিভলবার হাতে নিয়ে বসল কর্নেল।

গাড়িতে স্টার্ট দেবার পর রাজকুমার বলল, 'কেউ আমাদের ফলো করলে সোজা গুলি চালাবে। আমরা কিছুতেই ধরা দেব না।'

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কোনও রকম চালাকির চেষ্টা কোর না, খোকা। প্রথমেই প্রাণে মারব না তোমায়! আমার লোকদের বলা আছে, তুমি পালাবার চেষ্টা করলেই তোমার একটা পা খোঁড়া করে দেবে, দ্বিতীয়বার একটা হাত কেটে দেবে। সারা জীবন ল্যাংড়া আর নুলো হয়ে থাকতে হবে, মনে রেখ!'

সন্তু কোনও কথা বলল না। কাকাবাবু যে পাগল হয়ে যায়নি, এমনকি তাঁর যে পক্ষাঘাতও হয়নি, এই আনন্দেই সে আর কোনও বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। এই ডাকাতরা কাকাবাবুর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এরা যে সন্তুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেজন্য সন্তুর একটুও ভয় নেই।

অন্য লোকগুলো আসছে পেছনের একটা গাড়িতে। হেডলাইটের আলোয় সন্তু দেখতে পাচ্ছে, সামনে কোনও রাস্তা নেই। এখানে জঙ্গল সে-রকম ঘন নয়। আলাদা আলাদা বড় বড় গাছ, জিপটা চলছে এরই ফাঁক দিয়ে এঁকে-বেঁকে।

আন্দাজ প্রায় আধঘন্টা চলার পর সন্তু দেখল সামনে একটা নদী। প্রথমে মনে হয়েছিল জিপটা একেবারে নদীতেই নেমে পড়বে। কিন্তু খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে রাজকুমার সেটা থামাল একেবারে জলের কিনারে।

রাজকুমার বলল, 'কর্নেল, ওকে তোমরা ঘোড়ায় তোল!'

সত্যি সেখানে গোটা পাঁচেক ঘোড়া বাঁধা আছে। বড় ঘোড়া নয়, ছোট ছোট পাহাড়ি টাট্টু ঘোড়ার মতন। সন্তু দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে এই রকম ঘোড়া দেখেছে।

কর্নেল প্রথমে সন্তুকে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপাল। তারপর নিজেও সেই ঘোড়াটায় চেপে বসল। রাজকুমার বসল তার পাশের ঘোড়ায়। তারপর অন্য লোকদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল, 'তোমাদের মধ্যে দু'জন জিপ দুটো নিয়ে চলে যাও। বাকিরা এস আমাদের সঙ্গে।'

সন্তুদের ঘোড়াটা প্রথমে কিছুতেই জলে নামতে চায় না। 'কর্নেল' তার দুপায়ের গোড়ালি দিয়ে বারবার খোঁচা মারতে লাগল তার তলপেটে। তারপর ঘোড়াটা হঠাৎ হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে।

সন্তু আগে কখনো এভাবে নদী পার হয়নি। সিনেমাতে সে এরকম দৃশ্য কয়েকবার দেখেছে। সে সব ওয়েস্টার্ন ছবি। এই দেশেও যে কেউ ঘোড়ার পিঠে নদী পার হয়, তা তার ধারণাতেই ছিল না। তার দারুণ উত্তেজনা লাগছে।

নদীটাতে জল বেশি নয়, তবে বেশ স্রোত আছে।

সন্তুর কোমর পর্যন্ত জলে ভিজে গেল। সন্তু খুব ভাল সাঁতার জানে। একবার তার লোভ হল কর্নেল কে এক ধাক্কা দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ডুব সাঁতার দিয়ে সে অনেকটা দূরে চলে যেতে পারবে। জলের মধ্যে ওরা গুলি করলেও তার গায়ে লাগবে না।

কিন্তু সন্তু সেই লোভ সংবরণ করল। সে ভাবল, দেখাই যাক না এরা কোথায় তাকে নিয়ে যায়। এদের আস্তানাটা তার চেনা দরকার।

নদী পেরিয়ে অন্য পারে পৌঁছবার পর ঘোড়া চলতে লাগল দুলকি চালে। মাঝে-মাঝে ঘোড়াটা গা ঝাড়া দিচ্ছে আর তখন তার গা থেকে বৃষ্টির মতন জলের কণা উড়ছে। সেই সময় ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাই মুশকিল!

সন্তুর সারা শরীর জবজবে ভিজে। তার একটু-একটু শীত করছে। আকাশে এখন পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে, তাতে চারিদিকটা বেশ দেখা যায়। এদিকে আর জঙ্গল প্রায় নেই। উঁচু নিচু পাহাড়ি জায়গা। সন্তুর মনে হল, ঠিক যেন টেক্সাস কিংবা আরিজোনার কোনও প্রান্তর দিয়ে চলেছে তাদের ঘোড়া।

একটা ছোট টিলার ওপর উঠে একটা পাথরের বাড়ির সামনে থামল ঘোড়াগুলো। টপাটপ নেমে পড়ল সবাই। রাজকুমার সেই বাড়িটার সামনের লোহার গেট ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ভেতর থেকে কেউ একজন বলল, 'আসছি আসছি!'

বাড়িটা ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, এবারে তার একটা ঘরে জ্বলে উঠল একটা লণ্ঠনের আলো। তারপর সেই লণ্ঠনটা দোলাতে দোলাতে একজন লোক এল গেটের কাছে। লণ্ঠনটা উঁচু করতেই দেখা গেল তার মুখ। ঠিক যেন একটা গেরিলা।

লোকটি বলল, 'এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন?'

রাজকুমার বলল, 'মেজর, এই একটা ছোঁড়াকে এনেছি, একে কিছু দিন তোমার জিম্মায় রাখতে হবে।'

'মেজর' লণ্ঠনটা সন্তুর মুখের কাছে এনে বলল, 'এত দেখছি একটা দুধের ছেলে। একে এনে কি লাভ হল? ধাড়িটা কোথায়?'

রাজকুমার বলল, 'আসবে, আসবে, সেও আসবে। কান টানলেই মাথা আসে। এই ছোঁড়াটাকে এখন দোতলার কোণের ঘরে রাখ। দুধের ছেলে বলে হেলাফেলা কোর না। এ মহা বিচ্ছু। একটু আলগা দিলেই পালাবার চেষ্টা করবে।'

কর্নেল বলল, 'রাজকুমার, এবার তা হলে আমি যাই?'

রাজকুমার আবাক হয়ে বলল, 'যাবে মানে? কোথায় যাবে?

কর্নেল বলল, 'আমি আর থেকে কি করব? আমার তো এক রাত্তির ফ্রি সার্ভিস দেবার কথা ছিল। হাওয়া খুব গরম, আমি আর ত্রিপুরায় থাকতে চাই না।'

রাজকুমার কর্নেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকাল। তারপর বলল, 'তোমার নামে যে কেস ঝুলছে, তাতে তোমার নির্ঘাৎ ফাঁসি হবে তা জান?'

কর্নেল বলল, 'সেই জন্যই তো আর আমি একদিনও ত্রিপুরায় থাকতে চাই না।'

রাজকুমার বলল, 'তুমি না চাইলেই কি ত্রিপুরা ছেড়ে যেতে পারবে? তা ছাড়া যাবেই বা কোথায়? আসাম, পশ্চিমবাংলা এই দু'জায়গাতেই তোমার নামে হুলিয়া ঝুলছে।'

কর্নেল বলল,'সে কোথায় যাব, তা আমি ঠিক বুঝে নেব।'

রাজকুমার বলল, 'তোমার মাথায় যা ঘিলু আছে, তাতে তুমি কিছুই বুঝবে না।'

কর্নেল এবার রেগে উঠে বলল, 'কেন আমায় আবার এসব ঝুটঝামেলায় জড়াচ্ছেন। এমনিতেই আমি মরছি নিজের জ্বালায় .. আজ রাত্তিরে আমি সার্ভিস দিয়েছি, আর কিছু পারব না!'

রাজকুমার বলল, 'ওরে গাধা ! একমাত্র ত্রিপুরাতেই তুই নিরাপদ। এখানে আর কেউ তোর টিকি ছুঁতে পারবে না। তোর নামে এখানে যে কেস ছিল, তা আমি তুলে নেবার ব্যবস্থা করেছি।'

কর্নেল খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'সত্যি বলছেন? নাকি আমায় চুপকি দিচ্ছেন?'

মেজর এবার বলল, 'ও কর্নেলদাদা, রাজকুমারের সঙ্গে তর্ক কোর না, উনি যা বলছেন, মেনে নাও! ত্রিপুরা পুলিশ তোমায় আর কিছু বলবে না।'

রাজকুমার এবার মেজরের দিকে ফিরে বলল, 'এ কি, তুমি এখনও যাওনি? ছোঁড়াটাকে নিয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে আছ, ও সব শুনছে? যাও।'

মেজর এবার সন্তুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। যেতে যেতে সন্তু শুনল, কর্নেলের একজন সঙ্গী বলছে, 'রাজকুমার , তা হলে আমার কেসটাও তুলে নেওয়া হবে তো?'

সন্তু অবশ্য এসব কথার মানে ঠিক বুঝতে পারল না। কেস কি? এদের নামে কিসের কেস? রাজকুমার নিজেই তো একটা ডাকাত, সে ওদের নামে পুলিশ কেস তুলে নেবে কি করে?'

ঘোরান একটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এস 'মেজর' থামল একটা ঘরের সামনে। দরজাটা খুলে সে সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, কিছু খেয়ে-টেয়ে এসেছ তো, নাকি এত রাত্তিরে খাবার দিতে হবে?'

সন্তু বলল, ' না, খাবার চাই না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তোমার নাম মেজর কেন? তুমি কি মিলিটারির লোক?'

লোকটি হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'ওসব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, বুঝলে খোকা? সাধ করে এই বিপদের মধ্যে এসেছ কেন? তোমার ইস্কুল খোলা নেই এখন?'

সন্তু বলল, 'আমি কলেজে পড়ি।'

মেজর বলল, 'বাঃ! তবে তো আর এক কাঠি! পড়াশুনো ছেড়ে এখানে মরতে এসেছ কেন?'

সন্তু বেশ স্মার্টলি বলল, 'আর বেশিদিন থাকব না, কাল-পরশুই ফিরে যাব ভাবছি!'

মেজর ভুরু তুলে বলল, 'তাই নাকি? কাল-পরশু? এত তাড়াতাড়ি? হা-হা- হা - হা-!'

লোকটির মুখের চেহারা গেরিলার মতন হলেও কথাবার্তা কিংবা হাসিটা তেমন নিষ্ঠুর নয়। বরং বেশ যেন মজাদার লোক বলে মনে হয়। হাসির সময় তার মস্ত গোঁফটা নাচে।

ঘরের মধ্যে এক পা দিয়ে সে বলল, 'এস খোকাবাবু, দ্যাখ, আমাদের অতিথিশালাটি তোমার পছন্দ হয় কি না! এস, এস বাইরে দাঁড়িয়ে থেক না।'

লোকটি সন্তুর হাত ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগেই। ওর হাতে কোনও অস্ত্রও নেই। গোটা বাড়িটা অন্ধকার, এখন ইচ্ছে করলেই সন্তু এক ছুটে কোথাও লুকিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সন্তু বুঝতে পারল, 'সেটা বুদ্ধিমানর কাজ হবে না। নিচে অন্য সবাই রয়েছে, শিকারি কুকুরের মতন তাড়া করে ওকে ঠিক খুঁজে বার করবে।

সন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। এ ঘরে কোনও খাট, চেয়ার টেবিল নেই। মেঝেতে একটা বিছানা পাতা। বিছানা মানে শুধু একটা কম্বল আর বালিশ। আর একটা জলের কুঁজো।

মেজর বলল, 'কাল সকালে তোমায় গরম দুধ খাওয়াব। দেখ, এখানকার দুধের স্বাদ কত ভাল। তুমি খরগোশ খেতে ভালবাস? আজ একটা খরগোশ ধরেছি, সেটাকে রান্না করব কাল। তুমি রুটি খাও , না ভাত খাও?'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি হোটেল?'

মেজর অকারণে আবার হেসে উঠল। তারপর গোঁফ মুছে বলল, 'শোন বাপু, আগেভাগে তোমায় একটা কথা বলে রাখি। তুমি অনেক অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েছ নিশ্চয়ই? আমিও অনেক পড়েছি। সব বইতেই দেখেছি, তোমার বয়েসি ছেলেরা একবার না একবার পালাবার চেষ্টা করেই। তুমিও করবে নিশ্চয়ই। তোমার সবে ডানা গজাচ্ছে, এই তো পালাবার বয়েস! কিন্তু তুমি যদি পালাও, তাহলে আমার যে গর্দান যাবে! সুতরাং তুমি পালাবার চেষ্টা করলে আমিও তোমাকে ধরতে বাধ্য। তারপর ধরা যখন পড়বে, তখন তোমায় শাস্তিও দিতে হবে। প্রথম শাস্তি হচ্ছে খেতে না দেওয়া। তুমি যদি কাল দুপুরের মধ্যে পালাবার চেষ্টা কর, তা হলে কিন্তু খরগোশের মাংস তোমায় দেব না, বুঝলে?'

সন্তু বলল, 'আমি খরগোশের মাংস খেতে চাই না।'

মেজর বলল, 'যাক গে, ওসব কথা পরে হবে। আজ রাতে অনেক ধকল গেছে, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতন ঘুমিয়ে পড়!'

দরজার সামনে থেকে রাজকুমার ঠিক তক্ষুনি বলল, 'দাঁড়াও, এখন ঘুমোবে কি, ওকে এখন চিঠি লিখতে হবে।'

২০

ঘরের মধ্যে ঢুকে রাজকুমার মেজরকে বলল, 'যাও, জলদি কাগজ আর কলম নিয়ে এস!'

মেজর যেন আকাশ থেকে পড়ল। চোখ বড় বড় করে বলল, 'কাগজ? কলম? সে আমি পাব কোথায়?'

রাজকুমার বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেন, তোমার কাছে কাগজ-কলম নেই? জোগাড় করে রাখনি কেন?'

মেজর হে-হে করে হেসে বলল, 'কি যে বলেন, রাজকুমার! আমরা যে কাজ করি, তাতে কি কখনও কলমের দরকার হয়? আপনি আগে তো জোগাড় করে রাখার কথা বলেও যাননি।'

রাজকুমার তখন দরজার কাছে দাঁড়ান কর্নেল আর অন্য দু'জন লোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কাছে কলম আছে?'

কর্নেল কোনও উত্তর দেবার বদলে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল। যেন কলম কথাটি সে আগে কখনও শোনেইনি। অন্যরাও কেউ কথা বলল না।

রাজকুমার আবার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তুমি অন্য ঘরগুলিতে দেখে এস!'

মেজর বলল, আমি তিনদিন ধরে এ-বাড়িতে আছি। সব ঘরগুলিতে ঘুরে দেখেছি। এক টুকরো কাগজও দেখিনি, কলমও দেখিনি!'

রাজকুমার নিজের বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুসি মেরে বলল, 'সামান্য কাগজ-কলমের জন্য সময় নষ্ট করতে হবে? এখন সময়ের কত দাম জান? যা হোক, একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে কালকের মধ্যে! একটা চিঠি লেখার ব্যবস্থা রাখতে পারনি?'

মেজর বলল, 'পাশের ঘরে একটা পুরনো ক্যালেন্ডার আছে, তার একটা পাতা ছিঁড়ে উল্টো পিঠে লেখা যেতে পারে। কিন্তু কলম কোথায় পাওয়া যাবে?'

কর্নেল বলল, 'আমি গাছের ডাল কেটে কলম বানিয়ে দিতে পারি।'

এই বলে সে কোটের পকেট থেকে একটা বড় ছুরি বার করল। রাজকুমার ভেংচিয়ে বলল, 'গাছের ডাল কেটে কলম বানালেই চলবে? শুধু কলম দিয়ে লেখা যায়? কালি কোথায় পাওয়া যাবে?'

কর্নেল বলল, 'কাঠকয়লা নেই বাড়িতে? কাঠকয়লা গুঁড়ো করে কালি বানানো যায়।'

রাজকুমার এবার একটা হুংকার দিয়ে বলল, 'তবে যাও! শিগগির কালি আর কলম বানিয়ে নিয়ে এস!'

মেজর আর কর্নেল দৌড়ে বেরিয়ে গেল। রাজকুমার দুই কোমরে হাত দিয়ে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে রইল সন্তুর দিকে।

সন্তুর বেশ মজা লাগছে। এতগুলো লোক, কারুর কাছে একটা ডট্ পেন পর্যন্ত নেই। এই যে রাজকুমার এত চ্যাঁচামেচি করছে, সেও তো খুব সেজেগুজে রয়েছে, সেও পকেটে একটা কলম রাখে না? এতেই বোঝা যায়, এরা কি রকম ধরনের মানুষ!

রাজকুমার এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে জানলাটা খুলে দিল। তারপর জানলার শিকগুলো টেনে টেনে দেখল, সেগুলো ঠিক শক্ত আছে কিনা।

সন্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমার কথা আমি জানি। নেপালে আর আন্দামানে তুমি অনেক রকম খেল্ দেখিয়েছ! এখানে যেন সে রকম কিছু করতে যেও না। এটা শক্ত ঠাঁই!'

সন্তু কোনও উত্তর দিল না। এই রাজকুমারকে গোড়া থেকেই তার খুব গোঁয়ার বলে মনে হয়েছে। এই রকম লোকের পক্ষে ফট্ করে গুলি চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু না।

একটু বাদেই মেজর আর কর্নেল ফিরে এল। একটা চায়ের কাপে কালি গুলে এনেছে, আর গাছের ডাল কেটে একটা কলমও বানিয়েছে। মেজর নিয়ে এসেছে পুরনো ক্যালেন্ডারটা।

তার একটা পাতা ছিঁড়ে সন্তুর সামনে ফেলে দিয়ে রাজকুমার বলল, 'নাও, এবারে লেখ!'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'কাকে লিখতে হবে? প্রধানমন্ত্রীকে?

রাজকুমার চোখ পাকিয়ে বলল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে? তোমার কাকাবাবুকে চিঠি লেখ। আমি যা বলছি তাই লিখবে!'

সন্তু প্রথমে লিখল। পূজনীয় কাকাবাবু। তারপর রাজকুমারের মুখের দিকে তাকাল।'

রাজকুমার বলল, 'লেখ। আমি বেশ ভাল আছি।'

সেই ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ার সময় সন্তু ডিকটেশান লিখেছে, তারপর আর কারুর কথা শুনে তাকে চিঠি লিখতে হয়নি। যাই হোক, রাজকুমারের এই কথাটায় আপত্তির কিছু নেই বলে সে লিখে ফেলল।

রাজকুমার বলল, 'তারপর লেখ, এখনও পর্যন্ত ইহারা আমার উপর কোনও অত্যাচার করে নাই।'

সন্তু বলল, 'আমি সাধু ভাষা লিখি না। আমি চলতি ভাষায় চিঠি লিখি।'

রাজকুমার প্রচন্ড ধমক দিয়ে বলল, 'যা বলছি, তাই লেখ!'

সন্তু লিখল, 'এখনও পর্যন্ত এরা আমার ওপর কোনও অত্যাচার করেনি।'

কর্নেল, মেজর ও অন্য দু'জন সন্তুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে দেখল সন্তুর চিঠি লেখা।

রাজকুমার বলল, 'হয়েছে? এবারে লেখ, তবে, আপনার উপরেই আমার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। আপনি জঙ্গলগড়ের গুপ্তধনের সন্ধান ইহাদের না দিলে ইহারা আর আমায় জীবন্ত ফিরিয়া যাইতে দিবে না!'

সন্তু বলল, 'একথা আমি লিখব না!'

রাজকুমার বলল, 'লিখব না মানে? তোর ঘাড় ধরে লেখাব। হতচ্ছাড়া, যা বলছি তাই লেখ্ শিগগির!

সন্তু বলল, 'আমায় দিয়ে জোর করে কেউ কিছু লেখাতে পারবে না।'

রাজকুমার বলল, 'তবে রে? আচ্ছা দ্যাখ্ একটুখানি নমুনা। কর্নেল, এর বাঁ হাতে একটু অপারেশান করে দাও তো।'

কর্নেল অমনি খপ্ করে সন্তুর বাঁ হাতটা চেপে ধরে টেনে নিল নিজের কাছে। তারপর তার ছুরিটা সন্তুর কনুইয়ের খানিকটা নিচে একবার ছুঁইয়ে দিল শুধু। মনে হল ঠিক যেন পালক বুলিয়ে গেল একটা। তবু সেই জায়গাটায় একটা লম্বা রেখায় ফুটে উঠল রক্ত। টপ্ করে এক ফোঁটা রক্ত পড়ল ক্যালেন্ডারের পাতাটার ওপর।

রাজকুমার নিষ্ঠুরভাবে হেসে বলল, 'এইবার দেখ্লি? লেখ যে, এই রক্তের ফোঁটাটা আমার। কাকাবাবু,আপনি আমার কথা না শুনিলে ইহারা আমার মুন্ডু কাটিয়া ফেলিবে। তারপর সেই রক্তে আমার জামা কাপড় চুবাইয়া তাহা আপনার নিকট পাঠাইবে।'

সন্তু বলল, 'এ রকম বিচ্ছিরি ভাষা আমি কিছুতেই লিখব না। আমাকে মেরে ফেললেও না।'

রাজকুমার পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে উল্টো করে ধরল। ওর বাঁট দিয়ে সন্তুর মাথায় মারতে চায়।'

কিন্তু সে মারবার আগেই মেজর হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'রাজকুমার, একটা কথা বলব? আমি একটু একটু লেখাপড়া করেছি। গুম-খুনের কিছু বইও

পড়েছি। এই রকম সময় কি রকম চিঠি লিখতে হয়, তা খানিকটা জানি। আমি ওকে বলে দেব?'

রাজকুমার বলল, 'তুমি কি রকম লেখাতে চাও শুনি!'

মেজর বলল, 'যেটুকু লেখা হয়েছে তারপর লিখুক, কাকাবাবু, আপনি জঙ্গলগড়ের গুপ্তধনের জায়গাটার একটা নকশা এঁকে যদি এদের কাছে পাঠান, তবেই এরা আমাকে ছাড়বে বলেছে। তবে এ সম্পর্কে আপনি যা ভাল বুঝবেন, তা-ই করবেন। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি —।'

সন্তুর দিকে ফিরে মেজর বলল, 'দ্যাখ ভাই, চিঠি তো তোমায় একটা লিখতেই হবে। নইলে আমরা তোমায় ছাড়ব না। শুধু শুধু কেন মারধোর খাবে? 'আমি যা বললুম, তা লিখতে তোমার কি আপত্তি আছে?'

কথা বলতে বলতে সকলের অলক্ষিতে মেজর সন্তুর দিকে একবার চোখ টিপে দিল। যেন সে বলতে চাইল, এই কথাগুলো লিখতে রাজি হয়ে যাও, তাতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।

গাছের ডালের কলম দিয়ে বড় বড় অক্ষরে সন্তু লিখে দিল এই কথাগুলো।

রাজকুমার কাগজটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'রায়চৌধুরী তোমার এই হাতের লেখা দেখে চিনতে পারবে?'

সন্তু বলল, 'হ্যাঁ, আমার সই দেখে ঠিক চিনবেন।'

রাজকুমার বলল, 'পুনশ্চ দিয়ে আবার লেখ, ঠিক চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এর উত্তর চাই।'

সন্তু বলল, 'আর আমি কিছু লিখতে পারব না।'

মেজর বলল, 'দিন, সেটা আমি লিখে দিচ্ছি। আমার হাতের লেখা কেউ চিনতে পারবে না, আমি সাত-আট রকমভাবে লিখতে পারি।'

মেজর সন্তুর চিঠির নিচে লিখল, 'চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এর উত্তর আর নকশা না পেলে সব শেষ। তোমার ভাইপোকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুলিশে খবর দিলে কোনও লাভ হবে না।'

এর নিচে সে আবার একটা মড়ার মাথার খুলি এঁকে দিল।

রাজকুমার আবার চিঠিখানা নিয়ে একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইল। তারপর বলল। 'ঠিক আছে। এটাই পাঠিয়ে দাও!' কর্নেল তোমার একজন লোককে বল ঘোড়া নিয়ে আগড়তলায় চলে যেতে, ভোরের আগেই যেন পৌঁছে যায়। সেখানে গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। জেনারেলই চিঠি ডেলিভারি দেবার ব্যবস্থা করবেন!'

কর্নেল বলল, 'কিন্তু আমার লোক যদি রাস্তায় ধরা পড়ে যায়?'

রাজকুমার হুংকার দিয়ে বলল, 'কে ধরবে? কেউ ধরবে না, যাও! ধরা পড়লেও চিঠি পৌঁছে যাবে ঠিক জায়গায়। আর যে ধরা পড়বে, তাকে আমি একদিন পরেই ছাড়িয়ে আনব। আমি রাজকুমার, ভুলে যেও না!'

এরপর রাজকুমার সদলবলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সন্তুকে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। সন্তু আর সে দরজা টানাটানির চেষ্টা করল না।

সে এসে দাঁড়াল খোলা জানালার ধারে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গেটের কাছে ঘোড়ার ক্ষুর ঠোকার আর বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে এক ঝাঁক জোনাকি। টি ট্রি টি ট্রি করে দূরে একটা রাতপাখি ডাকছে। এরই মধ্যে কপাকপ্ শব্দ তুলে একটা ঘোড়া ছুটে চলে গেল।

যদিও কাছেই বিছানা পাতা, কিন্তু সন্তু বসে পড়ল ওই জানালার পাশেই। তারপর জানালার শিকে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। সকাল হয়ে রোদ এসে তার মুখে পড়াতেও তার ঘুম ভাঙল না।

দড়াম করে দরজাটা খুলে যেতেই সন্তু ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

২১

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেজর। তার এক হাতে একটা কাচের গেলাশ ভর্তি দুধ, তা থেকে ধোঁয়া উড়ছে। আর এক হাতে কয়েকখানা হাতে গড়া রুটি! সে পা দিয়ে দরজাটা ঠেলেছে বলেই অত জোরে শব্দ হয়েছে!

মেজর চোখ বড় বড় করে বলল, 'বাপ্ রে! তোমাকে দেখে ধরে প্রাণ এল! জান তো , কি কান্ড? কাল তোমার দরজায় তালা লাগাতে ভুলে গেছি। এখন এসে তা দেখে ভাবলুম পাখি বোধহয় উড়ে গেছে! কি ব্যাপার, তুমি এত লক্ষ্মীছেলে হয়ে গেলে যে, পালাবার চেষ্টা করনি?'

সন্তু হাসল। তারপর বলল, 'দরজায় যে তালা লাগাননি, সে কথা বলে যাবেন তো! আমি জানব কি করে যে ডাকাতরাও তালা দিতে ভুলে যায়!'

মেজর বলল, 'ভাগ্যিস তুমি পালাওনি! তা হলে রাজকুমার আর আমায় আস্ত রাখত না! রিভলভারের ছ'টা গুলিই পুরে দিত আমার মাথার খুলিতে। তুমি আমায় খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছ। তারপর, কি, খিদেটিদে পায়নি? এই নাও, দুধ আর রুটি এনেছি।'

সন্তু বলল, 'আমি দাঁত না মেজে কিছু খাই না!'

মেজর বলল, 'এই রে! তাহলে তো তোমায় নিচে নিয়ে যেতে হয়! নিচে কুয়ো আছে। কিন্তু তোমায় তো ঘর থেকে বার করার হুকুম নেই। তা বাপু একদিন দাঁত না মেজেই খেয়ে নাও বরং!'

সন্তু বলল, 'না, তা পারব না। আমার ঘেন্না করে।'

'তোমার জন্য কি আমি বিপদে পড়ব নাকি? তোমাকে আমি নিচে নিয়ে যাই, তারপর তুমি যদি একটা দৌড় লাগাও? এই পাহাড়ি জায়গায় তোমার পিছু পিছু আমি ছুটতে পারব না।'

'সকাল বেলা ছোটাছুটি করার ইচ্ছে আমার নেই।'

'অত সব আমি শুনতে চাই না। এই তোমার খাবার রইল। খেতে হয় খাবে, না হলে যা ইচ্ছে কর!'

লোকটি ঘরের মধ্যে গেলাসটা নামিয়ে তার ওপরেই রুটি রেখে দিল। তারপর দরজাটা খোলা রেখেই চলে গেল।

যখন অন্য কোনও কাজ থাকে না, তখন খুব খিদে পায়। গরম দুধ দেখেই সন্তুর পেট জ্বলতে শুরু করেছে। সে জানে, হাতের কাছে খাবার দেখলে কখনও অবহেলা করতে নেই। বিশেষত এইরকম বিপদের অবস্থায় কখন কি হয় তার ঠিক নেই, ইচ্ছে করলেই এরা তাকে শাস্তি দেবার জন্য খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। সেইজন্য খেয়ে নেওয়াই উচিত।'

কিন্তু ওই মেজরকে যে সে বলল, দাঁত না মেজে খেতে তার ঘেন্না করে। এখন সে খেয়ে নিলে লোকটা নিশ্চয়ই তাকে হ্যাংলা ভাববে। লোকটা দরজা খোলা রেখে গেছে। কি ব্যাপার, এবারেও ভুলে গেছে নাকি?

তক্ষুনি মেজর আবার ফিরে এল। তার এক হাতে এক মগ জল।

সে গজগজ করে বলল, 'এই নাও, জল এনেছি। এখানেই মুখ ধুয়ে নাও।'

সন্তু বলল, 'দাঁত মাজব কি দিয়ে? একটা নিমগাছের ডাল ভেঙে আনতে পারলেন না?'

'ইস্ তোমার শখ তো কম নয়! এর পর বলবে, শুধু রুটি খাব না। আলুরদম চাই। হালুয়া চাই! এই জলেই আঙুল দিয়ে দাঁত মেজে নাও!'

সন্তু দেখল কালকের রাত্তিরের সেই গাছের ডাল কেটে বানানো কলমটা তখনও সেখানে পড়ে আছে।

সেটাকেই সে তুলে নিল। কোন্ গাছের ডাল তা কে জানে! সেই কলমটারই উল্টো দিকটা চিবিয়ে দাঁতন বানিয়ে নিয়ে সে দাঁত মাজল। বেশ মজা লাগল তার।

দুধটা এখনও বেশ গরম আছে। তাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে সে রুটি তিনটে খেয়ে ফেলল। কাছেই মেজর বসে রইল উবু হয়ে। তার পরনে একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি। মস্ত ঝোলা গোঁফের জন্য তার মুখখানা সিন্ধুঘোটকের মতন দেখায়।

খেতে খেতে সন্তু ভাবল, এই মেজর লোকটি কিন্তু ঠিক ডাকাতদের মতন নয়। প্রথম থেকেই সে সন্তুর সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করছে। কাল রাত্তিরে চিঠি লেখার সময় সন্তুর দিকে তাকিয়ে ও একবার যেন চোখ টিপেছিল না? কেন, কিছু কি বলতে চায়? সন্তু জিজ্ঞেস করবে, না ও নিজের থেকেই বলবে?

এই যে সন্তুর মুখ ধোওয়ার জন্য জল এনে দিল লোকটা, এটাও কম কথা নয়। গেলাশ প্রায় ভর্তি করে দুধ এনেছে। আধ গেলাশও তো দিতে পারত!

সন্তুর খাওয়া শেষ হতে মেজর বলল, 'হ্যাঁ, বেশ খিদে পেয়েছিল বুঝতে পারছি। আর দু'খানা রুটি খাবে?'

সন্তু বলল, 'না।'

'আচ্ছা, এবারে তা হলে শুয়ে পড়। তোমার তো এখন কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই! যতক্ষণ তোমার কাকাবাবু জঙ্গলগড়ের নক্শাটা না দিচ্ছেন, ততক্ষণ তোমাকে, এইভাবেই থাকতে হবে!'

'আচ্ছা ,জঙ্গলগড়ে আপনারা কি খুঁজছেন বলুন তো?'

'তুমি জান না?'

'না। কাকাবাবু আমায় কিছুই বলেননি!'

'ও-হো-হো-হো! তুমিও জান না। আমিও জানি না!'

'আপনিও জানেন না? তা হলে আপনি এই ডাকাতের দলে রয়েছেন কেন?'

'ডাকাতের দল আবার কোথায়? আমি তো কোনও ডাকাতের দলে নেই!'

'আপনি এদের দলে নন? তা হলে ... মানে, এরা যে আমায় এখানে আটকে রেখেছে ..আপনিও তো তাতে সাহায্য করছেন!'

'সে হল অন্য ব্যাপার। আসল ব্যাপারটা কি জান? তোমায় বলছি, আর কারুকে জানিও না! আমি একটা বাড়িতে ঢুকে লোভ সামলাতে পারিনি। কয়েকখানা হিরে চুরি করেছিলুম। তারপর অবশ্য পুলিশ আমার বাড়ি সার্চ করে সে হিরে সব কটাই উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আমায় জেলেও দিয়েছিল। তা চুরি করার জন্য না হয় খাটতুম দু'তিন বছর। কিন্তু যে-বাড়ি থেকে আমি হিরে চুরি করেছিলুম, সেই বাড়ির একজন দারোয়ান খুন হয়েছে। পুলিশ এখন সেই খুনের দায়ে আমাকে জড়াতে চায়। কি অন্যায় কথা বল তো! আমি খুন করিনি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর। খুনটুন করার সাহস আমার নেই। শুধু শুধু আমি কেন খুনের দায়ে ফাঁসি যাব?'

'আপনি জেল থেকে পালিয়েছেন?'

'আমি একলা নয়। সবশুদ্ধ ন'জন। কাগজে পড়নি, আগরতলা জেল ভেঙে আসামিদের পালানোর খবর? অন্যরা পালাচ্ছিল, আমিও তাদের দলে ভিড়ে পড়লুম!'

'তারপর?'

'তারপর এই তো দেখছ এখানে!',

'জেল থেকে পালিয়ে এখানে আছেন? এটা আপনার নিজের বাড়ি?'

'এটা আমার বাড়ি? আমার এত বড় বাড়ি থাকলে কি আমি হিরে চুরি করি? এটা আগেকার কোনও রাজা-টাজাদের বাড়ি হবে বোধহয়। কেউ থাকত না। আমিই তো এসে পরিস্কার করেছি।'

'এটা ওই রাজকুমারের বাড়ি?'

'হতেও পারে. না-ও হতে পারে। সে-সব আমি জানতে চাইনি। আমার কাজ উদ্ধার হলেই হল।'

'কাজ মানে?'

'জেল থেকে পালালে তো সারজীবন পালিয়েই থাকতে হয়। কোনদিন নিজের বাড়িতে ফিরতে পারব না। আমরা যারা এই জেল থেকে বেরিয়েছি, তাদের কয়েকজনকে এই রাজকুমার বলেছে যে, আমরা যদি ওর কাজ উদ্ধার করে দিই, তাহলে উনি আমাদের নামে কেস তুলিয়ে নেবেন। পুলিশ আর আমাদের কিছু বলবে না। জঙ্গলগড়ে কি আছে না আছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি রাজকুমারকে সাহায্য করব, রাজকুমার আমায় সাহায্য করবে, ব্যাস!'

'রাজকুমার যদি মানুষ খুন করতে বলে, তাও করবেন?'

'মাথা খারাপ! আমি অত বোকা নই! খুন করে আবার পুলিশের ফাঁদে পড়ব! খুন করিনি, তাতেই প্রায় ফাঁসি হয়ে যাচ্ছিল!'

'কিন্তু এই রাজকুমার তো সাংঘাতিক লোক!'

'সে যেমন থাকে থাক না, তাতে আমার কি? আমি ওসব সাতে-পাঁচে নেই। এখন তোমার ওপর আর তোমার কাকাবাবুর ওপরে আমার সব কিছু নির্ভর করছে। তোমরা যদি মানে মানে জঙ্গলগড়ের জিনিসপত্তর সব রাজকুমারকে দিয়ে দাও, তাহলেই আমরা ছাড়া পাই। রাজকুমার বলেছে, পুরো কাজ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের নিষ্কৃতি নেই।'

'ওই কর্নেলও সেই দলে?'

'হ্যাঁ, ও -ওতো আমারই মতন জেল-পালানো।'

'ওর নাম কর্নেল কেন?'

'কাজ হিসেবে এক-একজনের এক-একটা নাম দেওয়া হয়েছে। আসল নাম ধরে ডাকা নিষেধ। এই যাঃ, তোমাকে অনেক কথা বলে ফেললুম। আসলে. সকালের দিকটায় আমার মনটা খুব নরম থাকে। আর ঠিক তোমার মতন বয়েসি আমার একটা ভাই আছে তো! আমি যে তোমাকে এত সব কথা বলেছি, তা যেন রাজকুমারকে আবার বলে দিও না! কি বলবে না তো?'

'না, হঠাৎ রাজকুমারকে আমি এসব বলতে যাব কেন?'

'তবে তুমি এখানে থাক। আমি যাই , চায়ের জল-টল বসাই গিয়ে। বাবুরা সব এখন ঘুমোচ্ছেন। তোমার চিঠি তোমার কাকাবাবুর কাছে এতক্ষণ পৌঁছে গেছে বোধহয়।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে মেজর চলে গেল।

সন্তু গিয়ে দাঁড়াল জানালার কাছে। এখানে সময় কাটবে কি করে? সকালবেলা তার যে-কোনও ধরনের বই পড়া অভ্যেস। কিংবা একা একা বেড়াতেও তার ভাল

লাগে। বাইরে দেখা যাচ্ছে বেশ ছোট ছোট পাহাড় আর জঙ্গল, গেটের বাইরে দু'তিনটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। একটাও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না।

এইভাবে তাকে ঘরের মধ্যে সারাদিন বন্দী থাকতে হবে! কাকাবাবুকে সে চিঠি পাঠিয়ে ডেকে আনতে চায়নি। কাকাবাবু নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, সন্তু কেন ওই রকম চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছে।

কাকাবাবু যে কখন, কী ভাবে এখানে এসে পড়বেন, তা কিছুই বলা যায় না। যদি এইমুহূর্তে কাকাবাবু পেছন থেকে 'সন্তু' বলে ডেকে ওঠেন, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কী খেয়াল হল, সন্তু জানালার কাছ থেকে সরে এসে বন্ধ দরজাটা ধরে টান মারল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুলে গেল।

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু। এবারেও দরজায় তালা লাগায়নি, এবারও ভুলে গেছে? তা কখনো হতে পারে? এটা কোনও ফাঁদ নয় তো!'

যাই হয় হোক ভেবে সন্তু দরজার বাইরে পা বাড়াল।

২২

সামনে একটা টানা বারান্দা। কোথাও কেউ নেই। তবে কিসের একটা শব্দ যেন পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে মন হয়েছিল মেঘের গর্জন। কিন্তু একটু আগেই সন্তু জানালা দিয়ে দেখেছে যে আকাশ একেবারে নীল, কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। তারপর মনে হল, কেউ যেন পাথরের ওপর একটা পাথর ঘষছে। আরও একটু মন দিয়ে শোনবার পর সন্তু বুঝতে পারল, আসলে ওটা কারুর নাক ডাকার আওয়াজ।

আওয়াজটা পাশের একটা ঘর থেকে আসছে। সন্তু পা টিপে টিপে সেদিকে এগোল। সে-ঘরের দরজা বন্ধ। সন্তু হাত দিয়ে একটু ঠেলল, তবু সেটা খুলল না।

সন্তু আর একটু এগিয়ে গিয়ে আর একটা ঘর দেখতে পেল। এ ঘরের দরজা খোলা। কোনও বিছানা-টিছানা নেই, খালি মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে কর্নেল আর দু'জন লোক। কর্নেল এর মাথার কাছে রয়েছে রিভলভার। বোধহয় ওদের পাহারা দেবার কথা ছিল।

সন্তুর একবার লোভ হল চুপিচুপি গিয়ে টপ্ করে রিভলভারটা তুলে নেয়। তারপর নিজেকে সামলে নিল। যদি হঠাৎ জেগে ওঠে ওরা কেউ, তা হলে মুশকিল আছে। কর্নেল লোকটা বড্ড নিষ্ঠুর ধরনের।

সন্তু এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। তার বুকের ভেতরটা ছম্‌ছম্ করছে। তাকে যে কেউ বাধা দিচ্ছে না, এটাতেই ভয় লাগছে বেশি। খালি মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে কেউ যেন তাকে লক্ষ করছে। হঠাৎ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একতলাতেও কারুকে দেখা গেল না। সেই মেজর-ই বা গেল কোথায়? একতলায় সবকটা ঘর তালাবন্ধ। অনেক দিন সেইসব তালা খোলা হয়নি মনে হয়। মাঝখানে একটা উঠোন। তার এক পাশে একটা ছোট দরজা, সেটা দিয়ে বোধহয় বাড়ির পেছনটায় যাওয়া যায়।

সন্তু সেই দরজার কাছে এসে উঁকি মারল। কাছেই একটা কুয়ো। বেশ উঁচু করে পাড় বাঁধান। দুটো খরগোশ সেখানে ঘুরঘুর করছে। সন্তু কোনও শব্দ করেনি, শুধু তার ছায়া পড়তেই ওরা টের পেয়ে গেল। দু'একপলক কান খাড়া করে খরগোশ দুটো দেখল সন্তুকে। তারপরই পেছন দিকটা উঁচু করে মারল লাফ। প্রায় চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

সন্তু কুয়োটার কাছে এসে এদিক-ওদিক তাকাল। খরগোশ দুটোর গায়ের রং পুরো সাদা নয়, খয়েরি-খয়েরি, তার মানে ওরা বুনো খরগোশ। একটু দূরে একটা করমচা গাছের নিচে আর একটা খরগোশ বসে আছে। এবারেও এর সঙ্গে চোখাচোখি হতে দৌড় মারল। বেশ মজা লাগল সন্তুর। এখানে তো অনেক খরগোশ। সেইজন্যই কালরাত্রে মেজর লোভ দেখাচ্ছিল খরগোশের মাংস খাওয়াবার।

বাড়ির পেছন দিকটায় এক সময় নিশ্চয়ই বেশ বাগান ছিল। এখন ফুলগাছ-টাছ নেই, আগাছাই বেশি। বাউন্ডারি দেওয়ালের পাশে পাশে রয়েছে অনেকগুলো কাঁঠাল গাছ। তাতে কত যে কাঁঠাল ফলে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। অনেকগুলো পাকা কাঁঠাল মাটিতেও পড়ে আছে, কেউ খায় না বোধহয়। সন্তুও কাঁঠাল খেতে ভালবাসে না। কিন্তু এঁচোড়ের তরকারি তার ভাল লাগে। এত কাঁঠালে কত এঁচোড়ের তরকারিই না হতে পারে!

শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সন্তু যেন হঠাৎ ডাকাত-ফাকাত, গুপ্তধন, মারামারির কথা সব ভুলে গেল। মাথার ওপর নীল আকাশ, ঝকঝকে রোদ উঠেছে, বাতাসও ঠান্ডা ঠান্ডা। সন্তুর মনে হল সে যেন কোথাও বেড়াতে এসেছে। টিলার ওপর এই রকম একটা বাড়ি, কাছাকাছি মানুষজন নেই। এইরকম জায়গা বেড়াবার পক্ষে খুব চমৎকার। মা-বাবা মানুষজন সবাই মিলে এলে কি ভাল হত।

হাঁটতে হাঁটতে সন্তু বাড়িটার সামনের দিকে চলে এল। গেটের কাছে তিনটে ঘোড়া এখনও বাঁধা আছে। ঘোড়াগুলোকে দেখে সন্তুর কালকের রাতের কথা মনে পড়ল! বাব্বাঃ, এক রাতের মধ্যে কত কি কান্ডই না ঘটেছে! যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এই ডাকাতরা সন্তুকে ধরে আনলেও সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই যে, কাকাবাবুর আর অসুখ নেই, তিনি ভাল আছেন।

কাকাবাবু কি তার চিঠিটা পেয়ে গেছেন এতক্ষণে?

সন্তু একবার মুখ ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল। কই, কেউ তো জাগেনি। কেউ তার ওপর নজর রাখছে না। সন্তু এখন স্রেফ একটা দৌড় মেরে পালিয়ে গেলে কে তাকে ধরবে?

ঘোড়াগুলোর কাছে এসে সন্তু দাঁড়াল। এগুলো বেশি বড় ঘোড়া নয়। পাহাড়ি টাট্টু ঘোড়া। এই একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে পালালে কেমন হয়?

সন্তু কখনও ঘোড়ায় চড়া শেখেনি। তবু তার ধারণা হল, টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চাপা সহজ। যে-কেউ পারে। একটা ঘোড়ার পিঠে হাত রাখল সন্তু, ঘোড়াটা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল, সন্তুকে লাথি-টাথি কিছু মারার চেষ্টা করল না।

ঘোড়ায় চাপার ইচ্ছেটা সন্তুর একেবারে অদম্য হয়ে উঠল। একটা ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিয়ে লাগামটা হাতে নিল সে। পিঠে কিন্তু জিন নেই। লাফিয়ে কী করে পিঠে উঠবে, ভাবতে ভাবতে সন্তুর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। লোহার গেট বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে তারপর ঘোড়ার পিঠে চাপা যেতে পারে।

সেইভাবে ঘোড়াটায় উঠে সন্তু বলল, হ্যাট হ্যাট!

কিন্তু ঘোড়াটা নট নড়ন-চড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সন্তু তার হাঁটু দিয়ে কয়েকটা গোঁত্তা দিলেও কোনও লাভ হল না।

কিন্তু একবার ঘোড়ার চেপে পালাবার প্ল্যান করে আবার সেটা বদলাবার কোনও মানে হয় না। এখন যদি কেউ এসে পড়ে তা হলে সন্তুকে দেখে নিশ্চয়ই হাসবে। ঘোড়ায় চড়া বীরপুরুষ, অথচ ঘোড়া ছোটাতে জানে না!

মরিয়া হয়ে সন্তু হাঁটু দিয়ে গোঁত্তাও মারতে লাগল, আর লাগামটা ধরেও টানতে লাগল খুব জোরে।

তাতে ঘোড়াটা চিঁ-হি-হি-হি আওয়াজ করে শূন্যে দু'পা উঁচু করল একবার। তারপর ছুটতে লাগল।

প্রথম ঝাঁকুনিতে সন্তু প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোনও রকমে সামলে নিল নিজেকে। কিন্তু বল্‌গাটা খসে গেল তার হাত থেকে। মাথা নিচু করে হাত বাড়িয়ে সে বল্‌গাটা আর ধরতে পারল না কিছুতেই।

ঘোড়াটা যখন বেশ জোরে টিলার নিচের দিকে নামতে লাগল, তখন সন্তুর মনে হল, সে আর কিছুতেই ব্যালান্স রাখতে পারবে না। এই অবস্থায় ছিট্‌কে পড়ে গেলে হাত-পা ভাঙবে নিশ্চয়ই। আর কোনও উপায় না দেখে সন্তু ঘোড়াটার গলাটা জড়িয়ে ধরল প্রাণপণে।

ঘোড়াটাও বেশ অবাক হয়েছে নিশ্চয়ই। কারণ সে মাঝে মাঝেই চিঁ-হি-হি-হি করে ডাক ছাড়ছে। সে ছুটছেও এলোমেলোভাবে। টিলাটার নিচেই জঙ্গল, সেখানে ঢুকে ঘোড়াটা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে বড়-বড় গাছের ধার ঘেঁষে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সন্তুর গা ঘষটে যাচ্ছে। এক একবার সে ভাবছে কোনও গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়বে কি না। কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

কোন্‌দিকে যে ঘোড়াটা যাচ্ছে তাই বা কে জানে! জঙ্গল ক্রমেই ঘন হচ্ছে। কাল রাত্তিরে এই পথ দিয়েই গিয়েছিল কি না তা সন্তুর মনে নেই। অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে কিছু দেখতেই তো পায়নি সে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে ঘোড়াটা একটা নদীর সামনে থামল। কাল রাতেও সন্তুরা একটা নদী পার হয়েছিল। এটা কি সেই নদী? তাই বা কে জানে!

যা থাকে কপালে ভেবে সন্তু লাফিয়ে নেমে পড়ল নদীর ধারের নরম মাটিতে। আসলে ওইভাবে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওরকমভাবে আর যাওয়া যাবে না।

যাই হোক, সন্তু মোটামুটি তার সার্থকতায় বেশ খুশি হয়েছে। বিনা বাধাতেই সে পালিয়ে আসতে পেরেছে। এখন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তার কোনও আপত্তি নেই। ঘুরতে ঘুরতে ঠিক কোন এক সময় সে একটা কোন শহরে পৌঁছে যাবে।

এতক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে কোন মানুষজন দেখেনি । এবারে নদীর ধাবে সে যেন কাদের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেল।

একটা কী যেন বড় গাছ নদীর ওপরে অনেকখানি ঝুঁকে আছে। কথা শোনা যাচ্ছে তার ওধার থেকেই। সন্তু আস্তে আস্তে গিয়ে গাছটার কাছে দাঁড়াল। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখল দু'জন জেলে মাছ ধরছে। একজন বয়স্ক লোক, একজন প্রায় সন্তুর সমান।

সন্তু ভাবল, যাক. ভয়ের কিছু নেই। তবে তক্ষুনি সে লোকগুলোর কাছে গেল না। এদিকেই একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। ওদের কথাবার্তা সে শুনতে পাচ্ছে। একটু পরেই ওদের কয়েকটা কথা শুনে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

বয়স্ক ছেলেটি ছোট ছেলেটিকে বলছে, 'সবই কপাল, বুঝলি? আমিও মাছ ধরি আর তোর সুবলকাকুও মাছ ধরত। সেই ছোটবেলা থেকে আমরা সমানে এই কাজ করেছি। মাছ ধরা ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না। অথচ, আজ আমি কোথায় আর তোর সুবলকাকু কোথায়!'

ছেলেটি বলল, 'সুবলকাকুকে তো সাপে কামড়েছে!'

জেলেটি বলল. 'সাপে কি আর এমনি এমনি কামড়েছে। নিয়তি যে ওরে টেনে নিয়ে গেছে। আমি বারণ করেছিলুম।'

ছেলেটি বলল, 'মাছ ধরা ছেড়ে সুবলকাকু জঙ্গলে খরগোশ মারতে গিয়েছিল।'

'খরগোশ না হাতি! আমরা জলের মাছ মারতে জানি, ডাঙার শিকারের কী জানি! আসল কথা কী জানিস, একদিন হাট থেকে সুবল আর আমি ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরতেছিলাম, এমন সময় কী যেন একটা জিনিস চকচক করে উঠল। একটুখানি মাটি খুঁড়ে সুবলই সেটা টেনে তুলল। সেটা একটা সোনার টাকা। আগেকার রাজা মহারাজাদের আমলে ওই রকম টাকার চল ছিল। তা সেই টাকাটা পেয়ে সুবলের কী আহ্লাদ। লাফাতে লাগল একেবারে। আমি বললুম, ওরে সুবল, এসব বড় মানুষদের জিনিস, গরিবের ঘরে রাখতে নেই। ও টাকাটা তুই থানায় জমা দিয়ে দে। তা সে কথা সে কিছুতেই শুনবে না। সোনার টাকা পেয়ে একেবারে পাগল হয়ে গেল। অন্য কাজকম্ম সব ছেড়েছুড়ে দিনরাত জঙ্গলে পড়ে থাকত। লোককে বলত খরগোশ

মারতে যায়, কিন্তু আমি তো জানি! ও সেখেনে যত গর্ত আছে আর পাথরের ফোঁকর আছে, সব জায়গায় হাত ভরে ভরে খুঁজত। সেইরকম একটা গর্তে হাত ঢুকিয়েই তো সাপের কামড় খেলে!'

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'জঙ্গলের মধ্যে একখানা সোনার টাকা এল কি করে?'

বয়স্ক লোকটি বলল, 'ও জায়গাটারে কয় জঙ্গলগড়। এককালে ওখানে ত্রিপুরার এক মহারাজা এসে লুকিয়েছিলেন। তাই লোকে এখন বলে, ওখানকার মাটির নিচে অনেক সোনাদানা পোঁতা আছে।'

জঙ্গলগড়ের নাম শুনেই সন্তু উঠে দাঁড়িয়েছে। এই বয়স্ক লোকটি তা হলেজানে, জঙ্গলগড় কোথায়? তা হলে তো এক্ষুনি ওর সঙ্গে ভাব করা দরকার।

কিন্তু সন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলতে যাবার আগেই অন্য একটা শব্দ শুনতে পেল। টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ করে ঘোড়া ছুটিয়ে কারা যেন এদিকেই আসছে।

২৩

পুলিশরা যে লোকটিকে ধরে নিয়ে এসেছে, কাকাবাবু তার আপাদ-মস্তক দেখলেন কয়েকবার। ধুতি আর নীল রঙের শার্ট-পরা সাদামাটা চেহারার একজন মানুষ। মুখে একটা ভয়ের ছাপ।

কাকাবাবু বললেন, 'ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক। এ লোকটাকে ধরে রেখে কোন লাভ নেই। কই, চিঠিটা কই?'

শিশির দত্তগুপ্ত উঠে লোকটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বললেন, 'এই, তুই এই চিঠি কোথায় পেয়েছিস?'

লোকটি বলল, 'আমি বাজারের কাছে দাঁড়িয়েছিলুম, একজন লোক এসে বলল, এই চিঠিটা রাজার অতিথিশালায় পৌঁছে দিলে আমায় ইয়ে মানে একটা টাকা দেবে, তাই আমি—'

শিশির দত্তগুপ্ত ধমক দিয়ে বললেন, 'সবাই এই এক গল্প বলে! যদি জেলে যেতে না চাস তো সত্যি কথা বল্!'

লোকটি বলল, 'এক টাকা নয়, ইয়ে, মানে, পাঁচ টাকা!'

'অ্যাঁ?'

'সত্যি কথা বলছি স্যার, দশ টাকা দিয়েছে! আমি দিব্যি কেটে বলছি, তার বেশি দেয়নি।'

'একটা চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য দশ টাকা দিল?'

'হ্যাঁ, স্যার। ফস্ করে টাকাটা আমার পকেটে গুঁজে দিল। আমি ভাবলুম, ডাকে চিঠি যেতে পঁয়তিরিশ পয়সা লাগে, আর আমি পাচ্ছি দশ টাকা। মোটে তো দু' পা রাস্তা। তাই ওদের কথায় রাজি হয়ে গেলুম।'

'ওদের মানে? এই যে বললি একটা লোক? ফের মিথ্যে কথা!'

'মানে, একজন লোকটি আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আর একটা লোক পাশে দাঁড়িয়েছিল।'

'তারা তোর চেনা?'

'না স্যার। কোনদিন দেখিনি।'

'অচেনা লোক এসে তোকেই চিঠি দেবার কথা বলল কেন?'

'আমি এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলুম কি না, পকেটে একটাও পয়সা নেই ভাবছিলুম কি করে কিছু রোজগার করা যায়, তাই বোধহয় ওরা ঠিক বুঝেছে!'

'লোকদুটোকে দেখতে কেমন?'

'খুব ভাল দেখতেও নয়, আবার খুব খারাপ দেখতেও বলা যায় না।'

'ভাল খারাপের কথা হচ্ছে না। লোকদুটোকে দেখলে কি মনে হয়, চোর-ডাকাতের মতন?'

একটু চিন্তা করে লোকটি বলল, 'আজ্ঞে না!'

'তবে কি ভদ্রলোকের মতন?'

'আজ্ঞে না।'

'চোর-ডাকাতের মতনও না। ভদ্রলোকের মতনও না। তবে কিসের মতন?'

'আজ্ঞে, পুলিশের মতন!'

'অ্যাঁ?'

'খুব গাঁট্টাগোট্টা চেহারা আর লম্বা গোঁপ আছে।'

'তুই যে বাজারের সামনে একলা দাঁড়িয়ে ছিলি, তার কোন সাক্ষী আছে?'

'স্যার, সাক্ষী রেখে কি একলা একলা দাঁড়িয়ে থাকা যায়?'

'ফের মুখে মুখে কথা বলছিস? যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দে।'

'পান্নাদার পাশের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলুম, পান্নাদা নিশ্চয়ই দেখেছে আমাকে!'

শিশির দত্তগুপ্ত একজান পুলিশকে বললেন, 'অবিনাশ, একে বাজারের কাছে নিয়ে যাও! লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ, এ সত্যি কথা বলছে কি না!'

পুলিশ দু'জন লোকটিকে নিয়ে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবু সন্তুর চিঠিটা দু'তিনবার পড়লেন, কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখলেন ভাল করে। তারপর সেটা এগিয়ে দিলেন নরেন্দ্র ভার্মার দিকে।

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা সন্টুর হ্যাণ্ডরাইটিং ঠিক আছে তো?'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে-জায়গায় সন্তুকে আটকে রেখেছে, সেখানে তো কাগজ-কালি-কলম কিছু পাওয়া যায় না। জঙ্গলের মধ্যে কোন গোপন আস্তানা মনে হচ্ছে।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'এরা খুব কুইক কাজ-কাম করে তো! বহোত জলদি চিঠি চলে এল! তার মানে খুব বেশি দূরে নেই! ঠিক কি না? এখন কি করা যাবে?'

শিশির দত্তগুপ্ত চিঠিটা নিয়ে দু'বার পড়লেন। তারপর বললেন, 'এবারে সব কটাকে জালে ফেলা যাবে! আপনি ওদের সঙ্গে একলা দেখা করবেন। আমি পুলিশ ফোর্স নিয়ে দূরে অপেক্ষা করব। আপনার হাত থেকে ওরা জঙ্গলগড়ের ম্যাপটা যেই নিতে যাবে, অমনি আমরা ক্যাঁক করে চেপে ধরব ওদের!'

কাকাবাবু বললেন, 'দেখা করব মানে? কোথায় দেখা করব? সে রকম কোন জায়গার কথা তো লেখেনি?'

'তাই তো! আসল কথাটাই লিখতে ভুলে গেছে!'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'সন্টু তো জঙ্গলগড়ের প্ল্যান এঁকে পাঠিয়ে দিতে বলেছে!'

কাকাবাবু বললেন, 'সেটাই বা পাঠাব কোথায়?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'সন্টু ছোকরা বহোত দুষ্টু আছে। ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট চিঠি লিখেছে, যাতে কি না আরও টাইম পাওয়া যায়।'

কাকাবাবু বললেন, 'সন্তু তো আর নিজের ইচ্ছেতে এই চিঠি লেখেনি, ওকে দিয়ে জোর করে লেখানো হয়েছে। এই দ্যাখ কাগজের ওপর এক ফোঁটা রক্ত। এ কার রক্ত বলে মনে হয়?'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'ইস! একটা ছোট ছেলের ওপর অত্যাচার করেছে ওরা। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। একদিন সব কটাকে ধরে চাব্‌কাব!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমার খালি ভয় হচ্ছে, সন্তু আবার পালাবার চেষ্টা না করে! ও যা ছটফটে ছেলে। চুপচাপ বন্দী হয়ে থাকবে না নিশ্চয়ই। পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে আরও বিপদ হবে। ওরা সাঙ্ঘাতিক লোক!'

শিশিরবাবু উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, 'আমি একটা জিনিস ভাবছি, ওদের কাছে একটা টোপ দিলে কেমন হয়?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'টোপ? টোপ কী?'

শিশিরবাবু বললেন, 'বেইট! কিংবা ডিকয়! ধরুন, আমরা আর একটা লোককে অবিকল মিস্টার রায়চৌধুরীর মতন সাজিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল। ওরা নিশ্চয়ই তাকে ফলো করবে। তারপর তাকে ধরবে। তখন পেছন পেছন গিয়ে আমরা ওদের সব কটাকে ধরব!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমার মতন একজনকে সাজাবেন? তা আবার হয় নাকি? সে তো ওরা চিনে ফেলবে!'

শিশিরবাবু বললেন, 'না, না, অত সহজ নয়। আমাদের পুলিশ লাইনে ছদ্মবেশের এক্সপার্ট আছে। দেখবেন একজনকে এমন আপনার মতন সাজিয়ে আনব যে, আপনি নিজেই চিনতে পারবেন না। একেবারে ক্রাচ-ট্রাচ সব থাকবে!'

কাকাবাবু বললেন, 'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমার একজোড়া ক্রাচ্ চাই, আজ দুপুরের মধ্যেই পাঠিয়ে দেবেন। আমার মতন একজনকে সাজাবার দরকার কি, আমি নিজেই তো জঙ্গলে একা যেতে পারি।'

শিশিরবাবু বললেন, 'না, না, আপনাকে আর আমরা বিপদের মধ্যে পাঠাতে চাই না। আপনার শরীর খারাপ, তার ওপর অনেক ধকল গেছে এর মধ্যেই!'

নরেন্দ্র ভার্মার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আপনিই বলুন মিঃ ভার্মা, মিঃ রায়চৌধুরীকে কি আবার বিপদের মধ্যে পাঠানো উচিত?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'রায়চৌধুরীকে ত্রিপুরায় পাঠাবার যে এরকম রেজাল্ট হবে, তা তো বুঝিনি আগে। বিলকুল সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল কিনা! আমাদের প্ল্যান সব গড়বড় হয়ে গেল!'

শিশিরবাবু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা মিঃ রায়চৌধুরীকে প্ল্যান করে ত্রিপুরায় পাঠিয়েছেন? কেন?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'হাঁ হাঁ, এটা দিল্লি থেকে প্ল্যান করা হয়েছিল। আমার বস্ মিঃ রাজেন্দ্র ভার্গবের মাথা থেকে এটা বেরিয়েছে। আপনি যেমন বললেন না, সেইরকম আগেই আমরা রাজা রায়চৌধুরীকে এখানে টোপ ফেলেছি।'

বলেই নরেন্দ্র ভার্মা হাসতে লাগলেন। কাকাবাবুও হাসতে হাসতে বললেন, 'বাঃ, বেশ মজা! আমাকে তোমরা টোপ ফেলবে, আমার জীবনের বুঝি কোন দাম নেই? গৌহাটি এয়ারপোর্ট থেকে যখন আমায় আবার প্লেনে তোলা হল, তখনই আমি বুঝেছি আমাকে আগরতলা নিয়ে আসা হচ্ছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেইজন্যই তো আমি তখন থেকে পাগল সেজে গেলাম!'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'তোমার জীবনের দাম? তোমাকে মারতে পারে, এমন বুকের পাটা হোল্ ইন্ডিয়াতে কিসিকো নেহি হ্যায়! বন্দুকের গুলি খেলেও তুমি মরো না!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি সত্যিকারের বন্দুকের গুলি কখনো খাইনি! খেলে ঠিকই মরে যাব! খেয়েছি তো ঘুমপাড়ান গুলি!'

শিশির দত্তগুপ্ত তখন কিছুই বুঝতে পারছেন না দেখে কাকাবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন, কলকাতার পার্কে আমায় ঘুম পাড়াবার গুলি মারা হয়েছিল তো! এরকম গুলি তো বাজারে বিক্রি হয়না! তা হলে যে আমাকে মেরেছে, সে এই গুলি পেল কোথায়? আপনি পুলিশের লোক, আপনি জানবেন নিশ্চয়ই, কয়েক মাস আগে একটা হিংস্র ভাল্লুককে ধরবার জন্য দিল্লি থেকে ওইরকম ছ'টা গুলি আনা হয়েছিল ত্রিপুরায়। ভাল্লুকটাকে দুটো গুলিতেই বশ করা গিয়েছিল। তারপর বাকি চারটে গুলি আর পাওয়া যায়নি!'

শিশিরবাবুর মুখে একটা লজ্জার ছায়া পড়ল। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সে গুলি চারটে কিভাবে হারাল তা কিছুতেই বোঝা গেল না। অনেক খোঁজ করা হয়েছিল।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'রায়চৌধুরকে ত্রিপুরায় পাঠানো হল দুসরা একটা কারণে। সে অনেক বড় ব্যাপার। একটা ইণ্টারন্যাশ্‌নাল গ্যাংকে পাকড়াতে চেয়েছিলাম। এখন এখানে এসে শুনছি, জঙ্গলগড়, গুপ্তধন, ফলানা ফলানা সব লোকাল ব্যাপার! ধুত! চল, কালই ফিরে যাই!'

কাকাবাবু বললেন, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, সন্তুকে এখনো একদল সাঙঘাতিক হিংস্র লোক আটকে রেখেছে। দশটা ইণ্টিরন্যাশ্‌নাল গ্যাঙের চেয়েও সন্তুর জীবনের দাম আমার কাছে অনেক বেশি।'

শিশিরবাবু বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার ভাইপোকে ঠিক আমি উদ্ধার করে দেব!'

এই সময় একজন পুলিশ এসে খবর দিল শিশির দত্তগুপ্তের ফোন এসেছে নিচে।

শিশিররবাবু ফোন ধরতে চলে গেলেন আর কাকাবাবু আর নরেন্দ্র ভার্মা ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন।

শিশির দত্তগুপ্ত ফিরে এলেন দারুণ উত্তেজিতভাবে। দরজার কাছ থেকে বেরিয়ে বললেন, 'ধরা পড়েছে! ধরা পড়েছে!'

কাকাবাবু মুখ তুলে বললেন, 'কে?'

'ওদের তিনজন। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়েছিল। কাল রাতে যারা আপনাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, এই তিনজন ছিল সেই দলে। নিজেরাই স্বীকার করেছে। এখন ওদের চাপ দিলে বাকি সব কটার সন্ধান পাওয়া যাবে!'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'গুড ওটার্ক!'

শিশিরবাবু বললেন, 'বলেছিলুম না, পালাতে পারবে না। জাল ছড়িয়ে রেখেছি। ওরা ঠিক ধরা পড়বে! লোক তিনটে লক্ আপে আছে। এখন ওদের জেরা করব, চলুন আমার সঙ্গে।'

নরেন্দ্র ভার্মা যাবার জন্য পা বাড়ালেও কাকাবাবু বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। তিনি বললেন, 'আপনারা ঘুরে আসুন, আমার আর যাবার দরকার নেই! আমি ততক্ষণ বরং জঙ্গলগড়ের ম্যপটা এঁকে ফেলি।'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'ঠিক আছে। সেই ভাল। চলুন, মিঃ ভার্মা!'

ওরা দরজার বাইরে যেতেই কাকাবাবু আবার ডেকে বললেন, 'শিশিরবাবু, আমার জন্য দুটো ক্রাচ্ পাঠাতে ভুলবেন না! আমি এবারে একটু নিজে নিজে হাঁটতে চাই!'

২৪

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনেই সন্তু তরতর করে সেই ঝাঁকড়া গাছটায় চড়তে সুরু করে দিল। বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে লুকিয়ে রইল পাতার আড়ালে। তার শরীরের সমস্ত শিরা যেন টানটান হয়ে গেছে। সে আবার ধরা পড়তে চায় না। কিছুতেই।

প্রথমে মনে হয়েছিল অনেকগুলো ঘোড়া আসছে। তারপর বোঝা গেল একটাই ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ঘোড়াটা ঠিক এই দিকে আসছে। সন্তু যে-ঘোড়াটার পিঠে এসেছিল, সেটা শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে আছে।

একটু বাদেই দেখা গেল একটা ঘোড়া এসে দাঁড়াল সন্তুর ঘোড়াটার পাশে। তার পিঠে যে বসে আছে, তাকে চিনতে সন্তুর প্রথমে একটু অসুবিধে হয়েছিল। খাকি প্যান্ট আর একটা ছাই-রঙের হাফশার্ট পরা গাঁট্টাগোট্টা লোক। ঘোড়া থেকে নেমে লোকটি এই গাছের দিকে মুখ ফেরাতেই তার সিন্ধুঘোটকের মতন ঝোলা গোঁফ দেখেই সন্তু চিনতে পারল এ তো সেই মেজর'।

একটু দূরে জেলে দুর্জনের কথাবার্তা তখনও শোনা যাচ্ছে। 'মেজর' নদীর ধারে এসে উঁকি দিয়ে দেখল একবার। তারপর মুখ উঁচু করে বলল, 'কই হে সন্তুবাবু, কোথায় লুকোলে? চলে এস, ভয় নেই!'

সন্তু একেবারে নিশ্বাস বন্ধ করে রইল, যাতে কোন শব্দ না হয়। কিন্তু পাতার আড়ালে তার সম্পূর্ণ শরীরটা আড়াল পড়েনি। এখানে বেশিক্ষণ আত্মগোপন করে থাকা যাবে না।

মেজর আবার বলল, 'কোন্ গাছে উঠে বসে আছ? ও সন্তুবাবু, শিগগির নেমে এস! সময় নষ্ট করে লাভ নেই!'

সন্তু বুঝতে পারল, সত্যিই সময় নষ্ট হচ্ছে। মেজর সবকটা গাছ ভাল করে দেখতে শুরু করলেই সে ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া তাড়হুড়ো করে ওঠার সময় তার একপাটি চটি পড়ে আছে গাছের নিচে।

সন্তু ডালপালা সরিয়ে বলল, 'আসছি!'

তারপর সরসরিয়ে নেমে পড়ল। মেজর তার সামনে এসে দাঁড়াতেই সন্তু একটুও অবাক হবার কিংবা ভয় পাবার ভাব না দেখিয়ে খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমায় কি করে খুঁজে পেলেন?'

মেজর সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'এ তো খুব সহজ! তুমি আমাদের এই সব ঘোড়া চালাতে পারবে না তা জানি! গোড়া তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই তোমায়যেতে হবে! এই ঘোড়াগুলো নদীর ওপারের একটা গ্রামে থাকে। সেইজন্য ছাড়া পেলে ওরা সেইদিকেই যায়!'

সন্তু বলল, 'বিচ্ছিরি ঘোড়া! আমি নেপালে এর চেয়ে অনেক ভাল ঘোড়ায় চেপেছি!'

মেজর বলল, 'সে যাই হোক! শেষ পর্যন্ত সেই পালালে তা হলে? এখন কি হবে? তুমি আমায় ফাঁসাবার ব্যবস্থা করে এসেছ। রাজকুমার ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে যে, তুমি নেই, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার পেটে একটা গুলি চালাবে না?এখন তোমায় যদি আমি আবার ধরে নিয়ে যাই, তাহলে আমি হয়তো বকশিস পাব, কিন্তু তোমার কি অবস্থা করে ছাড়বে বল তো?'

সন্তু বলল, 'দোষ তো আপনারই। আপনি ভাল করে পাহারা দেননি কেন? দরজা সব সময় খোলা। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ার চড়লুম। কেউ আমায় দেখতেই পেল না!'

মেজর মুচকি হেসে বলল, 'আমি কিন্তু দেখেছি! রান্নাঘরের জানলা দিয়ে সব লক্ষ করছিলুম!'

সন্তু এবার লোকটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। কাল রাত্তির থেকেই এ লোকটির ব্যবহার সে ঠিক বুঝতে পারছে না। লোকটা কি ভালমানুষ, না মিচকে শয়তান?

লোকটি বলল, 'শোন, সন্তুবাবু, তোমায় সব কথা খুলে বলি। আমার নাম নরহরি কর্মকার। একটা গভর্নমেণ্ট অফিসে সিকিউরিটির ডিউটি করতুম। একবার লোভের বশে হিরে চুরি করেছি। সেজন্য আজ আমার বড় লজ্জা। কিন্তু নিজের দোষে তারপর আমি ক্রমশই চোর-ডাকাতের দলে জড়িয়ে পড়ছি। এ আমি চাই না। শেষে দাগী আসামী হয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে? তাই আমি ইচ্ছে করে তোমার পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এস, তোমাতে আমাতে দু'জনেই এখন পালাই। তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক বড় বড় লোকের চেনা আছে। তাঁকে বলে আমার একটু ব্যবস্থা করে দিও। আমি দু'এক বছর জেল খাটতে রাজি আছি, তার বেশি শাস্তি যেন না হয়!'

সন্তু কথাগুলো শুনে গেল, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি করবে না, তা এখন ঠিক করতে পারল না।

নরহরি কর্মকার বলল, 'এখানে আর থাকা ঠিক নয়। ওরা খুঁজতে শুরু করলে প্রথমে এখানেই আসবে! চল, এক্ষুনি আগরতলা যাই। তুমি আমার সঙ্গে এক-ঘোড়ার চেপে যেতে পারবে?'

সন্তু বলল, 'আমি এখন আগরতলায় যাব না!'

নরহরি কর্মকার চোখ প্রায় কপালে তুলে বলল, 'আগরতলায় যাবে না? তোমার কাকাবাবু তো সেখানেই আছেন!'

সন্তু বলল, 'তা হোক। এখানে কাছেই জঙ্গলগড়। আমি সেখানে যেতে চাই!'

নরহরি বলল, 'এখানে জঙ্গলগড়? কে বলল তোমাকে?'

সন্তু দূরের জেলে দু'জনের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'ওই ওরা জানে। ওরা বলাবলি করছিল!'

নরহরি অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বলল, 'দূর! ওসব বাজে কথা! ওরকম কত জঙ্গলগড় আছে! কোথাও জঙ্গলের মধ্যে দু'একটা ভাঙা বাড়ি-টাড়ি থাকলেই লোকে তার নাম দেয় জঙ্গলগড়! সেরকম জায়গার তো অভাব নেই এ দেশে!'

সন্তু বলল, 'তবু আমি এই জঙ্গলগড়ে একবার যেতে চাই!'

নরহরি বলল, 'কী ছেলেমানুষি করছ! আসল জঙ্গলগড়ের খবর তোমার কাকাবাবু ছাড়া আর কেউ জানে না। এই রাজকুমার আর অন্যরা কি কম খোঁজাখুঁজি করেছে!'

সন্তু বলল, 'ওরা যে জঙ্গলগড়ের কথা বলছে, সেখানে একটা সোনার মুদ্রা পাওয়া গেছে!'

নরহরি চমকে উঠে বলল, 'মুদ্রা, মানে টাকা? সোনার টাকা? চল তো!'

দু'পা গিয়েই নরহরি আবার থেমে গেল। মুখে ফুটে উঠল একটা অসহায়ভাব। ডান হাত দিয়ে গোঁফ চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'না, না সন্তুবাবু, আমায় আর লোভ দেখিও না। সোনার টাকা শুনেই আমার মনটা চমকে উঠেছিল! একবার হিরে চুরি করে আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি যে আমাদের মতন লোকদের হিরে মুক্তো সোনাদানা সহ্য হয় না! ওসবে একবার হাত দিলেই বিপদ! জঙ্গলগড়ের সোনায় যদি আমি হাত দিই, তা হলে রাজকুমারের দলবল আমায় একেবারে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে!'

সন্তু আর কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল জেলে দু'জনের দিকে। নরহরি তার পেছন পেছন এসে কাতরভাবে বলল, 'কোথায় যাচ্ছে, সন্তুবাবু! আমি ভাল কথা বলছি, আগরতলায় চল!'

সন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না।

জেলে দু'জন এখন কথা থামিয়ে মন দিয়ে মাছ ধরছে। একটা জাল ফেলে সেটা টেনে তুলছে খুব আস্তে আস্তে। জাল টেনে তোলার সময় তারা একেবারে চুপ করে থাকে।

সন্তু আর নরহরি ওদের কাছে যখন পৌঁছল, তখনও জালটা পুরো টেনে তোলা হয়নি। বড় জেলেটি ওদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শুধু, কোনও কথা বলল না।

জালটা তোলার পর দেখা গেল তার গায়ে কয়েকটা ছোট ছোট মাছ লেগে আছে। চকচকে রুপোলি রঙের।

ছোটজেলেটি জাল থেকে মাছ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খালুইতে রাখতে লাগল। বড় জেলেটি গম্ভীরভাবে বলল, 'এ মাছ বিক্কিরি নেই, মহাজনকে দিতে হবে!'

নরহরি লোকটার ঘাড় চেপে ধরে হুংকার দিয়ে বলল, 'তোর মাছ কে চাইছে? জঙ্গলগড়ের সোনার টাকা কে নিয়েছে, আগে বল্!'

লোকটি ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, 'সোনার টাকা! আমি তো সোনার টাকা নিইনি! মা কালীর দিব্যি বলছি!'

'তবে কে নিয়েছে?'

'সে তো সুবল!'

'কোথায় সেই সুবল? এক্ষুনি আমাদের নিয়ে চল তার কাছে?'

ছোট জেলেটি এবারে বলল, 'সুবলকাকা তো মরে গেছে! তাকে সাপে কামড়েছে!'

নরহরি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, 'মরে গেছে? মিথ্যে কথা বলছিস আমার কাছে? এক্ষুনি থানায় নিয়ে যাব!'

সন্তু বলল, 'ওরা আগেই বলছিল সুবলকে সাপে কামড়েছে। ঠিক আছে, সেই জঙ্গলগড় জায়গাটা কোথায়, আমাদের একটু দেখিয়ে দেবে চল তো!'

নরহরি বলল, 'যেখানে সোনার টাকা পাওয়া গেছে, সেই জায়গাটা আর কে দেখেছে? তুই দেখেছিস?'

বড় জেলেটি বলল, 'বাবু, সেখানে যেও না। সেখানে খুব সাপ-খোপের উপদ্রব। জায়গাটা ভাল না!'

নরহরি বলল, 'সাপ থাক আর যাই থাক, সে আমরা বুঝব। শিগগির সেখানে আমাদের নিয়ে চল্!'

বড় জেলেটি কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলল, 'সে যে অনেক দূরের পথ। সেখানে তোমাদের নিয়ে গেলে আমার যে আজকের দিনটার রোজগার নষ্ট হয়ে যাবে!'

নরহরি বলল, 'মনে কর, তোর জ্বর হয়েছে। তা হলেও কি মাছ ধরে রোজগার করতে পারতি?'

জেলেটি বলল, 'আমার জ্বর হয়নি, তবু শুধু শুধু মনে করতে যাব কেন? মনে কর, তুমি রাজা, তা হলেই কি তুমি রাজা হয়ে যাবে?'

সন্তু বলল, 'ঠিক আছে, সবটা পথ তোমায় যেতে হবে না। খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দাও ঠিক কোন্‌দিকে যেতে হবে!'

ছোট জেলেটিকে সেখানেই বসিয়ে রেখে ওরা তিনজন চলল, নদীর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে। তার আগে নরহরি ঘোড়া দুটোকে ঠেলে ঠেলে নদীতে নামিয়ে দিয়ে এল। ঘোড়া দুটো সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে গেল নদীর ওপারে।

খানিকটা দূরে গিয়েও নরহরি থেমে গিয়ে ফিসফিসিয়ে সন্তুকে বলল, 'উঁহুঃ ওই ছোঁড়াটাকে ওখানে বসিয়ে রেখে আসা ঠিক হল না। কেউ আমাদের খুঁজতে এলে ওর কাছ থেকে সব কথা জেনে যাবে।'

সে বড় জেলেটিকে বলল, 'এর পর সারাদিন মাছ ধরলে তোর আর কত রোজগার হত?'

জেলেটি বলল, 'মাছ ধরতে পারি না পা' রঁ, রোজ মহাজনকে দশ টাকা শোধ দিতে হয়। এখন তো মাছ ওঠেই না।'

নরহরি তার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলল, 'এই নে। এখন ওই ছেলেটাকেও ডাক। ছেলেটাও আমাদের সঙ্গে চলুক। আমাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে তোরা আজ গাঁয়ে ফিরে যাবি। খবরদার, কারুকে কিচ্ছু বলবি না! এসব পুলিশের কাজ, খুব গোপন রাখতে হয়!'

প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর ওরা নদীর ওপর একটা সাঁকো দেখতে পেল।খুব লড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। সেটার ওপর দিয়ে খুব সাবধানে ওরা এক এক করে চলে এল অন্য ধারে।

আবার নদীর ধার দিয়েই হাঁটতে হল প্রায় দেড় ঘণ্টা। এদিকটায় বেশ ঘন জঙ্গল। অনেক গাছের ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে নদীর জলে।

আসবার পথে গোটা দুয়েক গ্রাম চোখে পড়েছে, কিন্তু এই জায়গাটা একেবারে জনমানবশূন্য। কয়েকটা পাখির তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যাচ্ছে।নদীটাও ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। সামনেই পাহাড় আছে মনে হয়।

এক জায়গায় বড় জেলেটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'এবারে আপনারা যান, আমরা আর যাব না।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'জঙ্গলগড় আর কতদূর?'

'সামনে আর একটুখানি গেলেই দেখতে পাবেন। একেবারে নদীর ধারেই।'

নরহরি জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের গাঁ ছেড়ে এত দূরের জঙগেলে এসেছিলে কেন শুনি? তোমাদের নিশ্চয়ই কোন মতলব ছিল।'

বড় জেলেটি বলল, 'নিয়তি, বাবু, নিয়তি! এইদিকে এক গাঁয়ে সুবলের শ্বশুরবাড়ি। একটু আগের ফাঁক মাঠ দিয়েও যাওয়া যায়, আর এই জঙগেলর মধ্যে দিয়েও যাওয়াযায়। তা সুবলের কী দুর্বুদ্ধি হল। বলল, এই জঙলের মধ্যে দিয়েই যাই, যদি দু'একটা খরগোশ মারতে পারি। সেই লোভেই তার কাল হল।'

নরহরি বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা এবারে ফিরে যেতে পার!'

বড় জেলেটি বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেল, আপনারা এখন জঙ্গলে যাবেন, তারপর ফিরবেন কখন? জায়গাটা ভাল না।তাছাড় দুপুরে খাওয়-দাওয়াই বা করবেন কোথায়?'

নরহরি বলল, 'সে আমরা বুঝব। তোমরা এখন যাও তো!'

ওরা চলে যাবার পর সন্তু আর নরহরি খুব সাবধানে এগোতে লাগল। একটু বাদেই তাদের চোখে পড়ল, মাটিতে নানারকম গর্ত, আর এখানে-সেখানে পাথর আর কাঠের টুকরো ঝড়িয়ে আছে।

তারপর দেখা গেল একটা লম্বা পাথরের দেওয়াল। তার মধ্যে কয়েকখানা পাথরের ঘর, কিন্তু কোনোটারই ছাদ নেই। একটা কারুকার্য করা কাঠের দরজাও পড়ে আছে মাটিতে।

পাথরের দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে সন্তু ভাবল, এই কি তবে সেই জঙ্গলগড়?

২৫

কাকাবাবু একা একাই দুপুরের খাওয়া শেষ করলেন। নরেন্দ্র ভার্মা কিংবা শিশির দত্তগুপ্তর দেখা নেই। ওঁরা কোন খবরও পাঠাননি। তবে একটু আগে শিশির দত্তগুপ্তর একজন আর্দালি এসে এক জোড়া ক্রাচ্ দিয়ে গেছে।

খেয়ে উঠে কাকাবাবু নিজের আঁকা ম্যাপগুলো দেখলেন কিছুক্ষণ ধরে। মোট পাঁচটা ম্যাপ। তারমধ্যে চারখানা ছিঁড়ে ফেলে একখানা রাখলেন তিনি। সেটাকে আবার নতুন করে আঁকলেন। তারপর সেটাকে পকেটে ভরে রেখে তিনি ক্রাচ বগলে দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার কাছে। অনেকদিন বাদে তিনি নিজে নিজে হাঁটছেন, কেমন যেন নতুন নতুন লাগছে।

আকাশটা মেঘলা মেঘলা। চারিদিকে কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। বেশ একটা বেড়াবার মতন দিন কাকাবাবু ভাবলেন, এখন সন্তু কোথায়? কি করছে? ছেলেটাকে ওরা ঠিকমতন খেতে-টেতে দিয়েছি তো?

এবারে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দা পার হয়ে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। ক্রাচ্ নিয়ে হাঁটার অসুবিধে এই যে, খট্ খট্ শব্দ হয়। কাকাবাবুর নিজস্ব ক্রাচের তলায় রবার লাগানো আছে। কিন্তু সে দুটো তো সঙ্গে আনেন নি।

নিচতলায় যে দু'জন পুলিশের পাহারা দেবার কথা, তারা এখন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। কাকাবাবু যে বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তা তারা লক্ষও করল না। কাকাবাবু একটু মুচকি হাসলেন।

সামনের লোহার গেটটা অবশ্য বন্ধ। তালা দেওয়া। অগত্যা কাকাবাবু নিজেই গেটের গায়ে দু'বার থাবড়া মারলেন। সেই আওয়াজ শুনে একজন পুলিশ বেরিয়ে এল আর কাকাবাবুকে দেখে প্রায় ভূত দেখার মতন মুখের ভাব হয়ে গেল তার!

একটু তোতলাতে তোতলাতে সে বলল, 'এ-এ-এ কি স্যার! আ-আ-আ-প্ নি!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি একটু বাইরে বেড়াতে যাব, গেটটা খুলে দাও!'

পুলিশটি বলল, 'আ-আ-প্ নি বেড়াতে যা-যা-যাবেন? আপনার তো অসুখ! আপনি নিজে নিজে হাঁটছেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'অসুখ ঠিক হয়ে গেছে। খেয়ে ওঠার পর আমার একটু হাঁটাহাটি করা অভ্যেস।'

'তবে একটু অপেক্ষা করুন স্যার। আমরাও যাব আপনার সঙ্গে। আমরা ততক্ষণে একটু খেয়ে নিই। উনুনে তরকারি ফুটছে!'

'আমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই। আমি এক্ষুনি ফিরে আসব।'

'না, স্যার, তা হয় না! আমাদের বড় সাহেব বলেছেন....'

'তোমাদের বড় সাহেব কি আমায় আটকে রাখতে বলেছেন? যাও, শিগগির চাবি নিয়ে এস!'

কাকাবাবুর ধমক খেয়ে লোকটি আর তর্ক করতে সাহস করল না । চাবি এনে গেট খুলে দিল।

কাকাবাবু বললেন, তোমাদের সাহেব এলে বসতে বোল। আমি ফিরে আসব। আর দিল্লি থেকে যে সাহেব এসেছিলেন, তিনি ফিরলে বোল, আমার যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে গেছি।'

'কোথায় যাচ্ছেন স্যার, বলে যাবেন না?'

'বললুম তো, একটু বেড়াতে যাচ্ছি। অনেকদিন হাঁটা হয়নি ভাল করে।'

গেট থেকে বেরিয়ে কাকাবাবু কিন্তু বেশিক্ষণ হাঁটলেন না। একটা সাইকেল রিকশা পেয়ে তাতে চেপে বসলেন।

রিকশাওয়ালা জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে যাব বাবু?'

কাকাবাবু বললেন, 'চল, যেদিকে খুশি! বেশ মেঘলা মেঘলা দিন, আমায় কোন ভাল জায়গায় একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এস। তুমি দশটা টাকা পাবে।'

রিকশা চলতে শুরু করতেই কাকাবাবু চোখ বুজলেন। যেন তাঁর কোন দুশ্চিন্তাই নেই। সত্যিই তিনি হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।

দু'জন সাইকেল-আরোহী একটু বাদেই কাকাবাবুর দু'পাশ দিয়ে চলে গেল তাঁর দিকে ভাল করে তাকাতে তাকাতে। খানিক দূর গিয়ে লোক দুটি আবার ফিরে এল। কাকাবাবুকে আবার ভাল করে লক্ষ করে তারা চলে গেল খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে। কাকাবাবু এসব কিছুই দেখলেন না। যেন তিনি ঘুমোচ্ছেন।

সাইকেন রিকশাটা শহরের ভিড় ছাড়িয়ে চলে এল একটা ফাঁকা জায়গায়। সামনেই একটা ছোট পাহাড়। আকাশে মেঘ আরও গাঢ় হয়েছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

রিকশাওয়ালা থেমে গিয়ে বলল, 'ও বাবু! বৃষ্টি আসতেছে। এবার কোথায় যাবেন?'

কাকাবাবু চোখ মেলে উঠে বসে বললেন, 'এ কোথায় এসেছ? বাঃ, বেশ জায়গাটা তো!'

রিকশাওয়ালা বলল, 'এ দিকটা তো বাবু কুঞ্জবন। কাছেই পুরনো রাজবাড়ি আছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'রাজবাড়ি আছে থাক, সেদিকে যাবার দরকার নেই, আরও ফাঁকার দিকে চল।'

'জোরে বৃষ্টি এসে যাবে যে বাবু!'

'ও, বৃষ্টি আসবে বলছ! তা হলে তো আর তোমার সাইকেল রিকশায় চলবে না!'

কাকাবাবু রিকশা থেকে নেমে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। যেন তিনি কোন চেনা লোককে খুঁজছেন। কিন্তু কাছাকাছি মানুষজন কেউ নেই। তবে দূর থেকে একটা মোষের গাড়ি আসতে দেখা যাচ্ছে।

রিকশা-চালককে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে কাকাবাবু বললেন, 'তুমি এবারে যেতে পার।'

রিকশাচালক তবু চিন্তিতভাবে বলল, 'জোর বর্ষা আসছে, আপনি এখান থেকে ফিরবেন কি করে?'

কাকাবাবু বললেন 'সেজন্য তোমার চিন্তা নেই। আমি এখন ফিরব না।'

মোষের গাড়িটা কাছে আসতেই কাকাবাবু হাতে তুলে সেটাকে থামালেন। গাড়োয়ান ছাড়া সে গাড়িতে আর কেউ নেই। মাঝখানের ছাউনিতে রয়েছে কয়েকটা বস্তা।

কাকাবাবু সেই গাড়ির গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ দিকে যাচ্ছ গো কর্তা?'

গাড়োয়ান বলল, 'যাচ্ছি তো বাবু, অনেক দূর। সেই কমলপুর।'

কাকাবাবু সন্তুষ্টভাবে বললেন, 'বাঃ বেশ! আমিও ওই দিকেই যাব। আমায় নিয়ে যাবে? চিন্তা কোর না, যা ভাড়া লাগে তা আমি দেব। তুমি গাড়িটা একটু নিচু কর, নইলে তো আমি উঠতে পারব না!'

কাকাবাবু উঠে বসার পর মোষের গাড়িটা চলতে লাগল টিমেতালে। কাকাবাবু ছাউনির মধ্যে বসে গাড়োয়ানের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়তে লাগল জোরে।

সেই বৃষ্টি ভিজেই দু'জন সাইকেল-আরোহী আবার আস্তে আস্তে যেতে লাগল মোষের গাড়িটার পাশে পাশে। কাকাবাবুর দিকে তারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রইল। কাকাবাবুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই তারা পালিয়ে গেল শাঁ শাঁ করে।

কাকাবাবু বললেন, 'আরেঃ!'

লোকদুটি কিন্তু বেশি দূর গেল না। খানিকটা এগিয়েই আবার সাইকেল ঘুরিয়ে এদিকে আসতে লাগল। তারা কাছাকাছি এসে পড়তেই কাকাবাবু হাতখানি দিয়ে ডেকে বললেন, 'এই যে, শোন, শোন!'

এবার তারা উল্টোদিক থেকে আসছে বলে গাড়ির পাশে পাশে চলতে পারে না। একজন থেমে পড়ল।কাকাবাবু মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে, শোন, রাজকুমারকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পার?'

লোকটি যেন কিছুই জানে না এইরকমভাবে শুকনো মুখে বলল, 'রাজকুমার? কোন্ রাজকুমার?'

কাকাবাবু কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন,'আমি যে রাজকুমারের কথা জিজ্ঞেস করছি, তাকে তুমি চেন না?'

লোকটি বলল, 'কই, না তো!'

কাকাবাবু বললেন, 'তবে এখানে ঘুরঘুর করছ কেন? যাও, ভাগো!'

ঠিক তক্ষুনি একটা জিপগাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। সাইকেলআরোহী আর কাকাবাবু দু'জনেই তাকালেন সেদিকে।

জিপটিও এসে থামল মোষের গাড়ির পাশে। কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরা লম্বামতন একজন লোক মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

কাকাবাবু লোকটির আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে, তুমি জান নাকি, রাজকুমারকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

লোকটি বললো, 'হ্যাঁ, জানি। আমি রাজকুমারের কাছেই যাচ্ছি। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?'

কাকাবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই! বাঃ, বেশ ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

মোষের গাড়ির গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ওহে, জিপগাড়ি পেলে কে আর মোষের গাড়িতে যেতে চায় বল! তোমার গাড়িটা নিচু কর, আমি নেমে পড়ি! এই নাও, তুমি দশটা টাকা নাও!'

কাকাবাবু জিপগাড়িতে বসলেন সামনের সিটে। পেছন দিকে তিনজন গুন্ডামতন চেহারার লোক বসে আছে গম্ভীরভাবে।

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ, ব্যবস্থা বেশ ভালই। আমি নিজে থেকে যেতে না চাইলে তোমরা কি আমায় জোর করে নিয়ে যেতে?'

কালো শার্ট পরা লোকটি বলল, 'আপনি কী করে জানলেন যে আমরা এই রাস্তায় আসব!'

কাকাবাবু আবার কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'বাঘ জঙ্গলে বেরুলেই তার পেছনে ফেউ লাগে। আমি জানতুম, আমি যে-দিকেই যাই না কেন, তোমরা ঠিক আমার পেছন পেছন আসবে!'

কালো শার্ট পরা লোকটাও অকারণে হেসে উঠল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'যেখানে যাচ্ছি, সেখানে পৌঁছতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে?'

লোকটি বলল, 'অন্তত তিন ঘণ্টা তো বটেই। সন্ধে হয়ে যাবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে আমি এই সময়টা ঘুমিয়ে নিচ্ছি। কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি। পৌঁছে গেলে আমায় ডেকে দিও।'

তারপর কাকাবাবু সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন মনে হল। গাড়ির লোকগুলো এই এতটা সময় কোন কথা বলল না। তবে তারা কেউ ঘুমোল না।

জিপটা শেষ পর্যন্ত থামতে কাকাবাবু জেগে উঠলেন নিজে থেকেই।

সন্তুকে যে-বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই বাড়ির গেটের সামনে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের হাতে দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল।সেই আলোতে কাকাবাবু চিনতে পারলেন রাজকুমারকে।

গাড়ি থেকে নেমে এসে কাকাবাবু রাজকুমারের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তা হলে আবার দেখা হল! এত শিগগিরই যে দেখা হবে তা ভাবিনি। আশা করি এবারে আর মারা মারি করার দরকার হবে না। সন্তুর চিঠি আমি পেয়েছি। আমি জঙ্গলগড়ের ম্যাপ দিয়ে দিয়ে তোমরা সন্তুকে ছেড়ে দেবে। আশা করি ভদ্রলোকের মতন তোমরা কথা রাখবে। এই নাও জঙ্গলগড়ের ম্যাপ।

জামার পকেট থেকে কাকাবাবু ম্যাপটা বার করে এগিয়ে দিলেন রাজকুমারের দিকে।

২৬

রাজকুমারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ছ'সাত জন লোক। আজ আর এদের ছদ্মবেশ ধরার কোন চেষ্টা নেই। মুখ দেখলেই বোঝা যায় এরা বেশ হিংস্র ধরনের মানুষ। ওদের পেছনে দেখা যাচ্ছে তিনটে ঘোড়া। সবেমাত্র সন্ধে হয়েছে, আকাশ এখনো পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। মশালের আগুন কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

রাজকুমারের মুখখানা গম্ভীর, থমথমে। সে ম্যাপটা নেবার জন্য হাত বাড়াতেই কাকাবাবু নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'উহুঁঃ। আগে সন্তুকে ডাকো। তুমি সন্তুকে ফেরত দেবে, তারপর আমি তোমায় ম্যাপটা দেব, এইরকমই তো কথা!'

রাজকুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'রায়চৌধুরী, তোমার সাহস আছে বটে! এ-কথা মানতেই হবে! ভেবেছিলুম, তোমাকে তুলে আনবার জন্য আবার অনেক ঝামেলা করতে হবে। কিন্তু তুমি নিজেই এসে ধরা দিয়েছ। তুমি খোঁড়া মানুষ, তাও একা। আমরা এখানে এতজন আছি। এবারে কিন্তু তোমাকে আর কেউ এখানে বাঁচাতে আসবে না! সে ব্যবস্থা করা আছে!'

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'বাঁচাবার প্রশ্ন উঠছে কি করে? তোমরা আমাকে মারবে কেন? তোমরা যা চেয়েছিলে, তা তো দিয়েই দিচ্ছি! ম্যাপ নাও। সন্তুকে ফেরতে দাও!'

'বাঃ। তুমি কি আমাদের এতই বোকা পেয়েছ? ওই ম্যাপটা যদি জাল হয়? সন্তুকে আমরা এ বাড়িতে আটকে রেখেছি। সে ভাল আছে। এই ম্যাপ অনুযায়ী তুমি

আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে তারপর সন্তুকে তুমি ফেরত পাবে!'

'আমাকে আবার অতদূর নিয়ে যাবে? তার চেয়ে এক কাজ কর না! আমিও এখানে সন্তুর সঙ্গে থাকছি। তোমরা এই ম্যাপ নিয়ে চলে যাও। গেলেই বুঝতে পারবে আমি ঠিক ম্যাপ দিয়েছি, না ভুল দিয়েছি!'

'দেখি ম্যাপটা!'

'বললুম না, আগে সন্তুকে দেখাও,তারপর ম্যাপ পাবে?'

'কেন পাগলামি করছ, রায়চৌধুরী? আমরা তোমার কাছ থেকে ওটা জোর করে কেড়ে নিতে পারি না? দেরি করে লাভ নেই! চল, রওনা হয়ে পড়া যাক!'

'আমাকে যেতেই হবে বলছ? তবে সন্তুকে ডাকো। সে-ও আমাদের সঙ্গে যাবে।'

'না! সে ছেলেমানুষ, তাকে নিয়ে যাবার দরকার নেই!'

একটু আগে থেকেই চলন্ত ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এই সময় দু'জন অশ্বারোহী সেখানে এসে পৌঁছল। ঘোড়া থেকে নেমে তারা ছুটে এল রাজকুমারের কাছে। একজন ফিসফিস করে বলল, 'কোথাও পাওয়া গেল না! সব জায়গায় তল্লাশ করেছি—'

রাজকুমার সেই লোকটির ঘাড়ে হাত দিয়ে ঠেলা মেরে ছিটকে ফেলে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'অপদার্থ! উল্লুক!'

তারপর রাজকুমার চোখ ফেরাতেই দেখল কাকাবাবু তার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন।

রাজকুমার বলল, 'তোমার কাছে গোপন করে আর লাভ নেই। তোমার গুণধর ভাইপোটি পালিয়েছে। মহা বিচ্ছু ছেলে!'

কাকাবাবু বললেন, 'পালিয়েছে? এটা কি সত্যি কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। ভোরবেলা সে চম্পট দিয়েছে। সারা দিন ধরে খোঁজা হচ্ছে তাকে। শুধু শুধু পালিয়ে তার কী লাভ হল? এই জঙ্গলের মধ্যে না খেয়ে থাকবে! বেশি দূর তো যেতে পারবে না!'

'এই জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই?'

'প্রায়ই ভল্লুকের উপদ্রব হয়! বুঝতেই পারছ, আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। আমরা তাকে ভালভাবেই রেখেছিলাম এখানে, কোন অত্যাচার করিনি!'

'ওর চিঠিতে এক ফোঁটা রক্ত দেখেছি। সেটা কার?'

রাজকুমারের পাশ থেকে 'কর্নেল' বলল, 'রাজকুমার, শুদুমুদু কথা বাড়িয়ে লাভ আছে? এই বুড়োটাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলুন না!'

রাজকুমার বলল, 'রায়চৌধুরী, ঘোড়ায় ওঠ। ঘোড়া চালাতে জান নিশ্চয়ই। এক পায়ে পারবে?'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, পারব। চল তা হলে! কিন্তু তোমরা কথা রাখতে পারলে না!'

মোট পাঁচটা ঘোড়া। সেগুলোর পিঠে চড়ে পাঁচজন যাত্রা শুরু করল, আর বাকিরা রয়ে গেল সেখানেই।

কাকাবাবু ম্যাপটা রাজকুমারের হাতে দিয়ে বললেন, 'এ সব রাস্তা তোমরাই ভাল চিনবে। তোমরাই পথ ঠিক কর। আসল জায়গায় পৌঁছে তারপর আমি দেখব।'

রাজকুমার আবার ম্যাপটা কর্নেল-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি এটা দেখে আগে আগে চল!'

কর্নেল পকেট থেকে একটা টর্চ বার করে সেটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'এ জায়গাটাতো আমার চেনা!'

রাজকুমার বলল, 'জায়গাটতো আমিও আগে দেখেছি। কিন্তু সেখানে গোপন একটা দরজা আছে। তার সন্ধান শুধু এই রায়চৌধুরীই জানে।'

তারপর শুরু হল অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাত্রা। মশালগুলো ওরা নিবিয়ে ফেলেছে। আকাশে অল্প জ্যোৎস্না আছে। জঙ্গলটাকে মনে হচ্ছে ছায়ার রাজ্য।

কর্নেল চলেছে আগে আগে। কাকাবাবুকে মাঝখানে রেখে ঠিক তার পেছনেই রয়েছে রাজকুমার। তার হাতে রিভলভার।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ কর্নেল-এর ঘোড়াটা চিঁ-হি-হি-হি ডাক তুলে সামনের দু-পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। কর্নেল টর্চের আলো ফেলল সামনে। কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু ঘোড়াটা আর যেতে চায় না।

রাজকুমার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল?'

কর্নেল বলল, 'মনে হচ্ছে সামনে কোন বড় জানোয়ার আছে। ঘোড়া ভয় পেয়েছে।'

রাজকুমার বলল, 'গুলি চালাও! যাই থাক না কেন, সরে যাবে!'

কর্নেল বলল, 'যদি হাতির পাল থাকে? তা হলে গুলি চালালে তো আরও বিপদ হবে!'

রাজকুমার বলল, 'না, না, এ জঙ্গলে হাতির পাল নেই, আমি জানি! চালাও গুলি!'

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পরপর দু'বার গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ হল। অনেক দূরে যেন একটা হুড়মুড় শব্দ শোনা গেল। আর কিছু না।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার এগোতে লাগল ওরা। এক জায়গায় নদী পার হতে হল। কর্নেল মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে ম্যাপ দেখে নিচ্ছে। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তারা পৌঁছে গেল জঙ্গলগড়ে। সবাই ঘোড়া থেকে নামবার পর আবার জ্বালানো হল মশাল।

রাজকুমার বলল, এ জায়গাটায় আমি আগে অন্তত তিনবার এসেছি। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাইনি। রায়চৌধুরী, তুমি ধোঁকা দিচ্ছ না তো? এটাই আসল জঙ্গলগড়? উদয়পুরের কাছে যেটা সেটা নয়?

কাকাবাবু বললেন, 'এক সময়ে এখানেই আমি তাঁবু গেড়ে ছিলাম কয়েকদিন।'

রাজকুমার বলল, 'সে খবর আমরা রাখি। কিন্তু তুমি আরও অনেক জায়গায় ঘুরেছ। স্বর্ণমুদ্রা তুমি কোথায় পেয়েছিলে?'

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'এখানেই!'

'তবে গুপ্তধন কোথায় আছে, চটপট দেখিয়ে দাও!'

'গুপ্তধনের সন্ধান আমি জানতে পারলে এখানে ফেলে রেখে যাব কেন? সেবারেই তো নিয়ে যেতে পারতুম!'

'গুপ্তধনের সন্ধান তুমি পেয়েছিলে ঠিকই। তুমি চেয়েছিলে একলা তা উদ্ধার করতে। তোমার সঙ্গে যারা ছিল, তাদের জানতে দিতে চাওনি। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ তুমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে--'

এই সময় কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে দপ্ করে একটা মশাল জ্বলে উঠল। তারপর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। ঠিক আগেকার দিনের সৈন্যের মতন সাজপোশাক পরা দু'জন লোক বেরিয়ে এল সেখান থেকে। তাদের হাতে লম্বা লম্বা বর্শা। আর তাদের পেছনে দেখা গেল আর একজন লোককে। এর গায়ে মখমল আর জরির পোশাক। মাথায় মুকুট। অনেকটা যাত্রাদলের রাজা কিংবা সেনাপতির মতন দেখতে। হাতে খোলা তলোয়ার।

সেই লোকটিকে দেখেই রাজকুমারের সঙ্গীরা সম্মান দেখিয়ে মাথা নিচু করল। রাজকুমার বলল, 'আসুন স্যার!'

কাছে আসার পর লোকটিকে চিনতে পেরে কাকাবাবু অস্ফুটস্বরে বললেন, 'শিশির দত্তগুপ্ত!'

পুলিশের বড়সাহেব শিশির দত্তগুপ্ত এই রকম পোশাক পরার পর তাঁর চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। মুখের হাসিটাও অন্যরকম। এক দিকের ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে তিনি বললেন, 'আমি সেনাপতি দেবেন্দ্র বর্মার বংশধর! রাজা অমরমাণিক্যের লুকনো ধনসম্পদের আমিই উত্তরাধিকারী!

কাকাবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। যেন এমন মজা তিনি বহুদিন পাননি!

রাজকুমার কাকাবাবুর গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে বলল, 'চুপ কর, বেয়াদব! ওঁর সামনে তুই হাসছিস!'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'এই! ওঁর গায়ে হাত তুলো না! উনি ভদ্দরলোক। উনি নিজেই সব দেখিয়ে দেবেন! মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি বিদেশী! আমাদের ধনসম্পদের ওপর আপনার কোনও অধিকার নেই। আপনি জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দিন। তারপর আপনাকে আমরা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেব!'

কাকাবাবু বললেন, 'তাই নাকি? আপনার পরিচয় আমি জেনে ফেলেছি, তারপর আপনি আমায় বাঁচিয়ে রাখবেন? আপনি এত বোকা? আপনি পুলিশের বড়কর্তা, তাই এইসব গুণ্ডা বদমাইশগুলোকে কাজে লাগিয়েছেন। সেইজন্যই এরা এত বেপরোয়া!'

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, 'আমরা বনেদি বংশের লোক। কথা দিলে আমরা কথা রাখি। আমি ত্রিপুরেশ্বরীর নামে শপথ করছি, আপনার কোন ক্ষতি করা হবে না। আমাদের কাজ উদ্ধার হলেই আপনাকে আমরা সসম্মানে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

কাকাবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন, 'আর যদি কাজ উদ্ধার না হয়?'

শিশির দত্তগুপ্ত এবারে তাঁর তলোয়ারটা কাকাবাবুর বুকের কাছে তুলে কর্কশভাবে বললেন, 'তা হলে এক কোপে আপনার মণ্ডুটা ধড় থেকে নামিয়ে দেব। তারপর আমার কপালে যা-ই থাক!'

২৭

কাকাবাবু হঠাৎ ক্রাচটা তুলে খুব জোরে মারতেই তলোয়ারটা শিশির দত্তগুপ্তর হাত থেকে উড়ে গিয়ে পড়ল অনেক দূরে।

রাজকুমার আর অন্যরা দৌড়ে এসে কাকাবাবুকে চেপে ধরল। কর্নেল কাকাবাবুকে মারবার জন্য ঘুঁসি তুলতেই কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'দাঁড়াও! আমি তোমাদের গুপ্তধনের গুহা দেখিয়ে দিচ্ছি!'

রাজকুমারের দিকে ফিরে তিনি ধমকের সুরে বললেন, 'তোমরা কথা রাখতে শেখনি! সন্তুকে ফেরত দেবার কথা ছিল তোমাদের!'

শিশির দত্তগুপ্তর দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আপনি সেনাপতি বংশের ছেলে! সেনাপতির মতন পোশাক পরলেই সেনাপতি হওয়া যায় না। তলোয়ারটা শক্ত করে ধরতেও শেখেননি?'

রাজকুমার বলল, 'তোমার চালাকি অনেক দেখেছি! আর বেশি বকবক করতে হবে না! এবারে ভালয়-ভালয় জায়গাটা দেখাও!'

শিশির দত্তগুপ্ত হুকুম দিল, 'ক্রাচ দুটো কেড়ে নাও ওর কাছ থেকে!'

কাকাবাবু বললেন, 'তার দরকার নেই। আমি শুধু আপনাকে দেখিয়ে দিলাম যে, তলোয়ার ঠিকমতন ধরতে না শিখলে ও জিনিস নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই। এখান থেকে আরও খানিকটা দূরে যেতে হবে।'

একটা ভাঙা দেওয়ালের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন কাকাবাবু। একজন মশালধারী চলল তাঁর আগে আগে। আর বাকি সবাই পেছনে পেছনে। শিশির দত্তগুপ্ত তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিয়ে খাপে ভরে নিয়েছে। এখন তার হাতে একটা রিভলবার। সেই রিভলভারের নল কাকাবাবুর পিঠে ঠেকান।

কাকাবাবু বললেন, 'সেই গুপ্তধন পেলে কে নেবে? আপনি, শিশিরবাবু, সেনাপতির বংশ। আর, রাজকুমার বলেছে, সে রাজবংশের ছেলে। তা হলে?'

শিশির দত্তগুপ্ত বলল, 'সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না!'

কাকাবাবু বললেন, 'রাজা অমরমাণিক্য বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি তাঁর জিনিসপত্র এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন যাতে কেউ তার সন্ধান না পায়। সকলেই ভাবে যে, দেয়ালের গায়ে বা পাথরের ওপরে কোথাও কোন বোতাম-টোতাম থাকবে, সেটা টিপলেই দরজা খুলে যাবে। সেইরকমভাবে গুপ্তধন খুঁজতে এসে বহুলোক এখানকার বাড়িঘর সব ভেঙেই ফেলেছে। এই যে ডান দিকের বড় পাথরটা, এর গায়েও গাঁইতির দাগ। আসলে এখানে সেরকম কিছুই নেই। যা কিছু আছে, সবই মাটির নিচে। মশালটা নিচের দিকে দেখাও, এখানে কোথাও একটা ঈগলপাখি আঁকা আছে!'

অমনি দু'দুটো মশাল নিচে নেমে এল, সবাই এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু সেখানে কোন পাখিটাখির ছবি পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু চারদিক ভাল করে দেখে নিলেন। মশালের আলোতে যে-টুকু দেখা যায়, তা ছাড়া আর সব দিকেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশের চাঁদও মেঘে ঢাকা পড়েছে।

কাকাবাবু বললেন, 'পেলে না? তাহলে কি ছবিটা মুছে গেল? না। তা তো হতে পারে না! ভাল করে দেখতো এখানে একটা বড় তেঁতুলগাছও আছে কিনা?'

কিন্তু সেখানে কোন তেঁতুলগাছও নেই।

কাকাবাবু বললেন, 'এমনও হতে পারে, গাছটা কেউ কেটে নিয়ে গেছে। জঙ্গলের গাছ তো অনবরতই লোকরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে! তা হলে চল তো পাথরটার ওদিকে।'

কাছাকাছি কোনো পাহাড় না থাকলেও সেখানে একটা বেশ বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে।

সেই পাথরের ওদিকটায় যেতেই মশালের আলোয় প্রথমেই চোখে পড়ল একটা সাদা রুমাল।

একজন লোক দৌড়ে গিয়ে রুমালটা তুলে নিল। শিশির দত্তগুপ্তর কাছে এনে সে বলল, 'স্যার, এই রুমালটা টাটকা। আজই কেউ ফেলে গেছে!'

শিশির দত্তগুপ্ত রুমালটা মেলে ধরল। তার এক কোণে ইংরিজি অক্ষরে 'ভি' লেখা।

কাকাবাবু বললেন, 'তার মানে আরও কেউ আজ এখানে গুপ্তধন খুঁজতে এসেছিল। দ্যাখ, সে আবার কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে কি না!'

চারদিকে মশাল ঘুরিয়ে দেখা হল, মানুষজনের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু একদিকে একটা তেঁতুলগাছ আছে। রুমালটা পড়ে ছিল সেই গাছটার কাছেই।

কাকাবাবু সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে গাছটার গোড়ার কাছে বসে পড়ে বললেন, 'এই তো ঈগলপাখির ছবি!'

সবাই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাকাবাবুর ওপরে।

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে শিশির দত্তগুপ্তকে বললেন, 'দেখি আপনার তলোয়ারটা।'

শিশির দত্তগুপ্ত তলোয়ারটা খাপ থেকে খুলে দিতেই কাকাবাবু সেটা তুলে ধরে বললেন, আপনারা জঙ্গলগড়ের চাবি খুঁজছিলেন, এই দেখুন, এটাই জঙ্গলগড়ের চাবি। দেখবেন?

শুধু মাটির ওপরেই বেশ বড় একটা ঈগলপাখি আঁকা। মাটি কেটে কেটে তার ওপর চুন বা ঐ জাতীয় কিছু ছড়িয়ে ছবিটা আঁকা হয়েছিল, বৃষ্টির জলে রং টং ধুয়ে মুছে গেলেও এখনও পাখির আকারটা বোঝা যায়। পাখির চোখ দুটো পাথরের।

কাকাবাবু তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে পাখিটার ডান চোখটা তোলার চেষ্টা করলেন। সেটা সহজেই উঠে এল। সেই ফুটো দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে কাকাবাবু গর্তটাকে বড় করতে লাগলেন। তাতেও বিশেষ অসুবিধে হল না। গর্তটা হাত ঢোকাবার মতন বড় হতেই কাকাবাবু তার ভেতর থেকে একটা তামার নল টেনে বার করলেন।

তারপর বললেন, 'সেই অতদিন আগেও কী রকম চমৎকার কপিকল ব্যবস্থা ছিল দেখ! এটা দিয়ে কাজ সারতে বেশি গায়ের জোর লাগে না। একটা বাচ্চা ছেলেও পারবে।

কাকাবাবু সেই তামার নলটা ধরে ঘোরাতে লাগলেন। কয়েক পাক ঘুরিয়েই বললেন, 'কাজ হয়ে গেছে। এবারে দ্যাখো!'

সবাই হাঁ করে ঈগলপাখিল ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সেখানে কিছুই ঘটল না।

শিশির দত্তগুপ্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'ওই পাথরটার কাছে আলো নিয়ে দেখুন! এখানে কি দেখছেন!'

মশালের আলো সেদিকে নিতেই দেখা গেল যে, পাথরের চাঁইটা খানিকটা সরে গেছে, সেখানে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়েছে।

সবাই ছুটে গেল সেদিকে। গর্তটার ভেতরে অন্ধকার। ভেতরে কিছুই দেখা যায় না।

কাকাবাবু সেখানে গিয়ে বললেন, 'এটা হল সুড়ঙ্গে ঢোকার পথ। সুড়ঙ্গটা সোজা নয়। এখান থেকে নিচে নামলেই সামনের দিকে আসল সুড়ঙ্গটাদেখা যাবে।

সবাই একসঙ্গে হুড়মুড় করে সেই গর্ত দিয়ে নামতে যাচ্ছিল, শিশির দত্তগুপ্ত রিভলবার তুলে বলল, 'খবরদার! আর কেউ যাবে না। প্রথমে শুধু আমি যাব!'

কর্নেল বলল, 'স্যার, প্রথমেই আপনি যাবেন? ভেতরে যদি সাপখোপ থাকে?'

শিশির দত্তগুপ্ত বলল, 'যাই থাকুক, প্রথমে আমি গিয়ে দেখব। দরকার হলে তোমাদের ডাকব। কারুর কাছে টর্চ আছে?'

কেউ টর্চ আনেনি। কাকাবাবু নিজেই তাঁর পকেট থেকে একটা সরু টর্চ বার করে বললেন, 'এটা দিতে পারি। এবারে আমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

শিশির দত্তগুপ্ত কাকাবাবুর কাছ থেকে টর্চটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে কঠোরভাবে বলল, 'একে ধরে রাখ। পালাবার যেন চেষ্টা না করে। ফিরে এসে এর ব্যবস্থা করব। আমি ভেতর থেকে যদি ডাকি, তা হলে তোমরা কেউ যাবে।'

টর্চের আলোয় দেখা গেল, সেই গর্তটা এক-মানুষের চেয়ে কিছুটা বেশি গভীর! ওপর থেকেই সবাই দেখতে পেল, শিশির দত্তগুপ্ত সেই গর্তের মধ্যে নেমে আবার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

সেই কুড়িয়ে পাওটা রুমালটা দিয়ে কাকাবাবু হাওয়া খেতে লাগলেন। তার কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল, এখন মুখখানা বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকটা মুহূর্তকে মনে হচ্ছে ভীষণ লম্বা। তবু প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে গেল, শিশির দত্তগুপ্তর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

গর্তটার মুখের কাছে মুখ দিয়ে রাজকুমার চিৎকার করে ডাকল, স্যার! স্যার!'

কোনও উত্তর এল না।

রাজকুমার এইরকম ডেকে চলল অনেকবার। তার ডাকেরই খানিকটা প্রতিধ্বনি শোনা গেল কিন্তু আর কোনও শব্দ নেই।

রাজকুমার বলল, 'কি হল? স্যার কোনও উত্তর দিচ্ছেন না কেন?'

কাকাবাবু বললেন,'আমি কি জানি! সে তোমাদের স্যারের ব্যাপার।

কর্নেল বলল, 'আর একজন কারুর ভেতরে গিয়ে দেখা দরকার।'

রাজকুমারও গর্তে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে। ওপর থেকে কর্নেল জিজ্ঞেস করল, 'কি হল, কিছু দেখতে পাচ্ছেন, রাজকুমার?'

ভেতর থেকে শোনা গেল, 'বড্ড অন্ধকার! কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

কর্নেল বলল, 'আমরা ডাকলে সাড়া দেবেন। স্যারের টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছেন না?'

রাজকুমারের কাছ থেকে আর কোনও উত্তর এল না! এবার কর্নেল শুরু করল ডাকাডাকি। রাজকুমার একেবারে নিশ্চুপ।

কর্নেল মুখ তুলে বলল, 'কিছু নিশ্চয়ই পেয়েছে। সেইজন্য সাড়া দিচ্ছে না। সাপ-টাপ থাকলেও সঙ্গে-সঙ্গেই তো কিছু একটা হয়ে যায় না।'

কাকাবাবু বললেন, 'এবারে তুমি নেমে দেখবে নাকি?'

কর্নেল বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি কি ভয় পাই?'

কর্নেল-এর কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল, সেটা খুলে নামিয়ে রেখে সে গর্তটার মধ্যে পা ঝুলিয়ে দিল। তারপর লাফিয়ে নেমে পড়ে প্রথমেই সুড়ঙ্গে না ঢুকে সেখান থেকেই ডাকতে লাগল, 'স্যার! রাজকুমার! আপনারা কোথায়?'

কোনও উত্তর না পেয়ে সে সুড়ঙ্গে মাথা ঢোকাতেই কেউ যেন হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে ঢুকিয়ে নিল ভেতরে।

অন্য যারা ছিল, তারা দারুণ ভয় পেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কাকাবাবু তাদের বললেন, 'ওহে, তোমরা যদি বাঁচতে চাও তো পালাও! ভেতরে জুজু আছে মনে হচ্ছে।'

লোকগুলো কি করবে ঠিক করতে পারছে না। তখুনি দেখা গেল গর্তটার ভেতর থেকে কার মাথা বেরিয়ে আসছে। কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'হাতটা দাও, আমি টেনে তুলছি!'

গর্ত থেকে উঠে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। তাঁকে দেখেই কর্নেল-এর দলবল দৌড় মারল।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'যাক, ওগুলো যাক। আসলি চাঁই গুলো ধরা পড়ে গেছে! খুব বুদ্ধি বার করেছিলে তুমি, রাজা!'

কাকাবাবু বললেন, 'এখানে আসার আগে পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি যে,শিশির দত্তগুপ্তই নাটের গুরু! পুলিশের কর্তা বলেই ও বড় বড় সব ক্রিমিনালকে নিজের কাজে লাগিয়েছে। তোমার রুমালটা প্রথমে না দেখতে পেয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলুম।'

নরেন্দ্র ভার্মা গর্তের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'কেয়া হুয়া? উ লোগকো বাঁধকে উপারে লে আও!'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ভেতরে থাকতে তোমার কষ্ট হয়নি তো? দুটো বেশ বড় বড় ঘর।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'তেমাকে এবারে সারপ্রাইজ দেব, রাজা। বল তো ভিতরমে কে কে আছে?'

কাকাবাবু বললেন, 'তার মানে?'

নরেন্দ্র ভার্মা একগাল হেসে বললেন, 'সন্টু! দ্যাট নটি বয়!'

কাকাবাবু সত্যিকারের অবাক হয়ে বললেন, 'সন্তু? ওর ভেতরে?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'হাঁ! কেয়া আজিব বাত্! ও ছেলেটার কিন্তু বুদ্ধি সাঙ্ঘাতিক।'

কাকাবাবু বললেন, 'সন্তু এখানে? ও সুড়ঙ্গের পথই বা কি করে জানল?'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'জানেনি। লেকিন, আর একটু হলেই জেনে ফেলত। তোমার ম্যাপ পেয়ে তো আমি দলবল নিয়ে বিকালেই এখানে পঁহুছে গেছি। তুমি শর্টকাট রাস্তা বাতলে দিয়েছিলে। এখানে এসে দেখি, ওই ঈগলের পাথরের আঁখ নিয়ে সন্তু নাড়াচাড়া করছে। পাশে অন্য একটা লোক।'

কাকাবাবু বললেন, 'সন্তু কি রাজকুমারের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল।'

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, 'হাঁ। তারপর গন্ধ শুঁকে-শুঁকে ঠিক এখানে হাজির হয়ে গেছে। ওদের দু'জনকেও আমরা সুড়ঙ্গের অন্দরমে নিয়ে গেলাম। ওই তো সন্তু উঠছে!'

তলা থেকে কেউ ঠেলে তুলেছে সন্তুকে, দু'হাতের ভর দিয়ে সে ওপরে উঠে এল। তারপর কাকাবাবুর দিকে চেয়ে সে লাজুকভাবে হাসল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক আছিস তো? কোথাও লাগে-টাগেনি তো?'

সন্তু বলল, 'না'।

কাকাবাবু বললেন, 'এবারে সত্যিই তোর জন্য চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলুম। এ লোকগুলো বড় সাঙ্ঘাতিক। চল্, কালই ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। তোর স্কুল খুলে গেছে না?'

সন্তু বলল, 'স্কুল না, কলেজ!'

দিনে ডাকাতি

১

টেবিলের ওপর ভাত দেওয়া হয়েছে। খেয়ে দেয়ে বিমান কলেজ যাবে। বিমানের বাবার খাওয়া হয়ে গেছে আগেই; তাঁর এক্ষুনি অফিসে বেরিয়ে যাবার কথা। কে একজন লোক এই সময় বাবার সঙ্গে দেখা করতে এল। আর একটা কাক বিমানের ভাতের থালায় সেই সময়েই মুখ দিয়ে গেল।

লোকটি যদি আর কিছুক্ষণ বাদে আসত কিংবা পাজি কাকটা যদি বিমানের ভাতের থালায় ঠোক্কর না মারত, তাহলে পরের গল্পটা কিছুই হত না।

কলিং বেলের আওয়াজ শুনে বিমানই ভাতের থালা ফেলে উঠে গিয়েছিল দরজা খুলে দিতে। বারান্দায় ওত পেতে ছিল কাকটা। দস্যুর মতন এসে থালা থেকে মাছভাজাটা তুলে নিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, অনেকগুলো ভাত ছড়িয়ে প্রমাণও রেখে গেল তার কুকীর্তির।

ফিরে এসে বিমান এই কান্ড দেখে রেগে আগুন। তাড়া করে গেল কাকটাকে। কাকটা বারান্দাতেই বসে মাছভাজাটা আরাম করে খাচ্ছিল। বিমানকে দেখে টুক করে উড়ে গিয়ে বসল রাস্তার লাইট পোস্টের ওপর। সেখান থেকে বিমানকে দেখিয়ে দেখিয়ে মাছভাজাটা শেষ করতে লাগল।

বিমান একটা ইটের টুকরো ছুঁড়ে মারল কাকটার দিকে। গায়ে লাগল না। কাকটা সেখানেই বসে রইল। বিমানকে সে গ্রাহ্যও করছে না।

বারান্দার দেওয়ালের একটা কোণ ভেঙে আছে অনেকদিন ধরে। সেই জায়গাটা আরও ভেঙে, আরও কয়েকটা ইটের টুকরো নিয়ে বিমান মারতে গেল কাকটাকে। একটাও লাগল না। নিচের রাস্তা থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'কী, হচ্ছে কি? কে ইঁট ছুঁড়ছে?'

বোধহয় রাস্তায় কারুর গায়ে লেগেছে। অসম্ভব মোটা গলা লোকটার। বিমান তাড়াতাড়ি বসে পড়ল, যাতে তাকে দেখতে পাওয়া না যায়। রাগের চোটে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, একদিন সে পৃথিবী থেকে সব কাকদের ধ্বংস করবে।

নিচের লোকটা হেঁড়ে গলায় আবার চিৎকার করল, 'কী হচ্ছে কি? অ্যাঁ? কী হচ্ছে কি? বিমান টপ করে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

কাকে যে-ভাতে মুখ দিয়েছে, সে-ভাত আর খাওয়া যায়না। সবটা ফেলে দিয়ে নতুন থালায় আবার তাকে ভাত দেওয়া হল। কিন্তু মাছ আর নেই। মাছ ছাড়া বিমান মোটেই ভাত খেতে পারে না। সুতরাং আবার মাছ ভাজা হচ্ছে। কলেজের দেরি হয়ে গেল বিমানের। একটা ক্লাস করা হবে না।

বসবার ঘরে বাবা সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলছিলেন। নিশ্চয়ই কোনও জরুরি কথা, কেননা, বাবা কখনও অফিসে যেতে দেরি করেন না। বিমানকে দেখে বাবা বললেন, 'তুই এখন কলেজে যাসনি? তা হলে আমার একটা কাজ করে দে তো! একবার ব্যাঙ্ক থেকে ঘুরে আয়, আমার আজ বেরুতে দেরি হবে।'

বাবা বিমানকে একটা এক হাজার টাকার চেক লিখে দিয়ে বললেন, 'এটা তুলে এনে তুই আমাকে পৌঁছে দিয়ে তারপর কলেজে যা। টাকাটা সাবধানে রাখবি কিন্তু। বাসে-ট্রামে উঠিস না। হেঁটেই আসিস বরং।'

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা-টোলার ব্যাপারগুলো বাবা নিজেই করেন, বিমানকে কখনও যেতে হয় না। ওই লোকটা না এলে বাবা অফিসে বেরিয়ে যেতেন। কাকটা ভাতে মুখ না দিলে বিমানও কলেজে চলে যেত এতক্ষণে — তা হলে আর তাকে ব্যাঙ্কে যেতে হত না।

চেকটা সাবধানে বুক-পকেটে রেখে বিমান বাসেই উঠল। আসবার সময় না-হয় টাকাটা নিয়ে হেঁটেই আসবে। অবশ্য তখন বাসে ফিরলেও ক্ষতি নেই। টাকাটা কি কেউ বিমানের কাছ থেকে কেড়ে নেবে নাকি? বাড়ি থেকে বাসের চারটে স্টপ দূরেই ব্যাঙ্ক।

যাক, ব্যাঙ্কে আজ বেশি লোকের ভিড় নেই। বিমান চেকটা জমা দিয়ে একটা পেতলের চাক্‌তি হাতে নিয়ে বসে রইল। আরও কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছে। সবাই গম্ভীর। ব্যাঙ্কে যারা টাকা জমা দিতে কিংবা তুলতে আসে, তারা সবাই গম্ভীর হয়েই থাকে, বিমান আগেও লক্ষ করেছে।

একজন মোটা মতন ভদ্রমহিলা শুধু কথা বলছেন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। তাঁর চেকে সই মেলেনি। মহিলা বেশ রেগে-মেগে বলছেন, 'বাঃ, আমার নিজেরই সই, অথচ মেলেনি, তার মানে কি?'

কাউন্টারের লোকটা বলল, 'মিলছে না, তা আমি কি করব বলুন! তিনবার সই করলেন, তিনটেই অন্যরকম!'

মহিলা বললেন, 'তা হলে আমার টাকা কি অন্য লোকে তুলবে? যদি কোনদিনই আমার সই না মেলে?'

বিমান ভাবল, ভদ্রমহিলা বোধহয় আগে খুব রোগা ছিলেন। তখন তাঁর সই অন্যরকম ছিল।

এই সময় বিমানের নম্বর ডাকা হল। পেতলের চাক্‌তিটা ফেরত দিয়ে বিমান টাকাগুলো নিয়ে গুনছে, ঠিক তখনই কাণ্ডটা ঘটল।

একটা প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল, 'আরে ইয়ে কেয়া হ্যায়? ছোড় দো.... বিষেণ সিং, বিষেণ সিং.... বড়েবাবু, বড়েবাবু, হোঁশিয়ার - আঁক্‌....'

চিৎকারটা এল দরজার কাছ থেকে। বিমান সেখান থেকে অনেকটা দূরে। বিমান টাকাগুলো মুঠোয় চেপে ধরে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, একজন লম্বা চেহারার লোক

ব্যাঙ্কের দারোয়ানের হাতের বন্দুকটা চেপে ধরেছে আর দারোয়ান ওই রকম চ্যাঁচাচ্ছে। তারপরেই মুখে রুমাল বাঁধা আর একজন লোক একটা লোহার ডান্ডা দিয়ে মারল দারোয়ানের মাথায়। দারোয়ানটি শেষ মুহূর্তে বন্দুকটা প্রায় ছাড়িয়ে এনেছিল, কিন্তু মাথায় ডান্ডার বাড়ি খেয়ে সে আর কিছুই করতে পারল না, ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

এর মধ্যেই দরজার কাছে আরও দু'জন লোক এসে দাঁড়িয়েছে, দু'জনের হাতেই রিভলবার। তাদের চোখের তলা থেকে মুখের সবটা একটা কালো কাপড়ে ঢাকা। আগের দু'জনের মুখও ওইরকম ঢাকা ছিল।

রিভলবার ধরা লোক দুটির মধ্যে একজন কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। একটু নড়লেই খতম করে দেব!'

সবাই ছবির মানুষের মতন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু মোটা মহিলা বলে উঠলেন, 'ওরে বাবারে! ওরে বাবারে!'

তারপর একজনের রিভলবারের মুখ তাঁর দিকে ফিরতেই তিনি আবার বললেন, 'না, না, চুপ করছি! চুপ করছি!'

বিমানের টাকা গোনা আর হল না। সব টাকা একসঙ্গে প্যান্টের পকেটে ভরে ফেলল। তারপর দাঁড়াল দেওয়াল ঘেঁষে। তার বুকটা অসম্ভব জোরে কাঁপছে। ডাকাতরা কি তার টাকাটাও কেড়ে নেবে?

রিভলবারধারী দু'জনের মধ্যে একজন চলে এল টাকার কাউন্টারের দিকে। আর একজন চলে গেল ভেতরে। সেখানে সে রিভলবারটা চারিদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে বলতে লাগল, 'কেউ নড়বে না, ম্যানেজার কই? ম্যানেজার? চাবি?'

লম্বা ডাকাতটা দারোয়ানের বন্দুকটা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছেই। লোহার ডান্ডাওয়ালা লোকটা পোস্ট অফিসের চিঠির থলির মতন একটা থলি নিয়ে এদিকে এল। কাউন্টারের দু'জন লোকই কাঁপতে কাঁপতে রাশি রাশি টাকা ভরে দিতে লাগল সেই থলির মধ্যে।

মোটা মতন মহিলাটি অসম্ভব ঘামছিলেন। হঠাৎ খুব জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'আমার হার্ট খুব উইক!' তারপরই ধপাস করে পড়ে গেলেন অজ্ঞান হয়ে—মাটিতে নয়, কাছাকাছি বেঞ্চির ওপর। বিমান নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল, সাহায্য করতে যেতে সাহস পেল না। তার নিজেরও বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে শব্দ হচ্ছে অনবরত। খুব যে ভয় পেয়েছে, তা নয়। খালি একটা উত্তেজনা,এর পর কি হবে? এর পর কি হবে?

এক মিনিট দেড় মিনিটের মধ্যে ডাকাতরা কাজ শেষ করে ফেলল। ব্যাঙ্কে সেদিন অনেক বেশি টাকা ছিল, তারা বোধহয় আগে থেকেই খবর পেয়েছিল। তারা হয়তো একথাও জানত যে, ব্যাঙ্কের দু'জন দারোয়ানের মধ্যে একজন সেই সময় থাকবে না।

ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী ভয় পেয়ে কিংবা যে-কারণেই হোক টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়েছিল। ডাকাতরা কাজ সেরে চলে যাবার সময় বিনা কারণেই তাকে কয়েকটা লাথি মেরে বলল, 'দূর কুত্তার বাচ্চা!'

বিমানের যেন মনে হল, এই গলার আওয়াজটা একটু-চেনা। কোনও চেনা লোকের নয়, একটু আগেই কোথায় যেন শুনেছে। খানিকটা আগে সে যখন কাকের দিকে ইঁট ছুঁড়ছিল, তখন রাস্তা থেকে যে লোকটা বলেছিল, 'কী হচ্ছে কি?' – অনেকটা সেই রকম।

ডাকাতরা দুদ্দাড় করে বেরিয়ে যাবার পরও কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ করে রইল হতভম্বের মতন। সবচেয়ে আগে কথা শোনা গেল সেই মোটা মহিলার। তিনি আসলে অজ্ঞান হননি। তাঁর গলায় সোনার হার ছিল বলেই তিনি অজ্ঞান হবার ভান করে সেটাকে লুকিয়েছিলেন। এবার চোখ খুলেই তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'পুলিশ! পুলিশ! শিগগির পুলিশে খবর দিন!'

তখন অনেকে মিলে ছুটল দরজার দিকে। বিমানও ছুটল। ডাকাতরা তখন একটা কালো রঙের গাড়িতে উঠছে। কয়েকজন রাস্তায় বেরিয়ে চেঁচাতে লাগল। বিমান কিন্তু রাস্তায় গেল না। সে দেখতে পেল দারোয়ানটা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে মাটিতে, মাথা দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত বেরুচ্ছে। এক্ষুনি রক্ত বন্ধ না করলে লোকটাকে বাঁচান যাবে না। অথচ তাকে এখন কেউ দেখছেই না।

বিমান সেখানেই বসে পড়ে পকেট থেকে রুমালটা বার করে চেপে ধরল লোকটির মাথায়। লোকটি শব্দ করল, 'ওহ্!' যাক। লোকটি তাহলে এখনও বেঁচে আছে। একে এক্ষুনি এখান থেকে সরান দরকার। ব্যাঙ্কে যদি ফার্স্ট এডের কিছু জিনিসপত্র থাকে–

বিমান আর কিছুই করার সুযোগ পেল না। যে-সব সাহসী লোকেরা ডাকাতদের তাড়া করে রাস্তায় ছুটে বেরিয়েছিল, তারা আবার হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে এল। দারোয়ানের শরীরটা মাড়িয়ে, বিমানকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তারা জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। বিমান উঠে দাঁড়াতেও পারল না। বাইরে দুম দুম করে দুটো শব্দ হল। তারপর একটা বোমা এসে লাগল বিমানের গায়ে।

বিমানও ঢলে পড়ল দারোয়ানের পাশে।

২

বিমান ব্যাঙ্ক থেকে অনেকক্ষণ ফিরছে না বলে তাঁর বাবা এক সময় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পাটনা থেকে একজন লোক একটা জরুরি খবর এনেছে। আজ রাত্রেই তাঁকে জরুরি কাজে পাটনা যেতে হবে। বিমানকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে আনতে

বলা হল, তবু সে ফিরছে না কেন? ও কি ভুল বুঝল? টাকাটা নিয়ে ওখান থেকে কলেজে চলে গেল?

বাবা টেলিফোন করলেন ব্যাঙ্কে। কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। কেউ টেলিফোন ধরেছেই না, ব্যাপার কি? বাবা ব্যস্ত হয়ে ছটফট করছেন, নিজেই বেরুবেন ভাবছেন। এমন সময় হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এল— এক্ষুনি চলে আসুন।

বিমানের মাথা আর পুরো হাতখানা জুড়ে বিরাট ব্যান্ডেজ। ভাল করে জ্ঞান ফেরেনি। মাঝে মাঝে চোখ খুলে কিছু একটা বলতে চাইছে, আবার ঢলে পড়ছে।

বাবা, মা, ছোট মাসি, জামাইবাবু বিমানের খাট ঘিরে বসে রইলেন। ডাক্তার এসে বলে গেলেন, চিন্তার কিছু নেই, তবু শান্ত হতে পারছেন না ওঁরা।

চোখ-বোজা অবস্থাতেই বিমান কী যেন বলছে বিড়বিড় করে। তারপর চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজছে।

মা ঝুঁকে এসে বললেন, 'কী রে, খোকন? কষ্ট হচ্ছে?'

বিমান বলল, 'না।'

বাবা বললেন, 'বিশেষ কিছু হয়নি। ডাক্তার বলেছেন, দু'এক দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবেন।'

বিমান আবার ঠোঁট নেড়ে কী যেন বলতে চাইল। তাকে দেখে মনে হয়, খুব চিন্তিত।

বাবা বললেন, 'আমাদের টাকাটা সবটাই পাওয়া গেছে, তোর প্যান্টের পকেটে ছিল।'

বিমান এবার পরিষ্কার ভাবে বলল, 'সে কোথায়?'

'কে? কে?'

'সেই লোকটা?'

'কোন লোকটা?'

'সেই লোকটা। যে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল?'

মা বলল, 'আমরাই তো দাঁড়িয়ে আছি। আর ডাক্তারবাবু এসেছিলেন দু'বার।'

বিমান মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

বাবা-মা-ছোটমাসি-জামাইবাবু পরস্পরের দিকে চিন্তিতভাবে তাকালেন।

বিমান একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, 'ব্যাঙ্কের সেই দারোয়ান!'

এই সময় নার্স এসে বকুনি দিয়ে বলল, 'আপনারা পেশেন্টকে দিয়ে এত কথা বলাচ্ছেন কেন? এখন ঘুমোতে দিন। আবার বিকেলে আসবেন। আমি এখন ওষুধ খাওয়াব।'

ওষুধ খেয়ে বিমান আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বাবা-মায়েরা আর একটু অপেক্ষা করে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারও এসেছিলেন বিমানকে দেখতে। তিনিও বিমানের সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারলেন না, দূর থেকে দেখে গেলেন। তারপর বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।

ম্যানেজার বললেন, 'একটা ব্যাপারে আপনার খুশি হওয়া উচিত। এরকম ছেলে আজকাল খুব কম দেখা যায়।'

বাবা চুপ করে রইলেন।

ম্যানেজার আবার বললেন, 'ব্যাঙ্কের দারোয়ানটা মাটিতে পড়েছিল, মাথা দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত বেরুচ্ছে—কেউ তাকে দেখেনি। সবাই নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। তখন আপনার ছেলেই তাকে বাঁচাতে গিয়েছিল। এমন সাঙঘাতিক ডাকাতির পরেও কি কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারে? আমার তো ভয়ে হাত-পা এমন কাঁপছিল...'

'ক'জন ডাকাত ছিল?'

'চারজনকে তো দেখলুম, আরও ছিল কিনা কে জানে। দু'হাতে বোমা আর স্টেনগান—দেখলেই গা ঠান্ডা হয়ে যায়। একটা দারোয়ান বিষেণ সিং আবার সেই সময়েই দোকানে গিয়েছিল খৈনি না কি কিনতে, একটা মোটা দারোয়ান, তাও হাতে মান্ধাতার আমলের বন্দুক।'

'কি হল সেই দারোয়ানের?'

'সেই কথাই তো বলছি। মাথাটা তার একেবারে ফাঁক করে দিয়েছে। আমরা যখন গেলাম, তখনও দেখলাম, আপনার ছেলে এক হাতে রুমাল দিয়ে দারোয়ানটার মাথা চেপে ধরে আছে। বোমাটা না লাগলে হয়তো....'

'দারোয়ানটা বেঁচে আছে তো?'

'নাঃ! হাসপাতালে আনবার আগেই... বলতে গেলে আপনার ছেলের হাতে মাথা রেখেই সে মারা গেছে! তবু তো বেচারি শেষ মুহূর্তে অন্তত একজনের সেবা পেয়েছিল।'

আটদিন বাদে বিমান হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। তার মাথার চোটটা বেশি কিছু না। শুকিয়ে এসেছে এরই মধ্যে। কিন্তু ডান হাত জুড়ে বিরাট প্লাস্টার করা। আরও অন্তত একমাস ওই রকম থাকবে।

ডাকাতরা সেদিন ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়েছে। আজও তাদের ধরা যায়নি। পুলিশ কোনও খোঁজই পায়নি।

ব্যাঙ্কের দারোয়ান বুধ সিং যে মারা গেছে, সে-কথা বিমানকে বেশ কিছুদিন জানান হয়নি। কারণ বিমান প্রায়ই তার কথা জিজ্ঞেস করত। হঠাৎ মনে আঘাত পেলে যদি ক্ষতি হয়, সেইজন্য তাকে বলা হয়েছিল, বুধ সিং ভাল আছে, তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে।

বাড়িতে আসবার পর একদিন ছোটমাসি সত্যি কথাটা বলে ফেলল। ছোট মাসি একদম মিথ্যে কথা বলতে পারে না কিনা!

খবরটা শুনে বিমান খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। বুধ সিং নামে এই দারোয়ানটার রক্তমাখা মুখটা তার চোখের সামনে ভাসে। দারুণ অবাক হবার মতন চোখ দুটো বড় বড় করে মেলেছিল লোকটা। ও কি ভেবেছিল তক্ষুনি মরে যাবে?

একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বিমান বলল, 'একটা আশ্চর্য ব্যাপার কি জান ছোট মাসি হাসপাতালে আমি যখন অজ্ঞান হয়েছিলাম, ঠিক অজ্ঞান নয়, একটু একটু জ্ঞান ছিল, সেই সময় চোখ মেলে একবার দেখলাম, ওই বুধ সিং আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে হাত জোড় করে বলল, বাবুজী, আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। আমি ভাবলাম, যাক, লোকটা তাহলে বেঁচে গেছে। কিন্তু লোকটা যদি মরেই গিয়ে থাকে, তা হলে আমি ওরকম দেখলাম কেন?'

ছোট মাসি বললেন, 'ওরকম হয়। অসুখের সময় কিংবা জ্বরের ঘোরে মানুষ অনেক সময় ওরকম স্বপ্ন দেখে।'

'স্বপ্ন নয়, চোখ মেলে দেখেছি।'

'তুই ভাবছিস তাই! আসলে স্বপ্নই দেখেছিলি।'

'এ আবার কী অদ্ভুত স্বপ্ন। একটা লোক মরে গেছে, আর স্বপ্নে দেখলাম, সে এসে বলছে, আমি বেঁচে গেছি!'

'স্বপ্নে কত অদ্ভুত ব্যাপার হয়। তেকে আর ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

বিমান আবার চোখ বুজল। আবার সে দেখতে পেল বুধ সিং-এর রক্তমাখা মুখটা। ইস্,লোকটা এমনি এমনি মরে গেল! তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়েস ছিল মাত্র, ভালমানুষ ধরনের চেহারা। লোকটা কোনও দোষ করেনি কারুর কাছে, কলকাতায় চাকরি করতে এসেছিল, অকারণে প্রাণটা চলে গেল। এর কোনও মানে হয়?

কয়েকদিন বাদে বিমান বুধ সিংয়ের কথা আস্তে আস্তে ভুলে যেতে লাগল। এখন তার বেশি চিন্তা নিজের ডান হাতখানা নিয়ে। হাতটা পুরোপুরি সারবে তো? বিমান খুব ভাল সাঁতার কাটে। ইন্টার-কলেজ সুইমিং-এ সে গত বছরেও চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এ বছর বাঙ্গালোর কমপিটিশনে তার যাবার কথা। তার দেরি আছে অবশ্য, কিন্তু হাতটা পুরোপুরি না সারলে সে সাঁতার কাটবে কি করে?

প্লাস্টার করা হাতখানা দারুণ ভারি। মাঝে মাঝে ভেতরটা চুলকোয়। কিন্তু চুলকোবার তো কোনও উপায় নেই। খুব খারাপ লাগে তখন। তা ছাড়া বাঁ হাতে চামচ দিয়ে ভাত খেতে হয়, তাও কি ভাল লাগে কারুর। রাগে দুঃখে বিমানের মন-মেজাজ বিগড়ে থাকে। সে কি কোনও দোষ করেছিল? শুধু-শুধু কয়েকটা ডাকাত তার হাতটা ভেঙে দিয়ে যাবে? ডাকাতরা কি যা খুশি তাই করবে নাকি?

বারান্দায় একটা কাক বিশ্রী গলায় ডাকছে কা-কা করে। কিন্তু বিমান কাকদের এখন অনেকটা ক্ষমা করে দিয়েছে। এখন তার ইচ্ছে করে, পৃথিবী থেকে সব ডাকাতদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে।

এক মাস বাদে বিমানের হাতের প্লাস্টার কেটে ফেলা হল। কী বিশ্রী হলদেটে রং হয়ে গেছে হাতটার। জোর যেন কমে গেছে অনেকখানি। একবার গরম জলে একবার ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা হল হাতটা। এই রকম বেশ কয়েকবার। তারপরে মনে হল আস্তে আস্তে জোর ফিরে আসছে। সেদিন ভাত খেতে বসে বিমানের মনে হল, যেন সে এক যুগ বাদে আবার নিজের হাতে মাছের কাঁটা বেছে খাচ্ছে।

কিন্তু সাঁতার না কাটলে বোঝা যাবে না, সত্যিই হাতের সবটা জোর ফিরে এসেছে কিনা। পরের দিনই বিমান সাঁতার কাটতে গেল।

বাড়ির খুব কাছেই লেক। ভোরবেলাতেই অনেকে সাঁতার কাটতে আসে। অনেকেই বিমানকে চেনে। বিমান কিন্তু কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা বলল না। আগে তাকে একলা-একলা সাঁতার কেটে দেখতে হবে, তার ফরম ঠিক আছে কিনা।

জলে নেমে বিমান দেখল তার কোনও অসুবিধে হল না। হাত দুটো ঠিকই চলছে। তবে স্পিড আগের মতনই আছে কিনা সেটা এক্ষুনি বোঝা যাবে না।

ছোট লেকটাকে দু-তিনবার এপার ওপার করা বিমানের পক্ষে কিছুই না। আগে সে প্রত্যেকদিনই করেছে। আজও বিমান খুব সহজভাবে এপারে চলে এল। তারপর একটুও বিশ্রাম না নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। খানিকটা এসেই কিন্তু খুব ক্লান্ত লাগল। মনে হচ্ছে যেন ডান হাতটা অসাড় হয়ে আসছে। এবার আর পার হতে পারবে না। এখনও অনেকটা। ফিরে যাবে?

ঠিক তখনই কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'বড়েবাবু, বড়েবাবু, হোঁশিয়ার।'

বিমান চমকে ঘাড় ফেরাল। কে চিৎকার করল ওরকমভাবে? লেকের এদিকটায় তো কোনও লোক নেই! অথচ বিমান পরিষ্কার শুনেছে। গলার আওয়াজটা কার মতন? কার মতন! ঠিক ব্যাঙ্কের দারোয়ান বুধ সিংয়ের মতন। কে এখানে ওইরকমভাবে চেঁচাবে? এখানে তো কেউ নেই!

বিমানের সারা শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল।

বিমানের এক মাসতুতো দাদা পুলিশে কাজ করে। তার নাম প্রিয়ব্রত দত্ত। মাঝে মাঝে আসে এ-বাড়িতে। পুলিশে কাজ করলেও প্রিয়ব্রত কবিতা লেখে, আর ভাল গান করে। প্রিয়ব্রত এ-বাড়িতে এলে কবিতা আবৃত্তি করে ও গান গেয়ে একেবারে জমিয়ে দেয়।

সেদিন প্রিয়ব্রত এসেছে এ-বাড়িতে। বিমান খানিকক্ষণ বিদ্রূপ করে বলল, 'তোমরা পুলিশরা কী! এখনও ডাকাতদের ধরতে পারলে না?'

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রিয়ব্রত বলল, 'ও ঠিক ধরা পড়ে যাবে!'

বিমান বলল, 'ছাই ধরা পড়বে! দেড় মাস হয়ে গেল। সব টাকা ওরা এতদিনে খরচ করে ফেলেছে!'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ করা কি সোজা কথা! তা ছাড়া ওদের মধ্যে একটা ঝগড়া লাগবেই।'

'কেন, ঝগড়া লাগবে কেন?'

'যারাই দল বেঁধে ডাকাতি করে, তারাই টাকার ভাগাভাগির সময় ঠিক ঝগড়া করে। অনেকবার দেখা গেছে।'

'কিন্তু চারজন ডাকাত যদি টাকাগুলো সমান ভাগে ভাগ করে নেয়?

'তা হয় না। প্রত্যেকেই ভাবে সে অন্যদের থেকে বেশি সাহস দেখিয়েছে, তাই সে বেশি টাকা পবে। এর পরেই ঝগড়া লাগে। পাপের টাকা কি ভালভাবে ভোগ করা যায়?'

বিমান বলল, 'এসব তোমাদের পুরনো থিয়োরি। আজকালকার ডাকাতরা অনেক বেশি চালাক। যাই বল, তোমাদের ক্যালকাটা পুলিশ আজকাল আর খুনি বা ডাকাতদের ধরতে পারে না। শুধু পারে ছাত্রদের মিছিলের ওপর লাঠি চালাতে!'

প্রিয়ব্রত হেসে উঠল। তারপর বলল, 'আজকাল আর সে-যুগও নেই। যাকগে, ওসব কথা, তোর হাতটা সেরে গেছে পুরোপুরি? মার তো আমার কাঁধে একটা ঘুসি. দেখি কি রকম জোর হয়েছে!'

বিমান ডান হাতটা মুঠো করে একটা দারুণ ঘুসি কষালো। প্রিয়ব্রত একটুও নড়ল না। একটা গাছের মতন স্থির হয়ে রইল। বিমান একটু অবাক হয়ে গেল। তাহলে কি তার ডান হাতে সত্যিই জোর কমে গেছে? আবার সে বাঁ হাতে একটা ঘুসি ঝাড়ল। এবারেও সে প্রিয়ব্রতকে একটুও টলাতে পারল না।

প্রিযব্রত মিটিমিটি হাসছে। বেশ লম্বা চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, পাঞ্জাবি আর পা-জামা পরা অবস্থায় তাকে একটুও পুলিশের মতন দেখায় না, কবি-কবিই মনে হয়। কিন্তু তার গায়ে অসম্ভব জোর! মাস্‌লগুলো লোহার মতন শক্ত।

প্রিয়ব্রত বলল, 'এবার আমি একটা মারব?'

বিমান পা দুটো ফাঁক করে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে বলল. 'মারো!'

কী অসম্ভব তাড়াতাড়ি হাত চালায় প্রিয়ব্রত। ঘুসি খেয়ে বিমান একেবারে ছিটকে পড়ে গেল ঘরের কোণে। অবাক হয়ে বলল, 'এ কি প্রিয়দা, তুমি যে আমাকে মেরে ফেলেছিলে আর একটু হলে!'

প্রিয়ব্রত এগিয়ে এসে বিমানের হাত ধরে টেনে তুলে বলল, 'আর পুলিশের নিন্দে করবি?'

বিমান বলল, 'শুধু গায়ের জোর থাকলেই পুলিশ হওয়া যায় না। একটু বুদ্ধিও থাকা দরকার।'

প্রিয়ব্রত হাসছে। দরজার দিকে একবার চেয়ে দেখল, বিমানের বাবা কাছাকাছি আছেন কিনা। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'দেখিস, ওই ডাকাতগুলোকে শেষ পর্যন্ত আমিই ধরব।'

বিমান এবার উৎসাহিত হয়ে বলল, 'সত্যি প্রিয়দা, তোমার ওপরেই এই কেসটার ভার পড়েছে নাকি?'

'একটা স্পেশাল স্কোয়াড তৈরি করা হয়েছে। আমিও তার মধ্যে আছি।'

'আচ্ছা, এই ধরনের ডাকাতিগুলো থেকে কী সূত্র পাও তোমরা? ডাকাতদের মুখ কেউ দেখেনি, ডাকাতরা কিছু ফেলেও যায়নি, কোনও সূত্রই নেই, কি করে ধরবে?'

'তবু ঠিকই ধরা পড়ে।'

'কী করে সূত্র পাও, বল না! ওরা যদি ডাকাতি-টাকাতি একদম ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক সেজে যায়, কি করে কলকাতার এত লোকের মধ্য থেকে খুঁজে বার করবে?'

'কোনও ডাকাতই আর বাকি জীবনে পুরোপুরি সাধারণ মানুষ হতে পারে না। আমাদের ইনফর্মার ছড়ান আছে বিভিন্ন পাড়ায়। কোথাও যদি দেখা যায় কোনও হঠাৎ-নবাব দু'হাতে টাকা খরচ করছে, তাহলেই ইনফর্মাররা এসে আমাদের খবর দেবে।'

'যদি তারা কলকাতাতেই আর না থাকে?'

'তারও উপায় আছে। তাছাড়া বললুম না, ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়। হঠাৎ দেখা যাবে, দমদম বা বেলঘরিয়ার দিকে রেল-লাইনের পাশে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। কাগজে এরকম খবর দেখিস না?'

'হ্যাঁ, দেখি।'

'এ ওদের নিজেদের মধ্যে মারামারির ফল। দলের লোকেই একজনকে মেরে এরকম ফেলে রেখে যায়। সেই ডেড বডিটাকে সনাক্ত করতে পারলে বাকি দলটাকে ধরা শক্ত হয় না। তবে আমার মনে হয়, এদের সে সময় আসেনি।'

'কেন?'

'পরশুদিন আসানসোলে একটা গয়নার দোকানে ডাকাতি হয়েছে, নব্বুই হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। সেখানেও চারজন ডাকাত ছিল, মুখে কালো কাপড় বাঁধা। এরাও কোনোরকম ভুল করেনি। যাবার সময় বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়েছে। আমার মনে হয়, এটাও ওই একই দলের কাজ। এখন পর্যন্ত ওরা কোনও ভুল করেনি বলে ওদের সাহস আরও বেড়ে যাবে। ওরা আরও দু-এক জায়গায় চেষ্টা করবেই। তার আগে ওদের ঝগড়াও হবে না।'

বিমান উত্তেজিতভাবে বলল, 'তার মানে ওরা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তার কোনও মানে নেই। কলকাতা থেকে আসানসোল যাতায়াত করতে একদিনও লাগে না। কলকাতা শহরটাই লুকিয়ে থাকার পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা। আচ্ছা এবার বল তো ডাকাতগুলোকে দেখতে কি রকম ছিল?

এ সম্পর্কে বিমান অনেকবার বলেছে। তবু তার আপত্তি নেই। সে বলল, 'আমি ওদের মুখ দেখিনি। কাল কাপড় দিয়ে মুখ বাঁধা ছিল।'

প্রিয়ব্রত ফস করে পকেট থেকে একটা কালো কাপড়ের টুকরো বার করে নিজের মুখটা বেঁধে ফেলল। তারপর বলল, 'এই রকম?'

বিমান বলল, 'হ্যাঁ'।

'এখন আমাকে চেনা যাচ্ছে?'

'বাঃ আমি তো তোমাকে জানি বলেই...'।

'অন্য লোক আমাকে এখন চিনতে পারবে?'

'না।'

'আমার চোখের দিকে ভাল করে তাকা। তাকিয়েছিস? এবার—'

প্রিয়ব্রত মুখ থেকে কালো কাপড়টা সরিয়ে নিল। বিমানকে বলল, 'এবার দেখ তো চোখ দুটো চিনতে পারছিস কিনা? সব মানুষেরই চোখের গড়ন আলাদা।'

বিমান বলল, 'হ্যাঁ, চিনতে পারছি।'

'কোনও ডাকাতের চোখ এরকমভাবে লক্ষ করেছিলি?'

'সে-রকমভাবে তো দেখিনি। একজন ডাকাতই শুধু আমার খুব কাছ দিয়ে কাউন্টারের দিকে গিয়েছিল, তাকে দেখেছিলাম, কিন্তু আবার দেখলে চিনতে পারব কিনা জানি না।'

'যখনই সময় পাবি, সেই চোখ দুটোর কথা চিন্তা করবি! যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কোনও আলাদা কিছু—। যাক্, এবার বল, ওদের চেহারাগুলো কি রকম।'

'ওরা ছিল চারজন।'

'না, পাঁচজন।'

'পাঁচজন কে বলল? চারজনই তো ছিল।'

'উঁহু! একজন গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বসেছিল। ট্যাক্সি না, প্রাইভেট গাড়ি— তাহলে সেও ডাকাতদেরই দলের।'

'তাকে আমি দেখিনি।'

'তুই যাদের দেখেছিস, তাদের কথাই বল্।'

'যে ব্যাঙ্কের দারোয়ানের কাছ থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিচ্ছিল, সে বেশ লম্বা, চওড়াও কম নয়—বেশ বড়সড় চেহারা, মাথার চুল থাক-থাক করা। আর যে লোহার ডান্ডা দিয়ে মারল, সে বেশ মোটা মতন, কিন্তু খুব চটপটে, আর দু'জন, আর দু'জন.....'

'কি?'

'আর দু'জন সম্পর্কে কী বলব? এমনই সাধারণ চেহারা যেমন হয়। মুখ দেখতে পাইনি, বলবার মতন বিশেষ কিছু নেই।'

'বয়েস কত হবে?'

'তাও বলতে পারছি না। কেউ বুড়ো নয়, কেউ খুব বাচ্চাও নয়, এইটুকু বলতে পারি।'

'কারুর গলার আওয়াজে কোন রকম আলাদা কিছু?'

বিমান একটুক্ষণ চুপ করে রইল। ওদের মধ্যে একজনের গলার আওয়াজ তার একটু চেনা-চেনা মনে হয়েছিল। রাস্তায় যে-লোকটা বলেছিল 'কী, হচ্ছে কি'-অনেকটা সেইরকম। কিন্তু সেই লোকটাকেও তো বিমান দেখেনি। ইস্, কেন যে দেখেনি তখন! অবশ্য সেই লোকটা নাও হতে পারে।

বিমান বলল, 'গলার আওয়াজ একজনের বেশ গম্ভীর ধরনের। আর অন্যদের খুব সাধারণ যে রকম হয়।'

'ওদের গলার আওয়াজ শুনলে আবার চিনতে পারবি?'

'তা পারব বোধহয়।'

'গুড। তোকে আমাদের কাজে লাগতে পারে। তুই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলি কিনা! ব্যাটারা ধরা পড়বেই। যে-রকম ফাঁদ পাতা হয়েছে!'

'কি রকম ফাঁদ?'

'সে কথা আগে থেকে বলা যায় না। যাই হোক, তুই একটা কাজ করতে পারবি?'

'বল।'

'নিউ আলিপুরে ক্রেডিট ব্যাঙ্কের যে শাখাটা আছে, তুই সেটা চিনিস? চিনিস না? আমি ঠিকানা বলে দিচ্ছি, ম্যাপ এঁকে জায়গাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, তুই কাল সেখানে সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে যাবি। কাউন্টারে গিয়ে বলবি, তুই একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে চাস। ওরা যা কাগজপত্র দেবে, নিয়ে আসবি। শুধু একটু নজর রাখবি, কোন লোকের চেহারা, চোখ বা গলার আওয়াজ শুনে তোর চেনা মনে হয় কিনা। যদি সেরকম দেখতেও পাস তবু ওখানে কোনও কথা বলবি না। মনে থাকে যেন, ওখানে যাই ঘটুক না কেন, একটুও চমকে উঠলে চলবে না। একদম মুখ বুজে থাকবি। হয়তো ওখানে কিছুই হবে না। কি, পাক্কা?'

'হ্যাঁ। আমি ঠিক সময় যাব। কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। যদি তুমি এই ডাকাত দলের সন্ধান পাও—কিংবা এদের খোঁজে তোমাকে বাইরে যেতে হয়, তাহলে আমাকেও সঙ্গে নেবে।'

'সে দেখা যাবে!'



পরদিন নিউ আলিপুরে ক্রেডিট ব্যাঙ্ক খুঁজে পেতে বিমানের কোনও অসুবিধে হল না। ব্যাঙ্কটার কাছাকাছি এসেই তার বেশ উত্তেজনা হতে লাগল। এখানেও আজ একটা কিছু কান্ড হবে নাকি?

ব্যাঙ্কে ভিড় খুব কম। দরজার কাছে একজন গোঁফওয়ালা দারোয়ান বন্দুক হাতে নিয়ে টুলের ওপর বসে আছে। চোখে একটা ঝিমুনির ভাব। নিশ্চয়ই গাঁজা খায়। এই লোকগুলো ঠিকমতন পাহারা দেয় না বলেই তো ডাকাতরা সুবিধে পায়।

কাউন্টারের কাছে দু-চারজন লোক দাঁড়িয়ে। কারুকেই সন্দেহজনক মনে হল না। লোড শেডিং, তাই পাখা বন্ধ। ভেতরের লোকেরা জামার বোতাম খুলে খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া খাচ্ছে।

প্রিয়ব্রত যে রকম শিখিয়ে দিয়েছিল, সেই অনুযায়ী বিমান একটা কাউন্টারে গিয়ে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্ম চাইল। সেখানকার লোকটি দেখিয়ে দিল অন্য কাউন্টার। সেখানকার লোকটা আবার আর-একটি কাউন্টারে যেতে বলল। সেই কাউন্টারের লোকটি আবার চেয়ারে নেই তখন। বিমানকে অপেক্ষা করতে হল। তাতে তার অবশ্য আপত্তি নেই। সে তো সময় কাটাতেই এসেছে।

মাঝে মাঝে দু-একজন নতুন লোক ঢুকছে। কেউ টাকা জমা দিচ্ছে, কেউ তুলতে এসেছে। অস্বাভাবিক কিছুই নেই। একটা কালো চশমা-পরা লোককে দেখে একটু সন্দেহ হয়েছিল। লোড শেডিং-এর জন্য ভেতরটা বেশ অন্ধকার অন্ধকার মতন, তবু লোকটা কালো চশমা খুলছে না কেন? কিন্তু লোকটা বড্ড রোগা, এত রোগা লোক কি ডাকাত হতে পারে? তা ছাড়া লোকটা খক্‌খক্‌ করে কাসছে। কেসো রুগীর পক্ষে চোর-ডাকাত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তবু লোকটা ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত বিমান তাকে লক্ষ করে গেল।

একটু পরেই বিমান তার কাগজপত্র পেল, কোথায় কোথায় সই করতে হবে, তাও দেখে নিল। এরপর আর তার অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। তাহলে লোকেরা তাকেই সন্দেহ করবে। কাল টাকা জমা দিয়ে যাব বলে সে আস্তে আস্তে এগল দরজার দিকে।

দারোয়ানটি টুলে বসে এখন সত্যিই ঢুলছে। পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। বিমান সেখান থেকে যাবার সময় লোকটা আরও পা ছড়িয়ে দিল। ধাক্কা লেগে বিমান আর-একটু হলে উল্টে পড়ে যাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে তাকাতেই লোকটা মুচকি হাসল।

সেই হাসি দেখেই চিনতে পারল বিমান। এ তো প্রিয়ব্রতদা! দারুণ ছদ্মবেশ ধরেছে তো। একেবারে অবিকল বিহারী দারোয়ানের মতন।

এই সময় কথা বলা উচিত কি উচিত না, বুঝতে না পেরে বিমান সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে পকেটে হাত দিয়ে খুচরো পয়সা গুনতে লাগল। প্রিয়ব্রতদা বিড়বিড় করে হিন্দিতে কী যেন বলছে, বিমান বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ বিমান 'আঃ!' শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল। তার শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। কয়েকজন লোক অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। বিমান দরজার আর-এক দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। সেখানে বন্দুক ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে আছে

আর-একজন দারোয়ান। একটু আগেও বিমান তাকে দেখেনি। সেই দারোয়ানটি আর কেউ নয়, বুধ সিং। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার মাথা থেকে, তবু সে বন্দুকটা চেপে ধরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, যেন খুঁজছে ডাকাতদের।

প্রিয়ব্রতদা বিমানের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া হুয়া বাবুজী?'

বিমান কথা বলতে পারছে না। আস্তে আস্তে বুধ সিং-এর শরীরটা ধোঁয়ার মতন মিলিয়ে যেতে লাগল। দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল বিমানের গা থেকে।

প্রিয়ব্রতদা বিমানের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগল, 'বাবুজী, আপকা তবিয়ত আচ্ছা নেহি?'

বিমান আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু এখনও বুকের ভেতরটা কাঁপছে। তবু প্রিয়ব্রতদার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কুছ নেহি হুয়া, ঠিক হো গিয়া!'

আর দেরি না করে বিমান বেরিয়ে এল রাস্তায়। একবার পেছন ফিরে দেখল, প্রিয়ব্রতদা তখন তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে হাতের ইশারা করে জানিয়ে দিল সব ঠিক আছে।

আস্তে আস্তে বিমান হাঁটতে লাগল বাস-রাস্তার দিকে। পা-দুটো খুব দুর্বল লাগছে। বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে এখন। এই অবস্থায় কি ভিড়েব বাসে ওঠা যাবে?'

বিমান একটা রিকশা নিল। কিন্তু তাতেও বেশি দূর যাওয়া গেল না। রাস্তাটায় নতুন খোয়া ফেলেছে, এখন পিচ ঢালাই হয়নি। রিকশাটা অনবরত লাফাচ্ছে। রিক্সওয়ালারও কষ্ট হচ্ছে খুব। খানিকটা গিয়েই একটা পার্ক দেখতে পেয়ে সেখানে নেমে পড়ল।

পার্কের একটা খালি বেঞ্চে বিমান বসে রইল অনেকক্ষণ। পুরো ঘটনাটা সে আবার চিন্তা করতে লাগল। সত্যিই কি সে ভূত দেখেছে? ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? তবে সে প্রায়ই বুধ সিংকে দেখতে পাচ্ছে কেন! আজ একেবারে দিনের বেলায়, এত কাছ থেকে-সে স্পষ্ট দেখেছে। কিন্তু আর তো কেউ দেখেনি। সে একাই শুধু দেখছে কেন? যদিও বুধ সিং তার কোনও ক্ষতি করেনি, কিন্তু একটা মরা মানুষেব গলার আওয়াজ শোনা কিংবা তাকে চোখের সামনে দেখা কি চাট্টিখানি কথা! ভয় পেতে না চাইলেও ভয় হয়!

কিংবা এটা কি চোখের ভুল? সে বারবাব ভুল দেখছে? আগে তো কক্ষনও এরকম হয়নি! না, এবার পুরো ব্যাপারটাই মাথা থেকে মুছে ফেলতে হবে? ডাকাতদের ধরা তো পুলিশের কাজ। সে কেন মাথা ঘামাতে যাবে।

বিমান এই কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপার ঘটল। সকালবেলা খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে মাঠটা কাদা হয়ে আছে। সেই জলকাদার মধ্যে কয়েকটা ছেলে ফুটবল খেলছিল অনেকক্ষণ ধরেই। এই সময় একটা ট্যাক্সি এসে থামল। তার থেকে প্যান্ট-শার্ট পরা একজন জোয়ান চেহারার লোক নেমে দাঁড়াতেই সামনের কাদায় থপাস্ করে এসে পড়ল ফুটবলটা। আর সেই কাদা ছিটকে লোকটার জামায় আর চোখে-মুখে লেগে গেল।

দৃশ্যটা দেখে বিমান হেসে ফেলেছিল। লোকটার মুখের চেহারা এমন বিচ্ছিরি হয়ে গেছে যে, না হেসে পারা যায় না।

লোকটা দারুণ রেগে গেছে। পার্কের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'এই, কী হচ্ছে কি? বদমাস ছেলে......'

সেই চিৎকার শুনে বিমান শিউরে উঠল। এই গলার আওয়াজ তার খুব চেনা। তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ঠিক এই কথা বলেই একটি লোক চেঁচিয়ে উঠেছি। ব্যাঙ্কের ডাকাতদের মধ্যেও একজনের গলা ঠিক এই রকমই ছিল না?

বিমান ভাল করে তাকিয়ে দেখল, ডাকাতদের একজনের চেহারাও ঠিক এই ধরনেরই ছিল, তার খুব মনে হচ্ছে এই লোকটাই। গলার আওয়াজ অবিকল এক। লোকটার মাথার চুলগুলো থাক থাক করা। বিমান আর দেরি করল না, তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে পার্কের রেলিং পার হয়ে সে লোকটার হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, চোর, চোর, চোর!'

লোকটা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপরই চেঁচিয়ে উঠল, কী হচ্ছে কি?'

এই কথাটা বোধহয় লোকটা মুদ্রাদোষের মতন যখন-তখন বলে। সে তার হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেও বিমান সেটা শক্ত করে ধরে আছে।

পার্কের ছেলেগুলো ফুটবলটা ফেরত নেবার জন্য রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যেন লোকটাকে ভ্যাঙাবার জন্য বলতে লাগল, 'কী, হচ্ছে কি? কী হচ্ছে কি?'

বিমান তাদের বলল, 'এ একটা ডাকাত! পুলিশ ডাকো, শিগগির পুলিশ ডাকো।'

লোকটা এতক্ষণে ভয় পেয়েছে মনে হল। বিমানকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করল। পারল না। তখন বিমানের মুখে একটা ঘুসি কষাল। সেই ঘুসিটা খেয়েই বিমান বুঝতে পারল, এরকম আর দুটো তিনটে খেলেই সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। বিমান লোকটার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের মুখ আড়াল করল। লোকটা সেই সুযোগে পালাবার চেষ্টা করতেই বিমান কাত হয়ে তার পায়ে মারল ল্যাং। লোকটা ধড়াম করে পড়ে গেল কাদার মধ্যে।

লোকটাকে ওঠবার কোনও সুযোগ না দিয়ে পার্কের দুটো ছেলে তার পিঠের ওপর উঠে লাফাতে লাগল। আর গানের সুরে চ্যাঁচাতে লাগল, কী হচ্ছে কি, কী হচ্ছে কি?'

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি তখনও দাঁড়িয়েছিল। সে অবাক হয়ে সব ব্যাপারটা দেখছে। বিমান খুব উত্তেজিতভাবে বলল, 'শিগগির শিগগির একটা পুলিশ ডাকতে হবে! আপ দেখিয়ে না!'

শিখ ড্রাইভারটি গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইল। যেন মন ঠিক করতে পারছে না। তারপর গোঁফে তা দিয়ে বলল, 'পুলিশ হামারা দোস্ত হ্যায় ক্যা?'

সেই লোকটা একটা কাদামাখা শুয়োরের মতন জোরজার করে উঠে পড়ল। এলোপাথাড়ি ঘুসি চালাতে লাগল। ছেলের দল তাতেও ভয় না পেয়ে লোকটাকে ঘিরে রইল। লোকটা তখন পকেট থেকে একটা ছুরি বার করল।

এতক্ষণ যাও বা সন্দেহ ছিল, এবার সব ঘুচে গেল। লোকটা তাহলে সত্যিই ডাকাত। ছুরি দেখেই ছেলেরা ভয় পেয়ে সরে গেল, বিমানও দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল ট্যাক্সির আড়ালে। লোকটা ট্যাক্সিওয়ালার দিকে ছুরিটা ঘুরিয়ে বলল, 'যানা হ্যায় কি নেহি?'

বিমান খুব আশা করেছিল, ট্যাক্সিওয়ালা বিরাট জোয়ান, সে নিশ্চয়ই লোকটাকে কাবু করে ফেলবে। পাঞ্জাবিরা কি একটা সামান্য ছুরি দেখে ভয় পায়?

কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা লোকটার কথা শুনে নির্বিকারভাবে বলল, 'ছোরি কা কেয়া বাত হ্যায়? যানা হ্যায় তো চলিয়ে!'

ডাকাতটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসতেই সেটা হুশ করে বেরিয়ে গেল। ছেলেরা কিছুটা রাস্তা সেটার পেছন পেছন দৌড়ে চোর, চোর, ডাকাত, ডাকাত বলে চ্যাঁচালেও কোনও লাভ হল না। রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা ছিল। আশেপাশের বাড়ির দু'একজন লোক বারান্দায় এসে দাঁড়ালেও কেউ সাহায্য করতে এল না। ট্যাক্সিটা চোখের আড়ালে চলে গেল।

দারুণ আফশোস হল বিমানের। ডাকাতটাকে হাতের মধ্যে পেয়েও ধরে রাখা গেল না। এত বড় কলকাতা শহরে একটা অচেনা লোককে দু'বার দেখতে পাওয়াই আশ্চর্যের ব্যাপার। আর কি কখনও ওর দেখা পাওয়া যাবে? লোকটার মুখ অবশ্য বিমান খুব ভাল করেই দেখে রেখেছে, আর কখনও ভুলবে না, কিন্তু তাতে লাভ কি? লোকটাও নিশ্চয়ই এবার থেকে সাবধান হয়ে যাবে। পকেটে সব সময় ছুরি নিয়ে ঘোরে, তার মানে সাংঘাতিক লোক।

একবার বিমান ভাবল, এক্ষুনি ব্যাঙ্কে ফিরে গিয়ে প্রিয়ব্রতদাকে সব কথা বলে। কিন্তু প্রিয়ব্রতদা যদি সব শুনে বকুনি দিতে শুরু করে? চোখের সামনে দিয়ে ডাকাতটা পালিয়ে গেল!'

পার্কের ছেলেগুলো বিমানকে ঘিরে ধরে একসঙ্গে সবাই মিলে কথা বলছে। বিমান কোনরকমে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে. সেখান থেকে সরে পড়ল।

৪

পরের দিন সকালেই প্রিয়ব্রত এসে হাজির। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কাল ওরকম করছিলি কেন? তোর শরীর খারাপ লাগছিল?' বিমান আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল যে, ভূতের ব্যাপারটা কারুকে বলবে না। দিন-দুপুরে কেউ কখনও ভূত দেখে? প্রিয়দা নিশ্চয়ই হাসবে। তাহলে ওটা চোখের ভুলই হবে। বুধ সিং

একেবারে বিমানের কোলের ওপর মাথা রেখেই মরে গিয়েছিল কিনা, সেইজন্যই ওকে ভোলা যাচ্ছে, না।

বিমান বলল, 'নাঃ, কিছু হয়নি, তোমাকে ওই রকম পোশাকে দেখে চমকে গিয়েছিলাম।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তুই এমন একটা ভাব করলি, যেন অজ্ঞান হয়ে পড়েই যাবি। যাক গে, তুই ব্যাঙ্কে সন্দেহজনক কারুকে দেখলি?'

'না। শোন না, তারপর কি হল!'

'কি হয়েছে?'

'একটা ডাকাতকে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলাম।'

'কি?'

বিমান তখন পার্কের পাশের ঘটনাটা সব বলল। শুনতে শুনতেই প্রিয়ব্রতর মুখটা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল, শেষ হবার পর সে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল। হতাশভাবে বলল, 'যাঃ তুই এরকম একটা কেলেংকারি করলি?'

বিমান বলল, 'কি করব! লোকটা ছুরি বার করল যে। নইলে আমরা সবাই মিলে লোকটাকে ধরে রাখতে পারতাম!'

'ওই রকমভাবে ডাকাত ধরে! এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেলি!'

'তা হলে কি করে ধরতাম বল?'

লোকটাকে ধরাই উচিত হয়নি!'

'ধরা উচিত হয়নি? এমনি-এমনি ছেড়ে দেব?'

'নিশ্চয়ই! আরে বুদ্ধুরাম, ওই রকমভাবে কেউ ডাকাত ধরে? তুই সব নষ্ট করে দিলি।' 'তাহলে আমার কি করা উচিত ছিল?'

'তোর উচিত ছিল লোককে কিছু না বলে ওর পেছন পেছন যাওয়া। লোকটা যখন ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল, তখন নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও বাড়িতে যেত। তোর উচিত ছিল সেই বাড়িটা দেখে আসা। একবার আস্তানাটা চিনতে পারলে দলসুদ্ধ সবাইকে ধরা যেত।'

বিমান একটু থতমত খেয়ে গেল। এ কথাটা তো ঠিক। অনেক বইতেই সে পড়েছে যে ডিটেকটিভরা অনেক সময় চোর-ডাকাতদের অনুসরণ করে, প্রথমেই ধরে না। অত বড় লম্বা-চওড়া লোকটাকে ধরার চেয়ে অনুসরণ করাই তো সুবিধের ছিল অনেক।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'এর পর এ পাড়ায় আর লোকটা আসবেই না। ওখানে যদি ওদের কোনও আস্তানা থেকে থাকত, সেটাও নিশ্চয়ই তুলে দিয়েছে।'

বিমান চুপ করে বসে রইল।

প্রিয়ব্রত বলল, 'যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে। চল, আমার সঙ্গে দমদম যাবি?'

'দমদমে, কেন?'

'ঘুঘুডাঙা রেল স্টেশন থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে।'

বিমান লাফিয়ে উঠল। উত্তেজিতভাবে বলল, চল, এক্ষুনি চল!'

ঝটপট প্যান্ট-শার্ট বদলে নিল বিমান। শু পড়ল। তারপরই যেই বেরুতে যাবে, সেই সময় বাবা ডাকলেন।

বিমানকে বাইরে যাবার পোশাকে তৈরি দেখে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস এখন?'

বিমান বেশ ভারিক্কিভাবে বলল, 'প্রিয়দার সঙ্গে দমদমে যাচ্ছি।'

বাবা প্রিয়ব্রতর দিকে তাকালেন অবাকভাবে। প্রিয়ব্রত বলল, 'সেই যে ...'

বাবা বললেন, 'সে-ব্যাপারে বিমান কি করবে? না, না, ওসব খুনে-ডাকাতদের ব্যাপারে বিমানের যাবার দরকার নেই।'

বাবা কোনও ব্যাপারে একবার 'না' বললে, আর 'হ্যাঁ' করান খুব শক্ত। বিমান একটু দমে গেল। এরকম একটা দারুণ কান্ড থেকে সে বাদ পড়ে যাবে!

প্রিয়ব্রত বলল, 'চলুক না,আমার সঙ্গেই তো যাচ্ছে, কোনও ভয় নেই।'

বাবা বললেন, 'তুমি পুলিশে কাজ কর, তুমি তো যাবেই। কিন্তু ও কেন পড়াশুনো ফেলে ছোটাছুটি করতে যাবে?'

'ওকে দরকার আমাদের। ও হয়তো লোকগুলিকে চিনতে পারবে।'

'ও কি করে চিনবে? লোকগুলোর মুখ ঢাকা ছিল। পুলিশের সঙ্গে বেশি ঘোরাঘুরি করলে ডাকাতরা যদি ওকেই চিনে ফেলে?'

'ঠিক আছে, আর কখনও যাবে না, আজকে শুধু যাক — আমি ডেপুটি কমিশনারকে বলে এসেছি যে, ওকে নিয়ে যাব।'

অনেক ঝোলাঝুলি করে প্রিয়ব্রত বাবাকে রাজি করাল। বাবা তবুও গজগজ করতে লাগলেন।

নিচে জিপ গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। প্রিয়ব্রত অন্যদিন এমনিই বাসে চেপে আসে কিংবা ট্যাক্সিতে। বিমানের একটু গর্ব-গর্ব ভাব হল। আজ পুলিশের জিপ এসেছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য।

গাড়িতে যেতে যেতে প্রিয়ব্রত বলল, 'তোর তো ডেড বডি দেখার অভ্যেস নেই, ভয়-টয় পাবি না তো?'

'না, ভয় পাব কেন?'

'আমরা তিনটে ব্যাঙ্কে ফাঁদ পেতে রেখেছি, ব্যাটারা পা দেবেই ঠিক।'

'তুমি রোজ দারোয়ান সেজে বসে থাক?'

'হ্যাঁ।'

বিমান হেসে ফেলল। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, হাসছিস যে?'

'গোঁফ লাগিয়ে তোমায় যা মজার দেখাচ্ছিল!'

প্রিয়ব্রত বলল, 'একবার একদল ডাকাতকে ধরবার জন্য আমি একমাস খবরের কাগজে হকার সেজেছিলাম। রোজ ভোরবেলা সাইকেলে চেপে একটা গলির সব বাড়িতে কাগজ দিতাম।'

'তারপর কি হল?'

'একটা বিশেষ বাড়ির ওপর নজর রাখতাম। দেখতাম, ভোরবেলা কারা সেই বাড়িতে আসে। সাধারণত ক্রিমিনালদের মিটিং ভোরের দিকেই হয়। সেবার এক ঝাঁকে এগারো জনকে ধরেছিলাম।'

গাড়ি এসে গেছে দমদমে। গাড়ি থেকে নেমে রেল লাইনের কাছে আসবার পর দেখা গেল দূরে ছোটখাট একটা ভিড় জমে আছে। আরও কয়েকজন পুলিশকেও দেখা যাচ্ছে। প্রিয়ব্রত বলল, 'যতদূর মনে হচ্ছে, আমাদের ডাকাতদের কেউ নয়। রেল-লাইনের পাশে সাধারণত স্মাগলারদের ডেডবডিই পাওয়া যায়।'

প্রিয়ব্রত অফিসের ডেপুটি কমিশনারও এসে গিয়েছিলেন। খুব লম্বা মতো একজন লোক, একদম পুলিশের মতন দেখতে নয়, হাসি-হাসি মুখ। কোমরে রিভলভার-টিভলভার কিছু নেই। প্রিয়ব্রত ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে বিমানের আলাপ করিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, 'চল, একবার দেখা যাক?'

ভিড় ঠেলে ওরা এগল। প্রিয়ব্রত দেখল দুটো পুলিশ-কুকুরও এসে গেছে। তাদের গলার চেন শক্ত করে ধরে আছে একজন, কুকুর দুটো জিব বার করে হা-হা করছে।

মৃতদেহটা রেল লাইনের পাশে গড়ান জায়গাটার পড়ে আছে কাত হয়ে। মনে হয়, কেউ যেন ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে একটা কালো কাপড় বার করে বিমানকে বলল, 'আমি ওর মুখের খানিকটা ঢেকে দিচ্ছি, তারপর দ্যাখ চিনতে পারিস কিনা!'

বিমান বলল, 'দাঁড়াও!'

বিমানের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেছে। গলা দিয়ে ঠিক আওয়াজ বেরুচ্ছে না। কোনোক্রমে বলল, 'এতো, সেই —'

প্রিয়ব্রত ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চিনতে পেরেছিস?'

বিমান বলল, 'এ তো সেই কালকের ট্যাক্সি ডাইভার।'

প্রিয়ব্রত অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'কি? ঠিক বলছিস?'

'হ্যাঁ। কোন ভুল নেই।'

ডেপুটি কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ ট্যাক্সি ড্রাইভার?'

প্রিয়ব্রত খুব সংক্ষেপে তাঁকে কালকের ঘটনাটা শোনাল।

ডেপুটি কমিশনার শিস দিয়ে উঠলেন। তখনও হাসি-হাসি মুখেই বললেন, 'তা হলে তো এরা সাধারণ ডাকাতের চেয়েও অনেক সাংঘাতিক ক্রিমিনাল। প্রিয়ব্রত, এই ছেলেটিকেও কিন্তু এবার থেকে সাবধানে রাখতে হবে!'

আরও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সেখানে থাকবার পর ওরা ফিরে এল গাড়ির কাছে। ডেপুটি কমিশনার বললেন, 'প্রিয়ব্রত, তুমি আর বিমান আমার গাড়িতেই এস। আমি তোমাদের নামিয়ে দিচ্ছি।'

ডেপুটি কমিশনারের গাড়িটা জিপ নয়, অ্যামবাসাডর তারই ভেতরে ওয়ারলেস ফিট করা। কারা যেন মাঝে মাঝে ইংরেজি সিনেমার লোকেদের মতন জড়ান ইংরেজিতে কি সব বলে, গাড়ির কেউ তা মন দিয়ে শোনেও না, উত্তরও দেয় না। ড্রাইভারের পাশে আর একজন লোক সব সময় চুপ করে বসে থাকে।

গাড়ি খানিকটা দূর চলার পর ডেপুটি কমিশনার বললেন, 'শুধু একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ওরা খুন করল কেন?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'স্যার, লোকটির দেহে কিন্তু কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না।'

'লোকটার জিবটা বেরিয়ে এসেছে অনেকখানি। মনে হল খুব ভয় পেয়েছিল।'

'অত বড় চেহারার একজন শিখ ড্রাইভার কিসে ভয় পাবে? গলা টেপার কেস হতে পারে।'

'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ড্রাইভারকে মারল কেন?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'নিশ্চয়ই ওরা ট্যাক্সিটা চুরি করে পালিয়েছে!'

'তা তো হতেই পারে। সেটা একটা সোজা উত্তর। কিন্তু ডাকাতি করার সময় ওরা ট্যাক্সিতে আসেনি, কালো রঙের গাড়িতে এসেছিল — অন্য ডাকাতিগুলোতেও ওরা গাড়ি এনেছে। তার মানে ওদের গাড়ি আছে।'

'সেগুলোও চোরাই গাড়ি হতে পারে।'

'তা তো হতেই পারে। কলকাতা শহরে রোজ তের-চোদ্দখানা গাড়ি চুরি হয়।'

বিমান জিজ্ঞেস করল, 'ডাকাতরা সব সময় কালো রঙের গাড়ি চেপেই আসে কেন?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তার কারণ চট্ করে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে পারে। শহরে এত অসংখ্য কালো গাড়ি আছে যে, কোনও একটা কালো গাড়ি দেখে কেউ কিছু মনে রাখতে পারে না।'

ডেপুটি কমিশনার বললেন, 'আচ্ছা ভাই বিমান, তুমি একটা জিনিস বলতে পারবে? কলকাতায় দু-রকম ট্যাক্সি চলে, এক রকম হচ্ছে হলদে-কালো রঙের আর এক-রকম শুধু হলদে। ওই ট্যাক্সিটা কোন রঙের ছিল?'

'শুধু হলদে।'

'নম্বরটা কি দেখেছিলে?'

'নম্বর তো দেখবই। ডাকাতটা ট্যাক্সি করে পালাল, আর আমি তার নম্বর দেখব না?'

প্রিয়ব্রত চিৎকার করে বলল, 'তা হলে এতক্ষণ বলিসনি কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম, ডাকাতটা তো একটু বাদেই ট্যাক্সি থেকে নেমে যাবে, তাই ওই নম্বরটা আর কোনও কাজে লাগবে না।'

'সব কিছুই কাজে লাগে।'

ডেপুটি কমিশনার মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মনে আছে নম্বরটা?'

'ডব্লু-বি-টি জিরো টু ফাইভ সেভেন।'

ডেপুটি কমিশনার একটু ঝুঁকে সামনের সিটে চুপ করে বসে থাকা লোকটিকে নম্বরটা বলে দিলেন। সেই লোকটি নম্বরটা এমনভাবে বিড়বিড় করতে লাগল, যেন সেটা মুখস্থ করছে। লোকটা নিশ্চয়ই গবেট, নইলে সামান্য একটা গাড়ির নম্বর অতবার মুখস্থ করতে হয় কেন?'

ডেপুটি কমিশনার প্রিয়ব্রতকে বললেন, 'সকালে চা খেয়েছ? নইলে রাস্তার ধারের কোনও দোকান থেকে ...'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আমরা খেয়েছি। আপনি যদি খেতে চান ....'

আমি তো সকালে পাঁচ কাপ চা খাই। চার কাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন থাক।'

প্রিয়ব্রতকে খুব উত্তেজিত দেখালেও ডেপুটি কমিশনার আগের মতনই শান্ত। ঠোঁটে হাসি লেগে আছে। তিনি মনে মনে কিছু একটা হিসেব করে বললেন, 'পর পর যে কটা ডাকাতি হয়েছে, সব গুলোই যদি এই একটা দলই করে থাকে, তা হলে ওরা অন্তত আট লাখ টাকা পেয়েছে। কম টাকা নয়। এত টাকা নিয়ে লোকগুলো করবে কি?'

এই বলে তিনি আপন মনে হাসতে লাগলেন।

প্রিয়ব্রত বলল,'এই ধরনের ডাকাতরা যখন-তখন খুন করে না। সে-কথা অগ্রাহ্য করে ডেপুটি কমিশনার আবার বললেন, 'ডাকাতরা এত টাকা নিয়ে কি করে বলতে পার? সব সময়েই তো তারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ভোগ করে কখন? এই ধর না, সারা রাত গাড়ি চালিয়ে ওরা নিশ্চয়ই মালদা পার হয়ে গেছে! 'প্রিয়ব্রত অবাক হয়ে বলল, 'মালদা? ওরা মালদায় যাবে কেন?'

'দমদম দিয়ে যারা গাড়িতে পালায়, তারা সাধারণত বহরমপুরের দিকের হাইওয়ে ধরে। তারপর ফরাক্কা পেরিয়ে সোজা দৌড়!'

ওয়ারলেসে তখনও বকবক করে যাচ্ছে । কথা বোঝা না গেলেও বিমান এবার শুনতে পেল, ট্যাক্সির নাম্বারটা উচ্চারণ করছে বেশ কয়েকবার। অর্থাৎ পুলিশ থেকে নাম্বারটা চারিদিকে জানিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ডাকাতরা তো যখন-তখন গাড়ির নাম্বার পাল্টে ফেলে। তা হলে কি লাভ হবে?

ডেপুটি কমিশনার বিমানের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গত এক মাস ধরে ফরাক্কা ব্রিজে সব গাড়ির নম্বর লিখে রাখা হচ্ছে।'

তারপরই তিনি ড্রাইভারকে বললেন, 'গাড়ি থামাও!'

ড্রাইভার খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করালেন। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, আপনি কি এখানে চা খাবেন?'

তিনি বললেন, 'না।'

তারপর চুপ করে বসে রইলেন। যেন ধ্যান করছেন। প্রিয়ব্রত আর বিমান দুজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

একটু বাদে পেছন থেকে একটা জিপ খুব জোরে ছুটে এসে গাড়িটার পাশে থামল। সেটা থেকে একজন পুলিশ অফিসার নেমে ঠকাস করে জুতোর শব্দ করে স্যালুট করতেই ডেপুটি কমিশনার ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়?'

'স্যার, ময়নাগুড়ির কাছে।'

তিনি প্রিয়ব্রতর দিকে ফিরে বললেন, 'বলেছিলাম না! উত্তর বঙ্গটাই পালাবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা!'

প্রিয়ব্রত উর্ধ্বশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, স্যার? ময়নাগুড়িতে কি হয়েছে?'

বাইরের পুলিশটি বলল, 'ময়নাগুড়ি থেকে তিন মাইল দূরে রাস্তার ধারে ওই ট্যাক্সিটা উল্টে পড়ে আছে। ভেতরে একটা ডেডবডি।'

ডেপুটি কমিশনার আবার শিস দিয়ে উঠলেন। তারপর প্রিয়ব্রতর দিকে চোখ নাবিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি?'

'আমাদের এক্ষুনি যাওয়া উচিত।'

'যাও!'

'আমি তাহলে ওই জিপটা নিচ্ছি। আপনি আমার বাড়িতে একটা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।'

'তা করব। একা যাবে, না স্কোয়াডের আর দু-একজনকে সঙ্গে নেবে?'

'আমি এগিয়ে পড়ি। দরকার হলে চক্রবর্তী আর মিত্তির পরে আসবে।'

'ঠিক আছে; পরে আমি ওদের প্লেনে শিলিগুড়ি পাঠিয়ে দেব. এই ছেলেটিকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

প্রিয়ব্রত গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। সে দরজা বন্ধ করার আগেই বিমান বলল, 'আমিও যাব!'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তুই কোথায় যাবি? পাগল নাকি? মেসোমশাই দারুণ রেগে যাবেন।'

'কিছু হবে না। আমি যাবই।'

'স্যার, আপনি ওকে বারণ করুন।'

ডেপুটি কমিশনার মুচকি হেসে বললেন, 'যাক না। ও গেলে আইডেন্টিফিকেশনের সুবিধে হবে!'

আর কথা না বাড়িয়ে বিমান তাড়াতাড়ি গিয়ে জিপটায় উঠে পড়ল। প্রিয়ব্রত গোমড়া মুখে তার পাশে এসে বলল, 'তোকে নিয়ে এখন ঝঞ্ঝাটে পড়লাম! যদি তোর কোনও বিপদ-টিপদ হয়! আমাদের ডি-সি-ও এমন পাগল!'

গাড়ি ছুটল কৃষ্ণনগরের দিকে। অন্য পুলিশ অফিসারটি দমদমের কাছে নেমে গেছে। বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'প্রিয়দা তোমার কাছে রিভলভার আছে?'

'কেন?'

'ডাকাত ধরতে যাচ্ছ রিভলভার থাকবে না?'

প্রিয়ব্রত জামাটা উঁচু করে দেখাল। বিমান বলল, 'আমাকে একটু দাও তো। আমি কখনও রিভলভার ছুঁয়ে দেখিনি!'

সেটা হাতে নিয়ে বিমান ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। জিনিসটা খুব ঠান্ডা। এটার ভেতর থেকে আগুন গরম বুলেট বেরুতে পারে, ভাবাই যায় না।

'আমি একবার চালাব?'

'তারপর তুই অ্যাকসিডেন্ট করে মর, আর আমি খুনের দায়ে ধরা পড়ি!'

'অ্যাকসিডেন্ট হবে কেন? তুমি শিখিয়ে দাও!'

'একটা বুলেটের দাম কত জানিস?'

'কে এখানে হিসেব নিচ্ছে? অত কিপটেমি করছ কেন? আমি শিখে রাখলে পরে কাজে লাগতে পারে।'

রাস্তার দু'ধারে ফাঁকা মাঠ। ধারে কাছে মানুষজন নেই। গাড়িটা থামিয়ে প্রিয়ব্রত বিমানের রিভলভার শুদ্ধ ডান হাতটা চেপে ধরল। তারপর বলল, 'মাত্র একবার কিন্তু। দূরে ওই গাছটার দিকে টিপ কর। মনে রাখবি, হাতটা যেন পিছনের দিকে চলে না আসে। এই সেফ্টি ক্যাচ্। এটাকে রিলিজ করে তারপর ....'

হ্-ই-স শব্দে বুলেটটা বেরিয়ে গেল। বিমানের হাতে জোর একটা ঝাঁকুনি লাগল শুধু, গুলিটা দূরে গাছটায় লাগল কিনা তা বোঝা গেল না।

প্রিয়ব্রত বলল, 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে।'

তারপর ঘড়ি দেখে বলল, 'শিলিগুড়ি পৌঁছতে আমাদের রাত নটা বেজে যাবে। ওদের ট্যাক্সিটা অত তাড়াতাড়ি ময়নাগুড়ি পৌঁছাল কি করে, সেটাই আশ্চর্য।'

ওরা মালদায় একটা হোটেলে ভাত খেয়ে নিল। তারপর আবার জিপ ছুটল। শিলিগুড়ি পৌঁছে গেল নটার অনেক আগেই। তারপর ময়নাগুড়ি আর খুব বেশি দূর নয়। প্রিয়ব্রত প্রথমেই চলে এল থানায়। সেখানকার ও-সিকে নিয়ে এল স্পটে।

ট্যাক্সিটা রাস্তা থেকে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে কাত হয়ে আছে। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জোরাল টর্চের আলোয় হলদে ট্যাক্সিটা চক্‌চক্ করছে। প্রিয়ব্রত সেটার কাছে গিয়ে দরজা খুলে উঁকি দিল। তারপর চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ডেড বডি কোথায় রেখেছেন?' ও-সি বললেন, 'আপাতত থানাতেই রাখা আছে।'

'গাড়িটা এখানে কখন দেখা গেছে?'

'সকাল থেকেই তো, মনে হয় কাল রাত্তিরেই ...'

'তা হতেই পারে না। শুনুন, ট্যাক্সিটা কাল রাত্তিরে কলকাতা থেকে ছেড়েছে। যত জোরেই আসুক, আজ সকাল ছটা-সাতটার আগে এখানে পৌঁছান অসম্ভব। সুতরাং অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছে দিনের আলোয়। অ্যাকসিডেন্টটা কেউ না কেউ দেখে থাকতে পারে। ট্যাক্সির অন্য লোকেরা নিশ্চয়ই অন্য কোনও গাড়িতে গেছে। সে সম্পর্কে কিছু খোঁজ নিয়েছেন?'

'কিছু তো খবর পাইনি!'

প্রিয়ব্রত বিরক্তভাবে বলল, 'খবর কি আর আপনা-আপনি আসে? চলুন, ডেড বডিটা দেখে আসা যাক্!'

থানার পেছন দিকের বারান্দায় একটা কম্বল মুড়ে মৃতদেহটি রাখা হয়েছে। বিমানের গা ছমছম করতে লাগল। এবার সে কাকে দেখবে? পার্কের কাছে যে-লোকটাকে দেখেছিল?

প্রিয়ব্রত হাঁটু মুড়ে বসে নিজেই মৃতদেহের মুখ থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিল। তারপর সে নিজেই একটা ভয়ের শব্দ করে উঠল।

মৃতের মুখখানা বীভৎস। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মৃত্যুর আগে লোকটা যেন প্রচন্ড ভয় পেয়েছিল। সম্ভবত তাকে মারা হয়েছে গলা টিপে।

'একে চিনতে পারছিস?'

বিমান নিঃশব্দে দু'দিকে ঘাড় নাড়ল।

'কি?'

'আমি একে দেখিনি কখনও।'

'ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখ।'

প্রিয়ব্রত পকেট থকে কালো রুমালটা বার করে লোকটার মুখের খানিকটা অংশ ঢেকে দিল। তাতে লোকটার চোখ দুটো বেশি করে দেখা গে ' বিমান মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল. 'উঃ, আমি আর তাকাতে পারছি না। প্রিয়দা আমি সত্যিই চিনতে পারছি না।'

প্রিয়ব্রত একটু দমে গেল। কম্বল দিয়ে আবার মৃতদেহটা ঢেকে দিয়ে বলল, 'তাহলে কি মিছিমিছি এতটা দূরে এলাম?'

ও সি-র দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'এই লোকটার পকেটে কি-কি পাওয়া গেছে, আমি একটু দেখতে চাই।'

'কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'অ্যাঁ?'

'লোকটার পকেটে এক টুকরো কাগজ পর্যন্ত ছিল না। ওর সঙ্গের লোকেরা সবকিছু নিয়ে গেছে। আমার ধারণা কি জানেন? ট্যাক্সিটার ঠিক অ্যাকসিডেন্ট হয়নি।

লোকটাকে আগে খুন করে তারপর কেউ ইচ্ছে করে ট্যাক্সিটা মাঠের দিকে চালিয়ে দিয়েছে।'

প্রিয়ব্রত সাবান দিয়ে হাত ধুতে ধুতে বলল, 'তা আবার হয় নাকি? গাড়ি কি বাইরে থেকে চালান যায়? গাড়ি চালাতে গেলে কারুকে ভেতরে বসতেই হবে।'

'গাড়িটা ঠেলে গড়িয়ে দিতে পারে।'

'তা হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। বাকি লোকগুলো গেল কোথায়? তারা তা হলে নিশ্চয়ই অন্য একটা গাড়ি জোগাড় করেছিল। একটু খোঁজ নিতে পারেন, এ-অঞ্চলে কারুর গাড়ি কিংবা ট্যাক্সি চুরি গেছে কিনা?'

ও-সি বললেন, 'আমি এক্ষুনি চারিদিকে খবর পাঠাচ্ছি।'

বেশ রাত হয়ে গেছে, এখন আর কিছু করার উপায় নেই। সারাদিন জিপে এসে প্রিয়ব্রত আর বিমান দুজনেই ক্লান্ত। খিদেও পেয়েছে।

ওদের দু'জনের জন্য খাবারও তৈরি হয়ে আছে। রাত্তিরে থাকার জন্য ঘর ঠিক হয়ে আছে ডাকবাংলোয়। ডেপুটি কমিশনার দুপুরেই কলকাতা থেকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, ওরা আসছে।

ডাকবাংলোয় এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। ও-সি কে বলে রাখা হল যেন কোনও রকম খবর পাওয়া গেলে তক্ষুনি প্রিয়ব্রতকে জানান হয়। ঘরের মধ্যে পাশাপাশি দুটো খাট। ফরসা চাদর পাতা। প্রিয়ব্রত বলল, 'কাল সকালেই একসেট করে জামাকাপড় কিনে নিতে হবে। কিছুই তো আনা হয়নি! তুই এবার শুয়ে পড় বিমান!'

বিমান বলল, ' কি রকম মজা লাগছে! সকালবেলা ছিলাম কলকাতায়, রাত্তিরে শুয়ে আছি ময়নাগুড়িতে। কোনদিন এখানে আসবার কথা ভাবিইনি। আমি যদি সেদিন বাবার চেকটা ভাঙাতে না যেতাম, তাহলে সেই ডাকাতিটাও দেখতাম না, এখানেও আসা হত না! তারপর তুমিই আবার এই কেসটা নিয়েছ. না হলে পুলিশ কি আমাকে এত পাত্তা দিত। কি রকম অদ্ভুত যোগাযোগ।'

প্রিয়ব্রত গম্ভীরভাবে বলল, 'তোর কথার উপর নির্ভর করে এতটা দূরে চলে এসেছি। সবটাই যদি ভুল হয়, হয়তো ট্যাক্সি ড্রাইভার খুনের সঙ্গে ডাকাতির কোনও সম্পর্কই নেই। এটা একটা অন্য দল।'

বিমান বলল, 'তোমাকে আমি একটা কথা বলতে পারি। কালকের পার্কের ধারে সেই ডাকাতটা যে এই ট্যাক্সিতে উঠেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাকে আমি দেখলে ঠিকই চিনতে পারব।'

'তুই যেমন তাকে চিনে রেখেছিস, তেমনি সেই লোকটাও তোকে দেখলে ঠিক চিনতে পারবে।'

' তা তো পারবেই।'

'আবার দেখা হলে লোকটা তোকে মোটেই পছন্দ করবে না।'

'তাতে আমার বয়ে গেছে!'

'সেইজন্যই ডেপুটি কমিশনার বলছিলেন তোকে সাবধানে থাকতে। তোকে এত দুর নিয়ে এসে ভুলই করেছি বোধহয়।'

দু'জনেই এক সময় চুপ করে গেল। বাইরে কোথায় যেন খর্‌র্‌-খর্‌র্‌ শব্দে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। অনেকদূরে একটা মোটর গাড়ির আওয়াজ। তা ছাড়া, সব চুপচাপ। প্রিয়ব্রতর বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে, বিমানের ঘুম আসছে না।

একটু পরেই বিমান খাট থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে লাগল, 'প্রিয়দা, প্রিয়দা।'

প্রিয়ব্রত ধড়মড় করে উঠে বলল, ' কি হয়েছে? এই বিমান, কি হয়েছে?'

বিমান দৌড়ে এসে প্রিয়ব্রতর হাত চেপে ধরল। সে ঠক ঠক করে কাঁপছে। প্রিয়ব্রত তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কি হয়েছে? বল্ না!'

প্রিয়ব্রত তাড়াতাড়ি আলো জ্বালাল। বিমানের মুখখানা কাগজের মতন সাদা। কোনও কারণে সে অসম্ভব ভয় পেয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধই আছে।

প্রিয়ব্রত আবার তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কি হয়েছে? কিছু দেখেছিস!'

বিমান আস্তে আস্তে বলল, 'কিছু না।'

'কিছু না মানে? স্বপ্ন দেখেছিস? তাতেই এত জোর চেঁচিয়ে উঠলি? আঃ, ছেলেমানুষ আর কাকে বলে।'

বিমান খাটের ওপর ধপ করে বসে পড়ে বলল, 'স্বপ্ন নয়। নিজের চোখে দেখেছি। ওইখানটাতে, ঠিক টেবিলের পাশটায় দাঁড়িয়েছিল।'

'দরজা বন্ধ কে আবার ওখানে আসবে। যা, চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। মাথা গরম হয়ে গেছে তোর।'

'প্রিয়দা বিশ্বাস কর, আমি সত্যি সত্যি দেখেছি।'

'কাকে দেখেছিস, সেটা বলতে পারছিস না?'

'বুধ সিংকে।'

'সে কে?'

'বাঃ, ভুলে গেলে? সেই যে ব্যাঙ্কের দারোয়ানটা মারা গেল -- আমি স্পষ্ট দেখলাম। সে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এমন কি, একটা কি কথাও বলল, ঠিক বুঝতে পারলাম না, মনে হল যেন বলছে, মা দাঁড়িয়ে—'

'মা দাঁড়িয়ে? তার মানে কি?'

'কি জানি, আমিও তো বুঝতে পারছি না।'

প্রিয়ব্রত চিন্তিতভাবে মুখ নিচু করল। তারপর বলল, 'তোর শরীর এখনও দুর্বল আছে না রে?'

'না তো! আমার শরীর ঠিক আছে। তুমি ভাবছ আমি চোখের ভুল দেখেছি। কানেও ভুল শুনলাম? শোন প্রিয়দা, আমি এই বুধ সিংকে মাঝে মাঝেই দেখতে পাই। আধ মিনিট কি এক মিনিটের জন্য, তারপরই মিলিয়ে যায় —'

প্রিয়ব্রত গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ!'

'তুমি বিশ্বাস করছ না তো? তুমি ভূতে বিশ্বাস কর না তো, তাইনা?'

'কোনও ভদ্রলোকই করে না!'

'আমিও করতাম না। ছেলেবেলায় করতাম অবশ্য, কিন্তু বড় হয়ে আর ... তবু ওটা কেন হচ্ছে? সত্যি সত্যি দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় যেন লোকটা আমাকে কিছু বলতে চায়।'

'তুই ওর কথা বেশি ভাবছিস বোধহয়। তাতে অনেক সময় ওরকম হয়। লোকটা তোর কোলেই মাথা রেখে মরেছিল তো। সেইজন্য তুই ওকে ভুলতে পারছিস না। মানুষের কল্পনায় যে কত কি হতে পারে।'

'কিন্তু কল্পনায় এত স্পষ্ট দেখা যায়? যেমন তোমাকে দেখছি, সেইরকমভাবে ওকে দেখি — মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, ঠোঁট নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছে — তবে খুব অল্প সময়ের জন্য -- কুড়ি সেকেন্ড, তিরিশ সেকেন্ড--'

'যারা আত্মায় বিশ্বাস করে, তারা বলে, অনেক সময় মৃত্যুর পরেও আত্মা শরীর ধরতে পারে — তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না — যদিও এর কোনও প্রমাণ হয়নি, তা বিশ্বাস করা যায় না। যা ঘুমিয়ে পড় — অত চিন্তা করতে হবে না।'

কিন্তু ঘুমোতে যাওয়া হল না। এই সময় দরজায় খটখট্ শব্দ হল। প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল, 'কে?'

'স্যার, আমি থানা থেকে আসছি।'

দরজা খুলে দেখা গেল, একজন সাব-ইন্সপেক্টর। সে বলল, 'স্যার, ও-সি আপনাকে একটা খবর দিতে বললেন। আজ দুপুরে ধূপগুড়িতে তিনজন লোক একটা জিপ ভাড়া করেছে। জিপওয়ালা প্রথমে ভাড়া দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু তারা বলেছে, যত টাকা লাগে দেবে। লোকগুলো এখানকার স্থানীয় লোক নয়।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'হুঁ। তারা ঠিক কখন গেছে?'

'জিপটায় কয়েকটা টুকটাক সারাবার কাজ ছিল। বেরুতে বেরুতে ওদের প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে।'

প্রিয়ব্রত দারুণ আফসোসের সঙ্গে বলল, 'ইস্! সন্ধে পর্যন্ত ওরা এত কাছে ছিল, কেউ ধরতে পারেনি। ওঁরা কোন্ দিকে গেছে, তা কেউ বলতে পারছে?'

'গ্যারেজের একটা ছেলে বলেছে, ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে মাদারিহাটের দিকে যাবে।'

'মাদারিহাট কোথায়?'

'বীরপাড়া হয়ে যেতে হয়।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। এত রাত্রে তো কিছু করার উপায় নেই। কাল সকালে দেখা যাবে!'

লোকটি চলে যাবার পর প্রিয়ব্রত দরজা বন্ধ করতেই বিমান বলল, 'প্রিয়দা, আমাদের এক্ষুনি যাওয়া উচিত!'

'এত রাত্রে গিয়ে কি হবে?'

'মাদারিহাট নামটা শুনলে না?'

'তাতে কি হয়েছে?'

'আমি ভেবেছিলাম বুধ সিং বলছে, মা দাঁড়িয়ে — আসলে সে মাদারিহাটই বলতে চাইছিল, আমি বুঝতে পারিনি। সে চায় আমরা মাদারিহাট যাই!'

'ধ্যাৎ যতসব গাঁজাখুরি কথা! বলছি না মাথা ঠান্ডা করে ঘুমোতে!'

বকুনি খেয়ে চুপ করে গেল বিমান। প্রিয়ব্রতও কিন্তু শুতে গেল না। বিছানার ধারে চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ আবার ফিরে বলল, 'চল, তাহলে যাওয়াই যাক। গিয়ে দেখি তো।'

চটপট তৈরি হয়ে নিল ওরা। ড্রাইভার সারাদিন গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত। তাকে আর জাগান হল না। প্রিয়ব্রতই জিপ চালিয়ে চলে এল থানায়। সেখানে সে কয়েকটা জরুরি নির্দেশ দিতে লাগল। রেডিও টেলিফোনে বীরপাড়া আর মাদারিহাট থানায় খবর দিয়ে রাখতে হবে, সে যাতে সেখানে গিয়ে যে-কোন সাহায্য পেতে পারে। জলপাইগুড়িতে এস.পি-এর কাছেও খবর দিয়ে রাখতে হবে।

ও-সি বললেন, 'আপনারা দু'জনেই শুধু যাবেন? সঙ্গে কনস্টেবল নেবেন না?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তার দরকার কি! পুলিশের প্রয়োজন হলে মাদারিহাট থানা থেকেই নিয়ে নেব। ওদের জানিয়ে রাখুন! আর দেরি করে লাভ নেই!'

প্রিয়ব্রত দ্রুত জিপ চালিয়ে ধূপগুড়িতে এসে গ্যারেজের সেই ছেলেটাকে খুঁজে বার করলে। তার কাছ থেকে সব কথা শুনল আবার। লোক দুটোর বর্ণনা নিল। একজন লম্বা মতন লোক আছে ঠিকই। মাদারিহাট যাবার রাস্তাটাও ঠিকমতন জেনে নিল। তারপর আবার স্টার্ট দিল গাড়িতে।

নিঝুম রাত, নির্জন রাস্তা। আকাশটাও মেঘলা, তাই জ্যোৎস্না নেই। দু'পাশে ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে দূরে মেঘের মতন জঙ্গল দেখা যায়।

প্রিয়ব্রত একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'কি রে বিমান, তোর ভয় করছে না তো?'

'আমার ভয় করবে কেন?'

'এ রাস্তায় প্রায়ই ডাকাতি হয়। অবশ্য পুলিশের জিপ দেখে ডাকাতরা কাছে ঘেঁষবে না। হাতিও বেরোয় মাঝে মাঝে। এই বর্ষার সময়েই বেশি। দেখবি হয়তো রাস্তার মাঝখানে একটা দাঁতাল হাতি শুয়ে আছে!'

'ভালই তো হবে। আমি কখনও হাতি দেখিনি।'

বিমান রাস্তার দু'পাশে জঙ্গলের দিকে খুব আশা করে তাকিয়ে রইল, যদি একটা হাতি দেখা যায়। এমন ঝুপসি অন্ধকার যে এক এক সময় মনে হয়, সত্যিই বুঝি সার বেঁধে কারা সব দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিয়ব্রত খুব গম্ভীর। তাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। বিমান জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ, প্রিয়দা?'

'তোর কথাতেই তো এত দূর যাচ্ছি। কী জানি কি হবে। যে-কোনও লোকই খুব দরকার হলে একটা জিপ ভাড়া করতে পারে। যদি কারুর অসুখ করে, তাহলে যত টাকা লাগে তাও দিতে রাজি হবে। সুতরাং ওই লোক তিনটে যে ডাকাতই হবে তার কি মানে আছে!'

বিমান বলল, 'যাই হোক না, বেড়ান তো হচ্ছে!'

প্রিয়ব্রত ধমক দিয়ে বলল, 'ছেলেমানুষি করিস না। এতবড় একটা দায়িত্ব রয়েছে আমার মাথায়, আর এর মধ্যে তুই বেড়াবার কথা ভাবছিস!'

বীরপাড়া থানাতেও কোনও খবর পাওয়া গেল না। জিপের নম্বরটা অবশ্য প্রিয়ব্রত জোগাড় করেছে ধূপগুড়ি থেকে কিন্তু সেই নম্বরের একটা জিপ গেছে কিনা কেউ বলতে পারে না। পেট্রল পাম্পেও কোনও হদিস নেই।

এখান থেকে মাদারিহাট বেশি দূর নয়, আবার বেরিয়ে পড়ল প্রিয়ব্রত। জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝেই চা-বাগান আর জঙ্গল। নিশুতি রাত। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই, শুধু জিপের গোঁ গোঁ আওয়াজ ছাড়া।

জিপের জোরাল হেড লাইটে দেখা গেল রাস্তার ধারে একটা গাড়ি উল্টে আছে। প্রিয়ব্রত আস্তে আস্তে গাড়ির গতি কমাল, তারপর একদম থামিয়ে দিয়ে বলল, 'জিপই তো মনে হচ্ছে। এরকম পর পর অ্যাকসিডেন্ট?'

প্রিয়ব্রত গাড়ি থেকে নেমে ওল্টানো জিপটার দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো ছায়ার মতন মানুষ জিপটার দুপাশ থেকে নেমে ঘিরে ধরল প্রিয়ব্রতকে। শক্ত একটা জিনিস দিয়ে তার মাথায় মারল। ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেল সে।

বিমান তখন সবেমাত্র নেমে দাঁড়িয়েছে। ওই দৃশ্যটা দেখে প্রথমেই তার মনে হল -- ইস্, প্রিয়দাটা এত ক্যাবলা, সঙ্গে রিভলভার রয়েছে, সেটা আগে বার করতে পারেনি!

তারপরই সে রাস্তা থেকে নেমে পাশের দিকে ছুটল। লোক দুটো চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই আর একটা পালাচ্ছে। ধর ধর।' '

বিমান দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। লোক দুটো খুব কাছে এসে পড়েছে। তবু বিমান জানে লোকগুলো কিছুতেই তাকে দৌড়ে হারাতে পারবে না। এই রকমভাবে খানিকটা দৌড়ে সময় কাটালে যদি প্রিয়দার জ্ঞান ফিরে আসে।

কিন্তু তক্ষুনি গুলির শব্দ হল। লোক দুটো বিমানের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। বিমান সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ল। গুলির মুখে দৌড়বার কোনও মানে হয় না!

লোক দুটো দৌড়ে এসে বিমানকে ধরে ফেলল। লম্বা মতন লোকটা বিমানের মুখটা দেখেই বলল, 'এই তো সেই বিচ্ছুটা।'

বিমানও চিনতে পেরেছে। এই হচ্ছে সেই ' কী হচ্ছে কি', পার্কের পাশে যাকে দেখেছিল।

লম্বা লোকটি বলল, 'ওঃ এই ছোঁড়াটা কম জ্বালিয়েছে?'

অন্য লোকটা গাঁট্টাগোট্টা। তাকেও বিমানের চিনতে অসুবিধে হল না। ব্যাঙ্ক-ডাকাতির দিন এই রকম একটা লোককে সে দেখেছিল। আর একটা লোক কোথায়?

বিমানের কাঁধের কাছে কলার চেপে ধরে ওরা টানতে টানতে নিয়ে এল রাস্তার ওপরে। লম্বা লোকটা তার গালে ঠাস করে এক চড় মারল। বেঁটে লোকটা মারল এক ঘুসি।

তারপর ওরা দু'জনে পালা করে মারতে লাগল। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল বিমানের নাক দিয়ে। লম্বা লোকটাই বেশি রাগের সঙ্গে মারছে।

বিমানের যেন একটা ক্ষীণ ধারণা ছিল, কেউ এসে তাকে এই সময় বাঁচিয়ে দেবে। হয়তো বুধ সিং-এর প্রেতাত্মা। বুধ সিং যদি সত্যিই ভূত হয়ে থাকে, তাহলে এই সময় তাকে সাহায্য করতে আসবে না? কিন্তু কেউ তো এল না। তাহলে সত্যিই চোখের ভুল?

এত মার সহ্য করা যায় না। এর থেকে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াই ভাল। বিমান অজ্ঞানের ভান করে চোখ উল্টে চুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

লম্বা লোকটা তারপরেও বিমানের বুকে একটা লাথি মেরে বলল, 'আপদ কোথাকার!'

একটু দূরে প্রিয়ব্রত তখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে; বিমান চোখ পিটপিট করে দেখতে লাগল।

লোক দুটো উল্টে পড়া জিপের কাছে গিয়ে জিনিসপত্র বার করে প্রিয়ব্রতর জিপে তুলতে লাগল। চারটে বাক্স আর কয়েকটা প্যাকেট। প্যাকেটগুলো দেখে মনে হয়, নানারকম খাবার-দাবার আছে। ওরা তো তিনজন ছিল, বাকি লোকটা কোথায় গেল!'

একটু বাদেই বিমান দেখতে পেল তাকে। জিপটা সোজা একটা গাছে ধাক্কা মেরেছে। সামনের সিট থেকে ওরা একজন লোককে টেনে বার করল! দেখেই বোঝা যায় মরা।

লম্বা লোকটা ভারি গলায় বলল, 'একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ওঃ কি যে হল!'

গাঁট্টাগোট্টা লোকটা বলল, 'আমি জীবনে এরকম কখনও দেখিনি! চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তিনটে অ্যাকসিডেন্ট। এ কখনও হয়?'

লম্বা লোকটা বলল, 'শুধু তাই নয় প্রত্যেকেই কিরকম চ্যাঁচাচ্ছিল? কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে। কালকে ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা তো বেশ ভাল ছিল, আমাদের দলে ভিড়িয়ে নেওয়া যেত। আমাদের এক কথায় রাজি হয়ে গেল। তারপরই লোকটা

স্টিয়ারিং ছেড়ে এমন চ্যাঁচাতে লাগল — আমি তো ভেবেছিলাম, যশোর রোডেই আমরা সবাই অ্যাকসিডেন্টে মরব।'

'ঠিক যেন কেউ ওর গলা টিপে ধরেছিল! নাকি পেট ব্যথা করছিল!'

'ডাবু আর ছেনোর বেলাতেও তাই।'

'ঠিক যেন ভূতুরে ব্যাপার।'

মোটা লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'ওরে বাবারে! এসব কি ব্যাপার! আমার দম আটকে আসছে। আমি আর পারব না!'

লম্বা লোকটা তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'এই কী হচ্ছে কি? তুইও ঘাবড়ে গেলি নাকি? চল আর তো বেশি দূর নেই।'

'আমার ভয় করছে! সত্যিই খুব ভয় করছে।'

'আর ভয় নেই। নদীটা পার হলে আমরা একেবারে সেফ্ হয়ে যাব।'

ওরা গিয়ে প্রিয়ব্রতর জিপটায় উঠল। মোটা লোকটা বলল, 'এই দুটোকে কি ফেলে যাব? মাথা-খারাপ নাকি? ওদের ঠিক মতনগতি করতে হবে।'

লম্বা লোকটা নেমে এসে প্রিয়ব্রত আর বিমানকে তুলে এনে ছুঁড়ে দিল জিপের পেছন দিকে। লোকটার গায়ে দারুণ জোর। এরপর লোকটা ওদের সঙ্গীর মৃতদেহটাও এনে রাখল বিমানদের পাশে।

জিপটা চলতে শুরু করল। একটু বাদেই বিমান বুঝতে পারল, জিপটা বড় রাস্তা ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরেছে। অসম্ভব ঝাঁকুনি, মনে হচ্ছে যেন হাড়পাঁজরা সব গুঁড়ো হয়ে যাবে। পাশেই একটা মরা পড়ে আছে বলে ঘেন্নাও করছে খুব। দু-একবার ছোঁয়া লাগছে, মড়ার শরীর খুব ঠান্ডা হয়। প্রিয়ব্রত তখনও অজ্ঞান। বিমানেব ভয়, প্রিয়দা মরে যায়নি তো?

সে ঠ্যালা দিয়ে প্রিয়ব্রতকে জাগাবার চেষ্টা করল। কোনও সাড়া পেল না। তবে প্রিয়ব্রতর শরীরটা গরম। বিমান প্রিয়ব্রতর কোমরের কাছে হাত দিয়ে দেখল রিভলভারটা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সেটা ওরা আগেই নিয়ে নিয়েছে।

গাড়ির গতি খুব বেশি নয়। বিমান ইচ্ছা করলে এখনও ওদের অলক্ষে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু একা গিয়ে সে কি করবে? প্রিয়দার তা হলে কি হবে? দেখা যাক এরপর কী হয়!

কান খাড়া করে সে ওদের কথা শুনতে লাগল। গাড়ি চালাচ্ছে মোটা লোকটা। সে এক সময় বলল, 'কপু, আমার গাড়ি চালাতে ভয় করছে। এ পর্যন্ত যে-কজন গাড়ি চালিয়েছে, তারাই গেছে।' লম্বা লোকটা বলল, 'দ্যাখ, আমি তো গাড়ি চালাতে জানি না, না হলে আমিই চালাতুম।'

'আমার যদি কিছু হয়?'

'কি হবে! তুই ভয় পাচ্ছিস কেন?'

'ভয় পাব না? ট্যাক্সিওয়ালাটার কথা বাদ দে। আমাদের দলের দুটো লোক আজ গাড়ি চালাতে গিয়ে তো মরল।'

'অ্যাকসিডেন্ট করলে কি করা যাবে?'

'সবাই এরকম অ্যাকসিডেন্ট করে একদিনে? বিলু তো সাংঘাতিক ভাল গাড়ি চালাত। কোনদিন অ্যাকসিডেন্ট করেনি। সাহসও ছিল দারুণ। সে হঠাৎ ভয় পেয়ে চ্যাঁচাতে লাগল ময়নাগুড়ির কাছে।'

'আমার মনে হয় বিলুর কোনও অসুখ ছিল আমরা জানতুম না।'

'আমার তো মনে ও চোখের সামনে কিছু দেখে ভয় পাচ্ছিল।'

'কি দেখবে? আমরা কেউ দেখলাম না, ও একা দেখবে!'

'যাই হোক আমিও যদি অ্যাকসিডেন্টে মরি, তুই আমার বউ আর বাচ্চাদের দেখিস।'

'যাঃ কী যে বলছিস! আর তো সামান্য রাস্তা। গাড়ি এত আস্তে চলছে, কোনও অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে না। শুধু শুধু কতটা দেরি হয়ে গেল। এখন নৌকোটা থাকলে হয়।'

'কোনক্রমে যদি চুয়াপাড়া পৌঁছতে পারি, তাহলে আমার টাকার ভাগ দিয়ে দিবি। আমি এ-লাইন ছেড়ে দেব একেবারে।'

'আর কে এই লাইনে থাকছে! যথেষ্ট হয়েছে।'

খানিক বাদেই জিপ থামল। ওরা দুজনে জিপ থেকে নেমেই কার নাম ধরে যেন ডাকল। একটা সাড়াও পাওয়া গেল।

ভিজে-ভিজে হাওয়া আসছে। কাছেই নিশ্চয়ই নদী আছে। ওরা প্রথমে জিনিসপত্র নিয়ে গেল। আর একজন পাহারায় রইল। তারপর লম্বা লোকটা এক-এক করে ওদের বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখল একটা নৌকায়।

নৌকোটা প্রায় সাধারণ নৌকোর মতন দেখতে হলেও তাতে মোটর লাগান আছে। আর একজন লোক ভটভট শব্দে সেটায় স্টার্ট দিল। লম্বা লোকটা বলল, 'দাঁড়াও, কয়েকটা পাথর নিয়ে আসি।'

নেমে গিয়ে সে কয়েকবার বেশ কয়েকটা পাথর বয়ে নিয়ে এল। তারপর বলল, 'চল।'

মাঝনদীতে এসে সে আবার বলল, 'থামো!' তারপর বলল, 'নিতাইকে এখানেই বিসর্জন দেওয়া যাক, কি বল?'

মোটা লোকটা বলল, 'সেই ভাল!'

একটা পাথরের সঙ্গে দড়ি বেঁধে মৃতদেহটার সঙ্গে দড়িটার আর একদিক বাঁধা হল। তারপর সবশুদ্ধ ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল জলে।

লম্বা লোকটা দুঃখের সঙ্গে বলল, 'যা নিতাই! আমরা কি করব বল্, আমাদের তো দোষ নেই।'

মোটা লোকটা বলল, 'এ দুটো কি অজ্ঞান হয়ে আছে না মটকা মেরে আছে? এদের নিয়ে কি হবে?'

'ওদেরও ফেলে দে।'

মোটা লোকটা প্রিয়ব্রত আর বিমানের জুলপি ধরে টেনে দেখল ওদের জ্ঞান আছে কিনা। দারুণ জোরে লাগলেও বিমান টুঁ-শব্দ করল না। মোটা লোকটা তখন প্রিয়ব্রতকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেল।

বিমান সব ঠিক করে ফেলেছে। এইরকমভাবে মরার চেয়ে যে-কোনও ঝুঁকি নেওয়া ভাল। সে কিছুতেই ওদের হাতে মরবে না।

বিমান দারুন জোবে ঘুসি কষাল মোটা লোকটার দিকে। ঘুসি খেয়ে লোকটা ছিটকে পড়ে গেল নৌকার মাঝখানে। তারপরই প্রিয়ব্রতও এগিয়ে গেল লম্বা লোকটার দিকে।

লম্বা লোকটির হাতে রিভলভার। সে বিচ্ছিরিভাবে হেসে বলল, 'ঠিক আছে, আগে শেষ করে দি, তারপর জলে ফেলব -- দুটোকে এক সঙ্গে...'

লম্বা লোকটার নিষ্ঠুর মুখ দেখেই বোঝা যায়, সে সত্যিই গুলি করবে। প্রিয়ব্রত থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তখনই বিমান দেখতে পেল লম্বা লোকটার পাশে একটা ছায়ামূর্তি। বিমান চিনতে পারল, বুধ সিং। বিমান আর দেরি করল না. লাফিয়ে পড়ল নদীতে।

লম্বা লোকটা একটু যেন অবাক হল। নদীটার নাম তোর্সা। বর্ষার সময় এই নদী ভয়ংকরী হয়ে ওঠে। এতে কেউ ইচ্ছে করে লাফিয়ে পড়তে পারে?

লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'মর্! মর্!'

জলে পড়ে বিমান অনেকখানি ডুবে গেল। তারপর আবার ভেসে উঠল ভুস্ করে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে একটা চিৎকার শোনা গেল ঃ বড়েবাবু, বড়েবাবু, হোঁশিয়ার!

জলের মধ্যেও বিমানের শরীরটা কেঁপে উঠল ভয়ে। তাহলে সে বুধ সিংকে ঠিকই দেখেছে।

নৌকোর ওপর ঠিক তখনই কে যেন চেঁচিয়ে উঠল দারুণ ভয় পেয়ে। কে যেন হুড়মুড় করে পড়ে গেল। তারপরই রিভলভারের গুলির শব্দ। বিমান আবার ডুব দিল।

জলে খুব স্রোত। টানের মুখে পড়লে কোথায় নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। কিন্তু বিমান সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন, জলকে সে ভয় পায় না।

জলের মধ্যে কি একটা জিনিস যেন তোলপাড় করছে। এই জলে কি কুমির থাকে? তাহলেই সেরেছে! কে যেন বিমানের নাম ধরে ডাকছে। প্রিয়ব্রতর গলা! এমন সময় ভুস করে বিমানের সামনেই কি যেন একটা মাথা তুলল। কুমির নয়, মানুষ। প্রিয়ব্রতও কি জলে পড়েছে! বিমানের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্রিয়দা তো সাঁতার

জানে না। অমনি সে তাকে ধরতে গেল। কিন্তু ধরতে পারল না। লোকটা একটা ভয়ের শব্দ করে ডুবে গেল জলের মধ্যে।

এবার নৌকোর ওপর থেকে প্রিয়ব্রতর গলা শোনা গেল, বি-মা-ন! বি-মা-ন! ছপ ছপ করে সাঁতরে সে এগুতে লাগল নৌকোর দিকে। কাছে আসতেই প্রিয়ব্রত তার হাত ধরে তুলে নিল।

মোটা লোকটার হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধেছে প্রিয়ব্রত। নৌকোর মোটর যে চালাচ্ছিল, সে বসে আছে আড়ষ্ট হয়ে, লম্বা লোকটা নেই।

বিমান জিজ্ঞেস করল, 'সে কোথায় গেল?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সেও তো জলে পড়ে গেছে!'

'কি করে?'

'তা তো বুঝলাম না! আমি ভাবলাম লোকটা আমাকে মেরেই ফেলবে। হঠাৎ লোকটা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, তারপরই ছিটকে পড়ে গেল। বোধ হয় পা পিছলে পড়ে গেছে।'

বন্দী মোটা লোকটা আস্তে আস্তে বলল, 'আমাদের আর-দু'জন লোকও ওই ভাবে ওঃ-ওঃ ওঃ!'

লোকটা কাঁদতে আরম্ভ করেছে। একটা নিষ্ঠুর ডাকাতকে এরকম কাঁদতে দেখলে কি রকম অদ্ভুত লাগে!

বিমান জিজ্ঞেস করল, 'প্রিয়দা, তুমি লম্বা লোকটার পাশে আর কারুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলে?'

'না তো! কে?'

'কোন শব্দও শোননি?'

'না! তুই কার কথা বলছিস?'

বিমান চুপ করে গেল। তার খুব ক্লান্ত লাগছে, ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। মাত্র কয়েক মিনিট আগেও মনে হয়েছিল মৃত্যু একেবারে চোখের সামনে এসে গেছে।

প্রিয়ব্রত লোকটির টর্চটা নিয়ে নদীতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। একবার সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে, ওই যে, ওইখানে ...'

বিমান জিজ্ঞেস করল, 'প্রিয়দা, তুমি ওর নাম জান?'

'ওকে তো দেখেই চিনেছি। ওই ঘনশ্যাম আগে একবার জেল খেটেছে।'

'আমি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম!'

বেশ খানিক দূরে সাদা মতন কিছু একটা দেখা গেল। বোধহয় সেই লম্বা লোকটার জামা। ঢেউয়ে ওলাট-পালোট খাচ্ছে। নৌকোটা তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। কিন্তু আর কিছুই দেখা গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর সন্ধান পাওয়া গেল না ঘনশ্যামের। সে স্রোতের টানে পড়ে গেছে। কোথায় থামবে কে জানে!

মোটা লোকটা তখন ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছে। প্রিয়ব্রত তাকে একটা ধমক দিল। তবু সে কান্না থামাল না। হাউ হাউ করে বলতে লাগল, আমাকে বাঁচান। ওরা সবাই গেল। আমাকে বাঁচান। আমি এখন থেকে কুলিগিরি করব!

বিমান নৌকোর পাটাতনের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখের সামনে বিরাট আকাশ। আবছা আবছা মেঘ। নদীর স্রোতের কলকল শব্দ। ঘুম এসে যাচ্ছে। তখনও সে ভাবতে লাগল, বুধ সিংকে সে একাই দেখতে পেল কেন? নৌকোর ওপর সে বুধ সিংকে স্পষ্ট দেখেছে – লম্বা লোকটাকে মারবার জন্য হাত তুলেছিল। প্রিয়দা কেন দেখতে পেল না?

নীলমূর্তি রহস্য

১

দুপুরবেলা হঠাৎ কলেজ ছুটি হয়ে গেল। একজন প্রোফেসর পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন, সেইজন্যে। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, কিছু ছেলেমেয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। সন্তু কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে বৃষ্টিতে ভিজবে কি ভিজবে না, এই সময় তার বন্ধু জোজো তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'চল সন্তু, কোথাও ট্রেনে করে ঘুরে আসি।'

জোজো সন্তুদের পাড়ায় থাকে, প্রায়ই ওরা একসঙ্গে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরে। জোজো একেবারে গুল ঝাড়বার রাজা। ওর কথা শুনলে মনে হবে, পৃথিবীর সমস্ত বড়বড় লোক ওর বাবা-মা'কে চেনে। ফিডেল কাস্ট্রো ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন, ইন্দিরা গান্ধী এক সময় ওদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে কিছুদিন লুকিয়েছিলেন, বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় জোজোর বাবাই তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে টেলিফোন করে বলেছিলেন, 'খবরদার, বঙ্গোপসাগরে সেভেন্‌থ ফ্লিট পাঠাবেন না, তা হলে আপনার প্রেসিডেন্টগিরি ঘুচে যাবে!' জোজোর বাবা শিবচন্দ্র সেনশর্মাকে সবাই এত মানে, কারণ তিনি একজন নামকরা জ্যোতিষী। এমনকি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারও নাকি আগের ইলেকশানের সময় ওর বাবার কাছ থেকে মন্ত্রপূত আংটি নিয়েছিলেন।

সন্তু জোজোর এই সব গল্প বিনা প্রতিবাদে শুনে যায়। তার ভালই লাগে। জোজো সব সময় প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, সন্তুর কাকাবাবুর চেয়ে তার বাবা অনেক বেশি বিখ্যাত। সন্তুর কোনও অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী কাগজে বেরুলেই জোজো এসে বলবে, 'আরে তুই তো মোটে নেপালে গিয়েছিলি! বাবা আমাকে গত মাসে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল জানিস? সাইবেরিয়ায়! কেন জানিস? না, সেটা বলা চলবে না, ভীষণ সিক্রেট, স্টেট সিক্রেট যাকে বলে, ফাঁস হয়ে গেলেই আমার ফাঁসি হবে।'

জোজোর ট্রেনে করে ঘুরে আসার প্রস্তাব শুনে সন্তু বলল, 'কোথায় যাবি? দিল্লি? বম্বে?'

জোজো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ধুত্‌, ওসব জায়গায় তো কতবার গেছি, নিউ ইয়র্ক, মস্কো, হেলসিংকি দেখার পর কি আর দিল্লি-বম্বে ভাল লাগে? এই সব বৃষ্টির দিনে যেতে হয় কোনও নতুন জায়গায়; মনে কর কোনও গ্রামের মধ্যে ছোট্ট একটা স্টেশন, চারিদিকে সবুজ গাছপালা, একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে। একটাই দোকান আছে সেই গ্রামে, সেই দোকানে বসে তেলেভাজা, মুড়ি আর চা খাওয়া কি রকম দারুণ না?'

সন্তু বলল, 'হ্যাঁ, শুনতে বেশ ভাল লাগল। কিন্তু ট্রেনে যে চাপব, পয়সা পাব কোথায়? পকেট তো ঢন্‌ঢন্‌!

জোজো এমনভাবে হাসল যেন সন্তুটা একেবারে ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝে না! সে ঠোঁট উল্টে বলল, 'বেড়াতে আবার পয়সা লাগে নাকি? তুই আমার সঙ্গে আছিস না? শিয়ালদা স্টেশনের স্টেশনমাস্টার আমার আপন মামা, আর হাওড়ার স্টেশনমাস্টার আমার পিসেমশাই। তুই ইন্ডিয়ার কোথায় যেতে চাস বল না! এক্ষুনি বিনা পয়সায় নিয়ে যেতে পারি।'

সন্তু মিনমিন করে বলল, 'স্টেশনমাস্টার আত্মীয় হলেই বুঝি ট্রেনে বিনা পয়সায় চাপা যায়; অন্য স্টেশনে ধরবে না?'

জোজো বলল, 'তুই টেস্ট করে দেখতে চাস; চল, শিয়ালদায় চল, আমি তোকে হাতেহাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি। টিকিট চাইবে কী রে? আমাদের জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট, সেলুন কাকে বলে জানিস, তাই জুড়ে দেবে। আমরা যেখানে বলব সেখানে থামবে!'

সন্তু বলল. 'ঠিক আছে, পরে কোনদিন তোর সঙ্গে ওইভাবে বেড়াতে যাব, এখন বাড়ি চলি।'

জোজো অবাক হয়ে ভুরু তুলে বলল, 'এর মধ্যে বাড়ি যাবি? আজ তো আমাদের সাড়ে চারটে পর্যন্ত ক্লাস হবার কথা ছিল। এখন মোটে একটা দশ বাজে। এতখানি সময়, আমরা অনায়াসেই কোনও জায়গা থেকে ঘুরে আসতে পারি।'

সন্তু বলল, 'এই কয়েক ঘন্টায় ট্রেনে চেপে কোথা থেকে ঘুরে আসব?'

জোজো বলল, 'কেন, ডায়মন্ডহারবার, বনগাঁ, চন্দননগর, উলুবেরিয়া, যে-কোনও জায়গায় যাওয়া যেতে পারে, ফিরতে বড়জোর সন্ধে হবে।'

সন্তু ততক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে, জোজোর পাল্লায় পড়া মোটেই বুদ্ধির কাজ হবে না। ডায়মন্ডহারবার বা ওই সব জায়গায় যেতে-আসতেই তিন চার ঘন্টা লেগে যাবে। বাড়িতে কোনও খবর না দিয়ে শুধুশুধু এরকম ঘুরতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।'

জোজো হঠাৎ যেন কিছু একটা আবিষ্কার করার মতন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'সোনারপুর! মনে পড়েছে! দ্যাট্‌স ইট! চল্‌ সোনারপুর ঘুরে আসি। তোকে সিংহ দেখাব!'

সন্তু আর না হেসে পারল না। সোনারপুর জায়গাটার নাম সে শুনেছে, সে জায়গাটা আফ্রিকায় নয়, চব্বিশ পরগনায়। সেখানে সিংহ?

সন্তুর অবিশ্বাসী দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে জোজো বলল, 'তুই তো ইজিপ্টে গিয়ে উটের পিঠে চেপেছিস, তাই না, হাতির পিঠে চেপেছিস কখনও? বল, সত্যি করে বল?'

সন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, সে কখনও হাতির পিঠে চাপেনি।

জোজো বলল, 'সোনারপুরে তোকে আমি হাতির পিঠে চাপাব। আমি তোর পাশে পাশে উটে চেপে যাব। সুন্দরবন পর্যন্ত ঘুরে আসব।'

সোনারপুরে সিংহ শুধু নয়, উট, হাতি! উঃ সত্যি, জোজোকে নিয়ে আর পারা যায় না!' গুলেরও তো একা সীমা থাকা উচিত। সন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে সুন্দরবন ঘুরে এসেছে, ওই সোনারপুরের পাশ দিয়েই যেতে হয়েছিল। সোনারপুর তো দূরের কথা, গোটা সুন্দরবনেই একটাও হাতি নেই। উট আর সিংহ থাকার কথা তো কল্পনাও করা যায় না!

এই সময় ওদের আর এক বন্ধু অরিন্দম পেছন থেকে এসে বলল, 'এই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কী গ্যাঁজাল্লি করছিস; বাড়ি যাবি না? এর পর রাস্তায় জল জমে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাবে!'

সন্তু বলল, 'অরিন্দম, তুই সোনারপুর জায়গাটার নাম শুনেছিস?'

অরিন্দম বলল,'কেন শুনব না? এই তো শিয়ালদা লাইনে, বোধহয় চার পাঁচটা স্টেশন! আমি ওই স্টেশন দিয়ে পাস করেছি অনেকবার।'

'সোনারপুরে জঙ্গল আছে?'

'জঙ্গল? মানুষ থিকথিক করছে। ওই স্টেশন থেকে যত রাজ্যের তরকারিওয়ালারা ওঠে। তবে দু'চারটে বাগানবাড়ি আছে শুনেছি।'

'জোজো বলছে, ওই সোনারপুরে নাকি বাঘ-সিংহ, হাতি-উট-গন্ডার ঘুরে বেড়ায়!'

অরিন্দম হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'ওফ জোজো, দিস ইস টু মাচ্! তুই সন্তুকে ভালমানুষ পেয়ে আর কত গুল ঝাড়বি? অ্যাঁ?'

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি বাঘ কিংবা গন্ডারের কথা বলিনি। সন্তু বাড়াচ্ছে। কিন্তু যদি সিংহ দেখাতে পারি?'

অরিন্দম বলল, 'আফ্রিকার কোনও রাজা বুঝি তোর বাবাকে সিংহ প্রেজেন্ট করেছে? তুই মাঝে-মাঝে সিংহ নিয়ে মর্নিং ওয়াক করতে যাস?'

সন্তু বলল 'শুধু সিংহ নয়, সোনারপুরে গেলে ও আমাদের হাতি কিংবা উটের পিঠে চাপাতে পারে।'

অরিন্দম বলল, 'জোজো, তুই শুধু শুধু কেন এই পচা কলেজে পড়ে আছিস? তুই ওয়ার্ল্ড গুল কম্পিটিশনে নাম দে। নির্ঘাত ফার্স্ট হয়ে যাবি। তারপর গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তোর নাম উঠে যাবে।'

জোজো গম্ভীরভাবে ডান হাতের পাঞ্জাটা বাড়িয়ে বলল, 'কত বেট?'

অরিন্দম বলল, 'কিসের বেট! তুই ওয়ার্ল্ড গুল কম্পিটিশনে ফার্স্ট হবি কি না? নিশ্চয়ই হবি।'

জোজো বলল, 'সে কথা বলছি না। আমি যদি এখন থেকে ঠিক দু'ঘন্টার মধ্যে তোদের হাতির পিঠে চাপাতে পারি, তা হলে কত টাকা বাজি হারবি?'

অরিন্দম জোজোর থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, 'আহা রে, চাঁদু! আমাদের বোকা পেয়েছিস? চিড়িয়াখানায় গেলেই তো হাতির পিঠে চাপা যায়।'

জোজো মিটিমিটি হেসে বলল, 'চিড়িয়াখানায় নয়।'

অরিন্দম বলল, 'তা হলে কোনও সার্কাসের হাতি!'

জোজো একইভাবে বলল, 'সার্কাসেরও নয়।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'আর উট আর সিংহ?'

জোজো বলল, 'হ্যাঁ, সিংহও দেখাব। উটও দেখাব।'

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল,'তুই সার্কাসের জানোয়ার দেখিয়ে আমাদের ঠকাবি না?'

জোজো বলল,'কোন সার্কাসে সিংহ থাকে রে? তা ছাড়া বলছি তো, সার্কাসের কোশ্চেনই উঠছে না।'

অরিন্দম বলল, 'তুই এই সবগুলো একসঙ্গে আমাদের দেখাবি? তা হলে দশ টাকা বাজি!'

জোজো বলল, 'ডান্! তা হলে চল এক্ষুনি স্টার্ট করি।'

বৃষ্টি বেশ জোর হয়েছে এখন। এর মধ্যে ট্রামে-বাসে উঠতে গেলেও ভিজে যেতে হবে। তবু তিনজনে দৌড় লাগাল। বাস স্টপে এসেই পেয়ে গেল একটা শিয়ালদার বাস। বাসে উঠে জোজো অরিন্দমকে বলল, 'তুই আমাদের তিনজনের টিকিটটা কেটে ফ্যাল তো।'

অরিন্দম বলল, 'বাজির দশ টাকা থেকে এই বাসভাড়ার পয়সাগুলো কাটা যাবে।'

সন্তু বলল, 'কাটা যাবে কী রে যোগ হবে বল্। জিতব তো আমরাই।'

জোজো বলল, 'দ্যাখ না কী হয়!'

বাসে ভিড় বেশি নেই। ওরা আরাম করে বসল। সন্তু আর অরিন্দম পাশাপাশি, জোজো অন্য দিকে। এর মধ্যেই ওরা দুটো পার্টি হয়ে গেছে।

সন্তু আর অরিন্দম পরে আছে প্যান্ট আর শার্ট। জোজোর গায়ে একটা মেরুন রঙের গেঞ্জি, তাতে সাদা অক্ষরে লেখা 'ভিকট্রি'।

ওই গেঞ্জিটা নাকি ব্রাজিল থেকে পেলে পাঠিয়েছে জোজোকে। জোজোর বাবার পাঠানো ফুল আর বেলপাতা পকেটে নিয়ে পেলে সব সময় খেলতে নামত।

জোজোর চেহারাটা সুন্দর, ওই গেঞ্জিটায় তাকে সুন্দর মানিয়েছে।

সন্তু ফিসফিস করে অরিন্দমকে বলল, 'আমরা তো যাচ্ছি ওর সঙ্গে, কিন্তু জোজোর কাছ থেকে বাজির টাকা আদায় করতে পারবি?'

অরিন্দম বলল, 'আমি ঠিক আদায় করে ছাড়ব। এর আগে তো কেউ জোজোর কথা চ্যালেঞ্জ করেনি।'

জোজো তাকিয়ে থাকে জানালা দিয়ে। হঠাৎ সে একটা চলন্ত গাড়ি দেখে মুখ বাড়িয়ে হাসল, হাতছানি দিল।

তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে গেল জানিস?'

অরিন্দম বলল, ‘ কি করে জানব?’

হাসি-ঝলমলে মুখে জোজো বলল, ‘কপিলদেব! আমার বাবার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছে। জানতুম, আসতেই হবে। এবারে অস্ট্রেলিয়া যাবার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করে যেতে ভুলে গেছে, তাই তো এই কান্ড!’

অরিন্দম বলল, ‘চুপ, একটু আস্তে বল। সবাই শুনতে পাবে।’

জোজো বলল, ‘তোরা বিশ্বাস করছিস না?’

অরিন্দম বলল,‘আচ্ছা জোজো, তোর বাবা পরীক্ষায় পাশ করার কোনও মাদুলি-টাদুলি দ্যান?’

জোজো সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘না। ওইটা কক্ষনো দ্যান না। তাহলে আমিই তো সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হতাম!’

সন্তু মনে মনে স্বীকার করল জোজোটার বুদ্ধি আছে। অরিন্দমের প্রশ্ন করার আসল উদ্দেশ্যটা ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছে।

একটুবাদেই ওরা পৌঁছে গেল শিয়ালদায়। স্টেশনের মধ্যে ঢুকে অরিন্দম টিকিট কাউন্টারের দিকে এগোতে যাচ্ছে, সন্তু তার হাতটেনে ধরে বলল,‘ওদিকে যাচ্ছিস কি রে! আমাদের তো টিকিট লাগবে না। আমরা যাব স্পেশাল কম্পার্টমেন্টে!’

জোজো বলল, ‘চল আগে বড় মামার সঙ্গে দেখা করে আসি।’

‘স্টেশনমাস্টার’ লেখা একটা ঘরের সামনে এসে সে বন্ধুদের বলল, ‘তোরা এখানে দাঁড়া, আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করে ফেলছি।’

দরজার বাইরে একজন বেয়ারা বসে আছে টুলে। তাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই জোজো দরজা ঠেলে গেল ভিতরে। বেয়ারাটি হা হা করে তেড়ে গেল তার পেছনে।

জোজো কিন্তু তক্ষুনি বেরিয়ে এল না। মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। তারপর বেরিয়ে এল হাসতে হাসতে।

সন্তু ভাবল, ‘তাহলে সত্যিই কি জোজোর এত চেনাশুনো?

জোজো কাছে এসে বলল, ‘একটা মজার ব্যাপার হয়েছে রে। আমার বড়মামাকে প্রাইম মিনিস্টার কি জন্য যেন ডেকেছেন। উনি তো দিল্লি চলে গেছেন কাল।’

অরিন্দম বলল, ‘তুই যখন দরজা ঠেলে ঢুকলি , তখন দেখলুম যে, ওদিকের চেয়ারে একজন বসে আছেন!’

জোজো বলল, ‘হ্যাঁ, উনি তো এখন অ্যাকটিং। ওঁকেও আমি খুব ভাল চিনি। উনি কি বললেন জানিস? আমাদের সোনারপুর যাওয়ার কথাটা উড়িয়েই দিলেন। উনি একটু বাদেই ইনস্পেকশনে দমদম যাবেন, আমাদেরও সেই সঙ্গে যেতে বললেন। যাবি দমদম?’

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, ‘দমদমেও সিংহ আছে নাকি?’

জোজো বলল, 'দমদম গেলে আমি তোদের ভাল চমচম খাওয়াতে পারি। একটা দোকান চেনা আছে।'

অরিন্দম বলল, 'কোথায় সিংহ আর কোথায় চমচম। আমি ভাই সিংহ দেখব বলে বাজি ফেলেছি।'

সন্তু বলল, 'আমিও ভাই সিংহ দেখার জন্য এসেছি।'

জোজো এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল,'ঠিক আছে, তা হলে সোনারপুরই যাওয়া যাক। এইটুকু তো মোটে রাস্তা, কতই বা টিকিটের দাম হবে। তোদের কাছে কত টাকা আছে রে?'

সন্তু অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা অবশ্য বিনা পয়সায় ট্রেনে যাওয়া নিয়ে কোনও বাজি ফেলিনি।'

অরিন্দম বলল, 'স্টেশনমাস্টার প্রাইম মিনিস্টার না রেল-মিনস্টার কার কাছে যাবে, সে-বিষয়েও আমাদের তর্ক তোলা উচিত নয়।'

সন্তু বলল,'আমরা সোনারপুরে সিংহ দেখতে চাই।'

অরিন্দম বলল, 'দ্যাট্স রাইট। তার সঙ্গে হাতি প্লাস উট।'

সন্তুর কাছে দু'টাকা আছে। অরিন্দমের কাছে একটা পাঁচ টাকার নোট। জোজো বলল, 'দে, দে, ওতেই হয়ে যাবে।'

অরিন্দম বলল, 'ফেরার ভাড়া রাখতে হবে।'

জোজো বলল, 'ফেরার জন্য চিন্তা করিস না। ওখানে আমার ছোট মেসোমশাই থাকেন. তাঁর গাড়িতে ফিরে আসব।'

বহু দূর দুর্গম জায়গা ঘুরে এলেও সন্তুর এই সামান্য দূরের একটা জায়গা ট্রেনে করে যাওয়ার চিন্তায় বেশ উত্তেজনা হচ্ছে। দেখাই যাক না জোজোর গুলের দৌড় কতদূর যায়।

টিকিট কাটার পর প্ল্যাটফর্ম খুঁজে-খুঁজে ওরা সোনারপুর লোকাল দেখতে পেল। দুপুর বেলায় ট্রেন একবারে ফাঁকা।

ট্রেনটা ছাড়ার পর সবে মাত্র একটু দূর গেছে, এমন সময় জোজো জিভ কেটে বলে উঠল, 'এই রে, এতক্ষণে মনে পড়েছে! জায়গাটা তো সোনারপুর নয়। আমরা ভুল ট্রেনে চেপেছি।' ট্রেনের একটা পাখা দারুণ শব্দ করে ঘুরছে। আর তিনটে পাখার জায়গায় কিছুই নেই। কামরার মেঝেতে অনেক মুড়ি ছড়ানো। কারুর হাত থেকে বোধহয় মুড়ির ঠোঙা পড়ে গিয়েছিল। সন্তু, জোজো আর অরিন্দম দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, যদিও বসবার জায়গা খালি আছে অনেক। বাইরে থেকে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা একজন লোক বসে বসে শশা খাচ্ছে। সেই লোকটি বলল, 'আপনারা বসুন না, শুধু শুধু ভিজছেন কেন?'

জোজো বলল, 'আমরা ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছি। আমরা যাব বারুইপুর, এটা তো সোনারপুরের ট্রেন।'

সন্তু আর অরিন্দম চোখাচোখি করল। জোজোর চালাকি শুরু হয়ে গেছে। সিংহ হাতি দেখাবার নাম করে কলা দেখাবে। এতক্ষণ সোনারপুর বলছিল, এবারে বারুইপুর হয়ে গেল। এরপর সিংহ হয়ে যাবে বেড়াল আর হাতি হয়ে যাবে ছাগল।

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, 'বারুইপুর যাবেন? তার জন্য কি ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়তে হবে নাকি? বসুন, এ ট্রেনেও যাওয়া যাবে।'

ওরা তিনজনে এবারে এসে বসল।

সন্তু ভাবল, 'ওই দাড়িওয়ালা লোকটি নিশ্চয় এদিকেই থাকে। সোনারপুরের সিংহ-হাতির কথা জিজ্ঞেস করলে, ও নিশ্চয়ই বলতে পারবে।'

সন্তু তবু কিছু জিজ্ঞেস করল না। সে আবার ভাবল, 'থাক। ট্রেনে যখন উঠে পড়াই গেছে, তখন শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কি হয়!'

দাড়িওয়ালা লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা বারুইপুরে কোথায় যাবেন?'

জোজো বলল, 'অংশুমান চৌধুরীর বাড়ি, আপনি চেনেন? ওয়ার্ল্ড ফেমাস সায়েন্টিস্ট!'

লোকটি দুদিকে মাথা নেড়ে জানাল যে, চেনে না।

সন্তু আবার তাকাল অরিন্দমের দিকে। বারুইপুরে শুধু সিংহই থাকে না, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরাও থাকে! জোজোর স্টকে আরও কত কী আছে!

জোজো ওদের দিকে ফিরে বলল, 'তোদের আগে এই অংশুমান চৌধুরীর কথা বলিনি, না? আমার পিসেমশাই হন। উনি কি করেছেন জানিস? সাইবেরিয়াতে বরফের তলায় সাত ফুট খুঁড়ে কয়েকটা গমের দানা পাওয়া গিয়েছিল। তার মানে ওখানে গমের খেত ছিল,কোনও একসময় বরফ চাপা পড়ে দিয়েছিল। ওই গমের দানাগুলো দশ হাজার বছরের পুরনো।'

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, ' কি করে জানল, ওই গমের দানাগুলো, অত বয়েস?'

জোজো বলল, 'ওসব টেস্ট করে বলে দেওয়া যায়। মাটির তলা থেকে যে কয়লা তোলা হয়, তাও টেস্ট করে বলা যায় কতদিনের পুরনো।'

সন্তু মাথা লাড়ল। এটা জোজো বানিয়ে বলছে না। কাকাবাবুর কাছ থেকে সে কার্বন টেস্টের কথা শুনেছে।

সে জোজোকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর পিসেমশাই ওই গমের দানাগুলো সাইবেরিয়া থেকে খুঁড়ে বার করেছেন?'

জোজো বলল,'না, উনি খুঁড়ে বার করেননি। তা করেছে ওখানকার লোকেরাই। পিসেমশাই সাংঘাতিক কান্ড করেছেন। উনি ওই দশ হাজার বছরের পুরনো গমের দানা মাটিতে পুঁতে গাছ তৈরি করেছেন। সেই গাছে আবার গম ফলেছে।'

অরিন্দম বলল, 'তাতে কি হয়েছে?'

জোজো বলল, 'তুই বুঝতে পারছিস না? কত বড় ব্যাপার! দশ হাজার বছরের পুরনো গম থেকে আবার গাছ হল!'

অরিন্দম বলল, 'ধুস্! এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। গম পুঁতেছে, তা থেকে আপনা আপনি গাছ হয়েছে। এতে তোর পিসেমশাইয়ের কৃতিত্বটা কি? তিনি কি ফুঁ দিয়ে দিয়ে গাছটা বড় করেছেন!'

জোজো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুই এসব বুঝবি না!'

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, 'ধান চাষের চেয়ে গমের চাষ অনেক সহজ।'

অরিন্দম বলল,'জোজো, তোর ওই পিসেমশাই আর কি কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন শুনি?'

জোজো বলল, 'তোরা অ্যামির ধূমকেতুর নাম শুনেছিস?'

অরিন্দম বলল, 'সেটা আবার কি, হ্যালির ধূমকেতুর ছোট ভাই নাকি?'

জোজো বলল, 'ঠিক তাই। তবে ছোট ভাই না বলে বড় ভাই বলতে পারিস। এই ধূমকেতুটা পৃথিবীতে ফিরে আসবে দুশো ছ'বছর অন্তর অন্তর। আমার পিসেমশাই এটা আবিষ্কার করেছেন। দেখিসনি সব কাগজেই তো খবরটা বেরিয়েছিল!'

জোজো সন্তুর দিকে সরু চোখে তাকাল। অর্থাৎ সে বুঝিয়ে দিতে চায়, শুধু তার বাবা নয়, পিসেমশাইও সন্তুর কাকাবাবুর চেয়ে অনেক বেশি বিখ্যাত।'

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, 'ওই ধূমকেতুটার নাম অ্যামি কেন?'

জোজো বলল,'পিসেমশাইয়ের নাম অংশুমান, মানে এ,এম.। তার থেকে অ্যামি।'

অরিন্দম বলল, 'নামটা একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে। নাম দেওয়া উচিত ছিল চৌধুরী'জ কমেট। যাক গে! উনি আর কি আবিষ্কার করেছেন?'

জোজো বলল, 'এরকম অনেক আছে!'

অরিন্দম বলল, 'উনি আকাশে ধূমকেতু আবিষ্কার করেছেন। আবার বরফের তলা থেকে গমের দানা বার করেছেন। প্রফেসার শঙ্কু নাকি?'

জোজো বলল, 'প্রফেসার শঙ্কু তো ফিকটিশাস্ ক্যারেকটার। আমার পিসেমশাইকে বারুইপুরে গেলেই দেখতে পাবি।'

'উনিই বুঝি সিংহের পিঠে চেপে রোজ হাওয়া খেতে যান?'

'সিংহের সঙ্গে ওঁর কোনও সম্পর্কই নেই। উনি জন্তু-জানোয়ার একদম পছন্দ করেন না। এমনকি, বেড়াল দেখলেও ভয় পান। একবার কি হয়েছিল জানিস? পিসেমশাইকে কেনিয়া থেকে ডেকেছেন খুব জরুরী কাজে। উনি যেতে রাজি হলেন না। কারণ, নাইরোবি শহরে যখন তখন সিংহের গন্ধ পাওয়া যায়।'

'সন্তু, তুই তো কাকাবাবুর সঙ্গে একবার নাইরোবি গিয়েছিলি না?'

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, দু'বছর আগে।'

'কি হয়েছিল রে সেখানে?'

সন্তু বলল, 'এখন আমার সেটা বলতে ইচ্ছে করছে না। জোজো একবার প্রশান্ত মহাসাগরের কোন্ দ্বীপে গিয়েছিল ওর বাবার সঙ্গে, সেই গল্পটা বরং শোনা যাক।'

ট্রেন এসে থেমেছে বালিগঞ্জ স্টেশনে।

জোজো জানালায় মুখ রেখে বলল, 'দ্যাখ এদিকে বৃষ্টি নেই। একটু বাদাম কেন না, অরিন্দম। বেশ খিদে পেয়ে গেছে।'

ট্রেন থামা মাত্রই ছেড়ে দেয় বলতে গেলে। অরিন্দম একটা বাচ্চা বাদামওয়ালাকে ডাকতেই সে লাফিয়ে কামরায় উঠে পড়ল।

সন্তু বলল,'এদের কি মজা তাইনা? টিকিট কাটতে হয় না, যখন যে ট্রেনে ইচ্ছে উঠে পড়ে, যে-কোনও স্টেশনে নেমে পড়ে।'

অরিন্দম বলল, 'আমারও ইচ্ছে করে এরকম ট্রেনে-ট্রেনে ঘুরে বেড়াতে। কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে বাদাম বিক্রির কাজ নিলে কেমন হয়?'

সন্তু বলল, 'তাতে তোর একটা ক্ষতি হবে এই যে, তুই জোজোর গল্পগুলো শুনতে পাবি না।'

অরিন্দম বলল, 'সেটা একটা বিরাট ক্ষতি।'

জোজো বলল, 'আমি গল্প বলি না, আমি যা বলি সব সত্যি।'

তিন ঠোঙা বাদাম কেনা হল। এই স্টেশনে ওদেরই বয়েসি আর কয়েকটা ছেলে উঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শুরু করে দিল খেলার আলোচনা। সন্তুদের আর গল্প জমল না। ওরাও শুনতে লাগল সেই গল্প।

সন্তুর শুধু ভয় হতে লাগল, এই ছেলেগুলোর সামনে জোজো যদি হঠাৎ বলে বসে যে, সুনীল গাভাসকার যে বার ব্রাডম্যানের চেয়ে বেশি সেঞ্চুরী করল সেবারে সে ওর বাবার কাছ থেকে মাদুলি নিতে এসেছিল, কিংবা কপিলদেব এখন ওদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে, তা হলে এরা কি শুধু হাসবে না চাঁটি মারতে শুরু করবে।

জোজো অবশ্য মুখ খুলল না। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। তার চোখ বোজা।

অরিন্দম একটু পরে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'এই জোজো, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

জোজো যেন মুখে মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল, 'না রে, আমি কখনো দিনের বেলা ঘুমোই না। তবে মাঝ-মাঝে চোখ বুজে একটু ধ্যান করে নিই।'

'ধ্যান করিস ? কেন?'

'তোরা ধ্যান করার উপকারিতা তো জানিস না। মাঝে-মাঝে করে দেখলে পারিস। ঠিকমতন ধ্যান করা শিখলে চোখ বুজে ভবিষ্যতের অনেক জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।'

'মহা ঋষি মহেশ যোগী তোর কাকা না মামা কি যেন?'

'তুই অনেকটা ঠিক ধরেছিস। মহেশ যোগী আমার জ্যাঠামশাইয়ের গুরুভাই। আমার জ্যাঠামশাই-ই তো মহেশ যোগীকে সব কিছু শিখিয়েছেন।'

'তোর জ্যাঠামশাই কোথায় থাকেন?'

'গত কুড়ি বছর ধরে আমার জ্যাঠামশাইকে দেখতে পাওয়া যায়নি। উনি মহেশ যোগীকে সব কিছু শিখিয়ে দিয়ে হিমালায়ের আরও গভীরে চলে গেছেন। শুনেছি, এভারেস্টের ঠিক নিচেই থাকেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কে যেন বলেছিল, তোর জ্যাঠামশাই দুটো ইয়েতি পুষেছিলেন। লোকে যেমন বাড়ি পাহারা দেবার জন্য কুকুর পোষে, সে রকম তোর জ্যাঠামশাইও তাঁর গুহা পাহারা দেবার জন্য দুটো ইয়েতিকে রেখেছিলেন। সন্তু, তুই শুনিসনি?'

জোজো এমনভাবে একটা অবজ্ঞার হাসি দিল, যেন অরিন্দম নিছক একটি শিশু। তারপর বলল, 'তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস? ইয়েতি বলে আবার কিছু আছে নাকি? সন্তু ওর কাকাবাবুর সঙ্গে একবার নেপাল থেকে কোথায় যেন গিয়েছিল, তারপর ফিরে এসে ইয়েতি সম্পর্কে গাঁজাখুরি গল্প রটিয়েছিল! আমার জ্যাঠামণি কোনদিন ইয়েতি দেখেননি!'

সন্তু বলল, 'বারুইপুরে যদি আমরা সিংহ, হাতি, উট দেখতে পাই, তা হলে সেটা হবে ইয়েতি দেখার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার।'

জোজো বলল, 'বাজি তো ধরাই আছে, আর একটুখানি ধৈর্য ধরে থাক!'

অরিন্দম বলল, 'ওর পিসেমশাইকেও দেখে আসতে হবে।'

গড়িয়া স্টেশনে একসঙ্গে অনেকে নেমে গেল। দাড়িওয়ালা লোকটি এখন একটা খবরের কাগজ পড়ছে। বাইরের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এদিকটায় আজ এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। মাটি একেবারে শুকনো।

সন্তু জানালা দিয়ে দেখছে বাইরের দৃশ্য। জোজো আর অরিন্দম কি কথা বলছে সে আর শুনছে না মন দিয়ে। সিংহ দেখা যাক বা না যাক, ট্রেনে করে এই যে হঠাৎ খানিকটা ভ্রমণ হল, তাই-ই বা মন্দ কী! সন্তুর বেশ ভালই লাগছে।

লাইন সারান হচ্ছে বলে এখান দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে আস্তে আস্তে। দুদিকেই ফাঁকা মাঠ, একদিকে ট্রেনের লাইন ঘেঁষে একটা সরু রাস্তা। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় সন্তু চমকে উঠল।

মুখ ফিরিয়ে সে দেখল জোজো আর অরিন্দম যেন কী নিয়ে তর্কে মেতে উঠেছে। সন্তু জোজোর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'তুই কি বারুইপুরে আমাদের ভাল্লুক দেখাবার কথাও বলেছিলি?'

জোজো মাথা নেড়ে গম্ভীর ভাবে বলল, 'না, তা বলিনি। ওখানে ভাল্লুক নেই।'

সন্তু জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ আছে। তুই জানিস না। ওই দ্যাখ ভাল্লুক!' সবাই ছুটে এসে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। কিন্তু অরিন্দম বা জোজো কিছুই দেখতে পেল না। জোজো তো ধরেই নিয়েছে যে, সন্তু মিথ্যে কথা বলছে তাদের চমকে দেবার জন্য, অরিন্দম অবশ্য সন্তুকে অবিশ্বাস করে না। সন্তু একেবারে বাজে কথা বলবে না। ওরা দু'জনেই বলতে লাগল, 'কই? কই?' ট্রেনটা এত আস্তে যাচ্ছে যে চলছে কিনা

বোঝাই যায় না। লাইনের ধারে ধারে কাজ করছে কয়েকজন লোক। ঝাঁঝাঁ করছে রোদ। এর মধ্যে একটা ভাল্লুক দেখতে পাওয়ার চিন্তাটাই অসম্ভব বলে মনে হয়।

সন্তু বলল, 'দেখতে পাচ্ছিস না? ওই যে ওই বড় গাছটার নিচে .. ভাল করে চেয়ে দ্যাখ!'

দৃশ্যটা অতি সুন্দর। একটা ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছের গোড়ায় বসে আছে একজন আধবুড়ো লোক, তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে একটা ভাল্লুক। ভাল্লুকটার গায়ের রোঁয়া উঠে গেছে খাব্‌লা খাব্‌লা। লোকটার এক হাতে একটা ডুগডুগি, আর এক হাতে সে ভাল্লুকটার মাথা চাপড়ে দিচ্ছে, ঠিক যেন ঘুম পাড়াচ্ছে।

বোঝাই যায় যে, এই লোকটা ভাল্লুক-নাচের খেলা দেখায়। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই গাছতলায় বিশ্রাম নিচ্ছে। এই দুপুরের রোদ্দুরে কেইবা ভাল্লুক-নাচ দেখবে।

জোজো বলল, 'ধুস, এই একটা ঘেয়ো মার্কা ভাল্লুক! তুই এমন চমকে দিয়েছিলি, সন্তু।'

অরিন্দম বলল, 'তুই বুঝি বারুইপুরে আমাদের তাগড়া তাগড়াজোয়ান সিংহ দেখাবি? যদি শেষ পর্যন্ত দেখাতে পারিস তো দেখব একটা সার্কাসের একটা হাড়-জির-জিরে সিংহ!'

জোজো বলল, 'কতবার বলছি না, সার্কাসের নয়! সার্কাসে বাঘ কিংবা হাতি থাকে, কিন্তু কোনও সার্কাসে সিংহের খেলা দেখেছিস? ওরা সিংহ পাবে কোথায়! সিংহ কি আর গাছে ফলে!'

সন্তু বলল, 'বারুইপুরের গাছে সিংহ ফলে নিশ্চয়ই!'

অরিন্দম বলল, 'একি, ট্রেনটা যে একেবারে থেমে গেল।'

সত্যিই ট্রেনটা থেমে গেছে। কামরায় অন্য যে সব ছেলেরা একটু আগে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খেলার আলোচনা করছিল, এখন তারা সবাই চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। ওদের অভ্যেস আছে। ওরা নিশ্চয় জানে যে, প্রতিদিন এখানে ট্রেন থেমে যায়।

জোজো বলল, 'এই রে, ট্রেন এইভাবে টিকটিকিয়ে চললে যে বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে! তোরা তো কেউ বাড়িতে কিছু বলে আসিস নি!'

সন্তু বলল, 'সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হবে!'

অরিন্দম বলল, 'তা হলে আর কি হবে, চল ট্রেন থেকে নেমে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করি। এখন থেকে হাঁটলে সন্ধের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব নিশ্চয়ই। আজ আর সিংহ-টিংহ দেখার দরকার নেই। কী রে, সন্তু তাই করবি?'

জোজো বলল, 'তোরা যদি হাঁটতে চাস, আমার আপত্তি নেই। আমি একবার চার ঘন্টায় তিরিশ মাইল হেঁটে গিয়েছিলাম।'

অরিন্দম হো-হো করে হেসে উঠে সন্তুকে বলল, 'দেখলি, জোজো জানত এ লাইনে ট্রেন বেশি দূর এগোয় না। সিংহ-টিংহ সব ফক্কা!'

জোজোও হেসে উঠল একই রকমভাবে।

অন্য যাত্রীরা দু'একজন ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল ওদের দিকে। এরা এরকম পাগলের মতন হাসছে কেন?

ট্রেনটা হঠাৎ আবার চলতে শুরু করে দিল। জোজো হাসি বন্ধ না করেই বলল, 'তাহলে আমাদের ফেরা হচ্ছে না!'

এক সময় ওরা পৌঁছে গেল বারুইপুর স্টেশনে। জোজোর মুখে কিন্তু কোনও উদ্বেগের ছায়া নেই। এবার যে তার জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। তার জন্যও ভয় নেই ওর।

ওদের মধ্যে শুধু অরিন্দমের হাতেই ঘড়ি আছে। জোজো বলল, 'কটা বাজে দ্যাখ তো।'

অরিন্দম বলল, 'দুটো পনেরো!'

জোজো বলল, 'ওঃ, ঢের সময় আছে। আমরা ঠিক সময়েই বাড়ি ফিরে যেতে পারব। ভয় নেই, তোদের হেঁটে যেতে হবে না!'

স্টেশন থেকে বেরিয়ে জোজো বলল, 'দুটো রিকশা নিতে হবে। সন্তু আর অরিন্দম একটা রিকশায় ওঠ, আমি আর একটাতে উঠছি।'

নিজের রিকশায় উঠে জোজো বেশ জোরে জোরে বলল, 'যে বাড়িতে সিংহ আছে, সেই বাড়িতে চল তো?'

রিকশাওয়ালার চোখ বড় বড় হল না, মুখ হাঁ হল না, সে কোনও প্রতিবাদ করল না। ঘাড় নেড়ে প্যাডেলে চাপ দিল।

সন্তু আর অরিন্দমেরই বিস্ময়ে চোখ গোল গোল হয়ে গেল। তা হলে এখানে সত্যিই সিংহ আছে নাকি? বাড়িতে পোষা সিংহ?

সাইকেল রিকশা চলতে লাগল অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে। তারপর আমাদের আগেকার আমলের মস্ত বড় একটা বাড়ির গেটের সামনে এসে থামল। জোজো আগের রিকশা থেকে নেমে মুখ ঘুরিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করল, 'গন্ধ পাচ্ছিস?'

সত্যিই বাতাসে একটা জন্তু জন্তু গন্ধ ভাসছে।

লোহার গেট পেরিয়ে একপাশে একটা বেশ উঁচু ঘর। তার সামনেটা লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা। তার ভেতরে তাকাবার আগেই ওরা শুনতে পেল সিংহের চাপা গর্জন।

ভেতরে রয়েছে একখানা তাগড়া, জ্যান্ত সিংহ। মোটেই রোগা, হাড়-জিরজিরে নয়, সোনালি রঙের গা, মাথাভর্তি কেশর।

সন্তু আর অরিন্দম বিস্ময়ে কিংবা লজ্জায় কথাই বলতে পারছে না।

একটু বাদে অরিন্দম বলল, 'জোজোর মুখে সত্যি কথা? বাজি হেরে গেছি, তা স্বীকার করছি! কিন্তু এখনও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। হ্যাঁ রে, জোজো, এটা কি ম্যাজিক নাকি?'

জোজো বলল, 'ঠিক ধরেছিস! এটা কার বাড়ি জানিস? এটাকে ম্যাজিকের বাড়ি বলতে পারিস। এটা পি. সি. সরকার, জুনিয়ারের বাড়ি, তিনিই এই সিংহটা পুষেছেন।'

'সিংহ পুষেছেন? এখানে তিনি সিংহ পেলেন কোথায়?'

'আফ্রিকার কোনও রাজা কিংবা প্রেসিডেন্ট ওঁকে একটা বাচ্চা সিংহ প্রেজেন্ট করেছিলেন, সেটাকেই তিনি খাইয়ে-দাইয়ে এত বড় করেছেন।'

'উনি ম্যাজিকে এই সিংহটা অদৃশ্য করে দিতে পারেন?'

'ওঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। এইবার চল, তোদের হাতি আর উট দেখাব! সাইকেল রিকশা দুটোকে সেইজন্য ছাড়িনি।'

'থাক, থাক, আর কিছু দেখাবার দরকার নেই।'

'না, না, না তোদের দেখতেই হবে। তোরা আমার কথা অবিশ্বাস করেছিলি। ভেবেছিলি জোজো সবসময় গুল মারে, তাই না?'

সন্তু ভাবল, জোজো আসলে খুব চালাক ছেলে। সবাই ওর কথা অবিশ্বাস করে বলে, মাঝে-মাঝে জোজো দু-একটা অদ্ভুত ধরনের সত্যি কথা বলে সবাইকে চমকে দেয়। এখন জোজোর কাছে বাজি হেরে যাবার পর ওরা যদি শোনে যে, জোজো ওর বাবার সঙ্গে একবার মঙ্গল গ্রহ ঘুরে এসেছে, তাহলে কি চট করে উড়িয়ে দিতে পারবে?

গেট থেকে বেরিয়ে জোজো বলল, 'এর আগেরবার যখন এই সিংহটা দেখতে আসি, তখন কি হয়েছিল জানিস?'

অরিন্দম বলল, 'সিংহটা খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছিল আর তুই খালি হাতে ওকে পোষ মানিয়েছিলি? তা হতে পারে, হতে পারে, আমি তোকে আর অবিশ্বাস করছি না রে জোজো।'

জোজো পাতলা হেসে বলল, 'না, সে রকম কিছু হয়নি। তোর যত সব অদ্ভুত ধারণা! সেবার আমরা বাবার সঙ্গে এসেছিলুম। আমার বাবা তো সব জীবজন্তুর ভাষা জানেন। বাবা এই সিংহটার সঙ্গে এক ঘন্টা আলাপ করে আফ্রিকা সম্পর্কে অনেক নতুন খবর জেনে নিয়েছিলেন।'

সন্তু হাসি চাপতে পারল না। জোজো এখন যা ইচ্ছে বলে যাবে। প্রতিবাদ করার উপায়নেই। সে তবু বলল, 'তোর বাবা কিভাবে সিংহের সঙ্গে কথা বললেন? হালুম হালুম করে?'

জোজো বলল 'তুই একটা ইডিয়েট! জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে চ্যাঁচামেচি করতে হয় না। মনে মনে বলতে হয়, অবশ্য ভাষাটা জানতে হয়।'

সন্তু হার স্বীকার করে বলল, 'ও!'

অরিন্দম বলল,'সেবার আর কি হয়েছিল?'

জোজো বলল, 'আর বিশেষ কিছু হয়নি। চল হাতি দেখতে যাবি চল!'

খানিক দূরের আর একটা ঘরে রয়েছে একটা হাতি। দুটি পা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। হাতিটা তখন মনের আনন্দে একটা কলাগাছ খাচ্ছে।

জোজো বলল, 'এটার পিঠে চাপবি?'

সন্তু আর অরিন্দম দু'জনেই একই সঙ্গে বলে উঠল,'না, না, দরকার নেই।'

জোজো বলল, 'কোনও অসুবিধে নেই। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভয়েরও কিছু নেই।'

সন্তু আর অরিন্দম দু'জনে আবার জোর দিয়ে 'না' বলল।

জোজো বলল,'হ্যাঁ বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আগেরবার আর একটা কান্ড হয়েছিল! আগের বার ভুলে এই হাতিটার পিঠে চেপেই আমার পিসেমশাইয়ের বাড়ি চলে গিয়েছিলুম। তার ফলে গুলি খেয়ে মরছিলুম আর একটু হলে!'

সন্তু বলল, 'কেন? কে গুলি করতে এসেছিল?'

'বাঃ,তোদের বলিনি যে আমার পিসেমশাই জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারেন না! ওঁর বাড়িতে গোরু-ছাগল ঢোকে না, উনি কুকুর পোষেন না। বেড়াল নেই, ইঁদুর নেই, এমনকি আরশোলাও নেই।'

অরিন্দম বলল, 'আরশোলাও নেই সে বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, আরশোলাও নেই, সত্যি!'

'তা হলে তো দারুণ কান্ড করেছেন বলতে হবে। আরশোলা তাড়ান কি সোজা কথা; শুনেছি অ্যাটমবোমায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও আরশোলারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না!'

'আমার পিসেমশাই একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, তার ভাইব্রেশানে আরশোলা পোকামাকড়ও সব মরে যায়।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল,·'তোর পিসেমশাই তোকে দেখতে পেয়েও গুলি করতে এসেছিলেন?'

জোজো বলল, হয়তো আমাকে চিনতে পারেননি। আমি হাতির পিঠে চেপে ও বাড়ির গেটের দিকে এগোচ্ছি! এমন সময় শুনতে পেলুম ছাদের ওপর থেকে উনি চেঁচিয়ে বললেন, 'আর এক পা এগোলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব গুলি করে!' আসলে অবশ্য কথাটা উনি নিজে বলেননি। ছাদে একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র ফিট করা আছে। কেউ কোনও জীব-জন্তু নিয়ে ওই বাড়ির একশ গজের মধ্যে এলেই ওই যন্ত্র থেকে আপনি আপনি ওই রকম ভয়-দেখানর কথা বেরিয়ে আসে।'

সন্তু উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'চল, তোর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

জোজো বলল, 'এখনও যে উট দেখা বাকি আছে?'

সন্তু অরিন্দম আর উট দেখতে রাজি নয়। তারা বাজিতে হেরে গেছে। তারা এখন অংশুমান চৌধুরীকে দেখতে চায়।

জোজো বলল, 'চল তা হলে।'

বাড়িটা আধখানা নতুন, আধখানা পুরনো। পুরনো বাড়িটার মাঝখান দিয়েই নতুন একটা দোতলা বাড়ি উঠেছে, সেই বাড়িটার রং হলদে, আর পুরনো অংশটার দেওয়ালে শ্যাওলা জমে আছে। সেদিককার দেওয়াল ফাটিয়ে উঠেছে একটা বেশ তেজী অশথ্ গাছ। গাছটা বাড়ির ছাদটার কাছে ছাতার মতন হয়ে আছে। বাড়ির ছাদে টিভি অ্যান্টেনা ছাড়া আরও যন্ত্রপাতি রয়েছে।

বাড়ির লোহার গেটটা মস্ত বড়, কিন্তু মর্চে ধরা। ওপরের দিকে বর্শা-বর্শা করা ছিল, তার মধ্যে ভেঙে গেছে কয়েকটা। গেটটা আধখানা খোলা, কাছাকাছি কেউ নেই। ভেতরে দেখা যায় খানিকটা বাগানের মতন, সেখানে একটা নাদুস-নুদুস চেহারার গোরু আপন মনে ঘাস খাচ্ছে।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে, তোর পিসেমশাইয়ের বাড়িতে ঢুকতে গেলে কি আগেথেকে খবর দিতে হয়? ছাদ থেকে কেউ গুলি-টুলি করবে না তো!'

জোজো একটু ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বলল, 'না, না, আমার নিজের পিসেমশাইয়ের বাড়ি। আমি যখন খুশি যেতে পারি। তবে, কথা হচ্ছে ..'

জোজো থেমে যেতেই অরিন্দম বলল, 'তবে মানে?'

সে ভয়ে-ভয়ে ছাদের দিকে তাকাল।

জোজো বলল, 'আমি ভাবছি লোহার গেটটা ইলেকট্রিফায়েড ছিল। হাত দিলেও যদি শক্ মারে?'

সন্তু ভেতর দিকটা দেখেছিল। সে বলল, 'এই জোজো, তুই যে বললি তোর পিসেমশাই কোনও জন্তু-জানোয়ার পছন্দ করেন না, বাড়িতে গোরু-ছাগল ঢোকে না? ওই যে দেখছি একটা গোরু?'

জোজো বলল, 'তাই তো।'

সন্তু বলল, 'এটাকে তো বাইরের গোরু মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে পোষা!'

অরিন্দম বলল, 'হ্যাঁরে, এটা ঠিক তোর পিসেমশাইয়ের বাড়ি তো? ভুল করে অন্য বাড়িতে আসিসনি?'

জোজো বলল, 'বাঃ, আমার পিসেমশাইয়ের বাড়ি আমি চিনব না? কতবার এসেছি! হ্যাঁ, গোরুটার কথা মনে পড়েছে। পিসেমশাই তো খাঁটি দুধ খেতে ভালবাসেন, তাই গোরুটা পোষা হচ্ছে। তবে প্রত্যেকদিন সকালে এই গোরুটাকে কার্বলিক অ্যাসিড মাখিয়ে চান করানো হয়।'

সন্তু বলল, 'তারপর বোধহয় পাউডারও মাখান হয়। দেখছিস না ওর গা'টাকেমন ধপধপ করছে!'

জোজো চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'কেষ্ট! কেষ্ট!'

কয়েকবার এই রকম ডাকার পর বাড়ির ভেতরের দরজা খুলে একজন মাঝবয়েসি মহিলা মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

জোজো বলল, 'কেষ্ট আছে?'

মহিলাটি এবারে বেরিয়ে এলেন। লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা, হাতে একটা কাটারি। তিনি বললেন, 'কেষ্ট আবার কে? ও নামে তো কেউ এখানে থাকে না!'

সন্তু আর অরিন্দম তাকাল জোজোর দিকে। জোজো বলল, 'এখানে বাগানের যে মালি ছিল ..'

মহিলাটি বললেন, 'বলছি তো কেষ্ট বলে কেউ নেই !'

জোজো বলল, 'তা হলে বোধহয় ওর নাম বিষ্টু!'

'এখানে কেষ্ট-বিষ্টু বলে কেউ থাকে না।'

'ওঃ হো, মনে পড়েছে। তার নাম ভোলানাথ!'

'তুমি কি বাছা এখানে সব ঠাকুর দেবতার নাম করতে এসেছ? ওই নামেও কেউ নেই।'

অরিন্দম ফিসফিস করে সন্তুকে বলল, 'আর দরকার নেই, চল,, ফিরে যাই!' সন্তুও মাথা নাড়ল।

অরিন্দম জোজোর পিঠে হাত দিতেই জোজো হো-হো করে হেসে উঠে হাত দিয়ে ঠেলে খুলে ফেলল লোহার গেটটা। তারপর ভেতরে ঢুকে বলল, 'বিশুর মা, আমায় চিনতে পারছ না। আমি জোজো! পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসছি!'

মহিলাটির ভুরু কোঁচকানো ছিল, আস্তে আস্তে তা সোজা হয়ে গেল। তারপর মুখে হাসি ফুটল। তিনি বললেন, 'ওমা, জোজো! তাই তো, চিনতেই পারিনি, তোমার যে একটু-একটু গোঁপ উঠে গেছে। তারপর ওখানে দাঁড়িয়ে কী সব কেষ্ট-বিষ্টুর নাম বলছিলে!'

জোজো বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, 'আয়!'

তারপর সে মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করল,'পিসেমশাই আছেন তো?'

মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ আছেন। তবে ঘুমোচ্ছেন। রাত্তিরে তো ঘুমোন না, দুপুরে এই সময়টা ঘুমিয়ে নেন। তোমরা ওপরে গিয়ে বোসো গে!'

সন্তু অরিন্দমের দিকে তাকাল। জোজো আজ আগাগোড়াই নতুন কায়দা দেখাচ্ছে। সে এমনভাবে কথা বলছে যেন সন্তু আর অরিন্দম অবিশ্বাস করতে বাধ্য হয়: তারপর সবগুলোই মিলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করে সে কেষ্ট আর বিষ্টুর নাম বলছিল।

বাড়ির ভেতর দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সেখানে টানা একটা বারান্দার মাঝখানে একটা দরজা। সেই দরজা খুলে একটা ছাদ দেখা গেল, সেটা পুরনো বাড়ির অংশ। এই ছাদের ওপরেও ছাতা মেলে আছে অশত্থ গাছটা।

জোজো তার বন্ধুদের নিয়ে এল সেই ছাদে। সেখানে কয়েকটা বেতের চেয়ার ছড়ান রয়েছে। আজ কলকাতায় বৃষ্টি হলেও এখানে কোনও চিহ্ন নেই।

জোজো বলল, 'ব্যাস, আর কোনও চিন্তা নেই। পিসেমশাই আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করে দেবেন। যদি একটু দেরিও হয়, সন্তুর বাড়িতে খবর দিয়ে দেওয়া যাবে টেলিফোনে!'

সন্তু ছাদের একপাশের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দেওয়ালে মুখোমুখি সেঁটে রয়েছে দুটি বেশ তাগড়া চেহারার টিকটিকি। জোজো বলেছিল,ওর পিসেমশাই কোনও পোকামাকড়ও সহ্য করতে পারেন না, এ-বাড়িতে আরশোলাও নেই! তা হলে টিকটিকি রয়েছে কেন? অবশ্য টিকটিকি বাইরে থেকে চলে আসতে পারে। কিন্তু পোকামাকড় না থাকলে টিকটিকি আসবে কেন?

অশত্থ গাছটার ডালেও কিচির-মিচির করছে অনেক পাখি। জোজোর পিসেমশাই পাখি অপছন্দ করলেও কোনও উপায় নেই, আকাশ দিয়ে পাখির ওড়াউড়ি তো তিনি আটকাতে পারবেন না।

জোজো বলল, 'ওই যে বিশুর মা'কে দেখলি, উনি নারকেল-কোড়া, মুড়ি আর চিনি দিয়ে একটা চমৎকার খাবার তৈরি করেন। একটু বলে আসি, তোদের খিদে পায়নি?'

অরিন্দম বলল, 'খুব! শুধু মুড়ি-নারকেল কেন, আর কিছু পাওয়া যাবে না?'

জোজো বলল, 'দেখছি!'

জোজো নিচে নেমে চলে গেল। সন্তু আর অরিন্দম চেয়ারে না বসে দাঁড়াল এসে পাঁচিলের পাশে।

অরিন্দম বলল, 'সন্তু, দেখছিস তো, আজ জোজো তোকে খুব ডাউন দিয়ে দিচ্ছে। যা যা বলছে সব মিলে যাচ্ছে।'

সন্তু বলল, 'জোজোটার সত্যি খুব বুদ্ধি আছে। আমি ভাবছি, ওর পিসেমশাই মানুষটি কেমন হবেন! শুনলাম তো, রাত্তিরে ঘুমোন না, দুপুরে ঘুমোন।'

অরিন্দম বলল, 'বৈজ্ঞানিকরা ওইরকম হয়! একটু পাগল না হলে বোধহয় বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। আইনস্টাইন নাকি অন্য লোককে জিজ্ঞেস করতেন, আমি কি খেয়েছি? আর নিউটন একটা খাঁচায় দুটো পাখি পুষে খাঁচাটার দুটো দরজা বানিয়েছিলেন। বড় দরজা বড় পাখিটার জন্য, আর ছোট পাখিটার জন্য ছোট দরজা!'

সন্তু হেসে উঠল।

অরিন্দম বলল, 'ওর পিসেমশাইয়ের গাড়ি আছে বলল জোজো। গাড়িটা কোথায়? দেখছি না তো!'

জোজো তক্ষুণি ফিরে এসে বলল, 'আসছে, অনেক রকম খাবার আসছে। প্রথমে আসছে ডাবের জল। আয়, চেয়ারে বসি।'

বেতের চেয়ারগুলোতে বসবার পর সন্তু আবার দেওয়ালটার দিকে তাকাল। টিকটিকি দুটো তখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। অদ্ভুত প্রাণী এই টিকটিকি। সারাদিনে যে কতটুকু নড়াচড়া করে তার হিসেব নেই। দুটো টিকটিকি পরস্পরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে কি দেখছে!

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। টিকটিকি দুটো টপটপ করে দেওয়াল থেকে খসে পড়ে গেল মাটিতে। সন্তু অবাক হয়ে গেল। টিকটিকি তো এমনি এমনি পড়ে যায় না। নিচে পড়ে গিয়েও ওরা নড়ছে না।

সন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে আরও অবাক হয়ে গেল। টিকটিকি দুটো পড়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, ওদুটো মরে গেছে।

সন্তু চেঁচিয়ে বলল, 'দ্যাখ, দ্যাখ!'

ওরা দু'জনও উঠে এল সন্তুর কাছে। সন্তু বলল, 'দ্যাখ, দ্যাখ, এই টিকটিকি দুটো হঠাৎ এমনি এমনি মরে গেল!'

জোজো বলল, 'টিকটিকি? এ বাড়ির দেওয়ালে? ও, বুঝেছি, তাহলে পিসেমশাই জেগে উঠেছেন!'

২

অংশুমান চৌধুরী খুব রোগা আর লম্বা একজন মানুষ। গায়ের রং বেশ ফরসা, মাথায় একটাও চুল নেই, দাড়ি-গোঁফ নেই, ভুরুর চুল সব পাকা, কিন্তু সেরকম বুড়ো থুরথুরে নন। চোখ দুটি ঝকঝকে। তাঁর ঘরে অনেককালের পুরনো একটা খাট, যার আর এক নাম পালঙ্ক। খাটটি বেশ উঁচু, একটা টুলের ওপর পা দিয়ে সেটার ওপরে উঠতে হয়। সেটির সারা গায়ে কারুকার্য করা। ঘরের দেওয়ালে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো দুটি ছবি। একটি চাঁদের আর একটি সূর্যের। দরজার পাশের দেওয়ালে, যেখানে আলো-পাখার সুইচ থাকে, সেখানে অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা সুইচ।

অংশুমান চৌধুরী ঘুম থেকে উঠে তামাক খেতে লাগলেন। খাটের মাথার কাছে একটা বেশ বড় গড়গড়া। তার নলটা এত লম্বা যে, অংশুমান চৌধুরী সারা ঘরে পায়চারি করতে করতেও তামাক খেতে পারেন। তিনি পরে আছেন একটা ডোরাকাটা আলখাল্লা আর তঁর পায়ের চটিজোড়া মনে হয় রুপো দিয়ে তৈরি। তিনি ঘুরে ঘুরে তামাক টানতে টানতে একটা গান ধরলেন 'এমন দিন কী হবে মা তারা ..'। প্রত্যেকদিন বিকেলে এই সময় তাঁর গান গাওয়া অভ্যেস। তবে ওই একটি গান ছাড়া তিনি আর কোনও গান জানেন না।

দরজার কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে জোজো জিজ্ঞেস করল, 'পিসেমশাই, আসব?'

দারুণ চমকে গিয়ে অংশুমান চৌধুরী হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'কে?'

জোজো বলল, 'পিসেমশাই, আমি জোজো। হঠাৎ চলে এলাম!'

অংশুমান চৌধুরী যেন বেশ রেগে গিয়ে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হেসে ফেলে বললেন, 'তুই জোজো, তাই না? আমি প্রথমে ভাবলুম

বুঝি দাজু! সে যখন-তখন এসে বড্ড বিরক্ত করে। তারপর তোর কী খবর বল! তোর বাবা আর ক'জন রাজা-উজিরকে খতম করল?'

জোজো বলল, 'পিসেমশাই, আমার কলেজের দু'জন বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।'

অংশুমান চৌধুরী চোখ থেকে চশমাটা খুলে সন্তু আর অরিন্দমকে দেখলেন ভাল করে। তারপর বললেন, 'এস, ভেতরে এস!'

ঘরের মধ্যে মস্ত বড় খাটখানা ছাড়া আর রয়েছে একখানা ইজিচেয়ার। তার ওপরে একখানা সুন্দর কাশ্মিরী শাল জড়ান। সন্তু আর অরিন্দম ভেতরে এসে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

জোজো তার পিসেমশাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'এই, এই, ছুঁস না আমাকে। ছুঁস না। তোর গায়ে কিসের গন্ধ? মনে হল জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ। নিশ্চয়ই ওই সিংহ-টিংহগুলো দেখতে গিয়েছিলি!'

জোজো অপরাধীর মতন মাথা চুলকোতে লাগল।

সন্তু অবাকভাবে তাকাল অরিন্দমের দিকে। জোজোর পিসেমশাইয়ের এত তীব্র ঘ্রাণশক্তি? ওরা সিংহটার কাছে একটুখানি দাঁড়িয়েছিল, তাতেই তাদের গায়ে এত গন্ধ হয়ে গেছে! এরকম কথা সন্তু কখনও শোনেনি।

অংশুমান চৌধুরী নাক কুঁচকে বললেন, 'জানিস না, আমি জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারি না! দ্যাখ, আমার ঘরে কোনও চামড়ার জিনিস নেই। আমি বেল্ট পরি না! চামড়ার জুতো পরি না!'

সন্তু আর অরিন্দম নিজেদের কোমরে হাত দিল। ওরা যদিও বাইরে জুতো খুলে রেখে এসেছে, কিন্তু ওদের কোমরে চামড়ার বেল্ট। এ-ঘরে সত্যিই কোনও চামড়ার জিনিস নেই।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'ইচ্ছে করলে আমি ওই ম্যাজিসিয়ান ছোকড়ার পোষা সিংহ আর হাতিটাতিগুলোকে এখানে বসে বসেই মেরে ফেলতে পারি। ছোকরাকে আমি লাস্ট ওয়ার্নিং দেব। ও যদি ওগুলোকে কলকাতায় নিয়ে না যায়, তাহলে মেরে ফেলতেই হবে।'

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি আমাদের বেল্ট বাইরে খুলে রেখে আসব?'

অংশুমান চৌধুরী সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জোজোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ বন্ধুদের নিয়ে এই বারুইপুরে এলি যে, এখানে কি দেখার আছে?'

জোজো বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করাবার জন্য নিয়ে এসেছি।'

অংশুমান চৌধুরী হেসে বললেন, 'আমার সঙ্গে আলাপ, এই বুড়ো মানুষটার সঙ্গে কথা বলে ওদের কি ভাল লাগবে?'

জোজো বলল, 'আপনি একজন বিশ্ববিখ্যাত মানুষ!'

অংশুমান চৌধুরী হো হো করে হেসে বললেন, 'বিশ্ববিখ্যাত বলছিস কেন? বল্ মহাবিশ্ববিখ্যাত! তা বিশুর মা তোদের কিছু খেতে-টেতে দিয়েছে? মুখচোখ তো শুকিয়ে গেছে দেখছি!'

জোজো বলল, 'হ্যাঁ, আমরা খেয়েছি। পিসেমশাই, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার এই যে বন্ধুটাকে দেখছেন, ওর ডাক নাম সন্তু। ওর কাকার নাম রাজা রায়চৌধুরী। আপনি নাম শুনেছেন? তিনি দু'একটা রহস্যের সমাধান করেছেন বলে কাগজে নাম বেরোয় মাঝে-মাঝে। আর সন্তুর পাশের জনের নাম অরিন্দম। ও আমার সঙ্গে বাজি ফেলে হেরে গেছে। ও বলেছিল .....।'

অংশুমান চৌধুরী এতক্ষণ সন্তু বা অরিন্দমের দিকে ভাল করে তাকাননি। এবারে তিনি সন্তুর মুখের দিকে দারুণ অবাকভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'রাজা রায়চৌধুরী তোমার কাকা? রাজা রায়চৌধুরী মানে সেই যার একটা পা একটু ডিফেকটিভ?'

সন্তু মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানাল।

অংশুমান চৌধুরী নিজের কপালে বাঁ হাত দিয়ে একটা চাপড় মেরে বললেন, 'নিয়তি, নিয়তি! জানতাম একদিন দেখা হবেই?'

তারপর তিনি ঘরের কোণায় গিয়ে কাচের একটা আলমারির পাল্লা খুলে একটা জরি-বসানো টুপি বার করে মাথায় পরলেন। আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখে টুপিটা ঠিকমতন বসাবার চেষ্টা করলেন একটুক্ষণ।

এবারে তিনি সন্তুর একেবারে কাছে চলে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কাকাবাবু কি পুরোপুরি রিটায়ার করেছেন? আজকাল আর কোনও সাড়াশব্দ পাই না?'

সন্তু কিন্তু উত্তর দেবার আগেই জোজো বলল, 'না, উনি রিটায়ার করেননি তো? এই তো কয়েক মাস আগে উনি ইজিপ্টে গিয়েছিলেন, পিরামিডের মধ্যে কি যেন আবিষ্কার করার জন্য। সন্তুও সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুই পাননি সেখানে। কি রে, ঠিক না? এবারে ইজিপ্টে গিয়ে তো তোরা পিরামিডের মধ্যে কিছুই খুঁজে বার করতে পারিসনি। তাই না? সোনাদানা কিছু পেয়েছিলি?'

সন্তু বলল, 'কাকাবাবু গিয়েছিলেন, পিরামিডের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে যেসব ছবি আঁকা আছে, তার ভাষা পড়তে। সোনাটোনা তো খুঁজতে যায়নি। সোনা পেলেও আমরা নিতাম না।'

অংশুমান চৌধুরী ভুরু কুঁচকে বললেন, 'পিরামিডের দেওয়ালের ভাষা? ইয়রোগ্লিফিক্স? রাজা রায়চৌধুরী আবার সে ভাষা পড়তে শিখল কখন? ওটা তো আমার সাবজেক্ট!'

জোজো জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা পিসেমশাই, বাড়ির দেওয়ালে টিকটিকি বা আরশোলা বসলেও আপনি এই ঘরে বসেই মেরে ফেলেন কি করে? সেটা আমাদের একটু দেখান না!'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'ওটা আর এমন কি ব্যাপার। এই যে সুইচ গুলো দেখছিস, এর সঙ্গে প্রত্যেকটা দেওয়ালের সঙ্গে যোগ আছে। যখনই আমি মন দিয়ে কাজ করি, তখন কোনও পোকামাকড়ের খারাপ গন্ধ আমার নাকে এলেই আমি সেই জায়গায় সুইচ টিপে দিই, অমনি সেখানকার মেঝেতে, দেওয়ালে, ছাদে এমনই ভাইব্রেশান হয় যে, কোনও পোকামাকড় আর সেখানে টিকতে পারে না। ছেলেবেলায় একটা কাঁকড়াবিছে আমায় কামড়ে দিল। মানে, ওরা তো কামড়াতে পারে না, হুল ফুটিয়ে দেয়। সেই থেকে আমি কোনও পোকামাকড় সহ্য করতে পারি না।'

জোজো বলল, 'আপনি তো কুকুর-বেড়াল ....'

'একবার একটা কুকুরও কামড়ে দিয়েছিল আমাকে। তখন আমি ঠিক করেছিলুম, পৃথিবী থেকে সব কুকুর ধ্বংস করে দেব! ইচ্ছে করলে ও পারি।

কথাটা শুনে সন্তু একটু শিউড়ে উঠল। তার নিজের একটা পোষা কুকুর আছে। সে কুকুর ভালবাসে। একবার একটা কুকুর কামড়েছে বলে ইনি সব কুকুর ধ্বংস করে দিতে চান!

অংশুমান চৌধুরী আবার সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি আমার এই টুপিপরা চেহারাটা ভাল করে দেখে রাখ। তারপর বাড়ি ফিরে তোমার কাকাবাবুকে আমার কথা বোল! তোমার কাকা রাজা রায়চৌধুরীকে আমি আমার জীবনের প্রধান শত্রু বলে মনে করি। দশ বছর আগে আমাদের দেখা হয়েছিল আফগানিস্তানে। তখন উনি একটা ব্যাপারে আমাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। সে অপমান আমি আজও ভুলিনি। আশা করি, এবারে আবার দেখা হবে। এবারে আমি শোধ নেব!'

তারপর তিনি হেসে সন্তুর কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'তোমার কোনও ভয় নেই। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না!'

৩

জাতীয় গ্রন্থাগারে কাকাবাবু একটা দরকারি বইয়ের খোঁজে এসেছিলেন। এখানে অনেকেই তাঁর চেনা। প্রধান গ্রন্থাগারিক নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। তারপর কাকাবাবু বই দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। সেখান থেকে বেরুতে বেরুতে সন্ধে হয়ে গেল। গেটের বাইরে এসে তিনি একটাও ট্যাক্সি দেখতে পেলেন না। সাধারণত চিড়িয়াখানার সামনে এই সময় অনেক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। পরপর

দুটো বাস এল, তাতে দারুণ ভিড়। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে এরকম ভিড়ের বাসে উঠতে পারেন না। তিনি ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এক সময় একজন মোটাসোটা চেহারার লোক তাঁর সামনে থমকে দাঁড়াল। বিগলিতভাবে হেসে বলল, 'কেমন আছেন, স্যার?'

তারপর সে নিচু হয়ে কাকাবাবুর এক পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

কাকাবাবু খুব বিব্রত বোধ করলেন। তিনি যাকে-তাকে প্রণাম করেন না, যার-তার প্রণাম নেওয়াও পছন্দ করেন না। তিনি একটুখানি পিছিয়ে গেলেন।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কোথায় গেছিলেন, স্যার?'

কাকাবাবু বললেন, 'এই একটু ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ....'

লোকটি কাকাবাবুর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'আপনাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছি, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি দরকার আছে।'

কাকাবাবু এবারে একটু কড়া গলায় বললেন, 'কিন্তু আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। দরকার থাকলে আপনি আমার বাড়িতে এসে দেখা করবেন।'

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ঠিকানাটা ....'

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে দিয়ে বললেন, 'এই যে, এতে আমার ঠিকানা পাবেন।'

লোকটি কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে বলল, 'বাঃ! খুব উপকার হল। দেখা করব একদিন। সত্যি খুব দরকার।'

লোকটি আর দাঁড়াল না, হনহন করে চলে গেল ডান দিকে। কাকাবাবু সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। কে লোকটা, আগে কোথাও দেখেছেন কি না কিছুই মনে পড়ল না।

পুলিশ কমিশনার একদিন কাকাবাবুকে বলেছিলেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, দিনকাল ভাল নয়। আপনি একলা-একলা রাস্তায় বেরবেন না। বিশেষত সন্ধের পর। আপনার তো শত্রু কম নয়, কে কখন প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে, তার ঠিক কী! যদি চান তো আপনার একজন বডিগার্ড ঠিক করে দিতে পারি।'

কাকাবাবু পুলিশ কমিশনারের এই প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সব সময় সঙ্গে একজন বডিগার্ড নিয়ে ঘোরার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। তাঁর ওপর অনেকের রাগ আছে বটে। তিনি অনেক গুপ্তচক্র ভেঙেছেন, অনেক বদমাশকে জেলে ভরেছেন। তাদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁর ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু কাকাবাবুর ধারণা যে-মানুষ নিজে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তার ঘর থেকে বেরনোই উচিত না।

আরও মিনিট পাঁচেক দাঁড়াবার পর কাকাবাবুর ধৈর্য নষ্ট হয়ে গেল। ট্যাক্সি পাবার আর আশা নেই। কাকাবাবু হাঁটতে লাগলেন। ময়দানের দিকে গেলে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

ক্র্যাচে ভর দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে এসে তিনি ব্রিজের ওপর উঠতে লাগলেন। সন্ধে হয়ে এসেছে। রাস্তার দু'দিকে ছুটন্ত গাড়ির হেডলাইট। এইখানটায় কেমন যেন বুনো-বুনো গন্ধ পাওয়া যায়। 'ক্যাঁকাও ক্যাঁকাও' করে কী একটা পাখি ডেকে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে। কাকাবাবু ভাবলেন, অনেকদিন চিড়িয়াখানায় আসা হয়নি। মাঝে-মাঝে এলে মন্দ হয় না। চিড়িয়াখানায় এলে নতুন করে বোঝা যায়, এই পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও কতরকম প্রাণী আছে।

ব্রিজটার মাঝামাঝি যখন এসেছেন, তখন তাঁর পাশে একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সেটা খালি। ড্রাইভারটি মুখ বার করে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, কোথায় যাবেন?'

কাকাবাবু বললেন 'হাওড়া স্টেশনেও যেতে পারি, টালিগঞ্জেও যেতে পারি। যেখানে আমার খুশি।'

ড্রাইভারটি বলল, 'উঠে পড়ুন।'

কাকাবাবু তবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যেখানে যেতে চাইব, সেখানেই যাবেন তো?'

ড্রাইভারটি বলল, 'নিশ্চয়ই!'

কাকাবাবু এবারে দরজা খুলে ভেতরে এসে বললেন, 'আপনি কি দেবদূত? আজকাল তো ট্যাক্সিওয়ালারা সন্ধের পর কোথাও যেতে চায় না!'

ড্রাইভারটি হেসে বলল, 'আমি তো আপনাকে চিনি। আমার গাড়িতে আপনি অনেকবার চেপেছেন। এখন কোথায় যাবেন, বলুন স্যার।'

কাকাবাবু তাকে বাড়ির ঠিকানা জানালেন। তাঁর মনটা খুশি হয়ে গেল। কলকাতা শহরটা তা হলে একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি। পুলিশ কমিশনার তাকে বিপদের ভয় দেখিয়েছিলেন, আবার এরকমও তো হয়, সন্ধেবেলা এক ট্যাক্সিওয়ালা অযাচিতভাবে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চান। কিংবা তিনি খোঁড়া বলেই কি ট্যাক্সিওয়ালাটির মায়া হয়েছে? সেটাও খারাপ কিছু নয়। অনেক সময় তো এরা অসুস্থ লোককেও নিতে চায় না।

বাড়িতে ফিরেও মনটা খুশি-খুশি রইল। দরজা দিয়ে ঢোকার পর তাঁর বউদি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সন্তু তোমার সঙ্গে যায়নি?'

কাকাবাবু বললেন, 'না তো? আমি দুপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরি গিয়েছিলাম।'

বউদি বললেন, 'সাতটা বেজে গেল, সন্তু এখনও ফিরল না!'

কাকাবাবু কিছু না বলে হাসলেন। সন্তু এখন কলেজে পড়ে, মাঝে মাঝে একটু আধটু দেরি তো হতেই পারে। ও তো আর ছোট ছেলেটি নেই।

তিনি উঠে গেলেন ওপরে।

সন্তু ফিরল রাত ন'টার একটু পরে। মায়ের বকুনি ভাল করে না শুনেই সে ছটফটিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, পরে সব বলছি। কাকাবাবুর, সঙ্গে আমার খুব দরকারি কথা আছে।'

দুমদাম করে ওপরে ছুটে এসে সে বলল, 'কাকাবাবু, তুমি অংশুমান চৌধুরীকে চেন? আজ তাঁর সঙ্গে .....'

কাকাবাবু রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে বললেন, 'হাঁপাচ্ছিস কেন? জামাটা ঘামে ভিজে গেছে। যা, আগে জামা-টামা খুলে চান করে আয়।'

কিন্তু সন্তুর এক মিনিটও তর সইছে না। সে এক্ষুনি বারুইপুরের ঘটনাটা কাকাবাবুকে জানাতে চায়। সে আবার কিছু বলার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু আবার বাধা দিয়ে বললেন, 'উঁহু, এখন আমি কিছু শুনতে চাই না। আগে চানটান করে, খাবার খেয়ে, সেই সঙ্গে তোর মায়ের বকুনি খেয়ে তারপর আয়। তখন সব শুনব।'

চেয়ার ঘুরিয়ে কাকাবাবু আবার বই পড়ায় মন দিলেন।

সন্তুকে বাধ্য হয়ে নিচে গিয়ে বাথরুমে ঢুকতে হল। আবার সে ওপরে উঠে এল প্রায় আধঘন্টা বাদে।

কাকাবাবু বললেন, 'বোস! এবার বল, কলেজ থেকে কোথায় গিয়েছিলি?'

সন্তু কাকাবাবুর কাছে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলল, 'দুপুরে কলেজ থেকে আজ হঠাৎ বারুইপুরে চলে গিয়েছিলুম আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে। সেখানে....'

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'ট্রেনে গিয়েছিলি না বাসে?'

সন্তু বলল, 'ট্রেনে। আমার বন্ধু জোজোর পিসেমশাই থাকেন সেখানে। তাঁরই নাম অংশুমান চৌধুরী। তিনি নাকি একজন বৈজ্ঞানিক।'

কাকাবাবু বললেন, 'তারপর, তিনি কি বললেন?'

সন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বলল, 'তুমি তাঁকে চেন না? নাম শুনে কিছু মনে পড়ছে না?'

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'তোর বন্ধুর পিসেমশাইকে আমি চিনব কি করে?'

'উনি যে বললেন, উনি একজন খুব বড় বৈজ্ঞানিক?'

'তা হতে পারে। কিন্তু সব বৈজ্ঞানিককে তো আমি চিনি না!'

'উনি তোমাকে চেনেন। তোমার নাম জানেন!'

'কেমন চেহারা ভদ্রলোকের?'

'অংশু মানে তো চাঁদ। ওর মাথাটা চাঁদের মতন!'

'তার মানে?'

'ফরসা মাথাটা ঠিক চাঁদের মতন চকচকে। একটাও চুল নেই। উনি বেশ লম্বা। আর রোগা।'

কাকাবাবু একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চিন্তা করে বললেন, 'নাঃ, এরকম চেহারার কোন লোককে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আফগানিস্তানে। বেশ কয়েক বছর আগে। ও হ্যাঁ, তখন ওঁর মাথায় টুপি ছিল। বাইরে বেরবার সময় উনি নিশ্চয়ই টুপি পড়েন। উনি বললেন, তুমি ওঁর কথা শুনলেই সব বুঝতে পারবে।'

কাকাবাবু আপন মনে বললেন, 'আফগানিস্তানে? টুপি পড়া বাঙালি? কী জানি! আফগানিস্তানে তো আমি বেশ কয়েকবার গেছি! সেরকম কোনও বাঙালির সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে। এখন মনে পড়ছে না! তুই এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন, সন্তু? ভদ্রলোককে যে আমার মনে পড়তেই হবে, তার কি মানে আছে?'

সন্তু চোখ বড় বড় করে বলল, 'কারণ আছে, কারণ আছে! ওই অংশুমান রায়চৌধুরী তোমার শত্রু!'

কাকাবাবু হা-হা করে অট্টহাসি হাসলেন এবারে!

সন্তু বলল, 'তুমি বিশ্বাস করছ না? উনি নিজের মুখে বললেন সেকথা। তুমি ওর জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু!'

কাকাবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, 'বড়-বড় ক্রিমিনালরা আসলে শত্রু বলে মনে করতে পারে! কিন্তু তোর বন্ধুর পিসেমশাই, তিনি আবার বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি আমার শত্রু হতে যাবেন কেন?'

সন্তু বলল, 'দশ বছর আগে তুমি আফগানিস্তানে কী একটা ব্যাপারে ওঁকে হারিয়ে দিয়ে অপমান করেছিলে।'

কাকাবাবু বললেন, 'ধ্যাত! কী সব বাজে কথা! তুই এখন যা তো! ওসব নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে রসিকতা করেছেন।'

সন্তু আরও অনেক কিছু বলতে গেল, কিন্তু কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিয়ে আবার বই পড়ায় মন দিলেন।

সন্তু ক্ষুণ্ণভাবে ফিরে গেল নিজের ঘরে।

পরদিন সকালবেলা সন্তু কলেজে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় একজন লোক এসে খোঁজ করল কাকাবাবুর। কাকাবাবু প্রত্যেক সকালবেলা বেড়াতে বেরন, কোনও-কোনও দিন দু'চারজন লোকের সঙ্গে দেখা করে একটু দেরিতে ফেরেন। আজ তিনি এখনও ফেরেননি।

লোকটি বলল, 'সে এসেছে বারুইপুর থেকে। কাকাবাবুর জন্য একটা জিনিস আছে। সই করে সেটা রাখতে হবে।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পিচবোর্ডের বাক্স। তার ওপরে লেখা, 'টু রাজা রায়চৌধুরী। ফ্রম অংশুমান চৌধুরী, বারুইপুর।'

সন্তু বললে, 'আমি সই করে রাখলে চলবে না?'

লোকটি মাথা নাড়াল। অর্থাৎ তাতেও হবে।

লোকটি যাবার পর সন্তু আর কৌতূহল সামলাতে পারল না। খুলে ফেলল বাক্সটা।

প্রথমে সন্তুর মনে হল বাক্সটার মধ্যে কিছুই নেই। একেবারে ফাঁকা। কেউ ঠাট্টা করে পাঠিয়েছে। তারপর সে ভাল করে দেখল, তলায় এক কোণে পড়ে আছে কয়েকটা চুল। মানুষের চুল বলেই মনে হয়।

একতলার ঘরে খেতে বসে সন্তু উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল কাকাবাবুর জন্য। একটা বাক্সের মধ্যে শুধু কয়েকটা চুল পাঠাবার মানে কি? এটা দেখে কাকাবাবু কি বলবেন? ওঁর কি কোনও কথা মনে পড়ে যাবে?

সাড়ে দশটার মধ্যেও কাকাবাবু ফিরলেন না। সন্তু আর অপেক্ষা করতে পারছে না, তাকে কলেজে যেতেই হবে।

যাবার সময় সে মাকে বলে গেল, 'মা, কাকাবাবু এলেই এই বাক্সটা দেখিও। খুব দরকারি!'

রাস্তায় বেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে বাসে ওঠবার আগেও সন্তু একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, কাকাবাবুকে দেখা যায় কি না। দেখা গেল না। সন্তুর চিন্তার মধ্যে একটা দারুণ কৌতূহল রয়ে গেল।

কাকাবাবু ফিরলেন আরও এক ঘন্টা বাদে, সঙ্গে দু'জন ভদ্রলোককে নিয়ে। তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওপরে উঠে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মা ডেকে বললেন বাক্সটার কথা।

কাকাবাবু বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে ওপরে লেখা নামগুলো পড়লেন। তারপর বাক্সটা খুলে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। চুলগুলো তাঁর নজরে পড়ল না। তিনি ভুরু কুঁচকে কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেশি সময় খরচ করলেন না।

তিনি বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে বাক্সটা বসবার ঘরের একটা টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। তারপর রান্নার ঠাকুরকে বললেন, 'তিন কাপ কফি চাই, আমার ঘরে দিয়ে এস!'

দোতলায় কাকাবাবুর ঘরে একটা লম্বা সোফা ও কয়েকটা চেয়ার রয়েছে। বিশেষ কাজের কথা থাকলে তিনি কোনও-কোনও লোককে ওপরের ঘরে নিয়ে আসেন। আজ যাঁরা কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা দু'জনেই অবাঙালি। এর মধ্যে একজনের নাম মাধব রাও, ইনি এ-বাড়িতে আগেও এসেছেন দু-একবার। ইনি পরে আছেন পা-জামা পাঞ্জাবি, অন্য লোকটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সাফারি সুট-পরা, সোফায় বসে তিনি একটি চুরুট ধরালেন।

কাকাবাবু একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেই লোকটির দিকে। তারপর বললেন, 'মাফ করবেন, এখানে চুরুট না খেলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে?'

লোকটি তাড়াতাড়ি ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'না, মানে, কেন বলুন তো! আপনার এখানে বুঝি....'

কাকাবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, 'আসলে ব্যাপার কী জানেন, আমি নিজে একসময় খুব চুরুট খেতাম। কিছুদিন আগে প্রতিজ্ঞা করে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু চুরুট সম্পর্কে দুর্বলতাটা ছাড়তে পারিনি। সামনে কেউ চুরুট টানলে, সেই গন্ধটা নাকে এলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। কাজের কথায় মন বসাতে পারি না।'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সামনের অ্যাশট্রেতে চুরুটটা নিবিয়ে দিয়ে বললেন, 'না, না, থাক। আগে কাজের কথা হয়ে যাক।'

তিনি তাকালেন মাধব রাও-এর দিকে। অর্থাৎ কথাবার্তা মাধব রাও-ই চালাবেন।

মাধব রাও একটু ইতস্তত করে বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, প্রথমেই আমি বলে রাখি, আমাদের প্রস্তাবটা শুনে আপনার একটু অদ্ভুত লাগতে পারে। কিন্তু আপনি চট করে রেগে যাবেন না। আমাদের কথাটা আপনি একটু মন দিয়ে শুনুন। তারপর ভালমন্দ যা হয় আপনার মতামত জানাবেন। এর আগে আমি দু'একবার আপনার কাছে এসেছি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। কিছু কিছু ব্যাপারে সাহায্য চাইবার জন্য। কিন্তু এখন আমি রিটায়ার করেছি। সুতরাং এবারে আমি সরকারি পক্ষ থেকে আসিনি।'

কাকাবাবু কোনও কথা না বলে মাথা নাড়লেন।

মাধব রাও আবার বললেন, 'আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন, তাঁর একটু পরিচয় দিই। এঁর নাম অনন্ত পট্টনায়ক, ওড়িশার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং আমার বন্ধু। ওঁদের পরিবার খুব নামকরা পরিবার। সম্বলপুরে ওঁদের বাড়িতে বহু পুরনো মূর্তি ও ছবির সংগ্রহ আছে। আপনি যদি চান, আপনাকে সেখানে একবার নিয়ে গিয়ে সব দেখাতে চাই।'

মাধব রাও কথা বলছেন ইংরেজিতে। এবারে অনন্ত পট্টনায়ক ভাঙা বাংলায় বললেন, 'আপনার জন্য সব সময় নেমন্তন্ন রইল। আপনি যদি চান তো আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যেতে পারি কলকাতা থেকে। এই সপ্তাহে যেতে পারবেন?'

কাকাবাবু সামান্য হেসে বললেন, 'না, এক্ষুনি তো যাওয়া হবে না। পরে যদি কোনও সুযোগ হয় নিশ্চয়ই যাব।'

মাধব রাও এবারে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি কখনও মধ্য প্রদেশের বস্তার জেলায় গেছেন? ওদিকটা সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে?'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, একবার গিয়েছিলাম, প্রায় বছর পনেরো আগে, তখন আমার দুটো পা-ই ভাল ছিল। অনেক ঘুরেছিলুম জঙ্গলে আর পাহাড়ে।'

মাধব রাও বললেন, 'আপনি অবুঝমার পাহাড়ের দিকেও গিয়েছিলেন, যেখানে সহজে কেউ যেতে চায় না। ওখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আপনি কয়েকদিন ওদের মধ্যে ছিলেন।'

কাকাবাবু একটু অবাক হয়ে ভুরু তুলে বললেন, 'সে-কথা আপনি জানলেন কি করে?'

'সেবার আপনার সঙ্গে পলাশ নন্দী বলে একটি ছেলে গিয়েছিল, দিল্লিতে সেই ছেলেটি কিছুদিন আমার আন্ডারে চাকরি করেছে, তার কাছ থেকে আপনার এই অভিযানের গল্প শুনেছি।'

'তা হলে আপনি জিজ্ঞেস করলেন কেন, আমি কখনও বস্তার জেলায় গেছি কিনা?'

মাধব রাও শুকনোভাবে হেসে ওঠে বলল, 'অনেক দিন আগে গিয়েছিলেন তো, আপনার মনে আছে কি না.... তা ছাড়া এইভাবেই তো কথাবার্তা শুরু করতে হয়।'

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে এবারে আসল কাজের কথা হোক।'

মাধব রাও বললেন, 'ওই বস্তার জেলায় ঝুংগি নামে একটা জায়গা আছে। সেটা জগদীশপুর থেকে একশ মাইল দূরে। সেখানে একজন আদিবাসী থাকে, তারা কিন্তু মারিয়া কিংবা মুরিয়া নয়, তারা আলাদা, তাদের নাম রোরো। সেই রোরোদের মন্দিরে একটা মূর্তি আছে। কিন্তু সেখানে ওরকম কোনও মূর্তি থাকবার কথাই নয়। সেটা সূর্যমূর্তি। ভুবনেশ্বর টেম্পলের দেওয়ালে যেরকম একটি গামবুট-পরা পুরুষের মূর্তি আছে। অবিকল সেই রকম।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই মূর্তিটা আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?'

মাধব রাও বললেন, 'না, আমি নিজের চোখে দেখিনি। তবে ছবি দেখেছি। কিছুদিন আগে পল হাউসমান নামে একজন বিদেশী ওই মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের নিয়ে একটি বই বার করেছেন, সেই বইতে ওই মন্দিরের ছবি, মূর্তির ছবি, রোরোদের গ্রামের ছবি সব আছে। আপনাকে দেখাবার জন্য বইটা আমরা সঙ্গে এনেছি।'

কাকাবাবু বললেন, 'কিন্তু মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের গ্রামে কী মূর্তি রয়েছে তার সঙ্গে আপনাদের এখানে আমার কাছে আসার সম্পর্ক কী তা তো বুঝতে পারছি না?'

মাধব রাও ভুরু তুলে খুব আশ্চর্য হবার ভাব দেখিয়ে বললেন, 'ওইরকম জায়গায় গামবুট-পরা সূর্যের মূর্তি কি করে গেল, সে কথা জানার জন্য আপনার কৌতূহল হচ্ছে না?'

কাকাবাবু বললেন, 'তার চেয়েও বেশি কৌতূহল হচ্ছে আপনারা আমার কাছে কি চান তা জানবার জন্য!'

মাধব রাও এবারে অনন্ত পটনায়কের দিকে তাকালেন। তিনি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'রায়চৌধুরীবাবু, ওই মূর্তিটা ছিল আমাদের বাড়ির সম্পত্তি। বেশ কিছু বছর আগে ওটা আমাদের বাড়ি থেকে চুরি গেছে। বাড়িরই কোনও কাজের লোক ওটা চুরি করেছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। আমার বাবা তার ডায়রিতে এই মূর্তির কথা লিখে গেছেন। এতদিন ওই মূর্তিটার কোনও খোঁজ ছিল না। এখন পল হাউসমানের

বইয়ের ছবি দেখে বোঝা গেল, আমাদের পারিবারিক সম্পত্তিটিই ওখানে পৌঁছে গেছে কোনও ভাবে।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই মূর্তিটা আপনাদের বাড়িতে এসেছিল কী ভাবে? তার কোনও রেকর্ড আছে?'

অনন্ত পটনায়ক বললেন, 'না, তা নেই।'

মাধব রাও বললেন, 'আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ওই রকম মূর্তি আদিবাসীদের পক্ষে বানান সম্ভব নয়। ওরা নিজেরা এখনও জুতো পরতেই জানে না, ওরা কি গামবুট-পরা কোনও দেবতার মূর্তি বানাতে পারে? ওটা চোরাই মূর্তি।'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনাদের বাড়ি থেকে মূর্তি চুরি গেছে পুলিশে খবর দিন। পুলিশ সেটা উদ্ধার করে দেবে।'

অনন্ত পটনায়ক বললেন, 'কিন্তু ওই মূর্তিটা যে চুরি গেছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে। আমার ঠাকুরদার আমলে। তখন তো কিছু করা হয়নি। এতদিন পরে ও কথা বললে আর কে বিশ্বাস করবে? তবে, মূর্তিটা আমাদেরই। ওরকম নীল পাথরের সূর্যমূর্তি আর কোথাও নেই।'

মাধব রাও বললেন, 'আমি মধ্যপ্রদেশের পুলিশের আই জি-র সঙ্গে কথা বলেছিলাম : তিনি বললেন, 'আদিবাসীদের গ্রাম থেকে ওই মূর্তি উদ্ধার করতে গেলে দাঙ্গা লেগে যাবে। ওরা যদি একবার খেপে যায়, তাহলে পুলিশকেও পরোয়া করে না!'

কাকাবাবু বললেন, 'সে তো ঠিকই বলেছেন তিনি।'

মাধব রাও বললেন, 'সেই জন্যই আপনার কাছে আসা। আপনি ওই সব আদিবাসীদের মধ্যে ঘুরেছেন। ওদের সঙ্গে থেকেছেন। ওই মূর্তিটা আদিবাসীদের গ্রামে কি করে গেল, সে রহস্য একমাত্র আপনিই সমাধান করতে পারেন।'

অনন্তবাবু বললেন, 'আপনি যদি মূর্তিটি উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেন, তা হলে আপনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এজন্য আপনার খরচ খরচা যা লাগবে, সব আমরা দিয়ে দেব তো বটেই। আমরা এক-লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে রাজি আছি!'

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা নমস্কার। আপনারা এবারে আসুন। আমাদের কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে।'

মাধব রাও বললেন, 'এই রে. আপনি রেগে যাচ্ছেন? প্রথমেই তো বলেছি, আমাদের সব কথা শুনুন আগে....'

কাকাবাবু এবারে তীব্র স্বরে বললেন, 'আপনাদের সব কথা আমার শোনা হয়ে গেছে। আপনারা আমাকে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে একটা মূর্তি চুরি করতে বলছেন? চোর হিসেবে আমার এমন সুনাম আছে, তা তো জানতুম না!'

মাধব রাও বললেন, 'আরে, ছি ছি ছি, আপনি শুধু শুধু ভুল বুঝছেন আমাদের। আপনি নামকরা অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করেন, সেই জন্যই ভেবেছিলাম। আদিবাসীদের গ্রামে গামবুট-পরা একটি মানুষের মূর্তি কি করে গেল, সেই রহস্য

সম্পর্কে আপনি কৌতূহলী হবেন। তারপর.... ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে.... ওদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে .... ওদের মন্দিরের জন্য আলাদা মূর্তি গড়িয়ে দিয়ে তারপর যদি আমাদের মূর্তিটা উদ্ধার করা যায় ... আমার বন্ধু সেই কথাই বলছিলেন! আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি....'

কাকাবাবু বললেন, 'ধন্যবাদ। আমার সব কথা শোনা হয়ে গেছে। আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড!'

অনন্তবাবু বললেন, 'শুনুন, ওই মূর্তিটা যে আমাদেরই পরিবারের সম্পত্তি, সে সম্পর্কে একটা প্রমাণ আপনাকে এনে দেখাতে পারি?'

কাকাবাবু তাঁর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'বললুম না, আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড অ্যাট অল। আমার সময়ের দাম থাকে।'

এই সময় রঘু এসে হাজির হল তিন কাপ কফি নিয়ে।

তাতে কাকাবাবুর মেজাজ আরও চড়ে গেল। এত দেরি করে কফি আনবার কোনও মানে হয়? এখন এই লোক দুটিকে কফি না খাইয়ে বিদায় করে দেওয়াটা অভদ্রতা। অথচ এই লোকদুটির সঙ্গে তাঁর আর এক মুহূর্তও সময় কাটাবার ইচ্ছে নেই।

মাধব রাও এবং অনন্ত পটনায়কও উঠে দাঁড়িয়েছেন। কাকাবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'কফিটা খেয়ে যান।'

মাধব রাও হেসে বললেন, 'ধন্যবাদ, এখন কফি খেতে গেলে গলায় বিষম লাগবে। আর একদিন এসে কফি খাব।'

অনন্ত পটনায়ক বললেন, 'আমি কফি খাই না। মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি এত রেগে গেলেন কেন বুঝলাম না। আপনার কাছে আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, আপনি তাতে রাজি হতে পারেন, নাও হতে পারেন। ব্যাস, এইটুকুই! আপনি রাজি না হলে ফুরিয়ে গেল!'

কাকাবাবু অতি কষ্টে রাগ দমন করে বললেন, 'আমি যদি রূঢ় ব্যবহার করে থাকি, সে জন্য মাপ চাইছি। এ-ধরনের কাজ আমি করি না। আপনারা অন্য কারও কাছে যান।'

লোক দুটি চলে যাবার পরেও কাকাবাবু ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর মাথাটা জ্বলছে। তিনি একটি বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলেন, তাঁর মন বসল না।

একটু পরে স্নান করে, খেয়ে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। ফিরলেন অনেক রাতে।

কলেজ থেকে ফিরেই সন্তু দেখল, বারুইপুর থেকে পাঠানো সেই বাক্সটা বসবার ঘরেই পড়ে আছে। সে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করছিল। কাকাবাবু যখন ফিরলেন, তখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন সকালে বারুইপুর থেকে একটি লোক আবার ঠিক ওই রকম একটি বাক্স নিয়ে এল।

আজ সন্তুর কলেজ ছুটি, আজ সে কাকাবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবে। অংশুমান চৌধুরী এসব কি অদ্ভুত জিনিস পাঠাচ্ছেন? ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি সেদিন সন্তুর ভাল লাগেনি। কাকাবাবুর ওপর খুব রাগ। উনি কাকাবাবুর কিছু একটা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবেন নিশ্চয়ই। অথচ ওঁর কথা সন্তুর মুখে শুনে কাকাবাবু একটুও পাত্তাই দিলেন না।

আজ যে বাক্সটা পাঠিয়েছেন, সেটার মধ্যেও প্রায় কিছুই নেই বলতে গেলে। চৌকো কাগজের বাক্সটা সুন্দরভাবে প্যাক করা, ওপরে কাকাবাবুর নাম লেখা। কিন্তু ভেতরে যে জিনিসটা রয়েছে, সেটা কেউ এরকম প্যাকেট করে পাঠাতে পারে, তা বিশ্বাসই করা যায় না। একটুখানি আলুর তরকারি! দু'তিন টুকরো আলু, তাতে মশলা মাখানো, কিন্তু ঝোল নেই, একেবারে শুকনো।

প্রথম দিন এল দু'তিনটে মানুষের চুল। তারপর এক চিমটে আলুর তরকারি। এর তো মাথা-মুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। কালকের বাক্সটা দেখে কাকাবাবু কোনও মন্তব্যও করেননি, কিন্তু সন্তু যে এই ব্যাপারটা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না।

কাকাবাবু এখনও মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরেননি। দরজার কলিং বেল শুনে সন্তু ছুটে গেল। খাকি প্যান্ট ও হাফ-শার্ট পরা একজন পিওন শ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল 'ইয়ে রাজা চৌধুরী বাবুকা কোঠি হ্যায়? সাহাব হ্যায় ঘর মে?'

সন্তু বলল, 'না. সাহেব আভি নেহি হ্যায়। আপকা কেয়া জরুরত হ্যায়?'

লোকটি বলল, 'হামারা সাহাব রায়চৌধুরী বাবুকো বুলায়া।'

সন্তু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপকা সাহাব কৌন হ্যায়?'

লোকটি পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে সন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ইসমে লিখা হ্যায়। রায়চৌধুরীবাবু লৌটনেসে তুরন্ত ইধার যানে বলিয়ে! বহুতই আর্জেন্টি হ্যায়।'

লোকটি কাগজটা দিয়ে চলে গেল। কাগজটি খুলে সন্তু আর এক প্রস্থ অবাক হল। একটা সাধারণ হ্যান্ডবিল। পার্ক স্ট্রিটের একটা কাপড়ের দোকানের নাম লেখা। বিজ্ঞাপন হিসেবে এরকম কাগজ রাস্তায় ছড়ানো হয়। ঠিকানার নিচে কেউ লাল কালির দাগ দিয়ে হাতে লিখে দিয়েছে ওয়ান পি. এম.।

সন্তুর চড়াত করে রাগ ধরে গেল। কাকাবাবুকে কেউ কখনও পিওন দিয়ে ডেকে পাঠায় না। কাকাবাবু সচরাচর কারও বাড়িতে যান না। কারও খুব দরকার থাকলে বাড়িতে এসে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে। কাকাবাবুর তো ডিটেকটিভগিরি করা পেশা নয়। চুরি-ডাকাতি বা খুন-জখমের কেস নিয়ে যারাই আসে, কাকাবাবু তাদের বলেন, আমার কাছে এসেছেন কেন, পুলিশের কাছে যান।

আর এই লোকটার এত সাহস, সাধারণ একটা হ্যান্ডবিল পাঠিয়ে সেই ঠিকানায় কাকাবাবুকে দেখা করতে বলেছে? কে লোকটা? এখনও দৌড়ে গেলে হয়তো ওই পিওনটিকে ধরা যায়। কিন্তু ও সম্ভবত কিছুই বলতে পারবে না!

কাকাবাবু ফিরলেন একটু পরেই।

সন্তু প্রথমেই বলল, 'কাকাবাবু, বারুইপুরের অংশুমান চৌধুরী কাল তোমাকে একটা বাক্স পাঠিয়েছিল, সেটা তুমি দ্যাখনি?'

কাকাবাবুর মুখখানা আজও থমথমে কোনও ব্যাপারে খুব চিন্তিত। গম্ভীরভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি, ওর মধ্যে তো কিছু নেই। যা ছিল তুই বার করে নিয়েছিস?'

'না তো। বাক্সটা ওই রকমভাবেই এসেছে। ওর মধ্যে শুধু কয়েকটা চুল পড়ে আছে। মানুষের চুল বলেই মনে হয়।'

'চুল?'

'হ্যাঁ, আজও একটা বাক্স এসেছে। তার মধ্যে যা আছে, সেটাও পাঠাবার কোনও মানে বুঝতে পারছি না।'

'আজ আবার কি এসেছে, দেখি?'

সন্তু দৌড়ে গিয়ে দ্বিতীয় বাক্সটা নিয়ে এল। কাকাবাবু সেটার মধ্যে কয়েক পলক দেখলেন মাত্র। তারপর বিরক্তভাবে বললেন, 'ধ্যাত? ও তো মনে হচ্ছে কোনও পাগলের কান্ড। ফেলে দে। এগুলো সব ফেলে দে!

তারপর সন্তু একটু আগের হ্যান্ডবিলটার কথা বলল। কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, 'এই দোকানে আমি কখনও যাইনি। চেনা কেউ পাঠায়নি। মনে হচ্ছে, কেউ কেউ আমাকে অকারণে বিরক্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাতে তাদের কি লাভ কে জানে!'

'কাকাবাবু, তুমি অংশুমান চৌধুরীকে একেবারেই চেন না!'

'কিছুই তো মনে পড়ছে না। তা ওই সব বাক্স-টাক্স না পাঠিয়ে সে নিজে এসে দেখা করতেই তো পারে।'

'আমার বন্ধু জোজোকে ডাকব। ওর পিসেমশাই হয়, ও অনেক কিছু বলতে পারবে। তাতে তোমার মনে পড়ে যেতে পারে।'

'এরকম পাগলকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না এখন। তবু ঠিক আছে, ডাকিস তোর বন্ধুকে, শুনে দেখব!'

এরপর কাকাবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

সন্তু ঠিক করল, দুপুরবেলাতেই সে বেরিয়ে জোজোকে ডেকে আনবে। জোজো কাকাবাবুর সামনে কতরকম গুল ঝাড়তে পারে, সেটা দেখা যাক।

একটু বাদেই অরিন্দম এসে হাজির হল। সন্তু খুশি হয়ে বলল, 'তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। চল। একটু পরে জোজোদের বাড়ি যাব। জোজোর সেই পিসেমশাই কি কান্ড করেছে জানিস। কাকাবাবুকে রোজ একটা করে বাক্স পাঠাচ্ছে।'

অরিন্দম বলল, 'কিসের বাক্স?'

সন্তু ওকে সব ব্যাপারটা খুলে বলল। বাক্স দুটো এনে দেখাল। অরিন্দম হেসে উঠে বলল, 'আরে জোজোর পিসেকে দেখে আমি ভেবেছিলুম, দ্বিতীয় এক প্রোফেসর শঙ্কু। এখন দেখছি বোম্বাগড়ের রাজা। ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ব ভাজা! অতদূর থেকে লোক দিয়ে এত বড় একটা বাক্স ভরে পাঠাচ্ছে এঁটো দু'টুকরো আলুর দম। কেন বাবা, বেশি করে পাঠালেই পারত, আমরা খেয়ে নিতুম। আর এগুলো যে মানুষের চুল তুই কি করে বুঝলি, সন্তু? ভাল্লুকের লোমও তো হতে পারে!'

সন্তু বলল, 'উনি জন্তু-জানোয়ার সহ্য করতে পারেন না, মনে নেই? সেই জন্যই আমি বুঝে নিয়েছি মানুষের চুল।'

অরিন্দম বলল, 'আমার বড় জামাইবাবু সায়েন্স কলেজে পড়ান। তাঁকে ওই নামটা বললুম, বড় জামাইবাবু বললেন, তিনি ওই নাম জন্মে শোনেননি। তবে সেলফ-মেইড্ সায়েন্টিস্ট হতে পারে। এরকম অনেক আছে। নিজের বাড়িতে কয়েকটা যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তারপর নিজেদের সায়েন্টিস্ট বলে প্রচার করে।'

'কাকাবাবুর ওপর এত রাগ কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। কাকাবাবুও কিছুই মনে করতে পারছেন না।'

হঠাৎ ওপর থেকে কাকাবাবু জোরে ডাকলেন, 'সন্তু! সন্তু!'

অরিন্দম বলল, 'তোকে কাকাবাবু ডাকছেন, যা শুনে আয়। আমি এখানে বসছি।'

সন্তু বলল, 'তুইও চল না আমার সঙ্গে। কাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

কাকাবাবু অরিন্দমকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই-ই তোর বন্ধু জোজো নাকি?

সন্তু বলল, 'না, এর নাম অরিন্দম। এই অরিন্দমও আমাদের সঙ্গে বারুইপুরে গিয়েছিল।'

'কাকাবাবুর মুখে এখন সেই গাম্ভীর্যের ভাবটা নেই। বরং ঠোঁটে চাপা হাসি। তিনি বললেন, 'ওই বারুইপুরের ভদ্রলোকের বাড়িতে টেলিফোন আছে?'

সন্তু বলল, 'তা তো ঠিক বলতে পারছি না। লক্ষ্য করিনি।'

'এ ভদ্রলোকের দেখছি সত্যিই মাথায় ছিট আছে। উনি আমায় এই যে এক-একটা বাক্স পাঠাচ্ছেন, এগুলো আসলে সাংকেতিক চিঠির একটা একটা টুকরো, বুঝলি! এরকম আরও পাঠাবেন। কিন্তু তার আর দরকার নেই, উনি কী বলতে চান আমি বুঝে গেছি। আমার সব মনে পড়ে গেছে। কিন্তু আফগানিস্তানে তো নয়, ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল পাঞ্জাব আর বেলুচিস্তানের সীমান্তে একটা ছোট জায়গায়। অনেকদিন আগেকার কথা। সেই জায়গার নাম ছিল কান্টালাপুরা। ভদ্রলোকের বাড়িতে টেলিফোন থাকলে আমি বলে দিতুম যে আপনাকে আর কষ্ট করে চিঠি পাঠাতে হবে না।'

'কাকাবাবু, উনি চুল আর আলুর তরকারি পাঠিয়ে কি চিঠি লিখলেন?'

'তোদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমার আগেই ধরা উচিত ছিল, কিন্তু আমি মাথা ঘামাইনি। শোন্, বুঝিয়ে দিচ্ছি, চুলের ভাল বাংলা কি?'

'কেশ।'

'আর একটা আছে, কুন্তল। আর ওই যে আলুর তরকারিটুকু, ওটা কী জানিস, একটা শিঙাড়া ভাঙলে তার মধ্যে ঠিক ওইটুকু তরকারি দেখতে পাবি। ওকে বলে পুর। কচুরি, শিঙারা, পিঠে এই সবের মধ্যে নানারকম পুর দেওয়া থাকে না? তা হলে কী হল, কুন্তলপুর। ওই যে কান্টালপুরা জায়গাটার কথা বললুম, 'অনেকে বলে, ওই জায়গাটার আগেকার নাম ছিল কুন্তলপুর।'

অরিন্দম বলল, 'শুধু নামটা একটা কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিলেই পারতেন?'

'সেইজন্যই তো বলছি, ভদ্রলোকের মাথায় খানিকটা ছিট আছে। তবে লোক খারাপ নায়। একটু ছেলেমানুষ মতন, এই যা। তবে, সেবারে আমি ওর সঙ্গে খানিকটা খারাপ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলুম ঠিকই।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল,'কাকাবাবু, কি হয়েছিল সেবারে?'

'সেটা আর তোদের শুনে দরকার নেই। তবে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় লোকেরা রেগে গিয়ে ভদ্রলোকের মাথার সব চুল কামিয়ে কী যেন একটা আঠা মাখিয়ে দিয়েছিল, সেটা আমি চেষ্টা করেও আটকাতে পারিনি।'

'ওই জন্যই ওঁর মাথা জোড়া টাক। আর একটাও চুল গজায় না।'

'ভদ্রলোক যখন আমার ওপর এখনও খুব রেগে আছেন, তখন, আমি ওঁর কাছে ক্ষমা চাইতে চাই। কিন্তু টেলিফোন না থাকলে মুশকিল। একটা চিঠি লিখলে তোরা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারবি?'

'জোজোকে বললে দিয়ে আসতে পারে।'

'আচ্ছা তাই-ই লিখে দেব তা হলে।'

দুপুরবেলা সন্তু আর অরিন্দম গেল জোজোর বাড়িতে। দরজার বেল বাজাতেই দোতলার বারান্দায় জোজো এসে ওদের দেখল, তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের চুপ করতে বলে ইশারায় জানাল যে সে নেমে আসছে।

অরিন্দম সন্তুর মুখের দিকে তাকাল, সন্তু বলল, 'আমরা তো জোজোর নাম ধরে ডাকিনি, শুধু বেল বাজিয়েছি, তবু ও আমাদের চুপ করতে বলল কেন?'

অরিন্দম বলল, 'সবাই যেরকম ব্যবহার করে, জোজোও তাই করবে, তুই এরকম আশা করিস কি করে?'

জোজো দরজা খুলে বাইরে এসে অতি সন্তর্পনে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর নিজে পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে যেতে বন্ধুদেরও সঙ্গে ডাকল।

সন্তু আর অরিন্দম ওর দু'পাশে চলে এল, অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, দুপুরবেলা তোর বাড়ি থেকে বেরনো নিষেধ বুঝি?'

জোজো ফিসফিস করে বলল, 'না, না, তা নয়। আমাদের বাড়িতে এখন কে এসেছেন তোরা কল্পনাও করতে পারবি না। বাবার সঙ্গে নিরিবিলিতে আলোচনা করছেন। গন্ডগোল হলে বাবার ডিসটার্বেন্স হয়।'

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছে রে, কে?'

জোজো বলল, 'সে নামটা বলা যাবে না ভাই। তা হলে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সে গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে। উনি এসেছেন ছদ্মবেশে।'

'তোদের বাড়ির সামনে কোন গাড়ি-টাড়ি তো দেখছি না।'

'তোদের মাথা খারাপ, 'আমাদের বাড়ির সামনে একটা বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে স্পাইরা সব জেনে যাবে না?'

'থাক বাবা, তা হলে নাম জেনে দরকার নেই।'

'তোরা হঠাৎ দুপুরবেলা এলি? কি ব্যাপার?'

সন্তু বলল, 'তোকে অসময়ে এসে কী ডিসটার্ব করলুম, সে জন্য দুঃখিত। ব্যাপার কি জানিস, তোর পিসেমশাই আমাদের বাড়িতে দুটো চিঠি পাঠিয়েছেন...'

জোজো থমকে গিয়ে বলল, 'চিঠি? অসম্ভব! আমার পিসেমশাই জীবনে কাউকে চিঠি লেখেন না। আমার বাবাকেই কক্ষনো চিঠি লেখেননি। আমার পিসিমা যতদিন বেঁচে ছিলেন, উনিও চিঠি পেতেন না। উনি নাকি কলমও ছুঁতে চান না।'

অরিন্দম বলল, 'কেন, কলম তো কোনও জন্তু-জানোয়ার নয়!'

জোজো বলল, 'এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয় অরিন্দম। সবাইকে নিয়ে ঠাট্টা করা যায় না। আমার পিসেমশাই তোদের বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছেন, মোট কথা এটা আমি বিশ্বাস করি না।'

সন্তু বলল, 'উনি কলম দিয়ে কাগজে লিখে চিঠি পাঠাননি বটে, কিন্তু যা পাঠিয়েছেন তাকে চিঠিই বলা যায়। এখন কাকাবাবু একটা উত্তর দিতে চান। উনি অবশ্য হাতে লিখেই দেবেন, সেই চিঠিটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবি। কিংবা ঠিকানাটা বল পোস্ট করে দেব।'

জোজো হঠাৎ চোখ গোলগোল করে বলল, 'চুপ! স্পাই!'

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, 'তুই কাকে স্পাই বলছিস? সন্তুকে?'

জোজো আঙুল তুলে একটা জিপ গাড়ি দেখাল। একদম নতুন জিপ। তার সামনের সিটে দু'জন লোক অলস ভঙ্গিতে বসে আছে। যেন তাদের কোথাও যাবার তাড়া নেই।

অরিন্দম বলল, 'তুই কি ভুতের মতন চারদিকে স্পাই দেখছিস নাকি? স্পাই তোর কি করবে?'

জোজো বলল, 'আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমাকে তোদের আড়ালে লুকোতে দে!'

জিপ গাড়ির লোক দু'জন এক সঙ্গে নেমে জিপ থেকে দৌড়ে এল ওদের দিকে।

৪

ঘুম থেকে ওঠার পর অংশুমান চৌধুরী প্রথমে খানিকক্ষণ গড়গড়া টানলেন। জানলা দিয়ে বাইরের মেঘলা আকাশ দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই জোর বৃষ্টি নামবে। অংশুমানের মুখে একটা খুশি-খুশি ভাব ফুটে উঠল। বৃষ্টি পড়লে তাঁর মেজাজ ভাল থাকে।

তিনি হাঁক দিলেন, 'ভীমু! ভীমু!'

বারান্দার দিকের দরজা খুলে একটি রোগা ছোটখাট চেহারার লোক উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, কিছু বলছেন?'

অংশুমান হাতছানি দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, একটু ভেতরে এসে বস তো।'

লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকে বসল না, কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রইল। এই লোকটির চেহারা এক সময় ছিল খুব গাঁট্টাগোট্টা, তখন এর নাম ছিল ভীমরঞ্জন ঘোষ। তারপর কী একটা অসুখে পড়ে রোগা টিংটিং-এ হয়ে গেছে। এখন আর ভীম নামটা মানায় না বলে অংশুমান ওকে ভীমু বলে ডাকেন।

অংশুমান গড়গড়ার নলে আবার টান দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা ভীমু, ওই যে রাজা রায়চৌধুরী নামে লোকটা, যাকে সবাই আজকাল কাকাবাবু বলে ডাকে তার ওপর তোমায় দু'দিন ধরে ওয়াচ রাখতে বলেছিলুম। এবারে বল, কি কি দেখলে।'

ভীমু ঘোষ পকেট থেকে কয়েকটা কাগজ বার করে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, 'স্যার, ওই লোকটা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে বই পড়ে।'

অংশুমান বললেন, 'প্রথমেই রাত্তির দিয়ে শুরু করলে, বাবা! তা তুমি কি করে জানলে ও রাত জেগে বই পড়ে? তুমি কি ওর ঘরে ঢুকে দেখেছ?'

ভীমু খুব লজ্জা পেয়ে বলল, 'না, স্যার, ঘরে ঢুকে দেখিনি, তবে, ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায় রাত একটা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে দেখেছি, ওই রাজা রায়চৌধুরীর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।'

'আলো জ্বললেই যে বই পড়বে, তার মানে আছে? ভাইপো'র সঙ্গে ক্যারাম খেলতে পারে! যাক গে যাক, আর কি দেখলে?'

'ভোরবেলা মর্নিংওয়াকে যায়।'

'অনেক রাত পর্যন্ত জাগে, আবার ভোরে হাওয়া খেতে বেরয়? সন্দেহজনক, খুবই সন্দেহজনক!'

'স্যার, ওই রাজা রায়চৌধুরী প্রতিদিন সকালে পার্কের একটা কোণের ছোট চায়ের দোকানে চা খায়।'

'এটা খুবই বোকামি করে। ইচ্ছে করলেই যে-কেউ ওর চায়ে একদিন বিষ মিশিয়ে দিতে পারে, তাই না?'

'দেব স্যার; দেব? আমি কালই ওকে খতম করে দিতে পারি।'

ভীমুর চোখ-মুখ উত্তেজিত হয়ে উঠল। যেন এতক্ষণে সে একটা সত্যিকারের কাজের কথা শুনেছে।

অংশুমান হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে না, না। তোমাকে তো আগেই বলে দিয়েছি, ওই রাজা রায়চৌধুরীর গায়ে আঁচড়টি না লাগে, তা দেখবে! রাজা রায়চৌধুরী বেঁচে না থাকলে আমি আমার অপমানের শোধ নেব কি করে?'

ভীমু বলল, 'আপনি যে বিষ মিশিয়ে দেবার কথা বললেন, স্যার?'

'আমি বিষ মেশানর কথা বলিনি। বললুম যে, অন্য যে কেউ বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। সেরকম যাতে কেউ না দেয়, তুমি দেখবে। তারপর বল?'

'বইয়ের দোকানে গিয়ে খালি ম্যাপ কেনে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়েও ম্যাপ দেখে।'

'হুঁ, তারপর?'

'ক্রাচ নিয়ে হাঁটে. ইচ্ছে করলে বেশ জোরে হাঁটতে পারে। কিন্তু দৌড়তে পারে না।'

'এটা তুমি ভারী নতুন কথা বললে! ক্রাচ বগলে নিয়ে কেউ দৌড়তে পারে নাকি? ক্রাচ কি রন্-পা? আর কি আছে বল!'

'আর কিছু নেই।'

'ভীমু, একাজে দেখছি তোমাকে রিটায়ার করিয়ে দিতে হবে। দু'দিন ঘুরে তুমি মোটে এই খবর জোগাড় করলে? ওদের বাড়িতে কুকুর আছে কি না খোঁজ নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, স্যার, কুকুর আছে। ওই ভাইপোটার পোষা। সেই কুকুরের নাম রকুকু।'

'এই খবরটাই তুমি এতক্ষণ বলনি? এই জন্যই তো আমি নিজে ওখানে যেতে পারব না। কি ঝামেলা বল তো? আচ্ছা, সন্ধের দিকে রায়চৌধুরী কোথায় যায়, তা খবর নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, স্যার,দু'দিনই দেখলাম, সন্ধেবেলা ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বেরোচ্ছেন। তারপর হেঁটে-হেঁটে ময়দানের দিকে যান।'

'বাঃ বাঃ! খুব খবর। এটা ভাল খবর। ভীমু, গাড়ি বার করতে বল। আজ আমি বেরব। প্রায় দশদিন বোধহয় বাড়ির বাইরে যাইনি, তাই না?'

'বড় জোর বৃষ্টি নেমেছে।'

'সেইজন্যই তো। যত বৃষ্টি, তত ভাল। তুমি তৈরি হয়ে গাড়িতে বস। আমি পনের মিনিটের মধ্যে নিচে নামছি।'

ভীমু বেরিয়ে যেতেই অংশুমান ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একটা ছোট্ট আলমারি খুলে বার করলেন নকল দাড়ি-গোঁফ,পরচুল। সেগুলো যত্ন করে লাগিয়ে মুখ দেখলেন আয়নায়। এখন তাঁর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে, বয়েসও মনে হচ্ছে অনেক কম।

পাজামা ও পাঞ্জাবি পরে, হাতে একটা রুপো-বাঁধানো ছড়ি নিলেন, পায়ের জুতোটা কাপড়ের।

অংশুমানের গাড়িটা আলাদা ধরনের। সমস্ত কাচে সবুজ রং করা। ভেতরে বসলে বাইরের রাস্তার কিছুই দেখা যায় না। গাড়ি চলার সময় সমস্ত কাচ বন্ধ থাকে, যাতে রাস্তার কোনও কুকুর-বেড়াল দেখতে না হয়।

গাড়ির ড্রাইভারের নাম গুঙ্গা। সে আবার বোবা। তার বয়েস তেইশ চব্বিশের বেশি নয়। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। বাচ্চা বয়েসে এই ছেলেটা রেল-স্টেশনে ভিক্ষে করত। অংশুমান ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে মানুষ করেছেন। তারপর ও লেখাপড়া শিখতে পারবে না বুঝে ওকে গাড়ির ড্রাইভারি শিখিয়েছেন। ভাল খাওয়া-দাওয়া করে ছেলেটার স্বাস্থ্য ফিরে গেছে।

গাড়িটা এসে থামল চিড়িয়াখানার সামনে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এখানে আজ একটাও গাড়ি নেই। চিড়িয়াখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও লোকজনও দেখা যাচ্ছে না।

অংশুমান ঘড়ি দেখে বললেন, 'সওয়া-সাতটা। রোজ ক'টার সময় তুমি রাজা চৌধুরীকে বেরতে দেখেছ?'

ভীমু বলল, 'সাড়ে সাতটা থেকে আটটা।'

তাহলে অপেক্ষা করে দেখা যাক। যদি এই বৃষ্টির জন্য আজ আগেই চলে যায়?'

'স্যার বৃষ্টি পড়ছে অনেকক্ষণ ধরে।'

'তা ঠিক।'

অংশুমান একটা পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগলেন।

মিনিট পনের বাদে বৃষ্টি একটু ধরে এল। একেবারে থামল না, টিপটিপ পড়েই চলল।

একটু বাদে দেখা গেল ন্যাশনাল লাইব্রেরির বড় গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। তিনি ছাতা ব্যবহার করেন না। একটা রেইন কোট গায়ে দিয়েছেন, মাথায় টুপি। তিনি কিছু চিন্তা করতে করতে আপনমনে আসছেন।

অংশুমান গুঙ্গার পিঠে চাপড় দিয়ে একটা ইঙ্গিত করলেন। গুঙ্গা বোবা বলে কানেও শুনতে পায় না। কিন্তু সামান্য ইশারা ও চমৎকার বোঝে।

সে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ঝট করে একটা ইউ টার্ন নিল। কাকাবাবু তখনও অনেক দূরে। গাড়িটা কাকাবাবুকে ছাড়িয়ে চলে গেল। অংশুমান আবার ইঙ্গিত করে গুঙ্গাকে থামতে বললেন। তিনি চান গাড়িটা কাকাবাবুর পেছন দিক দিয়ে আসবে।

কাকাবাবু চিড়িয়াখানার কাছে এসে একটু থেমে এদিক-ওদিক তাকালেন। ট্যাক্সি পাবার আশা নেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত হেঁটেই যাবেন ঠিক করলেন।

তিনি ব্রিজের কাছাকাছি এসেছেন, এমন সময় একটা কান্ড ঘটল। মাথায় ফেট্টি বাঁধা দু'জন গুন্ডা চেহারার লোক ঘিরে ধরল তাঁকে। একজনের হাতে ভোজালি, অন্য জনের হাতে রিভলভার। কাকাবাবু বাধা দেবার কোনও সময় পেলেন না, তারা কাকাবাবুর দু'হাত চেপে ধরে টেনে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

অংশুমান গাড়ির মধ্যে বসে, এই দৃশ্য দেখে অবাক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ভীমু এসব কি!'

ভীমু বলল, 'জানি না তো স্যার। অন্য পার্টি!'

অংশুমান তখন গুঙ্গার পিঠে বড়-বড় দুটো চাপড় মারলেন। গুঙ্গা তখনি গাড়িখানা ফুলস্পিডে চালিয়ে একেবারে ওদের পাশে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল।

অংশুমান সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে হাতের ছড়িটা বন্দুকের মতন তুলে বললেন, 'একসঙ্গে দু'টা গুলি বেরোবে। কে কে মরতে চাও?'

কাকাবাবুকে যে দু'জন ধরেছিল তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। লড়াই করার চেষ্টা না করে তারা দৌড় মারল ব্রিজের তলার দিকে।

অংশুমান কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কোন ক্ষতি হয়নি তো? একি, আপনি মিঃ রাজা রায়চৌধুরী না?'

কাকাবাবুর মাথার টুপিটা পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। তিনি সেটা তুলে নিয়ে হেসে বললেন, 'কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমি খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছি মনে হচ্ছে! একদল এল আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য, আবার ঠিক সেই মুহূর্তেই এক দল এসে পড়ল আমাকে রক্ষা করতে ! এ যে সিনেমার মতন ঘটনা!'

অংশুমান বললেন, 'আপনাকে তো আগে চিনতে পারিনি। হঠাৎ দেখলুম দুটো গুন্ডা এসে রাস্তায় একজন লোককে চেপে ধরল। তাই তাড়াতাড়ি গাড়িটা চালিয়ে বাধা দিতে এলাম।'

কাকাবাবু অংশুমানের মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন। চিনতে পারলেন না! তিনি বললেন, 'আজকাল তো অন্যের বিপদ দেখলেও কেউ সাহায্য করতে আসে না। আপনি দেখছি ব্যতিক্রম। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আমাকে চিনলেন কি করে!'

অংশুমান বললেন, 'কাছে এসে চিনলাম। আপনার ছবি দেখেছি। দূর থেকেও আপনাকে দেখেছি কয়েকবার। আপনি অবশ্য আমায় চিনবেন না। আমার নাম রতনমণি ঘোষ দস্তিদার। আমি কাগজের ব্যবসা করি। আসুন, আপনি গাড়িতে উঠে আসুন!'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোন্ দিকে যাচ্ছিলেন?'

'আপনি যেদিকে যাবেন সেখানেই পৌঁছে দেব।'

'বাঃ, এত চমৎকার প্রস্তাব। ভাগ্যিস ওই গুন্ডা দুটো এসে পড়েছিল, তাই আপনার গাড়ির লিফ্‌ট পেলাম। গুন্ডা দুটোকেই আমার ধন্যবাদ জানান উচিত।'

কাকাবাবু গাড়িতে উঠে বসলেন। অংশুমান আগে বসেছিলেন ড্রাইভারের পাশে। এবারে ভীমুকে সেই জায়গায় বসিয়ে তিনি এলেন পেছনে। তারপর বললেন, 'আপনার মতন মানুষ, আপনার অনেক শত্রু। আপনি এভাবে একা একা সন্ধ্যের পর যাতায়াত করেন? এটা ঠিক নয়।'

কাকাবাবু জোরে জোরে হেসে বললেন, 'আমার জীবনটা খুব দামি হয়ে গেছে নাকি?'

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর কাকাবাবু বললেন, 'দুটো রাস্তার গুন্ডা আমার ওপর হামলা করতে এল কেন? আমার কাছে তো দামি কোনও জিনিস নেই, টাকা-পয়সাও বিশেষ নেই। কেউ ওদের ভাড়া করে পাঠিয়েছে, কি বলেন?'

অংশুমান বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

'আপনার কাগজের দোকান না মিল?'

'মিল।'

'কোথায় আপনার মিল?'

'এই ইয়ে কাঁচড়াপাড়ায়!'

কাকাবাবু হেসে অংশুমানের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাতে আমি লোকের মিথ্যে কথা শুনে চট করে ধরে ফেলতে পারি। কাঁচড়াপাড়ায় কোনও কাগজের মিল নেই। কস্মিনকালেও আপনার কাগজের ব্যবসা ছিল না। আপনার নামও রতনমণি ঘোষ দস্তিদার নয়। এবারে বলুন তো সত্যি করে। আপনি কে?'

গাড়িটা বারুইপুরের দিকে গেল না। অংশুমান মাঝে মাঝে গুঙ্গার ডান কাঁধ আর বাঁ কাঁধ চাপড়াতে লাগল, সেই অনুযায়ী সে ডান দিকে বা বাঁ দিকে ঘোরাতে লাগল গাড়িটা।

কাকাবাবু বললেন, 'আমাকে বাড়িতে নামানর ইচ্ছা নেই আপনার? একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, আমি কোথায় যাচ্ছি?'

কাকাবাবু অংশুমানের আসল পরিচয় জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, প্রথম রাউন্ডে আপনিই জিতলেন। আপনি ধরে ফেলেছেন যে আমি কাগজের ব্যবসায়ী রতনমণি ঘোষ দস্তিদার নই। আমি কে তা একটু পরেই জানবেন।'

তারপর অংশুমান মাথা হেলান দিয়ে চুপ করে ছিলেন খানিকক্ষণ।

এবারে কাকাবাবুর প্রশ্ন শুনে বললেন, 'আপনার বাড়ি কোথায়, তা আমি জানি। আপনি বিখ্যাত লোক, আপনার বাড়ির খোঁজ পাওয়া তো শক্ত নয়। তবে মুশকিল হচ্ছে কি, আপনার ভাইপো বাড়িতে কুকুর পোষে।'

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'আমার ভাইপো কুকুর পোষে, তাতে আপনার মুশকিলের কি হল? ও, আপনি কুকুর পছন্দ করেন না, তার মানে... তার মানে ... আপনি বারুইপুরের অংশুমান চৌধুরী ... যিনি জন্তু জানোয়ারদের ঘৃণা করেন?'

অংশুমান বললেন, 'হ্যাঁ, এখন বারুইপুরে থাকি বটে, কিন্তু আপনি এর মধ্যে আমার চিঠি পাননি?'

'আপনার চিঠি? কুন্তলপুর, মানে কান্টালপুরা?'

'মনে আছে, মিঃ রায়চৌধুরী?'

'মনে ছিল না। আপনার ওই রহস্যময় বাক্স দুটি পাবার পর সব মনে পড়ে গেল। সেই ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত, অংশুবাবু!'

'শুধু দুঃখিত বললেই চুকে গেল? তাতেই আমি সব ভুলে যাব?'

'তা হলে এতদিন পরে আপনি আমায় কোনও শাস্তি দিতে চান?'

অংশুমান ভীমুর দিকে তাকালেন, সে এমনভাবে হাঁ করে আছে যে, মনে হয় সে কান দিয়ে শোনে না, মুখ দিয়ে শোনে।

অংশুমান তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'মুখ বন্ধ কর।'

সে সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করে অন্যদিকে তাকাল।

অংশুমান আবার কাকাবাবুকে বললেন, 'আমার ড্রাইভার কানে শুনতে পায় না, আবার আমার এই অ্যাসিস্ট্যান্টটি সব কথা শুনতে পায় বটে কিন্তু সব কথার মানে বোঝে না। আপনি একরকম বলবেন, ও অন্যরকম বুঝবে। সেইজন্য আমি ওর সামনে সবরকম কথা আলোচনা করতে চাই না। কোথায় নিরিবিলিতে বসে কথা বলা যায় তাই ভাবছি।'

কাকাবাবু বললেন, 'এই ময়দানেই তো কত ফাঁকা জায়গা। একটা কোথাও গাড়ি থামিয়ে কথা সেরে নেওয়া যেতে পারে।'

অংশুমান নাক কুঁচকে বললেন, 'এই ময়দানে! এখানে বড্ড গোবরের গন্ধ!'

'এতবড় ময়দান, বৃষ্টি পড়ছে .. এখানে আপনি গোবরের গন্ধ পাচ্ছেন?'

'কত গোরু-ঘোড়া-ভেড়া এখানে চড়ে বেড়ায় না; ভাবতেই আমার গা ঘিনঘিন করে।'

'তা হলে কোথায় যেতে চান, বলুন, আমি আপনাকে একঘন্টার বেশি সময় দিতে পারব না কিন্তু।'

'মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, এখন আপনি আমার গাড়িতে বসে আছেন। এ-গাড়ি থেকে কখন নামবেন, সেটা আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে না, কি বলেন!'

'অন্যের ইচ্ছাতে গাড়ি করে ঘুরতে আমার একটুও ভাল লাগে না। আপনি আপনার গাড়িতে তুলেছেন সে জন্য ধন্যবাদ। এখন আমি বৃষ্টির মধ্যেও হেঁটে যেতে রাজি আছি। গাড়িটা থামাতে বলুন।'

'আরে আরে আপনি জোর করে নামতে চান নাকি? আমার হাতে যে ছড়িটা দেখছেন, এটা একটা সাংঘাতিক অস্ত্র। আপনার কাছে বন্দুক-পিস্তল থাকলেও কোনও লাভ নেই।'

কাকাবাবু কপাল কুঁচকে বললেন, 'আমি সব সময় বন্দুক-পিস্তল সঙ্গে নিয়ে ঘুরব কেন? আমি কি চোর-ডাকাত নাকি? আপনিই বা আমাকে এরকম ভয় দেখাচ্ছেন কেন? এটা কি আপনার উচিত হচ্ছে?'

অংশুমান বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন, গঙ্গার ধারে যাওয়া যাক। এত বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে ওখানে কেউ এখন থাকবে না আশা করি।'

তিনি গুঙ্গার কাঁধে আবার চাপড় মারলেন।

আউটরাম ঘাট পেরিয়ে একটা জায়গায় গাড়িটা থামল। এখনও বেশ মাঝারি-জোরে বৃষ্টি পড়ছে। যারা রোজ এখানে বেড়াতে আসে, তারা কেউ নেই। জায়গাটা বেশ অন্ধকার মতন।

গাড়ির পেছন থেকে একটা ছাতা নিয়ে অংশুমান বললেন, 'আপনি বসুন, আগে আমি ভাল করে দেখে নিই।' দরজা খুলে তিনি নামতে গিয়েই বিকৃত গলায় চিৎকার করে ডাকলেন, 'ভীমু! ভীমু!'

গাড়িটা যেখানে থেমেছে, তার খুব কাছেই একটা কদমগাছের নিচে একটা কুকুর চুপচাপ বসে আছে

ভীমু গাড়ি থেকে নেমে হুশ হুশ করে ছুটে গেল। সে কুকুর বেচারা বুঝলই না সে কি দোষ করেছে। সে ল্যাজ তুলে দৌড়ল।

ভীমু এদিক-ওদিক দেখে এসে বলল, 'আর কিছু নেই, স্যার।'

অংশুমান কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তাঁর শরীর কাঁপছে। কুকুর দেখলে তাঁর এমন অবস্থা হয়। এমন মানুষকে তো জব্দ করা খুব সহজ!

একটু বাদে অংশুমান নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আর কিছু নেই, ঠিক দেখেছিস?'

ভীমু বলল, 'হ্যাঁ স্যার!'

'আসুন মিঃ রায়চৌধুরী, আমরা গঙ্গার ধারে দাঁড়াই।'

রেল লাইন পেরিয়ে দু'জনে এলেন গঙ্গার ধারেররেলিং-এর কাছে। অংশুমান ভীমু আর গুঙ্গাকে নির্দেশ দিলেন খানিকটা দূরে দূরে দু'পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দিতে।

কাকাবাবুর ছাতার দরকার নেই। তাঁর গায়ে রেইন কোট, মাথায় টুপি।'

অংশুমান ছাতা মাথায় দিয়ে কাকাবাবুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কান্টালপুরে আপনি আমায় যে অপমান করেছিলেন, তার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে হলে আপনাকে আমি এক্ষুনি মেরে গঙ্গায় ফেলে দিতে পারি, বুঝলেন? আপনাকে মেরে লাশটা জলে ফেলে দেব, ভাসতে ভাসতে সেটা বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে যাবে, কেউ কোনদিন আপনার খোঁজ পাবে না।'

কাকাবাবু হেসে উঠে বললেন, 'এই ভয় দেখাবার জন্য আপনি আমাকে বৃষ্টির মধ্যে গঙ্গার ধারে টেনে আনলেন? আমাকে মেরে ফেলার ভয় এ-পর্যন্ত কত লোক দেখিয়েছে, কেউ কিন্তু এখনও মারতে পারেনি।'

অংশুমানও কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে যে অস্ত্র আছে, সেটা আমার নিজের তৈরি। সেটা ব্যবহার করলে আপনার মুন্ডুটা এই মুহূর্তে ছাতু হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা আমি ব্যবহার করব না। কেন জানেন? কারণ আমি খুনি নই। আমি একজন

বৈজ্ঞানিক। আমি মানুষের ক্ষতি করি না। উপকার করি। কান্টালপুরে আপনি আমায় যে অপমান করেছিলেন ..'

'শুনুন অংশুমানবাবু, কান্টালপুরে সেবার আমি একটা সরকারি কাজে গিয়েছিলাম। আমাকে সেখানে অনেকে বলল, সেখানে একজন এমন অদ্ভুত লোক আছে যে, জলকে মদ করে দিতে পারে, লোহাকে সোনা করে দিতে পারে, ফুলকে প্রজাপতি বানিয়ে দেয় .. সেই লোকটা একটা গুহার মধ্যে থাকে। শুনে আমার কৌতূহল হল। প্রথমে ভাবলুম, কোনও সাধুটাধু হবে বোধহয়। কিন্তু আপনি এমন একটা অদ্ভুত পোশাক পরেছিলেন, তার ওপর আবার সেই গুহার মধ্যে অনেক রকম যন্ত্রপাতি. .. আপনাকে দেখে তো আমি বাঙালি বা ভারতীয় বলে চিনতে পারিনি। মনে হয়েছিল একটা বুজরুক। সেই লোকটা সাধারণ ম্যাজিক দেখিয়ে লোকদের ঠকাচ্ছে!'

'ঠকাচ্ছে মানে, আমি কি কারও কাছ থেকে পয়সা নিতাম? ওখানকার লোকদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করা আমার দরকার ছিল। আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল ওই গুহাটা ব্যবহার করা। ওই গুহাতে অন্য গ্রহ থেকে কয়েকটা বুদ্ধিমান প্রাণী এসেছিল, তাদের ফেলে যাওয়া যন্ত্র একটা আমি পেয়েছিলাম। ব্যাপারটা খুব গোপন রাখার জন্য ... '

'অন্য গ্রহের প্রাণীর ব্যাপারে আমি কিছু বুঝি না। আমি এখনও পৃথিবীর মানুষদের বোঝবার চেষ্টা করি। আমার ধারণা হয়েছিল, মিথ্যে কথা বলে লোকজনদের ঠকাচ্ছেন। লোহাকে সোনা করা, ফুলকে প্রজাপতি করা এসব তো অতি সাধারণ ম্যাজিক।'

'যারা ম্যাজিক দেখায়, তারা বুঝি লোককে ঠকায়? তারা তো লোকেদের আনন্দ দেয়।'

'কিন্তু তারা পরে বলে দেয়, এ সবই ম্যাজিক। মিথ্যে অন্য কথা বলে না। যাই হোক, আমি হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম। অত লোকজনের সামনে আপনার ম্যাজিক ফাঁস করে দেওয়া ঠিক হয়নি। তাতে লোকজন যে অত খেপে উঠবে, আপনার মাথা ন্যাড়া করে দেবে, তা আমি বুঝতে পারিনি।'

'তারপর থেকে আমার মাথায় আর চুল গজায়নি!'

'সেজন্য আমি দুঃখিত। খুবই দুঃখিত!'

'আপনি দুঃখিত বলেই আমার অপমান চুকে গেল? বাঃ, বাঃ।'

কাকাবাবু এবারে একটি অদ্ভুত কান্ড করলেন। একটা হাতের ঝটকায় অংশুমানের ছাতাটা ফেলে দিয়ে তারপর দু'হাতে তার ঘাড় চেপে ধরে একটা ঝটকা মারলেন। অংশুমানের অতবড় লম্বা শরীরটা শূন্যে উল্টে গেল। কাকাবাবু তাঁকে রেলিং-য়ের ওপাশে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে ধরে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বললেন, 'কেউ আমার দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে ভয় দেখালে তার ওপর আমি একটু না একটু প্রতিশোধ না নিয়ে পারি না। এটা আমার একটা প্রতিজ্ঞা বলতে পারেন, এখন আপনাকে নিচের কাদার মধ্যে ফেলে দেব।'

অংশুমানের ওই অবস্থা দেখে দূর থেকে ছুটে এল ভীমু আর গুঙ্গা।

কাকাবাবু আবার আর এক হ্যাঁচকা টানে অংশুমানকে রেলিংয়ের পাশে ফিরিয়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

অংশুমানের হাত থেকে খসে পড়া ছড়িটা তিনি নিজে তুলে নিয়ে ওদের বললেন, 'যাও, যাও, ঠিক আছে। যেখানে ছিলে, সেখানে যাও।'

অংশুমান দু'তিন মিনিট কোনও কথা বলতে পারলেন না। কাকাবাবুর ইঙ্গিতে ভীমু আর গুঙ্গা সরে গেল দূরে।

কাকাবাবু অংশুমানের পিঠে চাপড় মেরে বললেন, 'কি হল, এত ঘাবড়ে গেলেন কেন! অন্যদের মেরে ফেলার ভয় দেখাতে পারেন, আর নিজে এইটুকু বিপদে পড়েই কাবু! যান, শোধবোধ। ' আপনার ওপরে আমার আর কোনও রাগ নেই। আপনিও রাগ মুছে ফেলুন!'

অংশুমান দু'হাতে মুখ ঢেকে দিলেন। এবার হাত সরিয়ে বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, সেই কান্টালার ঘটনার পর আমিও প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, আপনার ওপর কোনও প্রতিশোধ না নিলে আমার জীবনে কোনও শান্তি আসবে না। আমার সে প্রতিজ্ঞা কি ব্যর্থ হবে?'

'ঠিক আছে, কি প্রতিশোধ নিতে নিতে চান, বলুন? আমার ক্ষমা চাওয়া যথেষ্ট নয়?'

'আপনি একা একা আমার কাছে ক্ষমা চাইলে কি হবে। সবার সামনে আমার কাছে আপনাকে অপমান সইতে হবে। কিংবা কোনও প্রতিযোগিতায় আপনি হেরে যাবেন, তারপর সকলের সামনে সেটা স্বীকার করবেন।

'কি রকম প্রতিযোগিতা বলুন; সেটা ঠিক করেছেন?'

'মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের এক গ্রামে একটা টারকোয়াজের মূর্তি আছে। সেটা উদ্ধার করতে আপনিও যাবেন, আমিও যাব। দেখা যাবে কে আগে সেটা উদ্ধার করতে পারে। আপনি, না আমি!'

কাকাবাবু প্রথমে কপাল কুঁচকে রইলেন। তারপর রাগ করার বদলে হেসে ফেলে বললেন, 'আপনিই জিতবেন, আমি হার স্বীকার করছি। ওই প্রতিযোগিতাতে আমি নামছি না!'

অংশুমান দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'তা বললে তো আমি মানছি না। আপনাকে যেতেই হবে। না গিয়ে আপনার উপায় নেই!'

৫

জিপগাড়ির লোকদুটোকে দেখে জোজো দৌড় লাগালেও সন্তু দাঁড়িয়ে রইল এক জায়গায়। অরিন্দম সন্তুর হাত ধরে টানতে লাগল। সন্তু একঝলক তাকিয়ে দেখল, জোজো নিজের বাড়ির দিকে না গিয়ে চলে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে।

লোক দুটো জোজোকেও তাড়া করে গেল না। সন্তুদের সামনেও এল না, ডান দিকে একটু বেঁকে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে নাচতে লাগল দু'হাত তুলে।

সন্তু হো-হো করে হেসে উঠল।

জোজো যাদের স্পাই ভেবে ভয় পেয়ে পালাল, সেই লোক দু'জন আসলে একটা ঘুড়ি ধরবার জন্য লাফাচ্ছে। একটা কালো রঙের চাঁদিয়াল ঘুড়ি কেটে এসেছে। দুলতে-দুলতে নামছে নিচের দিকে।

সন্তুরও ঘুড়ি ওড়াবার খুব শখ। এই বিশ্বকর্মা পূজোর দিনেও সে সারাদিন ঘুড়ি উড়িয়ে চোখ লাল করেছে। রাস্তায় চলতে চলতে আকাশে ঘুড়ির প্যাঁচ চলতে দেখলে তার চোখ আটকে যায়। কিন্তু এরকম বয়স্ক দু'জন লোককে ঘুড়ি ধরার জন্য রাস্তার মাঝখানে লাফাতে সে আগে কখনও দেখেনি।

আরও দু'তিনটে বাচ্চাবাচ্চা ছেলেও সেখানে ছুটে গেছে ঘুড়িটা ধরার লোভে। তাদের হাতে কঞ্চি ও আঁকশি। সেইরকম একটা ছেলের আঁকশিই প্রথম ঘুড়িটাকে ছোঁয়, কিন্তু জিপগাড়ির লোকদুটির মধ্যে যে বেশি লম্বা সে লাফিয়ে ঘুড়িটাকে ধরে নেয়।

তারপর ওদের সঙ্গে বাচ্চা ছেলেদের ঝগড়া লেগে যায়।

সন্তুর আবার হাসি পায়। জোজো এই লোকদুটোকে স্পাই ভেবেছিল।

অরিন্দমকে সে বলল, 'দেখলি জোজোর কান্ডটা?'

জোজো রাস্তার মোড়ে চলে গিয়ে একটা দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে। এবারে ওদের দেখে হাতছানি দিল।

সন্তু অরিন্দমকে আবার বলল, 'জোজোর এই সব কায়দার মানে কি, বুঝলি তো? ও আমাদের ওর বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে চায় না।'

অরিন্দম বলল, 'তুই ঠিক বলেছিস, সন্তু। এর আগে আমি দু'তিনবার জোজোর কাছে এসেছি। প্রত্যেকবারই জোজো আমার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছে। কেন এরকম করে বল্ তো?'

সন্তু বলল,'তার মানে, জোজো চায় না ওর বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যাক। ও যত গুলটুল মেরেছে, সব তা হলে ধরা পড়ে যাবে।'

অরিন্দম মোড়ের মাথায় এসে বলল, 'এই জোজো, তুই আমাদের স্পাই-এর মুখে ফেলে পালিয়ে এলি?'

জোজো চোখ বড়বড় করে বলল, 'চুপ! আস্তে। সাবধানের মার নেই। বুঝলি? স্পাইরা কখন কি সেজে থাকে, কিছু বলা যায় না। তোরা সঙ্গে আছিস বলেই ওই লোকদুটো অন্যরকম হয়ে গেল। নইলে আমি ডেফিনিট যে, ওরা আমাদের বাড়ির ওপরেই নজর রাখছে!'

অরিন্দম বলল, ' তা বলে দিনের বেলা তোর বাড়ির সামনে থেকে তোকে ধরে নিয়ে যাবে? তুই কি বাচ্চা, না এটা মগের মুল্লুক?'

জোজোদের পাশের বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে জিপ গাড়িতে উঠলেন। তারপরেই গাড়িটা স্টার্ট দিল।

সন্তু বলল, 'ওই যে চলে গেল স্পাইদের গাড়ি!'

জোজো তখনও বলল, 'তোরা আমার কথা বিশ্বাস করছিস না? আমাদের ওই পাশের বাড়িটা কী ডেঞ্জারাস না, জানিস না তো! প্রত্যেক মাসে ওই বাড়িতে ভাড়াটে পাল্টায়। কেন জানিস,আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখার জন্য! একদিন দেখি যে, ওরা ওদের ছাদের ওপর একটা র‍্যাডার বসাচ্ছে। আমাদের বাড়ির ছবিটবি সব তুলে নেবে ভেবেছে!'

সন্তু বলল, 'র‍্যাডার? পাশের বাড়ির ছবি তোলার জন্য র‍্যাডার লাগে বুঝি?'

জোজো বলল, 'আজকাল সায়েন্সের কতরকম উন্নতি হয়েছে তোরা জানিস না! অন্ধকারে ছবি তোলা যায়! শুধু শব্দ শুনে তা থেকে ছবি ফুটিয়ে তোলা যায়। রেডিও ফোটো কীভাবে আসে? সাউন্ডে আসে।'

অরিন্দম বলল, ' তা হলে তোদের বাড়ির সব ছবি পাশের বাড়ি থেকে তুলে নিল! তুই গিয়ে কয়েকখানা ছবি চাইলেই পারিস।'

জোজো বলল, 'আমাদের সঙ্গে অত সস্তায় বাজিমাত করা যায় না। বারুইপুরের পিসেমশাইকে খবরটা দিতেই উনি একখানা অ্যান্টির‍্যাডার যন্ত্র ফিট করে দিলেন আমাদের বাড়ির কাছে। ব্যাস, এখন ওদের সব ছবি ভুল উঠছে।'

সন্তু বলল, 'যাক গে, এসব কথা শুনে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আসল যে কাজের জন্য এসেছি, তোর বারুইপুরের পিসেমশাই-এর ঠিকানাটা লিখে দে।'

জোজোর কাছে কাগজ নেই অরিন্দমের পকেটের একটা নোটবই থেকে পাতা ছিঁড়ে জোজো লিখে দিল ঠিকানাটা।

তারপর ফিসফিস করে বলল, 'এটা খুব সিক্রেট। আর কাউকে দেখাসনি!'

সন্তু আর অরিন্দম দু'জনেই হেসে ফেলল আবার। ওরা বারুইপুরে অংশুমান চৌধুরীর বাড়ি দেখে এসেছে। ঠিকানাটাও অতি সাধারণ চৌধুরী লজ, বারুইপুর, এটা এমন কি গোপন ব্যাপার হতে পারে।

সন্তু বলল, 'ঠিক আছে আর কাউকে বলব না। এবারে যাই।'

জোজো বলল, 'তোরা এই দুপুর রোদ্দুরে এসেছিস, চল, তোদের কপিলের শরবত খাওয়াই। আমাদের পাড়ার এই শরবত ওয়ার্ল্ড ফেমাস। পেলে যখন

কলকাতায় ফুটবল খেলতে এসেছিল, তখন তাকে এই শরবত খাওয়ানো হয়েছিল। মস্ত বড় সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে।'

সন্তুদের বাড়িতে তার কোনও বন্ধু এলে সন্তুর মা-ই শরবত বানিয়ে দেন কিংবা অন্য খাবারটাবার দেন। কিন্তু জোজোর ব্যাপারই আলাদা। সে বন্ধুদের খাওয়াতে নিয়ে এল একটা দোকানে।

দোকানটি তেমন বড় নয়, সেরকম সাজানো-গোছানোও নয়। দেওয়ালে ঝুল-কালি জমে আছে। কাউন্টারে যিনি বসে আছেন তাঁর খালি গা। দেওয়ালে একটি মা কালীর ছবি আর একটি লম্বা তালগাছের।

শরবত অবশ্য খেতে মন্দ না।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, 'পেলের সার্টিফিকেটটা কোথায় রে? দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখেনি?'

জোজো মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে বলল, 'তুই কি পাগল হয়েছিস? পেলে এই দোকানে আসবে? পেলে এসেছিল আমার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাদের বাড়িতে। এই দোকান থেকে বানিয়ে তাকে শরবত খাওয়ানো হয়েছিল। পেলে এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে তক্ষুনি লম্বা সার্টিফিকেট লিখে দিল। এমন দামি জিনিস কি হাতছাড়া করা যায়? সেটা আমরাই রেখে দিয়েছি। এই দোকানের মালিককে দিইনি। মাঝে মাঝে দেব দেব বলি অবশ্য।'

সন্তু বলল, 'তোর সঙ্গে দেখা হলে সময়টা বেশ কেটে যায়রে!'

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর সন্তু বাড়ি চলে এল। বিকেলবেলা তার পাড়ার ক্লাবে ব্যাডমিন্টন খেলার কথা।

কিন্তু সন্ধের আগেই বৃষ্টি নেমে গেল। মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল খেলা। ক্লাবঘরে সন্তু খানিকটা বসে রইল। যদি বৃষ্টি থামে। তা আর হল না, সেই যে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল আর আলো ফুটল না, বৃষ্টিও থামল না।

বৃষ্টিতে ভিজতে সন্তুর খুব ভাল লাগে। র‍্যাকেটটা ক্লাবে জমা রেখে সন্তু বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। বৃষ্টির তেজ কম। সন্তুদের বাড়ি মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের পথ। বাড়ির কাছাকাছি এসে সন্তু দেখল, তাদের দরজার কাছে দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, আর তার কুকুরটা একটানা ডেকে চলেছে।

সন্তু জোরে পা চালিয়ে এসে পড়তেই অবাক হয়ে দেখল, এই লোকদুটি দুপুরবেলার সেই ঘুড়ি-ধরা লোক দুটি, কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটা নীল রঙের জিপ গাড়ি।

লম্বা লোকটি বলল, 'আচ্ছা ভাই, তোমার নামই তো সন্তু? তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। তোমার জন্য একটা খবর আছে!'

সন্তু গম্ভীরভাবে বলল, 'বলুন!'

লম্বা লোকটি বলল, 'রাজা রায়চৌধুরী তোমার কাকা হন তো?'

সন্তু মাথা হেলাল।

অন্য লোকটি বলল, 'উনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এক জায়গায়। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এ-কথাটা অন্য কাউকে বলতে বারণ করেছেন। তুমি বাড়িতে ছিলে না, তাই আমরা অপেক্ষা করছি।'

সন্তুর ভুরু কুঁচকে গেল। এটা এমন একটা সস্তা কায়দা যে আজকাল এসব কেউ বিশ্বাস করে না। কলকাতা শহরের মধ্যে কাকাবাবু এক জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আর সন্তুকে ডেকে পাঠিয়েছেন? কলকাতায় কি কাকাবাবুর চেনাশুনো মানুষের অভাব? তিনি এইভাবে অচেনা লোককে দিয়ে ডেকে পাঠাবেন কেন?

সন্তু জিজ্ঞেস করল,'উনি কোথায় আছেন?'

লম্বা লোকটি বলল, 'উনি ন্যাশনাল লাইব্রেরির কাছে বাসে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছেন, কোমরে চোট লেগেছে। ওঁর চেনা একজন লোক দেখতে পেয়ে আলিপুরের একটা নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়েছেন। টেলিফোনে তোমাদের বাড়িতে খবর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু লাইন পাওয়া যায়নি।'

ন্যাশনাল লাইব্রেরির কথা শুনে সন্তু একটু বিচলিত হল। কাকাবাবু প্রায় রোজই এখন ওখানে যাচ্ছেন। এই লোক দুটো সেই খবর রাখে।

কাকাবাবু সন্তুকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, এই রকমভাবে কোনও অচেনা লোক এসে কাকাবাবুর নাম করে সন্তুকে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে সে যেন কখনও না যায়। কিন্তু কাকাবাবুর তো সত্যি কোনও দুর্ঘটনা হতে পারে হঠাৎ! বাস থেকে পড়ে গিয়ে যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন..'

সে জিজ্ঞেস করল, 'নার্সিংহোমটার নাম কি বলুন তো!'

লম্বা লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'প্যারাডাইস নার্সিংহোম, তেইশ নম্বর আলিপুর রোড, সাত নম্বর কেবিন!'

সন্তু বলল, 'আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ির ভেতর থেকে আসছি।'

ভেতরে ঢুকে সে তার কুকুরটাকে চুপ করাল। মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। মাকে কি এই ঘটনাটা জানান উচিত। মা শুধুশুধু চিন্তা করবেন। মা সন্তুকে একা যেতে দিতে রাজি হবেন না। পুলিশে খবর দিতে চাইবেন।

কিন্তু বিপদ সন্তুকে হাতছানি দেয়। এই লোক দুটো কি মতলবে এসেছে তা জানার জন্য সন্তুর দারুণ কৌতূহল হল। সে আর দেরি করতে পারছে না।

সে এই ব্যাপারটা একটা কাগজে লিখে ফেলল খসখস করে। তারপর কাগজটা চাপা দিয়ে রাখল কাকাবাবুর টেবিলে।

সিঁড়ি দিয়ে আবার নামতে নামতে সে চেঁচিয়ে বলল, 'মা, আমি একটু ঘুরে আসছি।'

মা বাথরুমে। তিনি বললেন, 'এই মাত্র ফিরেই আবার বেরুচ্ছিস যে, কোথায় যাচ্ছিস?'

সন্তু বলল, 'আসছি, একটু বাদেই আসছি।'

বাইরে এসে সে লোক দুটোর সঙ্গে জিপ গাড়িতে চড়ে বসল। তারপর সে লম্বা লোকটিকে বলল, 'আপনাদের আমি দুপুরে এক জায়গায় দেখেছি। সত্যিকারের ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

লম্বা লোকটি হেসে সন্তুর কাঁধ চাপড়ে বলল, 'আমরা ভাল লোক। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার কোনও বিপদ হবে না।'

সত্যিই আলিপুরের একটা নার্সিংহোমের কাছে এসে থামল জিপ গাড়িটা। বৃষ্টি এখনও পড়ে চলেছে। লোডশেডিং-এর জন্য রাস্তাঘাট ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু গাড়ির হেড লাইটে দেখা যায় এই বৃষ্টির মধ্যেও রাস্তায় লোকজন আসা যাওয়ার বিরাম নেই।

সন্তুর খিদে পেয়ে গেছে বেশ। ব্যাডমিন্টন খেলার পরেই বাড়ি ফিরে তার কিছু খাওয়া অভ্যেস। এখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। সেই দুপুরবেলা জোজো এক গেলাস শরবত খাইয়েছিল, তারপর আর কিছু খাওয়া হয়নি। সেই শরবতটা নাকি হজমি শরবত, তাতে পেটের সব কিছু হজম হয়ে গেছে!

গাড়িটা পার্ক করার পর লম্বা লোকটি সন্তুকে বলল, 'নেমে এস ভাই; খুব বেশি দেরি হয়নি, কি বল? আশা করি তোমার কাকাবাবু ভাল আছেন।'

নার্সিংহোমের সামনেই খয়েরি রঙের স্যুট পরা একজন বেশ রাশভারি চেহারার লোক দাঁড়িয়ে। লম্বা লোকটি তার কাছে গিয়ে বলল, 'ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি স্যার। কোনও ঝঞ্ঝাট হয়নি।'

লোকটি সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এস আমার সঙ্গে। তোমার কাকাবাবু ভাল আছেন।'

লম্বা লোকটি বলল, 'আমাদের কাজ শেষ তো স্যার? এবার আমরা যেতে পারি?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

'আমাদের টাকাটা স্যার?'

স্যুট-পরা লোকটি পকেট থেকে একটা খাম বার করে লোকটির হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও, তোমাদের পুরো পেমেন্ট আছে।'

'কাল আবার লাগবে ?'

'না, আপাতত লাগবে না। আবার দরকার হলে তোমাদের কোম্পানিতে খবর দেব। লম্বা লোকটি সন্তুর দিকে হাত নেড়ে বলল, 'চলি ভাই!'

স্যুটপরা লোকটি ভুরু কুঁচকে হাতের ঘড়ি দেখল। যেন সে আর কারও জন্য অপেক্ষা করছে।

কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক জায়গা ঘুরে, অনেকরকম মানুষজন দেখে সন্তু খানিকটা লোক চিনতে শিখেছে। কোন্ মানুষটা ভাল আর কোন্ মানুষটার মন হিংসে আর লোভে ভরা, তা সন্তু প্রথম দেখেই বুঝতে পারে। এই স্যুট-পরা লোকটিকে তার খারাপ লোক বলে মনে হল না।

কিন্তু এর পরেই সে লোকটির মুখ থেকে এক আশ্চর্য কথা শুনল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'কাকাবাবু কত নম্বর কেবিনে আছেন? কোন তলায়?'

লোকটি সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে বলল, 'তোমার কাকাবাবু এখানে নেই। তোমাকে একটা মিথ্যে কথা বলে এখানে আনানো হয়েছে। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। তোমার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করবে না।'

সন্তু প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই লোকটা বলে কি? কলকাতা শহরের রাস্তায় সন্ধেবেলা দাঁড়িয়ে বলছে যে, সন্তুকে সে মিথ্যে কথা বলে নিয়ে এসেছে? সন্তু এক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠে লোক জড় করে লোকটাকে ছেলেধরা বলে ধরিয়ে দিতে পারে!

সন্তু ততটা বাচ্চা নয় যে ছেলেধরায় ধরে আনবে। সন্তু এক্ষুনি চলে যেতে চাইলে এই লোকটার সাধ্য আছে ধরে রাখার?

সন্তু বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'তার মানে? আমাকে মিথ্যে কথা বলে এখানে নিয়ে আসার কারণটা কি?'

লোকটি বলল, 'ঠিক মিথ্যে কথাও নয়। তোমার কাকাবাবু এখানে এসে পড়ার কথা ছিল। দু'জন লোক পাঠিয়েছিলাম ওঁকে নিয়ে আসার জন্য। উনি যদি সহজে আসতে রাজি না হন, যদি ধস্তাধস্তি হয়, উনি গায়ে-মাথায় চোট পান, তা হলে এই নার্সিংহোমে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে রেখেছিলাম। কিন্তু উনি এলেন না, লোক দুটোও ফিরল না। কি যে হল বুঝতে পারছি না। আজকাল এইসব লোকজনও হয়েছে অপদার্থ! টাকাও নেবে, কাজও করবে না!'

সন্তুর ক্রমশ ভুরু ওপরে উঠে যাচ্ছে। ঠান্ডাভাবে এসব কি বলছে লোকটা?

'কাকাবাবুকে জোর করে ধরে আনতে পাঠিয়েছেন? কেন?'

'কোনও খারাপ মতলবে নয়। এই একটু কথাবার্তা বলার জন্য। এখন কি করা যায় বল তো?'

'কিছু মনে করবেন না, আপনি কি পাগল?'

'এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছ ভাই? আমাকে দেখে কি পাগল মনে হয়?'

'অন্ধকারে আপনাকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। প্রথমে তো ভালই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আপনার কথাবার্তা শুনে ... কাকাবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য তো আমাদের বাড়িতে গেলেই পারতেন। তার বদলে জোর করে ধরে আনা ...'

'তোমার কাকাবাবু যে বড্ড গোঁয়ার। এমনিতে কথাবার্তা শুনতে চান না।'

'আমি চলি!'

'কোথায় যাবে?'

'বাড়ি ফিরে যাব। এখান থেকে ভবানীপুরে কত নম্বর বাস যায়?'

লোকটি আবার ঘড়ি দেখল। একটা দোকানের আলো একটু একটু রাস্তায় পড়েছে, ঘড়ি দেখবার জন্য লোকটিকে সেই আলোর কাছে যেতে হল। তারপর ফিরে এসে চিন্তিতভাবে বলল, 'তুমি যদি বাড়ি যেতে চাও, যেতে পার। কোন্ বাস

যায় আমি ঠিক বলতে পারব না। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে জেনে নাও। তবে, আমার মনে হয় তোমার কাকাবাবুকে হাওড়া স্টেশনেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

সন্তু আবার চমকে উঠে বলল, 'হাওড়া স্টেশন, কেন?'

'কথা ছিল, তোমার কাকাবাবুকে এখানে আনা হবে প্রথমে, তোমাকেও আনিয়ে নেওয়া হবে। তারপর সবাই মিলে হাওড়া যাওয়া হবে। ট্রেনের টিকিট কাটা আছে। এখন মনে হচ্ছে, কোনও কারণে ওরা সোজাসুজি হাওড়াতেই চলে গেছে।'

'আমাদের ট্রেনে করে কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'তা বেশ দূর আছে।'

'কাকাবাবু তো আমায় বাইরে যাওয়ার কথা কিছু বলেননি?'

'উনি কি আর এমনি যেতে চাইবেন? ওঁকে অজ্ঞান করে নিয়ে যাওয়া হবে। তোমাকে অবশ্য অজ্ঞান করবার দরকার নেই। কাকাবাবু সঙ্গে থাকলে তুমি এমনি এমনিই যেতে চাইবে।'

'আপনার সমস্ত কথাই আমার গাঁজাখুরি মনে হচ্ছে।'

'তুমি বাড়ি চলে যেতে পার। ইন ফ্যাক্ট, তোমাকে আমাদের সে রকম কোনও দরকারই নেই। তোমার পড়শুনা নষ্ট করে শুধুশুধু অনেকগুলো দিন বাইরে কাটাবার কোনও মানে হয় না। এই কথাই আমি সবাইকে বলেছিলাম। তা ওরা বলল,তুমি নাকি তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে সব জায়গায় যাও। তুমি সঙ্গে না থাকলে ওঁর অসুবিধে হবে। সেই জন্যই তোমাকে আনা।'

লোকটি আর একবার ঘড়ি দেখে বলল, 'নাঃ, আর দেরি করা যায় না। আমাকে হাওড়া স্টেশনে যেতেই হবে। আর এক ঘন্টার মধ্যে ট্রেন ছাড়বে। তোমার কাকাবাবুকে আমি বলব, তুমি আসতে রাজি হওনি।'

'কাকাবাবুকে অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যাওয়া এত সোজা ভেবেছেন? আপনাদের মাথা খারাপ?'

'একটা ইঞ্জেকশনের তো মামলা। অন্ধকার রাস্তায় পেছন থেকে টপ করে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলে উনি আর কি করবেন? তবে ওঁর কোনও ক্ষতি হবে না, এটা আমি বলে দিচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পার।'

'আপনারা কোন ট্রেনে যাবেন?'

'ন'টা পাঁচের ট্রেনে।'

'আমি হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে দেখতে চাই আপনার কথা সত্যি কিনা!'

'আমি একদম মিথ্যে কথা বলি না। যেতে চাও, চল! কাছেই দাঁড়ান একটা গাড়ির দরজা খুলে লোকটি বলল, 'এস!'

একটু আগেই সন্তু ভেবেছিল, সে মানুষ চেনে। এখন সে এই লোকটিকে কিছুই বুঝতে পারছে না। লোকটির কথাবার্তা মোটেই গুন্ডা বদমাশদের মতন নয়।

লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের মতন, অথচ সে ঠান্ডা মাথায় কাকাবাবুকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া, অজ্ঞান করা এই সব বলছে!

সন্তু আরও ভাবল, এই লোকটি তাকে এখন জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে না। সে যাচ্ছে নিজের ইচ্ছেতে। কিন্তু না গিয়েই বা উপায় কি? এই সব কথা শুনে নিশ্চিন্তভাবে বাড়িতে ফিরে যাওয়া যায়?

ড্রাইভার নেই, গাড়ি চালাচ্ছে লোকটি নিজেই। কিছুদূর আসবার পর, লোডশেডিং-এর এলাকা ছাড়িয়ে আলো-ঝলমল একটা পাড়ায় এসে লোকটি বলল, 'কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনে নিয়ে যেতে হবে। সামনেই একটা বড় দোকান আছে। তোমার কাকাবাবু চা বেশি ভালবাসেন, না কফি?'

সন্তু বলল, 'কফি।'

'উনি চিনি খান নিশ্চয়। মিষ্টি বিস্কুট না নোনতা বিস্কুট? তুমি চকলেট ভালবাস নিশ্চয়ই?'

লোকটি এমনভাবে কথা বলছে যেন সে সন্তু-কাকাবাবুর কোনও আত্মীয়। গাড়ি থামিয়ে একটা দোকানে ঢুকে লোকটি বেশ অনেকক্ষণ দেরি করল। এদিকে বলছিল ট্রেনের সময়ের আর বেশি দেরি নেই।

একটা মস্ত-বড় প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসে লোকটি বলল, 'যাক, সব কিছুই পাওয়া গেছে। আর কোনও চিন্তা নেই। তুমি একটা চকোলেট খাবে নাকি এখন?'

লোকটি পকেট থেকে একটা চকোলেট-বার বার করে এগিয়ে দিতে সন্তু আর আপত্তি করল না। তার প্রচন্ড খিদে পেয়েছে।

হাওড়া স্টেশনে ট্রাফিক জ্যাম। সন্তুরই উদ্বেগ হতে লাগল। যদি ট্রেন ছেড়ে যায়! লোকটি কিন্তু গাড়ির ইঞ্জিন থামিয়ে নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে তারপর বলল, 'তুমি রাত্তিরে বাড়ি না ফিরলে তোমার মা চিন্তা করবেন তো? ঠিক আছে, আমরা লোক দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেব।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'ট্রেন ছাড়তে আর কত দেরি?'

'আর দশ মিনিট আছে। তবে, আমি না পৌঁছলে ট্রেন ছাড়বে না। আমাদের লোক আছে, চেন টেনে দেবে।'

একটু বাদেই আবার গাড়ি চলল। লোকটি নিজের গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেল স্টেশনের মধ্যে। তারপর নেমে পড়ে বলল, 'ন নম্বর প্ল্যাটফর্ম!'

দু'জনকে দৌড়তে হল এবার। আর মাত্র এক মিনিট বাকি। ফার্স্টক্লাস কামরার সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে, স্যুটপরা লোকটিকে দেখে তারা হাত তুলল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা সরাসরি এখানে চলে এসেছ? নার্সিংহোমের সামনে আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি!'

অন্য লোকটি বলল, 'কি করব, প্ল্যানটা যে পাল্টে গেল।'

'এখন সব ঠিকঠাক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, মানে, এই ছেলেটির কাকাবাবুকে আনা হয়েছে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ঠিক আছে, গাড়ির চাবি নাও। গাড়ি গ্যারাজে তুলে রাখবে। যাবার পথে মিঃ চৌধুরীর বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যাবে। বলবে যে, সন্তু সম্পর্কেও চিন্তা বা ভয়ের কিছু নেই। দিন দশেকের মধ্যেই ফিরে আসবে।'

স্যুট-পরা লোকটি সন্তুর দিকে তাকাতেই সন্তু বলল, 'আমি একবার দেখতে চাই কাকাবাবু সত্যিই আছেন কিনা!'

'ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি ওঠ। গার্ড হুইশ্‌ল দিয়েছে।'

ট্রেনে উঠে লোকটি বলল, 'একদম ধারের কুপে। নম্বর হল এক।'

সন্তু দৌড়ে গেল সেদিকে। ট্রেন নড়তে শুরু করে দিয়েছে। এখনও সন্তু ইচ্ছে করলে লাফিয়ে নেমে পড়তে পারে। এক নম্বর কুপটির দরজা বন্ধ। সন্তু খোলার জন্য টানাটানি করতে লাগল। দরজায় দুম্‌দুম্ করে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগল, 'কাকাবাবু! কাকাবাবু! ভেতরে কে, খুলুন, খুলুন!'

ট্রেন ততক্ষণ প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গিয়ে স্পিড নিয়েছে।

কুপের দরজা খুলল একজন মোটাসোটা মাঝবয়েসী লোক। খাঁকি প্যান্টের ওপর সাদা হাওয়াই শার্ট পরা, মুখভর্তি দাড়ি। সন্তুর সঙ্গে যেন অনেক দিনের চেনা, এইভাবে বলল, 'এস!'

দরজা খোলা মাত্র সন্তু ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছে। একদিকের সিটে কে যেন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, কিন্তু কাকাবাবু নন। কাকাবাবু লম্বা-চওড়া মানুষ, যে শুয়ে আছে সে মোটামুটি সন্তুর সমান। মুখটা চেনা যাচ্ছে না।

কাকাবাবু এখানে নেই! সন্তুকে মিথ্যে কথা বলে নিয়ে আসা হয়েছে!

প্রথম থেকেই সন্তুর এরকম সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু আলিপুরে যে লোকটির সঙ্গে দেখা হল, যে গাড়ি করে সন্তুকে হাওড়া স্টেশনে দিয়ে এল, তাকে সন্তুর খারাপ লোক বা মিথ্যেবাদি বলে মনে হয়নি। তা হলে সন্তুর এতটা ভুল হল।

সন্তু পেছন ফিরে তাকাল। ট্রেন বেশ জোরে চলতে শুরু করেছে। এখন আর লাফিয়ে নেমে পড়া যায় না।

একটুও ভয় না পেয়ে সন্তু রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? কাকাবাবু কোথায়?'

খাকি প্যান্ট পরা লোকটি অবাকভাবে বলল, 'কাকাবাবু? কে ভাই তোমার কাকাবাবু?'

সন্তু আবার জোর দিয়ে বলল, 'আমার কাকাবাবুর নাম রাজা রায়চৌধুরী, তিনি কোথায়?'

'আমি তো ভাই তোমার কাকাবাবুকে চিনি না। তিনি কোথায় তা আমি জানব কি করে? তুমি এস, ভেতরে এসে বোস!'

'তা হলে কি কাকাবাবু অন্য কোন কুপেতে আছেন?'

'তাও তো আমি জানি না। তোমার কাকাবাবু এই ট্রেনে চেপেছে বলে মনে হয় না। তা হলে আর আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে কেন?'

সন্তু অন্য কুপগুলিতে উঁকি মেরে এল। সব কটারই দরজা খোলা। তার মধ্যে দুটি একদম খালি। অন্যগুলিতে অন্য যাত্রীরা রয়েছে। যে লোকটি সন্তুকে হাওড়ায় নিয়ে এসেছে, সেও এই কামরায় কোথাও নেই। সে ওঠেনি। দরজার কাছে খাবারদাবারের প্যাকেট পড়ে আছে।

খাকি প্যান্ট পরা লোকটি সেই প্যাকেট তুলে নিয়ে সন্তুকে বলল, 'এস। কিছু খেয়ে-টেয়ে নেওয়া যাক!'

সন্তুর মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। তাকে এইভাবে মিথ্যে কথা বলে ট্রেনে তোলা হল কেন? কারা এসব করছে? এতে তাদের কি লাভ? সন্তু কি ছেলেমানুষ নাকি? সে তো পরের স্টেশনেই নেমে পড়তে পারে। তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সে অন্য যাত্রীদের কাছে সাহায্য চাইবে!

সে খাকি প্যান্ট পরা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি আমি জানতে চাই। আমাকে কেন এই ট্রেনে তোলা হল?'

খাকি প্যান্ট পরা লোকটি একগাল হেসে বলল, 'আমার ওপর রাগ করছ কেন? আমি ব্যাপার-স্যাপার কিছুই জানি না। আমাকে প্রশ্ন করলেও উত্তর দিতে পারব না। আমার ওপর শুধু ভার পড়েছে তোমাদের দু'জনকে এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। তোমাদের কোথাও অযত্ন হবে না।'

'কোথায় পৌঁছে দেওয়া?'

'সেটা বলতে পারি। এখন বলতে কোনও ক্ষতি নেই। সম্বলপুরে।'

'সম্বলপুরে? সেখানে গিয়ে আমি কি করব?'

'তা তো ভাই আমি জানি না। সম্বলপুরে তোমাদের নিতে অন্য লোক আসবে। আমি তোমাদের হ্যান্ডওভার করেই ফেরত ট্রেনে চলে আসব। সুতরাং সম্বলপুরে গিয়ে তুমি কি করবে তা তো আমি জানি না।'

'সম্বলপুরে আমি যাব কেন? আমি পরের স্টেশনে নেমে যাব।'

লোকটি কয়েক পলক সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের দাড়ি চুলকে বলল, 'সেটা একটা কথা বটে। তুমি যদি যেতে না চাও, আমি কি তোমাকে জোর করে আটকে রাখব? সেরকম কোনও কথা তো আমাকে বলা হয়নি। আর অল্পবয়েসি ছেলেদের ওপর জোরজার করা আমি পছন্দ করি না। তোমার যেতে ইচ্ছে না হলে যেও না। আমি সম্বলপুরে গিয়ে বলব দু'জনের বদলে একজন এসেছে!'

'আর একজন কে?'

'নামটাম কিছু জানি না। তোমার নামও তো জানি না। ওই ওখানে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পরের স্টেশন তো খড়গপুর, পৌঁছতে অনেক দেরি আছে। ততক্ষণ তুমি ভেতরে এসে বোস!'

সন্তু ভেতরে এসে চাদরে ঢাকা লোকটির দিকে তাকাল। তার মুখটা দেওয়ালের দিকে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

খাকি প্যান্টপরা লোকটি খাবারের প্যাকেটটি খুলে বলল, 'বাঃ বাঃ, অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছে। ভাল স্যান্ডউইচ আছে। এই যে ভাই, খাবে নাকি? খাও, খাও, খাবারের ওপর রাগ করতে নেই।'

একখানা চকোলেট খেয়ে সন্তুর খিদে মেটেনি। খাবার দেখেই তার খিদে আবার বেড়ে গেল। কিন্তু এদের খাবার কি খাওয়া উচিত?

বেশি চিন্তা না করে সন্তু দু'খানা স্যান্ডউইচ হাতে তুলে নিল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'পরের স্টেশনে নেমে তুমি কি বাড়ি ফিরে যাবে? ট্রেনের টিকিট কাটার সময় আছে?'

'সে আমি বুঝব!'

'আমি তোমাকে গোটা দশেক টাকা দিতে পারি। ধার হিসেবেই নিও। আমার ঠিকানা দিয়ে দেব, যদি পার কখনও ফেরত পাঠিও!'

সন্তুর আবার খটকা লাগল। এ কি ধরনের লোক এরা? মিথ্যে কথা বলে, অন্যায়ভাবে তাকে ট্রেনে চাপিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি কিংবা কোনরকম জোরও করেনি। এমনকি সন্তু ফিরে যেতে চাইলে ট্রেনের টিকিট কাটার পয়সা দিয়ে দেবে বলছে?

স্যান্ডউইচ দুটো খেয়ে নিয়ে সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে, তা কি জানতে পারি?'

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, কেন জানতে পারবে না। আমি তো চোর-ডাকাত নই যে নাম লুকোব। আমার নাম মনোহর দাস। একটা সিকিউরিটি সার্ভিস অফিসে কাজ করি। আমাদের কাজ হল, লোকের দামিদামি জিনিসপত্র পাহারা দেওয়া। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনা, কোনও লোক হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করা, এইসব। এখন আমার ডিউটি পড়েছে, তোমাদের দু'জনকে ভালভাবে সম্বলপুরে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু জোর করে ধরে নিয়ে যেতে হবে, সেরকম কোনও ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়নি। তোমাকে কি কেউ জোর করে ট্রেনে তুলেছে? তুমি তো একাই এসেছ দেখছি।'

'আমাকে মিথ্যে কথা বলে আনা হয়েছে।'

'সে তোমায় কে কি বলেছে,, তা বাপু আমি জানি না। খড়গপুরেই নেমে পড় তা হলে। এখনও ফেরার অনেক ট্রেন পাবে।'

ঘুমন্ত লোকটি একটা শব্দ করে পাশ ফিরল। এবারে সন্তু এমন চমকে গেল যে তার বুকটা কাঁপতে লাগল ভূমিকম্পের মতন।

মুখ থেকে চাদরটা সরে গেল। ঘুমন্ত লোকটি আর কেউই নয়, তার বন্ধু জোজো!

সন্তু ভাবল, তা হলে এই সবই কি জোজোর কারসাজি? জোজো এইভাবে কোনও প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছে! জোজোটাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

সে উঠে গিয়ে জোজোর বুকে হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'এই জোজো,ওঠ! ওঠ! মটকা মেরে আর কতক্ষণ থাকবি।'

জোজো কোনও সাড়া দিল না।

দু'তিনবার ঝাঁকুনি দেবার পর সন্তু বুঝতে পারল, জোজো ঘুমের ভান করে নেই। তার শরীরটা অসাড়, তার জ্ঞান নেই। সন্তু এবারে ভয় পেয়ে গেল।

সন্তু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওর কি হয়েছে?'

মনোহর দাস উঠে এসে জোজোর নাকের কাছে হাত দিয়ে নিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখল। জোজোর নাড়ি দেখল। তারপর বলল, 'না চিন্তার কিছু নেই। অজ্ঞান হয়ে আছে। আমিও সেইরকম সন্দেহ করেছিলুম। ওরা ঘুমন্ত অবস্থায় শুইয়ে দিয়ে গেল। এমন অবেলায় কেউ কি অঘোরে ঘুমোতে পারে? ছিঃ এইটুকু লোককে কি কারুর অজ্ঞান করা উচিত?'

'মনোহরবাবু, ওর কখন জ্ঞান ফিরবে?'

'তা তো বলতে পারব না ভাই। আমি তো ডাক্তার নই। তবে ঘন্টা দু'একের বেশি লাগবে না মনে হয়।'

সন্তু দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। খড়গপুর পৌঁছবার আগে যদি জোজোর জ্ঞান না ফেরে তা হলে সে নামবে কি করে? জোজোকে ফেলে চলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কে কোন্ মতলবে তাকে আর জোজোকে একসঙ্গে ধরে নিয়ে যেতে চায়?

মনোহর দাস একটার পর একটা খাবার খেয়ে যাচ্ছে। একটু পরে সে বলল, 'এখন এক কাপ চা পেলে বেশ জমত। দেখা যাক খড়গপুরে চা ওয়ালা পাওয়া যায় কিনা। আমি এক কাজ করব, বুঝলে! খড়গপুরে অনেকক্ষণ ট্রেন থামবে। আমি এক কাপ চা খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি তার পরে নেমে যেও। আমি সম্বলপুরে পৌঁছে বলব আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সেই একফাঁকে একটি ছেলে নেমে গেছে। ব্যাস আমার আর কোনও দায়িত্ব রইল না। আমি ঘুমোতে পারব না, এরকম তো কোনও কথা নেই।'

সন্তু বলল, 'কিন্তু আমার বন্ধুকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি তো একলা নামতে পারি না।'

'এই ছেলেটি তোমার বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমরা এক কলেজে পড়ি। কালকে ক্লাস আছে। আমাদের দু'জনেরই আজ রাত্তিরেই বাড়ি ফেরা দরকার।'

'তোমরা দু'জনেই চলে গেলে ... সে বড় খারাপ ব্যাপার হয়ে যাবে। তাহলে আর আমার চাকরি থাকবে না। দু'জনকে পৌঁছে দেবার কথা, তার মধ্যে একজনও পৌঁছবে না, তা কি হয়? তুমি শুধু তোমার দায়িত্ব নাও!'

'আপনি বুঝি আপনার কোনও বন্ধুকে এরকম অবস্থায় ফেলে পালাতে পারেন?'

'এটা বড্ড শক্ত প্রশ্ন করলে, ভাই। উত্তর দেওয়া খুব শক্ত। আমি এটা বুঝব কি করে, আমার তো কোনও বন্ধুই নেই। 'অফিসে যাদের সঙ্গে কাজ করি, তারা চান্স পেলেই ল্যাং মারে।'

'আপনি বলছেন, আপনি সিকিউরিটির লোক, তার মানে কি পুলিশ?'

'না, না । প্রাইভেট কোম্পানি আমাদের। লোকে আমাদের ভাড়া করে। মনে কর , আমরা হচ্ছি ভাড়াটে দারোয়ান।'

'এরকম বিচ্ছিরি চাকরি করেন কেন?'

'অন্য চাকরি কে দেবে? তুমি দেবে? তোমার বাবাকে বলে দেবে তো।'

'আপনার সঙ্গে আর্মর্স আছে?'

'তা আছে ছোটখাট। তবে বিশেষ কাজে লাগে না।'

'ছোটখাট মানে? ছুরি না রিভলবার?'

'ধরে নাও দুটোই। রিভলভারের লাইসেন্স আছে বটে। কিন্তু এ পর্যন্ত একটাও গুলি ছুঁড়িনি। গুলির যা দাম!'

'ছুরি ব্যবহার করেছেন তা হলে?'

'ছুরিটা কাজে লাগে দড়িফড়ি কাটবার জন্য। এসব কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? তোমাদের ওপর আমি ছুরি গোলাগুলি চালাব ভেবেছ? কখনো না! শেষকালে খুনের দায়ে পড়ি আর কি! তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়েও যদি পালাতে চাও, তাতেও বাধা দেব না। চাকরি যায় যাক।'

খড়গপুর স্টেশন এসে গেল। সন্তু আবার জোজোকে ধাক্কা মারল কয়েকবার। জোজোর জ্ঞান ফেরার কোনও চিহ্নই নেই। সন্তু অসহায়ভাবে তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক। এখন সে কি করবে?

মনোহর দাস চাওয়ালা ডেকে পরপর দু'ভাঁড় চা খেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সন্তুর দিকে সে আড়চোখে দেখছে আর মিটিমিটি হাসছে।

একটু পরে সে বলল, 'যতদূর মনে হচ্ছে, বন্ধুকে ফেলে তুমি একলা যাবে না! চমৎকার,এই তো চাই। এমন না হলে আর কিসের বন্ধুত্ব! বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। তুমি এক কাপ চা খাবে নাকি?'

ট্রেন আবার চলতে শুরু করল।

৬

কাকাবাবু একবার চোখ মেলেই আবার চোখ বুজিয়ে ফেললেন। এখনও চোখের পাতাদুটো খুব ভারি। ঘুম কাটেনি। শরীরটা দুলছে। শরীরটা দুলছে না মাথা ঘুরছে?

কিংবা তিনি কি শূন্যে ভাসছেন? তাঁর ইচ্ছে করল চোখ খুলে ভাল করে দেখতে। কিন্তু কিছুতেই আর তাকাতে পারছেন না।

মিনিট পনেরো আবার অজ্ঞানের মতন ঘুমিয়ে কাকাবাবু দু'চোখ মেললেন। আলোতেও চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সেইজন্য কিছুই দেখতে পেলেন না। শরীরটা এখনও দুলছে। গলা শুকিয়ে কাঠ, জলতেষ্টা পেয়েছে খুব। অতি কষ্টে তিনি পাশ ফিরলেন।

কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'জল খাবেন?'

কাকাবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। আগে তিনি মনে করবার চেষ্টা করলেন, তিনি কোথায় রয়েছেন? কখন ঘুমিয়ে পড়লেন, ঘুমোবার আগে কোথায় ছিলেন, তাঁর এসব কিছুই মনে পড়ল না।

'মিঃ রায়চৌধুরী, জল খাবেন?'

প্রচন্ড মনের জোর এনে কাকাবাবু এক ঝটকায় উঠে বসলেন। তার মাথা ঘুরতে লাগল, মনে হল গায়ে একটুও জোর নেই। তারই মধ্যে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি রয়েছেন একটি রেলের কামরায়। বেশ বড় কামরা কিন্তু তাতে আর একজন মাত্র লোক রয়েছে। লোকটির গায়ে পাতলা সাদা কোট, হাসপাতালের ডাক্তাররা যেরকম পরেন।

ঘুমের ভাবে কাকাবাবু একটুও বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। লোকটির দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন বেশ কয়েক মুহূর্ত।

লোকটি একটা ফ্লাস্ক থেকে এক গেলাস জল ঢেলে নিয়ে কাছে এসে বলল, 'জলটা খেয়ে নিন, ভাল লাগবে।'

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিয়ে সবটা জল খেয়ে নিলেন ঢকঢক করে। তারপর গেলাসটি ফেরত দিয়ে বললেন,'ধন্যবাদ!'

সাদা কোট পরা লোকটা বলল, 'শরীর খারাপ লাগছে না তো? খিদে পেয়েছে?'

কাকাবাবু মনে মনে ভাবলেন, 'এটা ট্রেনের কামরা না হাসপাতাল? কোনও উত্তর না দিয়ে তিনি চারদিক ভাল করে চেয়ে দেখলেন। সবকটা জানলা বন্ধ। তবে এটা সাধারণ রেলের কামরা নয়। স্পেশাল ব্যাপার। খুব সম্ভবত সেলুন কার। এক পাশটা লেবরেটরির মতন। কিছু যন্ত্রপাতি ও টেস্ট-টিউব ইত্যাদি রয়েছে। ট্রেনটা খুব জোর ছুটছে। সেই জন্যই তার শরীরটা দুলছে।

সাদা কোট পরা লোকটি বলল, 'আপনি একটানা ঠিক সতরো ঘন্টা ঘুমিয়েছেন।'

যেন এটা মোটেই আশ্চর্য হবার মতন কোনও কথা নয়, এইভাবে কাকাবাবু বললেন, 'ও!'

কামরার এক কোণে তাঁর ক্রাচ দুটো রয়েছে। কিন্তু এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবার মতন তাঁর শরীরের জোর নেই। মাথাটাও ঠিক মতন পরিষ্কার হয়নি। সেইজন্যই কাকাবাবু ঠিক করলেন, এখন তিনি এই লোকটিকে কোনও কথাই জিজ্ঞেস করবেন না।

লোকটি আবার বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু খাবেন, স্যার? চা কিংবা কফি?'

কাকাবাবু বললেন, 'এক কাপ কফি খেতে পারি। ট্রেন থামুক।'
'ট্রেন থামার দরকার নেই। আমি কফি তৈরি করে দিচ্ছি। দুধ-চিনি থাকবে তো?'
'না, শুধু কালো কফি।'
লোকটি স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে জল গরম করল। তারপর এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এল, সঙ্গে দুটি বিস্কুট।
কাকাবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে সেই কফি ও বিস্কুট শেষ করলেন। এবং অনেকটা চাঙ্গা বোধ করলেন।
লোকটি বলল, 'কিছু মনে করবেন না, স্যার। আপনার পাল্‌স একটু দেখব?'
কাকাবাবু ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। লোকটি সত্যিই ডাক্তার, কাকাবাবুর নাড়ি টিপে ধরে দেখল। তারপর ব্লাড প্রেসার মাপল। খুশির সঙ্গে বলল, 'বাঃ, সব ঠিকঠাক আছে।'
সবকটা জানলা বন্ধ, ভেতরে চড়া আলো জ্বলছে, এখন দিন কি রাত তা বোঝা যাচ্ছে না। তবু কাকাবাবু কোনও কৌতূহল প্রকাশ করলেন না।
একটু পরে পাশের একটা দরজা খুলে ঢুকলেন অংশুমান চৌধুরী। তাঁর মাথায় টুপি, হাতে একটা রূপো বাঁধান ছড়ি। কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে তিনি কিছু বলতে যেতেই কাকাবাবু আগেই বললেন, 'কী খবর? ভাল?'
অংশুমান চৌধুরী বেশ চমকে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন, কাকাবাবু নিশ্চয়ই রাগারাগি করবেন।
তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি এখন ভাল বোধ করছেন তো?'
কাকাবাবু বললেন, 'চমৎকার। এই ছেলেটি কফি আর বিস্কুট খাওয়াল। শুনলাম, একটানা সতেরো ঘন্টা ঘুমিয়েছি, সেটাও বেশ ভাল ব্যাপার, অনেকদিন ভাল ঘুম হচ্ছিল না।'
অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর উলটো দিকের একটা বেঞ্চে বসে পড়ে বললেন, 'বাঃ, তাহলে কাজের কথা শুরু করা যাক!'
কাকাবাবু দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'থাক, এখন কাজের কথা টথা থাক। আবহাওয়ার কথা বলুন! গরমটা বেশ কমে গেছে, কী বলুন!'
অংশুমান চৌধুরী অট্টহাসি হেসে বললেন,'আপনি মশাই সত্যিই বিচিত্র মানুষ। আপনার ওপর রাগ আছে আমার অথচ আপনার কথা শুনে না হেসেও পারি না।'
কাকাবাবু বললেন, 'আপনার ওপর একটুও রাগ নেই, কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার হাসি পায় না। আপনি বরং কিছু মজার কথা বলুন তো!'
অংশুমান গম্ভীর হয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'একটা মজার কথা হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত আমি আর আপনি একই সঙ্গে সম্বলপুর যাচ্ছি। আমাদের প্রতিযোগিতার খেলা এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে।'
কাকাবাবু বললেন, 'সম্বলপুর ভাল জায়গা। বেড়াবার পক্ষে ভাল জায়গা।'

'শুধু সম্বলপুর নয়, তারপর জঙ্গলেও যেতে হবে।'

'তাও মন্দ নয় , অনেকদিন জঙ্গলে যাওয়া হয়নি। আমি অনেকদিন ট্রেনে চাপিনি। বেশ ভালই লাগছে।'

'মিঃ রায়চৌধুরী, আমার মাথায় চুল নেই। আর কোনওদিন চুল গজাবে না। কিন্তু আপনার মাথা ভর্তি চুল। আমি আপনার চুল দিয়ে বাজি ফেলেছি। এবারের খেলায় আপনি যদি হেরে যান তা হলে আপনার মাথা কামিয়ে ফেলতে হবে। তারপর আমি একটা আরক তৈরি করেছি। সেই আরক মাখিয়ে দিলে আপনার মাথাতেও আর কখনও চুল গজাবে না।'

'বাজি ফেলেছেন? কার সঙ্গে বাজি ফেলেছেন? আমার মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে হবে, অথচ আমি তার কিছুই জানলাম না?'

'বাজিটা আমি নিজের মনে মনেই ফেলেছি। আর আমি যদি হেরে যাই তাহলে আমি নিজেও এর পর থেকে ক্রাচ নিয়ে হাঁটব। কোনওদিন আর দু'পায়ে হাঁটব না।'

কাকাবাবু এবারে মুচকি হেসে বললেন, 'এইটা আপনি একটা মজার কথা বলেছেন। হারজিতের কথা আসছে কি করে? আমি আপনার সঙ্গে কোনও প্রতিযোগিতায় নামছিই না!'

নামছেন না কি মশাই, প্রতিযোগিতা তো এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আমরা কি আর এমনি এমনি সম্বলপুরে যাচ্ছি?'

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে আমি সম্বলপুরে যাচ্ছি না!'

এর মধ্যে ট্রেনটার গতি কমে এসেছে। কোনও একটা স্টেশন আসছে। কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ দুটো নিলেন। তারপর ডাক্তারটির দিকে ফিরে অনুরোধের সুরে বললেন, 'দরজাটা একটু খুলে দিন তো ভাই!'

ডাক্তারটি তাকাল অংশুমান চৌধুরীর দিকে। অংশুমান চৌধুরীও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি কি নামতে চাইছেন নাকি? না, না এখানে আপনার নামা হবে না।'

কাকাবাবু দরজার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'আপনি আমাকে ঘুমের ওযুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে জোর করে এতটা পথ নিয়ে এসেছেন। এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এজন্য আমি আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতুম। কিন্তু তা দিচ্ছি না। এবারেও আপনাকে ক্ষমা করছি। দয়া করে, আপনি আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।'

অংশুমান রেগে উঠে বললেন, 'ক্ষমা? আপনি আমাকে ক্ষমা করবার কে? এবারে আপনার মাথা ন্যাড়া না করে আমি ছাড়ছি না।'

অংশুমান এক পা এগোতেই কাকাবাবু ক্রাচ তুলে প্রচণ্ড জোরে মারলেন তাঁর হাতের লাঠিটায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারটির বুকে সেই ক্রাচটি ঠেকিয়ে বললেন, 'আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না।'

ডাক্তারটি অসহায়ভাবে বলল, 'না না। আমি আপনাকে বাধা দেব কেন? সেটা তো আমার কাজ নয়।'

ট্রেন থেমে গেছে। কাকাবাবু দরজার হাতল ঘুরিয়ে বললেন, 'গুড বাই।'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'এখানে আপনি জোর করে নামতে চান নামুন। পরে আপনাকে আসতেই হবে সম্বলপুরে। আপনার ভাইপো সন্তু এতক্ষণে সম্বলপুরে পৌঁছে গেছে!'

৭

জোজোর জ্ঞান ফিরল আরও তিন ঘণ্টা বাদে। ততক্ষণে সন্তুর ঝিমুনি এসে গেছে। খড়গপুরে সে জোজোকে ফেলে নামতে পারেনি, তারপরেও জোজোর জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় সে অনেকক্ষণ বসেছিল। খাকি পোশাক পরা লোকটাও চা খাবার একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্তু আর একা কতক্ষণ জেগে থাকবে?

জোজো চোখ মেলেও শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় ধড়মড় করে উঠে বসল। সন্তু ও খাকি পোশাক-পরা লোকটির দিকে সে তাকাল অবাকভাবে। তাকে কখন ট্রেনে তোলা হয়েছে, তা সে বিন্দুবিসর্গও জানে না। রাত্রির ট্রেন ছুটছে দারুণ জোরে। জানলা খোলা, বাইরে শুধু অন্ধকার। কুপের দরজাটাও খোলা।

এদিক-ওদিক চোখ বোলাতেই জোজোর চোখে পড়ল স্যান্ডইচের বাক্সটা। ঘুম ভাঙতেই খিদেতে তার পেট জ্বলছে দাউ দাউ করে। কোনও দ্বিধা না করে সে বাক্সটা তুলে নিল। তাতে তখনও গোটা তিনেক স্যান্ডউইচ অবশিষ্ট আছে। জোজো প্রথমে একটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। তারপর খেতে শুরু করে দিল। তিনটেই শেষ করে ফেলল সে। দেওয়ালের একটা হুকে একটা ওয়াটার বট্‌ল ঝুলছে। সেটা নামিয়ে সে জল খেল অনেকখানি।

এবারে সে সন্তুর মুখের কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে এনে দেখল। সত্যিই সন্তু কিনা। তার ভুরু কুঁচকেই আছে। এখনও সে কিছু বুঝতে পারছে না। খাকি পোশাক পরা লোকটাকেও সে লক্ষ্য করল ভাল করে। একে সে জীবনে কখনও তো দেখেনি। লোকটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

জোজো এবারে কুপের দরজার কাছে গিয়ে বাইরেটায় উঁকি দিল। সরু করিডরটা জনশূন্য। এখন কত রাত কে জানে।

'ল্যাট্রিনটা বাঁ দিকে!'

জোজো চমকে পেছনে ফিরে তাকাল। খাকি পোশাক-পরা লোকটার নাক ডাকছিল একটু আগে, কিন্তু আসলে সে ঘুমোয়নি। লোকটা কিন্তু চোখ বুজেই আছে এখনও।

লোকটি আবার বলল, 'বাথরুমে যাবে তো, যাও ঘুরে এস!'

জোজোর সত্যিই বাথরুম যাওয়া দরকার। সে কোনও কথা না বলে বাঁ দিকে চলে গেল। বাথরুমের কাছেই একটা আলাদা সিটে একজন কন্ডাকটর গার্ড বসে বসে ঢুলছে। এখন বেশ গভীর রাত, মনে হচ্ছে। এই কামরায় আর কেউ জেগে নেই মনে হয়। কোথায় যাচ্ছে এই ট্রেন?

বাথরুম সেরে জোজো ফিরে এল কিন্তু কুপের মধ্যে ঢুকল না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ডাকল, 'সন্তু! এই সন্তু!'

খাকি পরা লোকটি চোখ বোজা অবস্থাতেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'শ্ শ্ শ্ শ্! এত জোরে কথা বলে না! ভেতরে এসে কথা বল!'

জোজো এবারে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?'

লোকটি বলল, 'ভেতরে এসে শুয়ে পড় না ভাই। এত রাতে কেন গোলমাল করছ? আমি কেউ না। আমি একজন অতি সাধারণ লোক! তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি!'

এত কথাবার্তায় সন্তু জেগে উঠল। তাকে চোখ মেলতে দেখেই জোজো বলল, 'এই সন্তু, উঠে আয়! শিগগির উঠে আয়। আমি পুলিশ ডেকেছি। এক্ষুনি পুলিশ এসে এই স্পাইকে অ্যারেস্ট করবে!'

খাকি পোশাক-পরা লোকটা এবারে উঠে বসে বিরক্ত ভঙ্গি করে বলল, 'হাড় জ্বালালে দেখছি! চলন্ত ট্রেনে পুলিশ আসবে কি করে? এলে তো আসবে পরের স্টেশনে? পরের স্টেশন আসতে এখনও দু'ঘন্টা দেরি আছে। ততক্ষণ ভেতরে এসে বোস!'

তারপর সে সন্তুর দিকে ফিরে বলল, 'তোমার বন্ধুকে বল না, আমি কি তোমাদের মারছি না ধরছি? তোমরা পালাতে চাও পালাবে, থাকতে চাও থাকবে! তা ছাড়া আমি স্পাই হতে যাব কোন্ দুঃখে? ওসব ঝামেলায় আমি নেই!'

জোজো সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি লোকটাকে চিনিস?'

সন্তু দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, 'না!'

জোজো বলল, 'আমি চিনি। রামপ্রতাপ সিং-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট। রামপ্রতাপ সিং হল আমার বাবার এক নম্বরের শত্রু। বিলাসগড়ের রাজার ছেলেকে রামপ্রতাপ সিং গুম করতে গিয়েছিল, আমার বাবা তার সব ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছিল। এখন সেই রাগে রামপ্রতাপ সিং আমাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল! আমি কিন্তু অজ্ঞান হয়নি। এতক্ষণ চোখ বুজে সব শুনেছি।'

খাকি-পোশাক-পরা লোকটি চোখ বড় বড় করে বলল, 'ওরে বাবা, এ যে এক লম্বা চওড়া গল্প। রামপ্রতাপ সিং-এর নাম আমি বাপের জন্মে শুনিনি! বিলাসগড়টাই বা কোথায়?'

সন্তু বলল, 'জোজো , ভেতরে এসে বোস। আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জোজো এবারে ভেতরে এসে বলল, 'আমি গার্ডসাহেবকে সব বলে এসেছি। উনি টরে টক্কা করে পরের স্টেশনে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। ট্রেন থামলেই পুলিশ এসে এই স্পাইটাকে অ্যারেস্ট করবে!'

লোকটি উঠে কুপের দরজাটা টেনে বন্ধ করে ছিটকিনি লাগাল। তারপর তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই, স্পাই স্পাই করবে না বলে দিচ্ছি! পুলিশ আসে তো ভালই, আমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখাব। তুমি তো খুব চালু দেখছি। এর মধ্যে গার্ডকে খবর দিয়ে এলে?'

সন্তু জোজোর একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। ঘুম থেকে উঠেই জোজোর উদ্দাম কল্পনা শক্তি চালু হয়ে গেছে!

জোজো লোকটিকে বলল, 'আপনি দরজা বন্ধ করলেন কেন?'

'পুলিশ এলে খুলে দেব। রাত্তিরে দরজা বন্ধ করে রাখাই নিয়ম। যদি চোর-ছ্যাচোর ঢুকে পড়ে। এখন লক্ষ্মী ছেলের মতন শুয়ে পড়। রাত্তিরটায় আর ঝঞ্জাট কোর না!'

জোজো বলল, 'মোটেই আমরা এখন ঘুমোব না।'

'তা হলে তো দেখছি, আমাকেও ঘুমোতে দেবে না। তুমি যা বিচ্ছু ছেলে দেখছি, আমি ঘুমোলে যদি আমার বুকের ওপর চেপে বস! তোমার বন্ধুটি কত ভাল, এতক্ষণ কিছু করেনি!'

সন্তু বলল, 'জোজো, ওনার কাছে রিভলবার ছুরি দুটোই আছে!'

লোকটি বলল, 'আচ্ছা সে কথা বলে ওকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? আমি তোমাদের বয়েসি ছেলেদের ওপর ছুরি-বন্দুক চালাব না মোটেই! সঙ্গে রাখতে হয় বলে রাখা। শোন ভাই, একটা কথা বলি, পুলিশ যদি আসে, আমি নিশ্চয়ই দরজা খুলে দেব। আর যদি না আসে, তা হলে আর রাত্তিরে দরজা খুলো না। সকাল হলে দেখা যাবে! আমি এখন শুয়ে পড়ছি কেমন? যদি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি, আমার গায়ে-টায়ে যেন হাত দিতে যেও না। আমার ঘুম খুব পাতলা।'

লোকটি সত্যিই আবার শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। জোজো এসে বসল সন্তুর পাশে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'তুই আগে বল তো, তোকে এরা কি করে নিয়ে এল এখানে?'

জোজো বলল, 'আমি চেতলা পার্ক দিয়ে শর্টকাট করছিলুম, বুঝলি। লোডশেডিং, মানুষ-জন দেখা যায় না। এমন সময় চারজন লোক হঠাৎ আমায় ঘিরে ধরল। আমি ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছি, জানিস তো? টপাটপ এক একজনকে ঘায়েল করতে লাগলুম। তিনজন চিতপটাং হয়ে গেল, শুধু অন্ধকারের মধ্যে একজন হঠাৎ আমার পিঠে একটা ইঞ্জেকশন-এর সিরিঞ্জ ফুটিয়ে দিল! তাতে আমি টেমপোরারি, কিছুক্ষণের জন্য ...'

সন্তু বুঝল , জোজোর কাছ থেকে আসল ঘটনাটা সহজে জানা যাবে না। জোজো অনেকখানি রং না চড়িয়ে কিছুই বলতে পারে না। সন্তুর ঘুম পাচ্ছে। জোজো বহুক্ষণ ঘুমিয়ে বা অজ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু সন্তু তো বেশিক্ষণ ঘুমোয়নি। জোজোর কথা শুনতে শুনতে তার ঝিমুনি এসে গেল।

পরের স্টেশনে পুলিশ এল না, তার পরের স্টেশনেও। সন্তু যখন আবার ভাল করে জেগে উঠল, তখন ভোর হয়ে গেছে। জোজোও তার কাঁধে হেলান দিয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। খাকি পোশাক-পরা লোকটি এর মধ্যেই উঠে পড়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

সন্তুর চোখে চোখ পড়তেই সে বলল, 'তৈরি হয়ে নাও, এবারে নামতে হবে!'

একটা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেনটা এসে থামল। সন্তু ভেবে দেখল এখানে নেমে পড়া ছাড়া উপায় নেই। লোকটা তাদের কোথায় নিয়ে যায় দেখাই যাক না। এ পর্যন্ত লোকটা তাদের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। এখন চ্যাঁচামেচি করে লোক জড় করা যেতে পারে বটে। কিন্তু লোকজনদের সে কি বলবে? এই লোকটা তাদের দু'জনকে জোর করে ধরে এনেছে? এ কথা শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে? এরকম কথা সন্তু মুখ ফুটে বলবেই বা কি করে? তা ছাড়া এই লোকটা তো সত্যিই সন্তুকে জোর করে আনেনি। সন্তু খড়গপুরে নেমে যেতে চাইলে লোকটা তো একবারও আপত্তি করেনি। তা হলে দেখাই যাক না, কি উদ্দেশ্যে তাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে!

সে জোজোকে ঠ্যালা মেরে বলল, 'এই ওঠ!'

জোজো চোখ মেলেই জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ এসেছে?'

খাকি পোশাক পরা লোকটি বলল, 'চল, আগে নামি স্টেশনে। তারপর সেখানে পুলিশের খোঁজ করা যাবে এখন। এখানে কিন্তু ট্রেন বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।'

ওরা নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। একটু পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

ছোট স্টেশন, আর দু'তিনজন মাত্র যাত্রী নেমেছে এখানে। লোকজন বিশেষ নেই। স্টেশনের বাইরে সুন্দর ফুলের বাগান।

একজন ফরসা, লম্বা মতন লোক, পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা , এগিয়ে এল ওদের দিকে। সঙ্গে একটা বেশ বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর।

হাসি-হাসি মুখে লোকটি তিনজনের দিকেই বলল, 'কি আসতে কোনও অসুবিধা হয়নি তো? রাত্রে ঘুম হয়েছে?'

লোকটির ভাবভঙ্গি এমন যেন সন্তুদের সঙ্গে তার অনেক দিনের চেনা। যেন কোনও আত্মীয় ওদের স্টেশনে রিসিভ করতে এসেছে। অথচ সন্তু এই লোকটিকে কোনদিন দেখেনি। সে জোজোর দিকে তাকাল। জোজোও লোকটিকে চেনে বলে মনে হয় না। যদিও জোজো ভুরু কুঁচকে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে।

খাকি পোশাক পরা লোকটি বলল, 'রাত্তিরে মশাই ভাল ঘুম হয়নি। আমি এখন হোটেলে গিয়ে ঘুমোব। তারপর বিকেলের ট্রেনে ফিরব।'

পকেট থেকে একটা লম্বাটে পাস খাতা বার করে পাতা উল্টে বলল, 'নিন, এখানে সই করুন; দু'জনকেই ঠিকঠাক বুঝে পেয়েছেন তো?'

সিল্কের জামা-পরা লোকটি খাতাটায় সই করে দিল।

'আমার ডিউটি ওভার? সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। আপনি যেতে পারেন!'

খাকি পোশাক-পরা লোকটি সন্তুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলি ভাই! ভাল থেকো! ভাল বেড়ান হোক তোমাদের!'

সে লাইন পেরিয়ে চলে গেল অন্যদিকে।

সিল্কের জামা পরা লোকটি সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার নাম সন্তু, আর এর নাম জোজো, তাই না! আমার নাম লর্ড আর আমার এই কুকুরের নাম টম! চল তবে যাওয়া যাক।'

জোজো বলল, 'নমস্কার মিঃ লর্ড। আচ্ছা , এখানকার থানাটা কোথায় একটু বলতে পারেন?'

সিল্কের জামা পরা লর্ড বলল, 'থানা? তা একটু দূরে আছে। থানায় কিছু দরকার আছে বুঝি? সে যাওয়া যাবে বিকেলের দিকে। তোমাদের কাকাবাবু আর পিসেমশাই অপেক্ষা করে আছেন, চল দেরি করলে ওনারা চিন্তা করবেন।'

৮

সন্তুর নাম শুনে কাকাবাবু একটু থমকে গেলেন। সম্বলপুরে সন্তু? দু'জন ভদ্রলোক একদিন একটা বিদঘুটে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। একটা নীল পাথরের মূর্তি উদ্ধারের ব্যাপারে। তাঁকে সম্বলপুর নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল খুব। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেখানেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সন্তুকে আগেই ধরে নিয়ে গেছে। এই অংশুমান চৌধুরী লোকটিকে পাগল বলে মনে হয়। সন্তুকে নিয়ে কি করবে কে জানে!

কাকাবাবু দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললেন, 'মিঃ চৌধুরী, আমার ওপর আপনার রাগ থাকতে পারে, তা বলে আমার ভাইপো একটা ছোট ছেলে, তাকেও জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন? আপনাকে আমি ভদ্রলোক ভেবেছিলাম! সন্তুর কয়েক বেলা পড়াশুনা নষ্ট হবে .. '

অংশুমান চৌধুরী মেঝে থেকে তাঁর রুপো বাঁধানো লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটার ওপর এমন মমতার সঙ্গে হাত বুলোতে লাগলেন, যেন সেটা তাঁর নিজের হাত কিংবা পা।

মুখ না তুলে তিনি বললেন, 'আপনাকে ক্রাচ দুটো ব্যবহার করতে দিয়েছি। সেটাই কি আমার ভদ্রতা নয়? তা বলে যখন তখন ক্রাচ তুলে মারতে আসবেন, এটাই কি আপনার ভদ্রতা? আমি ইচ্ছে করলেই আপনার ক্রাচ দুটো সরিয়ে রাখতে পারতুম কি না? তখন তো এক পাও হাঁটতে পারতেন না!'

তরুণ ডাক্তারটি এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাকাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বলল, 'এই রকম মারামারি ব্যাপার হবে জানলে আমি আসতুম না। আমাকে এনগেজ করা হয়েছিল ট্রেনে একজন অসুস্থ লোকের দেখাশুনো করার জন্য।'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'তোমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল! তোমাদের মেডিক্যাল সায়েন্স যা জানে না সেরকম একটা ওষুধ আমি আবিষ্কার করেছি। সেই ওষুধ একটা পিনের ডগায় অতি সামান্য একটু লাগিয়ে যে কোনও মানুষের শরীরে ফুটিয়ে দিলে, সে পাঁচ-ছ ঘন্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়বে! কত বড় আবিষ্কার ভেবে দ্যাখ তো! বড়-বড় খুনে ডাকাতকেও এই সামান্য একটা পিন ফুটিয়ে কাবু করে দেওয়া যাবে! এই আবিষ্কারের জন্য আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত।'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনার সেই ওষুধ আমার গায়ে ফুটিয়ে পরীক্ষা করেছেন? আমাকে জিজ্ঞেস না করে?'

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন! আমার ঝুলিতে এরকম আরও অনেক রকম ওষুধ আছে, বুঝলেন? সেজন্যই এর পরে আর হঠাৎ ওরকম যখন-তখন ক্রাচ তুলে মারবার চেষ্টা করবেন না। আপনার একটা পা তো নষ্ট হয়ে গেছেই। এরপর যদি আপনার একটা হাত কিংবা একটা চোখ নষ্ট হয়, সেটা কি ভাল হবে?'

কাকাবাবু সামান্য হেসে বললেন, 'আপনি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন বুঝি? আমাকে মেরে ফেলা বরং সহজ, কিন্তু আমাকে ভয় দেখানো কিন্তু খুব শক্ত।'

অংশুমান চৌধুরী ডাক্তারটির দিকে ফিরে বললেন, 'পাশের কেবিনে গিয়ে বলুন তো, আমাদের জন্য কফি আর টোস্ট দিতে। একটু খিদে-খিদে পাচ্ছে।'

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, অংশুমান চৌধুরী গোটা একটা সেলুন-কার ভাড়া নিয়েছেন। অনেক টাকার ব্যাপার। এত টাকা কে খরচ করছে? অংশুমান চৌধুরী নিজে, না সম্বলপুরের সেই দুই ভদ্রলোক? নীল পাথরের মূর্তিটা তা হলে সাধারণ কোনও মূর্তি নয়। এবারে তাঁর কৌতূহল জেগে উঠল। মূর্তিটা একবার অন্তত দেখা

দরকার। তাছাড়া যদি সন্তুকে সম্বলপুরে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে সে পর্যন্ত তো যেতেই হবে!'

দরজার কাছ ছেড়ে তিনি সিটে এসে বসলেন।

অংশুমান চৌধুরী কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'আপনার ভাইপোর জন্য চিন্তা করছেন তো? আপনি আপনার ভাইপোর পড়াশুনোর কোনও খোঁজ-খবরই রাখেন না। ওদের কলেজে পরীক্ষার সিট পড়েছে বলে পরশু থেকে ওদের সতের দিন ছুটি। এই ছুটিতে আমাদের সঙ্গে একটু জঙ্গলে বেড়িয়ে আসবে তাতে ক্ষতি কি? আপনারও চোখ কিংবা হাত নষ্ট করার ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু আপনার মাথা ন্যাড়া করে দিতে চাই। আমার মতন আপনার মাথাতেও চুল থাকবে না।'

কাকাবাবু বললেন, 'মিঃ চৌধুরী, আপাতত আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি বরং আর একটু ঘুমিয়ে নিই। সম্বলপুর এলে আমায় ডেকে দেবেন।'

'আপনি কফি-টোস্ট খাবেন না?'

'ধন্যবাদ। এখন আমার আর কিছুর দরকার নেই।'

কাকাবাবু লম্বা সিটের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে পাশ ফিরে চোখ বুজলেন। কয়েক মিনিট বাদে ঘুমিয়ে পড়লেন সত্যি-সত্যি।

কয়েক ঘন্টা বাদে একজন কেউ তাঁর গায়ে ঠ্যালা মেরে জাগাল। কাকাবাবু চোখ মেলে দেখল। এ সেই রোগা ভীমু।

সে বলল, 'উঠুন স্যার নামতে হবে।'

কাকাবাবু উঠে বসলেন, ট্রেন থেমে আছে। কামরার দরজা খোলা। ডাক্তারটি আগেই নেমে গেছে, অংশুমান চৌধুরী মাথায় টুপি পরে ছড়িটি হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কাকাবাবুর দিকে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'আপনি নামুন আগে। আমি সব শেষে নামব। ভীমু সব ঠিক ঠাক আছে তো?'

ভীমু বলল. 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার!'

এমন সময় প্ল্যাটফর্মে ঘ্যা-ঘ্যা ঘ্যা-ঘ্যা করে একটা দিশি কুকুর ডেকে উঠল। অংশুমান চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ভীমু ! ও কিসের ডাক? কোন্ জন্তুর?'

ভীমু বলল, 'স্যার, চারজন কুলি লাগিয়েছি সব কুকুর বেড়াল তাড়িয়ে দিতে। একটা বোধহয় কোনওরকমে আবার এদিকে চলে এসেছে। ওরা ঠিক তাড়িয়ে দেবে!'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'আগে দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখে নাও সব ক্লিয়ার কিনা!'

ভীমু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অনেকখানি মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'ওই যে চলে যাচ্ছে, একটা ছোট্ট নেড়ি কুত্তা। এই ভাগাও, ভাগাও, একদম বাহার হটাও, উধার খাড়া রহো!'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'প্ল্যাটফর্মে গন্ধ স্প্রে করে দাও। আমি এখানেও বদ গন্ধ পাচ্ছি।'

কাকাবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিলেন। তারপর ক্রাচ দুটি বগলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

প্ল্যাটফর্মে তিন-চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। কাকাবাবুকে দেখে একজন এগিয়ে এসে বলল, 'নমস্কার রাজাবাবু! নমস্কার! পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো! বড্ড লম্বা জার্নি। ঘুম হয়েছিল আশা করি।'

কাকাবাবুকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার জন্য খানিকটা কসরত করতে হয়। সেই লোকটি কাকাবাবুকে সাহায্য করবার হাত বাড়িয়ে দিলেও কাকাবাবু নিজেই কোনও ক্রমে নামলেন নিচে। তারপর বললেন, 'আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না!'

নীল রঙের সাফারি স্যুট পরা লম্বা মতন সেই লোকটি বিগলিতভাবে হেসে বলল, 'আমার নাম অসীম পট্টনায়ক। আমার দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আপনার মতন বিখ্যাত লোক যে এখানে আসতে রাজি হয়েছেন সে জন্য আমরা খুব কৃতজ্ঞ হয়েছি। আজ সন্ধে বেলাতেই মিটিং, আপনি দুপুরে রেস্ট নিয়ে নেবেন, তারপর .. '

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'মিটিং, কিসের মিটিং?'

যুবকটি বললেন, 'এখানকার দুতিনটি ক্লাব মিলে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করেছে, সেখানে আপনি আপনার দুচারটি অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাবেন। আমার দাদা বলেছেন কি আপনি আসতেই চাইছিলেন না ... আমরা খুব আশা করেছিলাম ...'

যুবকটি পিছন ফিরে বলল, 'এই মালা, মালা কোথায়?'

পেছন থেকে দু'জন লোক ফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে এল এবং কাকাবাবু কোনও আপত্তি জানাবার আগেই তাঁর গলায় পরিয়ে দিল।

কাকাবাবু মনে-মনে রাগলেও মুখের ভাবটা গম্ভীর করে রাখলেন। তাঁকে যে জোর করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, তা যাতে কেউ বুঝতে না পারে সেই জন্যই এই সব ফুলের মালা-টালার ব্যবস্থা! মিটিং -এ বক্তৃতা দেবার কথা তো তাঁকে এর আগে কেউ একবারও বলেনি। ,

অসীম পট্টনায়ক বললেন, ' আসুন স্যার। এদিকে আসুন। গাড়ি রয়েছে।'

কাকাবাবু বিনা প্রতিবাদে এগিয়ে গেলেন ওদের সঙ্গে। ট্রেন জার্নির পরই তাঁর স্নান করতে ইচ্ছে করে। জামা-কাপড় পাল্টাতে ইচ্ছে করে। তাঁর সঙ্গে অন্য কোনও পোশাক নেই। এইসব চিন্তাই তাঁর মাথায় ঘুরছে এখন। অন্য কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা বড় স্টেশন ওয়াগানে উঠতে গিয়ে তিনি দেখলেন, কাছেই একটা থামের আড়ালে একটা বেড়াল ছানা বসে আছে গুটিসুটি মেরে। কাছাকাছি আর কোনও কুকুর বেড়াল দেখতে পেলেন না। ভীমুর লোক সেগুলোকে সব তাড়িয়ে দিয়েছে। এই বেড়াল ছানাটা বোধহয় ওদের চোখে পড়েনি।

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু অসীম পট্টনায়ককে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখান থেকে কত দূর যেতে হবে?'

অসীম বলল, 'খুব বেশিদূর নয় স্যার। মাত্র চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জার্নি।'

যাবার পথে আমরা কি শহরের মধ্য দিয়ে যাব?'

'তা যেতে পারি। যদিও অন্য রাস্তা আছে। কেন বলুন তো স্যার?'

'একটা জামা-কাপড়ের দোকানের সামনে নামতে হবে। আমার দু-একটা গেঞ্জি-জামা কেনা দরকার।'

'সে জন্য চিন্তা করবেন না, স্যার। সেসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমাদের এখানে যখন দয়া করে এসেছেন, তখন আপনার দায়িত্ব আমাদের।'

'আমার গেঞ্জি-জামা আমি নিজে দেখে কিনতে চাই।'

'বলছি তো স্যার, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই তো, উনিও এসে গেছেন।' কাকাবাবু দেখল স্টেশন গেট পেরিয়ে বাইরে আমাদের অংশুমান চৌধুরী। চোখে কালো চশমা। এক হাতে তিনি নিজের নাক টিপে আছেন, অন্য হাত ধরে আছে তার সহকারী ভীমু। খুব সম্ভবত চোখ বুজে আছেন অংশুমান চৌধুরী।

অসীমরা এগিয়ে গেল তাঁকে গাড়ির কাছে খাতির করে নিয়ে আসার জন্য। অংশুমান চৌধুরীর জন্য আর একটা আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা করা আছে। পাশেই সেই গাড়িটা দাঁড়াল। সে গাড়ির সব কাচ রং করা। সিনেমার নায়ক-নায়িকারা এই রকম কাচ তোলা গাড়িতে যায়।

অংশুমান চৌধুরী সেই গাড়ির কাছে এলেন। তখনও চোখ খোলেননি। তবে নাক থেকে হাতটা সরিয়ে বললেন,'ভীমু আমার লাঠিটা কই?'

ভীমু বলল, 'লাঠিটা যেন কার হাতে দিলাম? লাঠি, লাঠি এই স্যারের লাঠিটা দাও।'

অংশুমান চৌধুরী বিরক্তভাবে বললেন, 'আমার লাঠি তুই অন্য লোকের হাতে দিয়েছিস? ইডিয়েট, বলেছি না, ওটা কক্ষণও কাছ ছাড়া করবি না। কোথায় গেল লাঠি, কে নিল?'

উত্তেজিতভাবে অংশুমান চৌধুরী একটু ঘুরে দাঁড়াতে যেতেই তাঁর এক পায়ের একটা ধাক্কা লাগল বেড়াল ছানাটার গায়ে, অমনি বেড়াল ছানাটা ভয় পেয়ে খুব জোরে ডেকে উঠল ম্যা — ও — ও! ফ্যাঁচ!

সঙ্গে সঙ্গে অংশুমান চৌধুরী তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'ও কি? ওটা কি? ওরে ভীমু ওটা কোন প্রাণী।'

অসীম বলল, 'ও কিছু নয় স্যার, একটা সামান্য বেড়াল!'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'আমায় আঁচড়ে দিয়েছে? ভীমু, আঁচড়ে দিয়েছে? কামড়ে দিয়েছে?'

ভীমু বলল, 'না স্যার, কিছু করেনি!'

অংশুমান চৌধুরী বলল, 'হ্যাঁ, আঁচড়ে দিয়েছে। আমি টের পাচ্ছি! জ্বালা করছে। ওরে বাপরে, মেরে ফেলবে আমাকে! ভীমু বিশ্বাসঘাতক .. '

কথা বলতে বলতে অংশুমান চৌধুরী অতবড় লম্বা শরীরটা নিয়ে ধপাস করে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

৯

স্টেশন থেকে বেরবার সময় সন্তু লক্ষ্য করল, 'এটা সম্বলপুর স্টেশন নয়। যদিও ট্রেনের খাকি পোশাক পরা লোকটি বলেছিল, তাদের সম্বলপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই জায়গাটার নাম ধওলাগড়। ছোট স্টেশন, তার বাইরে সুরকির রাস্তা। সেখানে দু-তিনটে সাইকেল রিকশ আর একটা টাঙা দাঁড়িয়ে। সন্তু আগে থেকেই বুঝতে পারল, টাঙাটা এসেছে তাদের জন্যই। সাধারণ ভাড়ার টাঙা নয়। বেশ ঝকমকে তকতকে, ঘোড়াটিও বেশ তেজী।

সিল্কের পাঞ্জাবি পরা লর্ড নামের লোকটি সামনের দিকে উঠে বসল গাড়োয়ানের সামনে। দু'বার শিস দিয়ে ডাকল, 'টম! টম!' কুকুরটি এক লাফ দিয়ে চলে এল তার পাশে। তারপর লর্ড সন্তু আর জোজোদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা ভাই পেছন দিকে উঠে পড়!'

সন্তু উঠতে যাচ্ছিল, জোজো তার হাত ধরে টেনে নামাল। তারপর সে সামনের দিকে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি যে আমাদের নিতে স্টেশনে এসেছেন, আপনাকে কে পাঠিয়েছে?'

লর্ড বলল, 'কেউ তো পাঠায়নি, আমি নিজেই এসেছি।'

জোজো বলল, 'আপনি কি করে জানলেন আমরা এই ট্রেনে আসব? আমাদের দু'জনের নামই বা জানলেন কি করে?'

'এসব সামান্য ব্যাপার জানা এমন কি শক্ত? মানুষের নামের সঙ্গে চেহারার খুব মিল থাকে। তোমার নাম জোজো, তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় তোমার নাম কিছুতেই সন্তু হতে পারে না। আর তোমার বন্ধুটিকে দেখলেই বোঝা যায়, সে খুব শান্ত-শিষ্ট ছেলে, তাই তার নাম সন্তু! আর আমাকে দেখলেই কি মনে হয় না, আমার নাম লর্ড?'

এই কথা বলে সে হেসে উঠল হা-হা করে। জোজো কিন্তু হাসল না, ভুরু কুঁচকে বলল, 'সরি, আমার তা মনে হয়নি। যাই হোক, আপনি এখন আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

লর্ড বলল, ' ওই যে বললাম, তোমার পিসেমশাই আর ওর কাকাবাবুর কাছে: অর্থাৎ মিঃ অংশুমান চৌধুরী আর মিস্টার রাজা রায়চৌধুরীর কাছে।'

'ওরা দু'জনে একই জায়গায় আছেন?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই!'

'আই ডোন্ট বিলিভ ইউ!'

তারপর সে সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাউন্ডস ভেরি ফিসি, বুঝলি? আমার পিসেমশাই আর তোর কাকাবাবু একই জায়গায় রয়েছেন। এটা বিশ্বাস করা যায়?'

পকেট থেকে একটা দামি সিগারেট বার করে ধরাতে ধরাতে লর্ড বলল, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কি আছে? আমার সঙ্গে গেলেই তো দেখতে পাবে।'

জোজো বলল, 'আমরা যদি আপনার সঙ্গে না যেতে চাই?'

লর্ড ভুরু তুলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল জোজোর দিকে। গাড়োয়ানটির দিকে ফিরে দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব বলল। তারপর আবার জোজোর দিকে ফিরে বলল, 'না যদি যেতে চাও, তা হলে কি আর জোর করে ধরে নিয়ে যাব? মিঃ রায়চৌধুরী আর মিঃ চৌধুরী বললেন, এই ছেলেদুটি বেড়াতে ভালবাসে, আজ বিকেলবেলা জঙ্গলে যাওয়া হবে ..'

জোজো জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বলুন তো, অংশুমান চৌধুরীকে কিরকম দেখতে?'

লর্ড আবার শব্দ করে হেসে উঠে বলল, 'পরীক্ষা করা হচ্ছে আমাকে? এ তো বেশ মজার ব্যাপার! আমার কত কাজ নষ্ট করে তোমাদের নিতে এলুম এখানে, আর এখন আমাকেই তোমরা অবিশ্বাস করছ? মিঃ অংশুমান চৌধুরী বেশ লম্বা, আমার চেয়েও লম্বা, গায়ের রং ফরসা, মাথায় একটা টুপি, সেই টুপিটা খুললেই অমনি দেখা গেল মাথায় একটাও চুল নেই!'

জোজো সন্তুর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, ' কিরে কি করবি?'

সন্তু বলল, 'চল, যাওয়া যাক!'

দু'জনে উঠে বসল টাঙার পেছনে। সেটা একটু বাদেই বেশ জোড়ে দৌড়তে লাগল। রাস্তা ভাল নয়। ঝাঁকুনির চোটে ওদের লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে হচ্ছে। সেই অবস্থাতেই জোজো সন্তুর কানে ফিসফিস করে বলল, 'এই লোকটা নির্ঘাত স্পাই!'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'কাদের স্পাই?'

'তা জানি না। তবে স্পাই হতে বাধ্য। দেখছিস না কি রকম পলিশ্‌ড চেহারা, আর মিটিমিটি হাসছে।'

স্পাইরা সিল্কের জামা পরে মিটিমিটি করে হাসে কি না, সে সম্পর্কে সন্তুর কোনও ধারণা নেই। জোজো তো যাকে-তাকে যখন-তখন স্পাই বানিয়ে ফেলে। তবে একটা জিনিস অদ্ভুত লাগছে। এ পর্যন্ত কেউ তার ওপর একবারও জোর-জবরদস্তি করেনি। প্রথমে যে লোক দুটো কাকাবাবুর নাম করে তাকে ডেকে নিয়ে গেল, তাদের

অবিশ্বাস করে সন্তু তো না যেতেও পারত! তারপর হাওড়া স্টেশনে আসা, ট্রেনে ওঠা .. কেউই তাকে জোর করে আনেনি। অবশ্য জোজোকে এরা অজ্ঞান করে এনেছে। সত্যি কি পিঠের মধ্যে কিংবা জোজোর হাতে সিরিঞ্জ ফুটিয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিল? মুশকিল হচ্ছে, জোজোর মুখ থেকে ঠিক ঠিক ঘটনাটা জানাই শক্ত।

টাঙাটা যে রাস্তা দিয়ে চলছে, সেদিকে কোনও বাড়ি-ঘর নেই। ফাঁকা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। দূরে একটা পাহাড়ের রেখা। ওরা কোথায় চলেছে কে জানে!

একটা জায়গায় দেখা গেল কয়েকটা দোকানপাট। সেখানে টাঙাটা থেমে গেল হঠাৎ। লর্ড পেছন ফিরে বলল, 'এখানে খুব ভাল জিলিপি পাওয়া যায়। একটু জিলিপি খাওয়া যাক, কি বল? তোমাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?'

রাত্তিরে ভাত-টাত কিছু খাওয়া হয়নি। দু'একটা মাত্র স্যান্ডউইচ। সন্তুর খিদে পেয়েছে খুবই। জিলিপির নাম শুনেই যেন তার খিদে আরও বেড়ে গেল।

লর্ড নেমে পড়ল জিলিপি নেবার জন্য। তার কুকুরটাও লাফ দিয়ে নামল তার সঙ্গে সঙ্গে। এত বড় চেহারার একটা কুকুর! কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করে না। শুধু সে খুব জোরে জোরে ল্যাজ নাড়ে।

জিলিপি ভাজার গন্ধ নাকে আসছে। জোজো হঠাৎ বলল, 'ওই দ্যাখ সন্তু! রাস্তার ওপাশের বাড়িটা!'

সেটা একটা একতলা টালির বাড়ি। তার গায়ে ইংরেজিতে লেখা 'পুলিশ চৌকি'। সামনে একটা ভাঙা লরি দাঁড়িয়ে আছে।

জোজো বলল, 'ওই তো থানা। ওখানে একটা খবর দিতে হবে।'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'থানায় কি বলবি?'

জোজো সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে তড়াক করে নেমে গেল টাঙা থেকে। সন্তু নামল না। থানায় গিয়ে কি বলা হবে? এই লোকটা তাদের জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে? এ কথা শুনলে পুলিশরা হাসবে না? যারা জোর করে ধরে নিয়ে যায়, তারা কখনও থানার কাছে গাড়ি থামিয়ে জিনিস কেনে?

জোজো বেশি দূর যেতে পারল না। রাস্তাটা পার হতেই টম তীব্রভাবে ছুটে গিয়ে সোজা তার বুকের ওপর দুটো থাবা মেলে দাঁড়াল। জোজো চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, সেইভ মি ! সেইভ মি!'

লর্ড দৌড়ে যেতে যেতে হুকুমের সুরে বলল, 'টম, টম, কাম ব্যাক! কাম হিয়ার!'

প্রভুর হুকুম শুনে টম ছেড়ে দিল জোজোকে। ততক্ষণে সন্তুও নেমে পড়েছে। টমকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে .. খুব ট্রেনিং পাওয়া কুকুর। সহজে কামড়াবে না, শুধু ভয় দেখাবে।

লর্ড জোজোকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ তুমি দৌড়তে গেলে কেন? টম কারও দৌড়ন পছন্দ করে না।'

জোজো বলল, 'আমার ছোট বাথরুম পেয়েছে।'

লর্ড হেসে বলল, 'ও, এই ব্যাপার! তা আমাকে আগে বললেই হত। ওই যে বড় গাছটা দেখা যাচ্ছে, তার পাশ দিয়ে মাঠে নেমে যাও। আস্তে-আস্তে যাও, দৌড়বার দরকার নেই।'

টম সন্তুর কাছে এসে তার গায়ের গন্ধ শুঁকে তারপর সন্তুর উরুতে মাথা ঘষতে লাগল। যেন সে সন্তুর কাছ থেকে আদর চাইছে। সন্তু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

লর্ড জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাড়িতে কুকুর আছে বুঝি?'

সন্তু মাথা হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার গায়ের গন্ধ শুঁকে টম ঠিক টের পেয়েছে। তুমি যখন কুকুর ভালবাস, তোমার সঙ্গে টমের খুব সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। চল জিলিপি খেতে শুরু করি!'

জোজো একটু বাদে ফিরে এল। সন্তু লক্ষ্য করল, জোজো থানায় ঢুকল না। জিলিপি খাওয়ার পর্ব শেষ হবার পর ওরা আবার চাপল টাঙায়।

চলতে শুরু করার পর জোজো বলল, 'তুই ভাবিস না, আমি কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়েছি। ওটা আমার অভিনয় বুঝলি। স্রেফ অভিনয়। আসলে আমি শেষ মুহূর্তে মাইন্ড চেঞ্জ করলুম। ভেবে দেখলুম, থানায় গিয়ে কি হবে? এই মিস্ট্রিটা আমরাই সল্‌ভ করব। তুই আর আমি, পুলিশের সাহায্যের কোনও দরকার নেই। সম্বলপুর কোন্ স্টেটের মধ্যে রে?'

'ওড়িশায়!'

'ওঃ তবে তো কোনও চিন্তাই নেই। ওড়িশার পুলিশের একজন আই. জি. আমার ছোট কাকার বন্ধু। আমাদের বাড়িতে কতবার এসেছেন। একবার তাঁকে খবর পাঠালেই .. তাঁর নাম শুনলেই এরা ঘাবড়ে যাবে।'

' কি নাম তার?'

'চুপ! এখন বলব না, এই লোকটাকে এক্ষুণিই কিছু জানাবার দরকার নেই। তুই ঘাবড়াসনি, সন্তু, আমি যখন সঙ্গে আছি, তোর কোনও চিন্তা নেই।'

'ভাগ্যিস তুই এই কথাটা বললি, জোজো। সত্যি আমি একটু একটু ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম।'

আর আধঘন্টা পরে টাঙাটা এসে থামল একটা বাগান বাড়ির সামনে। দোতলা সাদা রঙের বাড়ি, অনেককালের পুরনো, কোথাও কোথাও দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। বাগানটারও বিশেষ যত্ন নেই।

টাঙা থামতেই টম লাফিয়ে পড়ে ছুটে গেল বাগানের মধ্যে। সেখানে আর দুটো ছোটখাট চেহারার কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নিশ্চয়ই বাইরের কুকুর, টমকে দেখেই তারা ল্যাজ গুটিয়ে পালাল।

জোজো লর্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার পিসেমশাই এই বাড়িতে রয়েছেন?'

লর্ড বলল, 'হ্যাঁ, সেই রকমই তো কথা!'

ইমপসিবল! এখানে এত কুকুর! ইউ আর এ লায়ার!'

এবারে রেগে গেল লর্ড। তার ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গেল। সে কড়া গলায় বলল, ' কি, তুমি আমাকে লায়ার বললে? ঠিক আছে, বিশ্বাস করতে না চাও, এস না। তোমাকে কি আমি ধরে রেখেছি? তোমার যেখানে খুশি চলে যেতে পার।'

তারপর সে তো গটগট করে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে।

১০

স্নান করে, খাওয়া সেরে কাকাবাবু ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে নিলেন। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস নেই তাঁর কিন্তু আজ তিনি ক্লান্তি বোধ করছিলেন। স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই বাড়িটায় পৌঁছাবার পর কাকাবাবুকে একটা ঘর দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কাকাবাবু তখনই বলেছিলেন, আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চাই।

আসবার পথে একটা দোকানে গাড়ি থামিয়ে কাকাবাবু দু'জোড়া করে প্যান্ট গেঞ্জি ইত্যাদি কিনে এনেছেন। তাঁর গায়ে এখন নতুন পোশাকের গন্ধ। ঘুম থেকে ওঠবার পর তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে বসে রইলেন। জীবনে তিনি অনেক ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক দেখেছেন। অনেক বিপদে পড়েছেন, অনেকবার খুদে ডাকাতদের হাতে বন্দি হয়েছেন, কিন্তু ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিত লোকেরা তাকে জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে গেছে, এ রকম অভিজ্ঞতা তাঁর আগে কখনও হয়নি। এরা সম্বলপুর স্টেশনে তাঁর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে পর্যন্ত, যেন তিনি একজন সম্মানিত অতিথি। অথচ ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ব্যাপারটা হালকা করে দেখছিলেন। এখন তাঁর মনে মনে রাগ জমছে। অংশুমান চৌধুরীর পাগলামি তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। তবে, অংশুমান চৌধুরীর সঙ্গে এখানকার যারা হাত মিলিয়েছে, তাদেরও একবার দেখা দরকার। সন্তুকেই বা এরা কোথায় রেখেছে?

কাকাবাবু দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সামনে একটা টানা বারান্দা পাশাপাশি বেশ কয়েকটা ঘর। বারান্দার রেলিংয়ের ওপারে গ্রিল লাগান, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়ির সামনের রাস্তা। এরা কোনও পাহারার ব্যবস্থা রাখেনি। কাকাবাবু ইচ্ছে করলেই বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু এরা ভাল করেই জানে যে সন্তুকে সঙ্গে না নিয়ে কাকাবাবু একা-একা চলে যাবেন না।

বারান্দা পেরিয়ে খানিকটা আসতেই কাকাবাবু দেখতে পেলেন সিঁড়ির পাশের একটি ঘরের দরজা খোলা। সেখানে বসে আছে অসীম পট্টনায়ক, আর কাকাবাবুর পূর্ব পরিচিত মাধব রাও। অসীম পট্টনায়ক গায়ে এখনও নীল সাফারি স্যুট আর মাধব

রাও পরে আছে পাজামা আর হলুদ রঙের পাঞ্জাবি। মাধব রাওয়ের বয়স ষাটের বেশি হলেও বেশ শক্ত সমর্থ শরীর, নাকের নিচে মোটা গোঁফ।

কাকাবাবুকে দেখে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। মাধব রাও খাতির করে বলল, 'আসুন মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন তাই ডিস্টার্ব করিনি। ভাল মতন বিশ্রাম হয়েছে তো?'

অসীম পট্টনায়ক বলল, 'আসুন স্যার, ভেতরে এসে বসুন। আমাদের আজকের সন্ধেবেলার মিটিংটা ক্যানসেল হয়ে গেছে। পরে আর একদিন হবে। মিঃ অংশুমান চৌধুরীও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।'

কাকাবাবু এই ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম রাখা, তা দেখে কাকাবাবুর চা তেষ্টা পেল, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তিনি এক দৃষ্টিতে মাধব রাওয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মাধব রাওয়ের ঠোঁটে একটা লম্বা চুরুট। কিছুদিন আগে মাধব রাও অন্য একজন ভদ্রলোককে নিয়ে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে কাকাবাবু ওকে চুরুট খেতে নিষেধ করেছিলেন তাঁর সামনে। আজ মাধব রাও চুরুট নামাল না মুখ থেকে, ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন 'মাধব রাও. আপনি এক সময় দিল্লিতে সরকারি চাকরি করতেন, তাই না?'

মাধব রাও মাথা হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ ঠিক. আপনার মনে আছে দেখছি। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট সার্ভিস করতাম, এখন রিটায়ার করেছি.

কাকাবাবু বললেন, 'রিটায়ার করার পর এইসব ইললিগ্যাল কাজ শুরু করেছেন? আপনার নামে অভিযোগ জানালে আপনার পেনশান বন্ধ হয়ে যাবে।'

দারুণ অবাক হয়ে মাধব রাও বলল, 'ইললিগ্যাল কাজ? আপনি বলছেন কি? আই অ্যাম স্ট্রিক্টলি অন দা সাইড অব ল।'

কিডন্যাপিং। অ্যাবডাকশান, এসব বেআইনি কাজ নয়? আমাকে আর আমার ভাইপোকে আপনারা জোর করে ধরে এনেছেন।'

এবারে অসীম পট্টনায়ক অবাক হয়ে বলল, 'জোর করে? আপনার তো স্যার সম্বলপুরে একটা মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করার কথা। আপনি নিজে আসতে রাজি হয়েছেন।'

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, 'আমি কোনও দিন কোনও পাবলিক মিটিংয়ে যাই না। এখানকার কোনও মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করার কথাও আমি আগে শুনিনি। আমাকে আনা হয়েছে জোর করে ঘুম পাড়িয়ে কিংবা অজ্ঞান করে, আর সন্তুকে কি ভাবে আনা হয়েছে তা আমি এখনও জানি না। তারও সম্বলপুর আসবার কোনও কারণ নেই।'

মাধব রাও বলল, 'আপনি রেগে যাচ্ছেন মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি সব কথা আগে শুনুন। আপনাকে গোড়া থেকে খুলে বলছি, সব শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, আমাদের কোনও দোষ নেই। তার আগে একটু চা খাওয়া যাক। আপনি চা খাবেন তো, না কফি আনব?'

কাকাবাবু বললেন, 'চা হলেই চলবে। আগে আপনি কি বলতে চান, সেটাই শুনি।'

একটা ট্রেতে টিপট কাপ, ছাঁকনি ইত্যাদি সব সাজান রয়েছে। পট থেকে কয়েকটি কাপে চা ঢালতে ঢালতে মাধব রাও বলল, 'আমার বন্ধু পট্টনায়ক একটা বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন। তিনি থাকলে তাঁর মুখ থেকেই সব শুনতেন। যাই হোক, আমিই বলছি আমি আর অনন্তবাবু কলকাতায় আপনার বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম মনে আছে?'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, মনে আছে। আপনারা আমাকে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, সে প্রস্তাবে আমি ইন্টারেস্টেড নই। ঠিক কিনা?'

মাধব রাও একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, সেদিনও আপনি খুব রেগে গিয়েছিলেন, আমাদের প্রায় তাড়িয়েই দিয়েছিলেন বলা যায়। তা আপনার বাড়ি, আপনার যদি কোনও লোকের কথা পছন্দ না হয়, তাহলে তো চলে যেতে বলতেই পারেন। তাতে আমরা কিছু মনে করিনি। আপনাকে অনুরোধ করেছিলুম, একবার অন্তত সম্বলপুর থেকে ঘুরে যেতে তাতেও আপনি রাজি হননি!'

'সেইজন্যই আমাকে জোর করে ধরে আনবার ব্যবস্থা করেছেন?'

'আরে ছি ছি, আপনার মতন লোককে জোর করে ধরে আনতে পারি কখনও? সে-রকম চিন্তা আমরা মনেও কখনও স্থান দিইনি। আপনি রিফিউজ করার পর আমরা আরও দু'এক জনের কাছে যাই। তাদের মধ্যে মিঃ অংশুমান চৌধুরী কাজটা করতে রাজি হন। কিন্তু তিনি একটা শর্ত দেন। তাঁর কাজে আপনাকেও পার্টনার করে নিতে হবে। আমরা বললুম, সেটা তো সম্ভব নয়। আপনি রাজি হবেন না। তো, তিনি বললেন, সে দায়িত্ব তিনিই নেবেন। তিনিই আপনাকে সম্বলপুরে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়েছেন। কি করে তিনি আনবেন, তা আমরা কিছুই জানি না। তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন যে, একটা মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করার কথা বলে আপনাকে রাজি করানো হয়েছে।'

'মাধব রাও, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'রায়চৌধুরীবাবু, আপনি যে-কোনও শপথ করতে বলুন। আমি সেই শপথ নিয়ে বলব যে, আপনাকে জোর করে ধরে আনার কথা আমরা চিন্তা করিনি, কোনও ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা।'

অসীম পট্টনায়ক বলল, 'স্যার, আমরা নাম-করা ফ্যামিলি এখানকার। আমাদের বাড়িতে কারুকে জোর করে আটকে রাখব, এ তো অতি লজ্জার কথা! আপনি একজন সম্মানিত অতিথি।'

'কাকাবাবু বললেন, 'আর আমার ভাইপো সন্তু, সে এখানে এল কি করে?'

মাধব রাও বলল, 'অংশুমানবাবুই বলেছিলেন যে, দুটি ছোকরাও এই সঙ্গে আসবে। তবে তাদের মধ্যে একজন আপনার ভাইপো কিনা তা আমরা জানব কি করে?'

'দুটি ছোকরা মানে? কত বয়েস তাদের?'

'এই আঠারো-উনিশ হবে। কলেজের ছোকরা মনে হয়। অংশুবাবু কেন তাদের আনিয়েছিলেন, তাও আমরা জানি না।'

'সেই ছেলেদুটি কোথায়?'

'তারা আছে অন্য বাড়িতে। তাদের চার্জও আমরা নিইনি। অংশুবাবুর চেনা লোক তাদের ভার নিয়েছে।'

'অংশুবাবু ভেবেছেন কী। তিনি যা খুশি তাই-ই করবেন। ডাকুন অংশুবাবুকে।'

'তাঁকে তো এখন ডাকা যাবে না। স্টেশনে পড়ে গিয়ে উনি কোমরে চোট পেয়েছেন, মনেও একটা শক পেয়েছেন। তাই ওঁর নিজের ডাক্তার ওঁকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন।'

'মাধব রাও, আপনাকে বুদ্ধিমান লোক বলে জানতাম। এই অংশুমান চৌধুরী আপনাদের কি সাহায্য করবে? যে লোক একটা বেড়ালের বাচ্চা দেখে ভয় পায়, সেই লোক যাবে জঙ্গলের মধ্যে একটা মূর্তি উদ্ধার করতে?'

মাধব রাও গোঁফে তা দিতে দিতে নিঃশব্দে হাসল, চুরুটটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বলল, 'আমাদের বরাবরই ধারণা, আপনিই একমাত্র আমাদের সাহায্য করতে পারেন। অংশুমান চৌধুরী আপনাকে এখানে আসতে রাজি করাবেন শুনেই আমরা তাঁর সব কথা মেনে নিয়েছি।'

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটা মূর্তি চুরির মতন জঘন্য কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চাইছেন, আপনার লজ্জা করে না? আমি কিছুতেই আপনাদের প্রস্তাবে রাজি হব না। আমি আজ রাতেই কলকাতার ট্রেন ধরব, তার আগে আমার ভাইপো সন্তুকে এনে দিন আমার কাছে।'

অসীম পট্টনায়ক বলল, 'স্যার হিরাকুদ ড্যাম দেখতে যাবেন না? সম্বলপুর এসে হিরাকুদ না দেখে কেউ ফিরে যায় না। আর আমাদের সেই মিটিংটা হবে পরশুদিন।'

কাকাবাবু বললনে, 'একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন। আমি এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে যাব, তাঁকে সব কথা খুলে বলব।'

অসীম পট্টনায়ক বলল, 'ট্যাক্সির দরকার কি, আমাদের বাড়ির গাড়ি আছে,তাতে আপনি যেখানে ইচ্ছে মনে করবেন, সেখানেই যেতে পারবেন।'

মাধব রাও বলল, 'রায়চৌধুরীবাবু, আপনি আমাদের নামে আর একটা মিথ্যে দোষ দিলেন। আমরা আপনাকে কোনও মূর্তি চুরি করার কথা একবারও বলিনি, আমরা আপনাকে অনুরোধ করেছি একটা চুরি যাওয়া মূর্তি উদ্ধার করে দিতে। সেটা কি অপরাধ? আপনাকে আর একটা অনুরোধ করব? আপনি এ-কাজ করতে রাজি হোন বা না হোন, এ বাড়ির মূর্তির কালেকশনটা একবার দেখতে? একটু দেখুন না, কতক্ষণই বা লাগবে? তারপর আপনি না হয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাবেন।'

কাকাবাবু অগত্যা রাজি হলেন। পুরনো মূর্তি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ আছে। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন!'

বাড়িটা পুরনো আমলের। দেখলেই বোঝা যায় বেশ শৌখিন লোকের বাড়ি। তবে এখন এ বাড়িতে বিশেষ কেউ থাকে না। এই পরিবারের মেয়েরা ও অন্যান্য লোকেরা এখন থাকে ভুবনেশ্বরের অন্য একটি বাড়িতে।

একতলার সিঁড়ির নিচে খানিকটা অন্ধকার-মতন জায়গা। তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে অসীম পট্টনায়ক একটা লুকনো দরজা খুলল চাবি দিয়ে। মাধব রাও কাকাবাবুকে বলল, 'আসুন. আপনার আর একটু কষ্ট হবে, সিঁড়ি দিয়ে আরও নামতে হবে, আমাদের স্ট্যাচু কালেকশনের ঘরটা মাটির নিচে।

মাটির নিচের ঘর শুনেই কাকাবাবুর খটকা লাগল। মাধব রাও এতক্ষণ যা বলল, তা সবই যদি মিথ্যে হয়, তা হলে এবারে ওরা তাঁকে মাটির নিচের ঘরে আটকে রাখার চেষ্টা করতে পারে। ওদের দু'জনের সঙ্গে কাকাবাবু গায়ের জোরে পারবেন না, তা ছাড়া মাধব রাওয়ের কাছে রিভলভার থাকা খুবই সম্ভব। কাকাবাবুর কাছে কিছুই নেই।

তবু তাকে যেতেই হবে। এখন আর যাব না বলা যায় না। তিনি মাধব রাওয়ের পেছন পেছন চললেন। অসীম আগেই নেমে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। চমৎকার নিয়ন আলোর ব্যবস্থা আছে, এমনকি, পাখাও আছে। ঘরটি বেশ বড়, তাতে বেশ কিছু ছবি এবং গোটা কুড়ি-পঁচিশ মূর্তি সাজানো।

মাধব রাও বলল, 'অনন্তবাবু থাকলে তিনি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। আমিও কিছু-কিছু জানি। এই যে মূর্তিগুলি দেখছেন, এগুলো আগে ওপরেই থাকত। অনন্তবাবুর বাবার শখের কালেকশন। এ-বাড়ির ছাদে একটা ঠাকুরঘর আছে। এক সময় সেখানে পুজোও হত। এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে দামি মূর্তিটাই চুরি গেছে। তারপর থেকে অন্য মূর্তিগুলো এই ঘরে এনে সাবধানে রাখা হয়েছে। এই যে এদিকটায় আসুন!'

ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা কাঠের বেদির ওপর দুটি ছোট-ছোট নীল রঙের নারী মূর্তি রয়েছে। বেদির দু'পাশে মূর্তি দুটি বসানো, মাঝখানটা ফাঁকা।

মাধব রাও ডাকলেও কাকাবাবু চট করে সেদিকে গেলেন না। অন্য মূর্তিগুলি যত্ন করে দেখতে লাগলেন। কয়েকটি বেশ পুরনো মনে হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গায়ে

যে-রকম মূর্তি আছে, অনেকটা সেই ধাঁচের। কাকাবাবু দু'একটা মূর্তির গা আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে কিছু পরীক্ষা করলেন, তারপর চলে এলেন মাধব রাওয়ের কাছে।

মাধব রাও বলল, 'এই যে দুটি নীল মূর্তি দেখছেন, এ দুটি রাধা আর লক্ষ্মীর। এর মাঝখানে একটা ছিল বিষ্ণু মূর্তি। ওপরের ঠাকুর ঘরে সেই মূর্তিটাই পুজো করা হত। সেই মূর্তিটাই চুরি গেছে, অবশ্য অনেককাল আগেই চুরি হয়েছে। কিন্তু এখন সেটার সন্ধান পাওয়া গেছে। মূর্তিটা কিন্তু বেশ বড়। টারকোয়াজের মূর্তি, এক হিসেবে সেটা অমূল্য। সেটার একটা ছবি আছে না অসীম?'

অসীম বলল, 'হ্যাঁ, এখানেই তো ছিল, দেখছি।'

অসীম নিচু হয়ে ছবিটা খুঁজতে লাগল, কাকাবাবু ছোট একটা নীলমূর্তি হাতে তুলে নিয়ে নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলেন। তার ঠোঁটে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।

কাঠের বেদিটার তলা থেকে অসীম ছবিটা তুলে আনল। সেটা একটা হাতে-আঁকা ছবি। সেটা বিষ্ণু মূর্তির ছবি বলে চেনা যায় না। দাঁড়ানো অবস্থায় একজন পুরুষ, তার পায়ে হাঁটু পর্যন্ত গাম বুটের মতন জুতো, মাথায় মুকুট। ভুবনেশ্বরে এরকম একটা সূর্য মূর্তি আছে।

কাকাবাবু ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে যেতেই সিঁড়িতে একটা শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন নেমে আসছে। অসীম বলল, 'কে?' মাধব রাও পকেটে হাত দিল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল লম্বা ছিপছিপে একজন মানুষ, মাথায় তার একটাও চুল নেই, চোখে কালো চশমা। অংশুমান চৌধুরী। তাঁর হাতে একটা বড় কাগজের বাক্স।

কয়েক পা এগিয়ে এসে কাষ্ঠ হাসি হেসে তিনি বললেন, 'রাজা রায়চৌধুরীকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছবি দেখে উনি কি বুঝবেন?'

কাগজের বাক্সটা খুলে তিনি বড় একটা নীল রঙের পুরুষ-মূর্তি বার করে উঁচু করে ধরে বললেন, 'এই দেখুন সেই আসল মূর্তি।'

১১

স্টেশন ওয়াগনটা কোন্ডাগাঁওতে যখন পৌঁছল তখন রাত প্রায় এগারোটা। চারদিক একেবারে নিঝুম, রাস্তায় আর কোনও গাড়ির শব্দ পর্যন্ত নেই। কোনও দিকে এক বিন্দু আলোও দেখা যায় না।

গাড়ি চালাচ্ছে মাধব রাও নিজেই। কাকবাবু বসে আছেন তার পাশেই। গাড়ির মধ্যে রয়েছে অংশুমান চৌধুরী আর তাঁর সহকারী ভীমু। তাদের কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

গাড়ি থামিয়ে মাধব রাও বললেন, 'ব্যাস , এই পর্যন্ত! সারাদিন গাড়ি চালিয়ে আমি একেবারে থকে গেছি। আজ রাতের মতন এখানেই রেস্ট নিতে হবে।'

অংশুমান চৌধুরী ঘুমচ্ছিলেন। গাড়ি থামতেই তিনি জেগে উঠে বসলেন, 'পৌঁছে গেছি? কোথায় এলাম? এ জায়গাটার নাম কি।'

মাধব রাও বললেন, 'এই তো আপনার কোন্ডাগাঁও। দেখুন, মাইল পোস্টে নাম লেখা আছে। এবারে কি করবেন?'

অংশুমান চৌধুরী জানালা দিয়ে টর্চ ফেলে রাস্তাটা দেখলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবারে ডান দিকের রাস্তাটায় চলুন। এক মাইলের মধ্যে একটা সাদা বাড়ি দেখতে পাবেন, সেখানেই থামবেন। ভীমু, তৈরি হয়ে নে!'

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল এবং খানিক বাদে একটা বড় সাদা বাড়িও পাওয়া গেল। সেটা একটা পি.ডব্লু.ডি-র বাংলো । গেটখোলা গাড়ির আওয়াজ শুনেই গেটের বাইরে একটি লোক এসে দাঁড়াল।

ভীমু আগে গেট থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলে, 'সব ঠিক আছে?'

লোকটি বাংলাতেই বলল, 'হ্যাঁ স্যার। সব ঠিক আছে। এখানে কুকুর-বেড়াল কিছু নেই। রান্না-টান্নাও সব করে রেখেছি।'

কাকাবাবু এক দৃষ্টিতে সামনের অন্ধকার দেখছিলেন চুপ করে। আকাশে অল্প-অল্প মেঘ। অনেক দূরে মাদলের শব্দ হচ্ছে, ডুং-ডুং, ডুং-ডুং।

মাধব রাও বললেন, 'এবারে নামুন মিঃ রায়চৌধুরী।'

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে নামলেন। ডাকবাংলোর গেটের কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সন্তু এখানে আছে?'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার ভাইপো আর আমাদের জোজো এখানেই আছে। কোনও চিন্তা নেই।'

কাকাবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'সন্তু, সন্তু?'

কোনও উত্তর এল না। ডাকবাংলোর লোকটি বলল, 'ছেলে দুটি তো চলে গেছে, স্যার?'

অংশুমান চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন, 'চলে গেছে? তার মানে? কোথায় চলে গেছে?'

লোকটি বলল, 'আজ সন্ধেবেলাতেই চলে গেল। ওরা বলল যে, এই জায়গাটা ভাল লাগছে না। তাই বোধহয় নারানপুরের দিকে গেল।

'সঙ্গে কে ছিল?'

'সঙ্গে আর একজন লোক ছিল নাম ঠিক জানি না।'

কাকাবাবু অংশুমান চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি সন্তুর কথা বলে আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন। এখানেও সন্তুর দেখা পাওয়া গেল না। এরপরেও কি আপনাকে আমি বিশ্বাস করব?'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'এখানেই থাকার কথা ছিল। সন্ধেবেলা ওরা দুজনে কেন চলে গেল তা আমি জানি না। আপনাকে আমি মিথ্যে কথা বলব কেন? নারানপুর এখান থেকে বেশিদূর নয়, কাল সকালেই খোঁজ করা যাবে।'

'আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তার প্রমাণ কি?'

'প্রমাণ, মানে, তারা তো ছিলই এখানে। এই, ইয়ে, ছেলে দুটি ডাকবাংলোর খাতায় নাম-টাম লেখেনি?'

ডাকবাংলোর লোকটি বলল, 'হ্যাঁ স্যার লিখেছে। ওদের সঙ্গের লোকটি সব চার্জ মিটিয়ে দিয়ে গেছে।'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'কই, খাতাটা দেখাও এঁকে।'

সবাই ঢুকে এল ডাকবাংলোর মধ্যে। কাকাবাবু খাতাটা দেখলেন। সন্তু নিজের নাম লিখেছে। সন্তু রায়চৌধুরী। হাতের লেখাটা সন্তুরই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কাকাবাবু বললেন, 'আপনাদের চালাকিটা বোঝা এমন কিছু শক্ত নয়। আপনারা সন্তুকে বলেছেন, আমি একজায়গায় আছি। সেই শুনে সন্তু সেখানে যাচ্ছে। আবার আমাকে বলছেন, সন্তু ওমুক জায়গায় আছে। আমিও তাই শুনে সেখানে যেতে রাজি হচ্ছি। সন্তুকে এখান থেকে সরান হল কেন আমি জানতে চাই।'

অংশুমান চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে মশাই, আপনি আমাকে ধমকাচ্ছেন কেন? আপনার ভাইপো যদি নিজের ইচ্ছেয় অন্য জায়গায় চলে যায়, তা হলে আমি কি করব?'

কাকাবাবু এর উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, মাধব রাও হাত তুলে বললেন, 'আগে আমাকে একটা কথা বলতে দিন। আমি খুব টায়ার্ড। এই বাংলোতে আমার থাকার ইচ্ছে নেই। আমি আজ রাতেই জগদলপুরে চলে যাব। তার আগে আমার বন্ধু অনন্ত পটনায়কের পক্ষ থেকে একটা ফাইনাল কথা বলে নিতে চাই।'

ডাকবাংলোর লোকটির দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াবেন, প্লিজ। আমি এঁদের দু'জনের সঙ্গে প্রাইভেটলি কথা বলতে চাই।'

লোকটি বাইরে চলে যেতেই মাধব রাও দরজা বন্ধ করে দিলেন। চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আপনাকে কিংবা আপনার নেফিউ-কে কলকাতা থেকে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমাদের কোনও দোষ দিতে পারবেন না। এসব ব্যবস্থা করেছেন মিঃ অংশুমান চৌধুরী। সে আপনি ওঁর সঙ্গে বুঝে নেবেন। আমরা কেউ আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। আমরা শুধু আমাদের চুরি যাওয়া মূর্তিটা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড।'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনাদের মূর্তি সম্পর্কে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।'

মাধব রাও বললেন, 'আমার কথাটা শেষ করতে দিন। এরপর থেকে আমরা আর আপনাদের কাছে থাকব না। আমি জগদলপুরে দিন-দশেক থাকব। এর মধ্যে আপনাদের একজন যদি মূর্তিটা উদ্ধার করে আনতে পারেন, তাহলে আমরা তিন লক্ষ

টাকা দেব। সব খরচ-খরচা আপনাদের। আর যদি দু'জনে এক সঙ্গে উদ্ধার করে আনেন, তা হলে টাকাটা দু'জনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।'

কাকাবাবু দারুণ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'আমি কতবার বলব যে, আপনাদের ওই মূর্তি-টুর্তির ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই?'

মাধব রাও বললেন, 'মিঃ রায়চৌধুরী, আমি শেষবার অনুরোধ করছি, আপনি আমার সঙ্গে ওরকম ধমক দিয়ে কথা বলবেন না। আপনি কাজ করতে চান না, তো ইউ মে গো টু হেল! আপনার যা খুশি করুন। আমাদের অফার আমি জানিয়ে দিয়েছি, এখন আমি চলে যাচ্ছি!'

কাকাবাবু মাধব রাও-এর হাত চেপে ধরে বললেন, 'না, এখন আপনার যাওয়া চলবে না। আপনি আমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। এখন আপনি আমাকে নারানপুরে নিয়ে চলুন। আমি আজ রাতেই সন্তুর খোঁজ করতে চাই।'

মাধব রাও এক ঝটকায় নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। অন্য হাতটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আমার ওপর গায়ের জোর ফলাবার চেষ্টা করবেন না। তার ফল ভাল হবে না। আপনাকে আমি নারানপুরে নিয়ে যেতে বাধ্য কেন হব? আমি কি আপনার হুকুমের চাকর?'

কাকাবাবু কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন মাধব রাও-এর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'না, আপনি আমার হুকুমের চাকর নন। আমি আপনার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলেছি বলে দুঃখিত। আমার মেজাজ ঠিক নেই। আমাকে আর আমার ভাইপোকে আপনারা কেন অকারণ ঝঞ্ঝাটে জড়াচ্ছেন?'

অংশুমান চৌধুরী কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'কি রাজা রায়চৌধুরী, মাধব রাওকে পকেটে হাত ঢোকাতে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? আপনাকে তো সবাই খুব বীরপুরুষ বলে জানে!'

কাকাবাবু বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ কখন শিশুপালকে বধ করেছিল জানেন? শিশুপালের একশটা অপরাধ ক্ষমা করবার পর। আপনার অপরাধও কিন্তু প্রায় একশটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'নিজে ভয় পেয়ে উলটে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? এবার আমার গায়ে একটু হাত ছোঁয়ালে কিন্তু আমি আপনার অন্য পাটা আস্ত রাখব না। আমি যা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। আমার যথেষ্ট টাকা আছে। আমার আর টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই। ওদের ওই তিন লাখ টাকা পুরস্কারের লোভে আমি এ-কাজে নামিনি। আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট চ্যালেঞ্জ আছে। আপনি যদি মূর্তিটা উদ্ধার করে আনতে পারেন ওই তিন লক্ষ টাকা আপনিই পাবেন, আমি ভাগ বসাতে যাব না। আর আপনার আগেই আমি যদি মূর্তিটা সরিয়ে আনতে পারি, তাহলে সবার সামনে আপনাকে মাথার চুল আর ওই গোঁফ কামিয়ে ফেলতে হবে। এবারে আপনাকে আমি ন্যাড়া করবই।'

কাকাবাবু তখনও মাধব রাও-এর হাত ছাড়েননি। অংশুমান চৌধুরীর দিকে তিনি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। মাধব রাও-এর চোখ থেকে তিনি চোখ সরাননি। তাঁর ঠোঁটে পাতলা হাসি ফুটে উঠল। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, 'এক্সকিউজ মি।'

তারপরই তিনি বিদ্যুৎগতিতে মাধব রাও-এর হাত ধরে জোরে একটা টান দিলেন। সেই টানে অতবড় চেহারাটা নিয়েও মাধব রাও উঠে গেলেন শূন্যে, তারপর হুড়মুড়িয়ে পড়লেন অংশুমান চৌধুরীর ঘাড়ে। আচমকা আঘাত পেয়ে অংশুমান চৌধুরী যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন।

বিশেষ ব্যস্ততা না দেখিয়ে কাকাবাবু মাধব রাও এর কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে নিলেন। অংশুমান চৌধুরীর হাতের লাঠিটা ঠেলে দিলেন দূরে। তারপর মাধব রাও-এর দিকে আবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'উঠুন, আশা করি আপনার বেশি লাগেনি। আমি দুঃখিত।'

মাধব রাও-এর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। না এখনও তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, এইমাত্র যে কান্ডটা ঘটে গেল সেটা ম্যাজিক না অন্য কিছু।

অংশুমান চৌধুরী উপুড় হয়ে পড়ে যন্ত্রণায় উঁ উঁ করছেন। কাকাবাবু মুখটা অন্যদিকে ফিবিয়ে বললেন, 'এনাফ অফ দিস সাংকি বিজনেস। মাধব রাও, আপনি দেখুন, ওই লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে কিনা। ওর দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছে করছে না। কিছুতেই আমি রাগ সামলাতে পারছি না। ওকে টেনে তুলুন।'

কাকাবাবু মাধব রাও-এর রিভলভারটা খুলে দেখলেন গুলি ভরা আছে কিনা। সেফটি ক্যাচটা তিনি লক করলেন। তারপর তিনি বললেন,'হয়তো আপনারা জানেন না, তাই জানিয়ে রাখছি যে, আমার হাতের ছটা গুলির একটাও ফসকায় না। আমার একটা পা খোঁড়া তাই আমার দুটো হাতে চারজন মানুষের শক্তি। আর মাথাটাও, লোকে বলে বেশ ধারাল। এরপর থেকে আর কোনও রকম চালাকি আমি সহ্য করব না। উঠে বসুন, আমরা এক্ষুনি নারানপুর যাব। সেখানে সন্তুকে পেয়ে গেলে কালই আমি বাড়ি ফিরব। আপনাদের মূর্তি গোল্লায় যাক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।'

অংশুমান চৌধুরী দেওয়ালে ভর দিয়ে উঠেছেন। কাকাবাবু বললেন, দেরি করবেন না, উঠুন!'

প্রায় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন অংশুমান চৌধুরী। কাকাবাবু তাঁর জামার পকেট থাবড়ে দেখলেন আর কোনও অস্ত্র আছে কিনা। তারপর রিভলভারের নলের এক খোঁচা দিয়ে বললেন, 'নারানপুরে গিয়েও যদি সন্তুকে দেখতে না পাই, তাহলে আপনার ভগবানও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।'

ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরবার পর ডাকবাংলোর লোকটি বলল, 'স্যার, খাবার গরম করব?'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনার বাংলোতে কুকুর নেই কেন? কুকুর পোষা ভাল। রাত্তিরবেলা খাবার-দাবার বেঁচে গেলে কুকুরগুলো খেতে পারে। আমাদের এখন খাওয়ার সময় নেই।'

রাত্রির অন্ধকারে স্টেশন ওয়াগনটা ছুটে চলল আবার।

১২

একটা গাড়ির আওয়াজে সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল। এমনিতেই তার খুব পাতলা ঘুম। তাছাড়া নতুন কোনও জায়গায় প্রথম রাত্তিরে অন্তত তার ভাল করে ঘুমই হয় না।

রাত এখন কটা হবে কে জানে! দুটো-তিনটের কম নিশ্চয়ই নয়। সন্তুরা শুতেই গেছে বারোটার পর। পাশের খাটে ঘুমোচ্ছে জোজো। বিছানায় শোওয়া মাত্র সে ঘুমিয়ে পড়ে, এক ঘুমে রাত কাবার করে দেয়।

গাড়ির শব্দটা দূর থেকে এগিয়ে আসছে কাছে। মনে হল, বাংলোটার চারপাশ দিয়ে গাড়িটা একবার ঘুরে এল, তারপর গেটের কাছে থামল।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু উঠে বসে ডাকল, 'জোজো, জোজো!'

জোজো উঠল না। সন্তু দু'তিনবার ধাক্কা দিল তাকে। বাংলোর দরজায় খটখট করে শব্দ হচ্ছে, একবার কেউ ডেকে উঠল,'সন্তু, সন্তু!'

কাকাবাবুর গলা চিনতে পেরেই সন্তু তড়াক করে খাট থেকে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দরজার সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, মাধব রাও, ভীমু আর অংশুমান চৌধুরী, তাদের পেছনে রিভলভার হাতে কাকাবাবু। তাঁর এক বগলে শুধু ক্রাচ। সন্তু সামনের তিনজনকে এড়িয়ে কাকাবাবুর পাশে গিয়ে দারুণ স্বস্তির সঙ্গে বলল, 'কাকাবাবু! তুমি এসেছ!'

কাকাবাবু সন্তুর দিকে না তাকিয়ে আদেশের সুরে বললেন, 'টর্চটা ফেলে দাও, মাথার ওপর হাত তোল!'

লর্ড নামের লোকটিও আওয়াজ শুনে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঘুম চোখে সে প্রথমটা কিছুই বুঝতে, পারেনি। কাকাবাবুর কড়া সুরের হুকুম শুনে সে জিজ্ঞেস করল,'আপনি কে?'

কাকাবাবু তার কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, 'অংশুমান চৌধুরী, আপনার লোককে বলুন, মাথার ওপর হাত তুলতে, আমি বেশি সময় নষ্ট করতে পারব না।'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'ওরে লর্ড, হাত তোল। যা বলছে শোন!'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনারা সবাই ভেতরে ঢুকুন। সন্তু তুই গিয়ে আলোটা জ্বেলে দে।'

বাংলোটার মাঝখানের ঘরটা খাবার ঘর। একটা গোল টেবিল ও চারখানা চেয়ার রয়েছে। কাকাবাবুর ইঙ্গিতে অংশুমান চৌধুরী, ভীমু, মাধব রাও আর লর্ড সেই চেয়ারগুলোতে বসলেন। কাকাবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন একদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। রিভলভারটা নামালেন না।

এবার তিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বন্ধু কোথায়?'

সন্তু বলল, 'জোজো ঘুমোচ্ছে। ডেকে আনব?'

কাকাবাবু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে এরপর লর্ড-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি এই ছেলে দুটিকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছ?'

লর্ড যেন আকাশ থেকে পড়ল এই কথা শুনে। চোখ বড়-বড় করে সে বলল, 'কিডন্যাপ করব, আমি? কেন? আমি কত কষ্ট করে ছেলে দুটির সঙ্গে-সঙ্গে ছুটছি। যেখানে যেতে চাইছে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি, আর আপনি বলছেন, ওদের আমি কিডন্যাপ করেছি? ওদের কি ধরে রাখা হয়েছে, না বেঁধে রাখা হয়েছে?'

কাকাবাবু বললেন, 'ওদের কলকাতা থেকে এতদূর টেনে আনা হল কেন? আমি সেটা জানতে চাই!'

লর্ড সেইরকম অবাক ভাবে বলল, 'ওদের কলকাতা থেকে টেনে আনা হয়েছে? কি আজব কথা বলছেন মশাই? আমি স্বচক্ষে দেখলুম, ওরা ট্রেন থেকে নামল, আমার সঙ্গে নিজের ইচ্ছেতে গাড়িতে চাপল, সম্বলপুরে গেল, তারপরেও আমাকে এতদূর পর্যন্ত ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে, ওরা নাকি আপনাকেই খুঁজছে!'

এই সময় জোজোকে নিয়ে ফিরে এল সন্তু। লর্ড ওদের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'আপনি ওদেরই জিজ্ঞেস করুন না। একবারও ওদের গায়ে হাত দিয়েছি? একটুও জোর করেছি!'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'ওদের কেন কলকাতা থেকে আনা হয়েছে। আমি বলছি। জোজোকে এনেছি সন্তুকে সঙ্গ দেবার জন্য। একজন বন্ধু থাকলে আপনার ভাইপো সন্তু একা-একা বোধ করবে না। আর সন্তুকে আনা হয়েছে আপনাকে সাহায্য করবার জন্য। আপনি বাইরে গেলেই এই ছেলেটি আপনার সঙ্গে থাকে, আমি জানি। আমাকে সাহায্য করবার জন্য যেমন ভীমু আছে, আপনাকে সাহায্য করবার জন্যও তেমন আপনার ভাইপো থাকবে. এই আমি চেয়েছিলুম। আমি ফেয়ার কমপিটিশনে বিশ্বাস করি!'

কাকাবাবু বিদ্রুপের সঙ্গে হেসে বললেন, 'চুরির কমপিটিশন, তাও আবার ফেয়ার আর আনফেয়ার! সন্তু, তুই আর তোর বন্ধু জানিস আসল ব্যাপারটা কি?'

সন্তু দুদিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, 'এখানকার একটা আদিবাসী গ্রামে একটা নীল পাথরের দেবতার মূর্তি আছে। এরা সেটা চুরি করতে চায়। এই অংশুমান চৌধুরী সেই মূর্তিটার

একটা নকল বানিয়ে এনেছে। কোনওরকমে সেই আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে নকল মূর্তিটা রেখে আসল মূর্তিটা চুরি করে আনাই এদের মতলব।'

মাধব রাও বাধা দিয়ে বলল, 'আমি আপত্তি করছি, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি বারবার বলছেন চুরি, কেন? ওটা আমরা উদ্ধার করতে চাই, মূর্তিটার আসল মালিক আমরা, আদিবাসীরাই ওটা চুরি করেছে। পুলিশের সাহায্য নিয়ে উদ্ধার করতে গেলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে, সেই জন্যই আমরা অন্য পথ নিতে চাইছি।'

কাকাবাবু বললেন, 'ওটা যে আপনার বন্ধুর বাড়ি থেকে কোনও এক সময় চুরি হয়েছিল, সেটা আগে প্রমাণ করতে হবে। পুলিশের সাহায্য না নিয়ে গোপনে-গোপনে মূর্তিটা বদলে আনাও এক ধরনের চুরি। আমি তো আপনাদের কোনও সাহায্য করবই না, বরং আপনাদের মতলব যাতে বানচাল হয়ে যায়, আমি সে ব্যবস্থা করব। আমি আজ রাত্তিরেই এখানকার এস. ডি. ও-কে খবর দেব।'

তারপর তিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোরা এখানে কি গাড়িতে এসেছিস?'

সন্তু বলল, 'হ্যাঁ। ওই লর্ড চালিয়ে এনেছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে আর-একটা গাড়ি আছে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমরা সেই গাড়িতেই যাব। এক্ষুনি রওনা হতে চাই, সন্তু ,তুই তৈরি হয়ে নে।'

সন্তু বলল, 'আমি তৈরি। কিন্তু জোজো কি করবে?'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কি আমাদের সঙ্গে যেতে চায়?'

জোজো একবার তার পিসেমশাইয়ের দিকে তাকাল, একবার কাকাবাবুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'আমি কলকাতায় ফিরে যাব!'

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে চল, বেরিয়ে পড়া যাক।'

তিনি এগিয়ে এসে রিভলভারটা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'ভীমু, তোমার মনিবকে নিয়ে ওই ঘরটায় ঢুকে পড়। মাধব রাও, আপনিও উঠে পড়ুন, ওই ঘরের মধ্যে যান। আজকের রাতটা আপনাদের তিনজনকে একসঙ্গে কাটাতে হবে।'

মাধব রাও উষ্ণভাবে বলল, 'আপনি আমাকেও কেন আটকে রাখতে চান? আমি আপনার কোনও ক্ষতি করিনি, আপনাকে জোর করে এখানে নিয়েও আসিনি।'

কাকাবাবু বললেন, 'মাধব রাও চাকরি ছেড়ে রিটায়ার করে আপনার নিরিবিলিতে শান্তিতে জীবন কাটানো উচিত ছিল। চোরাই মূর্তির ব্যবসা করতে গেলে তো কোনও না কোনও সময় ধরা পড়তেই হবে!'

মাধব রাও রাগ সামলাতে না পেরে হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে তেড়ে এলেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রাচটা তুলে মাধব রাও-এর পেটে খোঁচা দিয়ে আটকালেন। তারপর বললেন,'আপনারা দু'জনে মিলে আমার মেজাজ খুবই খারাপ করে দিয়েছেন। রাগের মাথায় আমি হঠাৎ গুলি চালিয়ে ফেলতে পারি। প্রাণে মারব না বটে, কিন্তু পা খোঁড়া করে দেব; যান, ওই ঘরের মধ্যে যান!'

অংশুমান চৌধুরী কোন প্রতিবাদ না করে আগেই ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। তাঁর পেছনে পেছনে ভীমু। তারপর মাধব রাও। লর্ডও ঢুকতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু তার দিকে হাত তুলে বললেন,'তুমি দাঁড়াও! আমার একটা পা ভেঙে যাবার পর থেকে আমি আর গাড়ি চালাতে পারি না। তুমি আমাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে!'

অন্য তিনজন ঘরে ঢুকে পড়ার পর কাকাবাবু সন্তুকে বললেন 'ওই দরজায় তালা লাগিয়ে দে। আজকের রাতটা ওখানেই থাক ওরা। এই বাংলোর চৌকিদার কোথায়?

সন্তু বলল, 'আমরা আর কাউকে দেখিনি। এই বাড়িটা খালিই ছিল।'

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ, আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করা আছে। যাক, ভালই হল। ওরা চ্যাঁচামেচি করলেও এখন এত রাতে কেউ শুনতে পাবে না। কাছাকাছি আর তো কোনও বাড়ি দেখলুম না।'

বাংলোর বাইরে এসে, বাইরের দরজাতেও তালা লাগিয়ে ওরা উঠে পড়ল একটা অ্যামবাসাডর গাড়িতে। লর্ডের পাশে কাকাবাবু। পেছনে সন্তু আর জোজো। এমনিতেই এত স্মার্ট ছেলে জোজো, কিন্তু এখন তার মুখ দিয়ে একটাও কথা ফুটছে না।

কাকাবাবু লর্ডকে বললেন, 'আসবার পথে আমি থানায় একটা আলো জ্বলতে দেখেছি। প্রথমে সেখানে চল, এস.ডি.ও-র বাড়ি খোঁজ করতে হবে।'

লর্ড কোনও উত্তর দিল না।

কাকাবাবু বললেন, 'তোমার ভয় নেই, তোমাকে আমি এখন পুলিশে ধরিয়ে দেব না। তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকবে।'

এবারে লর্ড বলল, 'আমি কোনও দোষ করিনি। পুলিশ আমাকে ধরবে কেন!'

কাকাবাবু বললেন, 'বেশ তো, ভাল কথা।'

আলো দেখে থানাটা সহজেই চেনা গেল। কিন্তু সেখানে কেউ জেগে নেই। অনেক ডাকাডাকির পর একজনকে তোলা গেল, সে একজন কনস্টেবল সে ভাল করে কথাই বলতে চায় না। তবে তার কাছ থেকে এইটুকু জানা গেল যে, এস.ডি.ও. কিংবা পুলিশের কোনও বড় অফিসার এখন নারায়নপুরে নেই। কি একটা জরুরি ডাক পেয়ে তাঁরা জগদলপুর গেছেন। সেখানে আরও বড়-বড় অফিসাররা মিটিং করতে এসেছেন।

কাকাবাবু বললেন,, 'ঠিক আছে, জগদলপুরেই যাওয়া যাক তাহলে। বড় অফিসারের সঙ্গে কথা না বললে কোনও কাজ হবে না।'

গাড়িটা আরও খনিকদূর যাবার পর কাকাবাবু লর্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি অংশুমান চৌধুরীর লোক না মাধব রাও-পটনায়কদের লোক?'

লর্ড বলল, 'আমি কারও লোক নই। আমি একজন বেকার। আমার ওপর এই ছেলে দুটির দেখাশুনোর ভার দেওয়া হয়েছিল।'

কাকাবাবু বললেন, 'বেকারের নাম লর্ড। বাঃ, বেশ ভাল তো!'

লর্ড বলল, 'মা-বাবা এই নাম দিয়েছেন, আমি তার কি করব?'

'তোমার জামাকাপড় দেখেও তো বেকার বলে চেনা যায় না। খুব শৌখিন বেকার বলতে হবে। তোমাকে এই কাজের দায়িত্ব কে দিয়েছে?'

'সেটা বলতে পারব না। নিষেধ আছে।'

'তোমার কানের মধ্যে রিভলভারের নলটা ঢুকিয়ে দিলেও বলবে না?'

'দেখুন স্যার, আমি নতুন গাড়ি চালাতে শিখেছি। আপনি এরকম ভয় দেখালে হঠাৎ অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে, তোমাকে আর ভয় দেখাব না। তুমি শুধু আর একটা কথার উত্তর দাও। যে নীল মূর্তিটার জন্য এতসব কান্ড হচ্ছে, এত টাকা খরচ হচ্ছে, সেই নীল মূর্তিটার বিষয়ে তুমি কিছু জান?'

'না, কিছুই জানি না। আমি কোন মূর্তির কথা শুনিইনি।'

'তুমি কি নির্বোধ? তোমাকে কেউ বলল, দুটি অচেনা ছেলেকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে, আর তুমি অমনি তাই শুরু করে দিলে? একবারও জানতে চাইলে না, কেন, কি ব্যাপার?'

'আমি ভেবেছিলাম, এটা কিছু একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক।'

'তোমার দেখছি অদ্ভুত সেন্স অব হিউমার! তুমি যে সত্যি কথা বলছ না, তা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। মিথ্যে কথা বলার সময় মানুষের গা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোয়, আমি সেই গন্ধ পাই!'

পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সন্তু, ঘুমিয়ে পড়েছিস?'

সন্তু সবই শুনছিল, 'সে বলল, না।'

কাকাবাবু বললেন, 'আমার একটা খটকা লাগছে। একটা পাথরের মূর্তির জন্য এরা এতখানি ঝুঁকি নিল কেন? মূর্তিটার জন্য এরা তিন লাখ টাকা পুরস্কার দিতে চায়, তা ছাড়াও আরও অনেক খরচ করছে। আদিবাসীদের একটা ঠাকুরের সাধারণ মূর্তির তো এত দাম হতে পারে না।'

সন্তু বলল, 'মূর্তিটা একবার দেখে গেলে হয় না?'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি ঠিক সেই কথাই ভাবছি। আমার কলকাতায় ফেরা খুবই দরকার। কিন্তু মূর্তিটা একবার না দেখে যেতেও ইচ্ছে করছে না।'

লর্ড এই সময় গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল?'

লর্ড কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'রাস্তার ওপরে .... ওরা কারা?'

হেড লাইটের আলোয় দেখা গেল রাস্তার মাঝখানে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মনে হল, দু'জন ওভারকোট পরা লোক ঝুঁকে পড়ে রাস্তার ওপরে কী যেন দেখছে। তারপর আর একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল, মানুষ নয়, দুটো ভাল্লুক। এই গাড়ির দিকেই মুখ করে আছে।

লর্ড ভয় পেয়ে গাড়িটা ঘোরাতে যেতেই সেটা হুড়হুড়িয়ে গড়িয়ে গেল ডান পাশের একটা খাদে।

১৩

সন্তুর প্রথমে মনে হল, সে জলে ডুবে যাচ্ছে। খুব গভীর সমুদ্র, তার মধ্যে সে ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সব দিক নীল, শুধু নীল। প্রচন্ড ঢেউয়ের শব্দ। তারপরই সন্তুর মনে পড়ল, সে তো সাঁতার জানে, তা হলে শুধুশুধু ডুবে যাচ্ছে কেন? সে হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে শুরু করল। তার মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরতে লাগল।

আসলে, একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাড়িটা উলটে যাবার সময় সন্তু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। গাড়িটা খাদের দিকে গড়িয়ে পড়ার সময় কাকাবাবু চিৎকার করে সবাইকে দরজা খুলে লাফিয়ে পড়তে বলেছিলেন, তখন লাফাতে গিয়ে কোনও একটা কঠিন জিনিসে তাব মাথা ঠুকে গিয়েছিল।

জ্ঞান ফেরার পর সন্তু আস্তে আস্তে চোখ মেলে দেখতে পেল, মিশমিশে কালো অন্ধকার রাত। কোথায় নীল জলের সমুদ্র? তার মাথায় অসম্ভব ব্যথা। কানের মধ্যে যেন ব্যথার কামান গর্জন হচ্ছে।

একটু পরে সে উঠে বসেও ঝিম মেরে রইল। মাথার ব্যথাটার জন্য সে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারছে না। মাথায় হাত বুলিয়ে দেখার চেষ্টা করল, রক্ত পড়ছে কিনা' কিন্তু রক্ত টের পেল না।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, অ্যাকসিডেন্ট হবার ঠিক আগের মুহূর্তে তারা দুটো ভাল্লুক দেখেছিল। সেই ভাল্লুক দুটো কোথায়?

এবারে সে ব্যথা ভুলে গিয়ে ছটফটিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা বেশ ঢালু মতন। মাটিতে হাত চাপড়ে চাপড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে গিয়ে কার গায়ে যেন হাত লাগল। চমকে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

যার গায়ে সন্তুর হাত লেগেছে, সে-ও বলে উঠল, 'কে?'

গলা শুনে চিনতে পারা গেল জোজোকে। সন্তু তার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'এই জোজো, কি হল রে? গাড়িটা কোথায় গেল? কাকাবাবু?'

জোজো বলল, 'তা জানি না! তুই কে রে সন্তু? ঠিক তো , সত্যি সন্তু তো?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'ওরে সন্তু, আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি রে? আমরা বোধহয় মরেই গেছি। গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে। মরার পর এই রকম হয়, চোখে কিছুই দেখা যায় না।'

'ধ্যাত! কি পাগলের মতন বকছিস! তোর হাত-পা কিছু ভাঙেনি তো?'
'কি জানি, ভেঙেছে কিনা! মরার পর আর ব্যথাট্যাথা টের পাওয়া যায় না।
'তুই আগে ক'বার মরেছিস? মরার পর কি হয়, তুই জানলি কি করে?'
'গাড়িটা তা হলে নেই কেন? আমরা অন্য জায়গায় চলে এলুম কিভাবে?'
'গাড়িটা বোধহয় আরও অনেকটা গড়িয়ে নেমে গেছে। আমার হাত ধর, চল,আস্তে-আস্তে এগোই। কাকাবাবুকে খুঁজতে হবে। বেশি শব্দ টব্দ করিস না। ভাল্লুক দুটো তো কাছাকাছি থাকতে পারে।'
'ভাল্লুক?'
জোজো এমনভাবে জড়িয়ে ধরল সন্তুকে যে, সে টাল সামলাতে পারল না, দুজনে মিলে গড়িয়ে নেমে গেল খানিকটা।
সেই অবস্থাতেও সন্তুর একটু হাসি পেয়ে গেল। জোজো অন্য সময় খুব লম্বা-চওড়া কথা বলে, কিন্তু আসলে সে বেশ ভীতু।
অন্ধকার খানিকটা চোখে সয়ে গেলে সন্তু দেখতে পেল, ডান পাশে বেশ খানিকটা দূরে গাড়িটা দুটো গাছের ফাঁকে আটকে আছে। সন্তুরা কি এত জোরে লাফিয়েছিল? কিংবা গাড়িটা নামতে নামতে হঠাৎ বোধহয় ডান দিকে বেঁকে গেছে। ইঞ্জিন বন্ধ, আলোও জ্বলছে না। কোনও শব্দ নেই। কাকাবাবুর কি হল? খোঁড়া পা নিয়ে উনি শেষ মুহূর্তে লাফাতে পেরেছিলেন তো? আর লর্ডই বা কোথায় গেল?
আর একটু কাছে এগোতেই দেখা গেল, গাড়ির পাশে দুটি ছায়া মূর্তি। দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছেন যখন, তখন কাকাবাবু কিংবা লর্ড কেউই জখম হননি।
সন্তু কাকাবাবুকে চেঁচিয়ে ডাকতে যাবার আগেই জোজো কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'ভা-ভা-ভা...'
সন্তু বলল, 'তুই ভাবছিস বুঝি ভাল্লুক? আরে না, গাড়িটা গাছে ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ শুনেই ভাল্লুক দুটো পালিয়েছে।'
কিন্তু জোজোই ঠিক দেখেছে। একটা ছায়ামূর্তি এপাশে মুখ ফেরাতেই স্পষ্ট চেনা গেল। কোনও সন্দেহ নেই, ভাল্লুকই বটে। অন্ধকারের মধ্যে তাদের ঠিক ওভারকোট পরা মানুষের মতনই মনে হয়। কিন্তু এই গরমকালে কাকাবাবু কিংবা লর্ড কারও গায়েই কোট নেই।
তারপরেই যা ঘটল,তা দেখে সন্তু একেবারে শিউড়ে উঠল। গাড়িটার সামনের দরজা খোলা, সেখানে হাত ঢুকিয়ে একটা ভাল্লুক একজন মানুষকে টেনে বার করল। সঙ্গে-সঙ্গে মানুষটিকে চেনা গেল। কাকাবাবু!
কাকাবাবু অজ্ঞান হয়ে আছেন। ভাল্লুক দুটো কাকাবাবুকে মেরে ফেলবে। এখন কাকাবাবুকে বাঁচাবার একটাই মাত্র উপায় আছে। সন্তু উঠে দাঁড়িয়েই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'হেই! হেই! হেই!'

জোজো পেছন ফিরে দৌড় মারল। সন্তু পাগলের মতন চিৎকার করতে করতে মাটি থেকে পাথর তুলে তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগল ভাল্লুক দুটোর দিকে। দূর থেকে জোজো বলল, 'সন্তু গাছে উঠে পড়! গাছে উঠে পড়!'

সন্তুর চিৎকারেই কাজ হল। বোঝা গেল যে, ভাল্লুকরা মানুষের চ্যাঁচামেচি একেবারেই পছন্দ করে না। কাকাবাবুকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তারা গুটগুট করে উলটো দিকে দৌড়তে শুরু করল।

সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল একটা গুলির আওয়াজ।

সন্তু দেখতে পেল, মাটিতে পড়ার পরই কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসেছেন, তাঁরই হাতে রিভলভার।

সন্তু এবারে ছুটে এল গাড়ির কাছে।

কাকাবাবু বললেন, 'সন্তু, গাড়ি থেকে আমার ক্রাচ দুটো বার কর তো! উঃ বাপরে বাপ, কী ঝঞ্ঝাট, কী ঝঞ্ঝাট! দুটো ভাল্লুক এসে জুটে সব গন্ডগোল করে দিল! জোজো কোথায়?'

সন্তু ক্রাচ দুটো বার করতে করতে বলল, 'জোজো আছে। কাকাবাবু, তোমার কি হয়েছিল? তুমি গাড়ি থেকে লাফাওনি?'

কাকবাবু গাড়িটা ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'লাফাতে যাচ্ছিলুম, ঠিক সেই মুহূর্তে ওই লর্ড নামের ছোকরাটা আমার জামার কলার ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। তাতে আমাকে শুয়ে পড়তে হল। তার মধ্যে সে লাফিয়ে পালাল। আমি আর পারলাম না। গাড়িটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেতেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।'

'একটা ভাল্লুক তোমাকে ধরেছিল...'

'হ্যাঁ রে, তখনও আমি অজ্ঞান ছিলাম। ভাল্লুকটা আমায় তুলতেই জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমে তো বুঝতেই পারিনি ভাল্লুক, ভেবেছিলাম কোনও মানুষই বুঝি। তারপর বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারছিলাম না, প্যান্টের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করার উপায় নেই, এমনভাবে ধরেছে, উঃ, কি নখের ধার, আমার উরুতে আর পাঁজরায় নখ বসে গেছে। তুই না চ্যাঁচালে বোধ হয় আমাকে চেপ্টে পিষে মেরে ফেলত!'

যেদিকে ভাল্লুক দুটো গেছে, সেদিকে তাকিয়ে কাকাবাবু আবার বললেন, 'গুলির শব্দ শুনেছে, আর বোধহয় এদিকে ফিরে আসবে না!'

'কাকাবাবু, লর্ড কোথায় গেল?'

'যদি আহত না হয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই দৌড়ে পালিয়েছে, দ্যাখ্ তো, গাড়ির মধ্যে একটা টর্চ ছিল না?'

সন্তু গাড়ির মধ্যে টর্চ খুঁজতে লাগল। কাকাবাবু প্যান্টের পকেট চাপড়ে বললেন, 'ও, আমার কাছেই তো লর্ডের টর্চটা রেখেছিলাম। এটা আবার ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল কিনা কে জানে?'

পকেট থেকে টর্চটা বার করে কাকাবাবু সুইচ টিপলেন। সেটা জ্বলল।

সন্তু জোরে ডাকল, 'জোজো, এই জোজো । এদিকে আয়, ভয় নেই!'

একটু দূরে একটা গাছের ওপর থেকে চিঁচিঁ গলায় শোনা গেল, 'আমি নামতে পারছি না!'

টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল, একটা শাল গাছের ওপরে পাতলা ডালে গুটিসুটি মেরে বসে আছে জোজো। শাল গাছ মাটি থেকে অনেকখানি সোজা উঠে যায়, কোনও ডালপালা থাকে না। জোজো ওই গাছে উঠল কি করে? বিপদের ভয়ে মানুষ কি না পারে!

কাকাবাবু বললেন, 'এ যে দেখছি সেই ভাল্লুকের গল্পই সত্যি হয়ে গেল। এক বন্ধুকে ছেড়ে আর এক বন্ধু গাছে উঠে গেল।'

সন্তু বলল,'যেমনভাবে উঠেছিস, তেমনিভাবেই নেমে আয়।'

জোজো বলল, 'পারব না, আমার মাথা ঘুরছে। আমি পড়ে যাব!'

'তা হলে তুই থাক ওখানে বসে। আমরা কি করে তোকে নামাব?'

কাকাবাবু বললেন, 'ওহে, তুমি গাছের ডালটা ধরে ঝুলে পড়। তারপর হাত ছেড়ে দিলে আমরা নিচের থেকে তোমাকে লুফে নেব। কর, কর, তাড়াতাড়ি কর। বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না।'

মাটিতে পা দিয়েই জোজো বলল, 'আমার জুতো?'

সন্তু এক ধমক দিয়ে বলল, 'এখন আমরা তোর জুতো খুঁজব নাকি? কোথায় ফেলেছিস নিজে দ্যাখ!'

কাকাবাবু চতুর্দিকে টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। লর্ডের কোনও চিহ্ন নেই। তার কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যায়নি। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেই সে দৌড়ে পালিয়েছে।

কাকাবাবু গাড়ির ভেতরটাও ভাল করে খুঁজে দেখে বললেন, 'গাড়িটা খুব সম্ভবত বেশি ড্যামেজ হয়নি। এখনও চালান যায়, কিন্তু লর্ড চাবিটা নিয়ে গেছে। যাতে পরে আমরা আর চালাতে না পারি।'

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'ইস, চাবিটা নেই! তাহলে আমি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতুম!'

সন্তু কাকাবাবুর অলক্ষ্যে জোজোর মাথায় একটা গাঁট্টা মারল। এত কান্ডের মধ্যেও জোজোর গুল মারার অভ্যেস যায়নি। জোজো আবার গাড়ি চালান শিখল কবে?

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'নারান পুর বাংলো থেকে আমারা কতটা দূরে চলে এসেছি রে সন্তু? খুব বেশি দূর হবে না।'

সন্তু বলল, 'বড় জোর ছ-সাত মাইল।'

কাকাবাবু বললেন, 'লর্ড এ ছ-সাত মাইল হেঁটেই চলে যেতে পারবে। নিশ্চয়ই ও এদিককার রাস্তাঘাট চেনে। ওখানে আর একটা গাড়ি আছে। সেই গাড়ি নিয়ে সবাই

মিলে আমাদের ধরতে আসতে পারে। ওদের কাছে আরও কোনও অস্ত্র থাকা আশ্চর্য কিছু নয়। অংশুমান চৌধুরী এবারে সহজে ছাড়বে না।'

সন্তু বলল, 'আমাদের এই জায়গা থেকে সরে পড়তে হবে।'

কাকাবাবু জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওহে, তোমার পিসেমশাই মানুষটি খুব সুবিধের নয়!'

জোজো অমনি বলল, 'ঠিক বলেছেন। সেইজন্যই তো আমার পিসিমার সঙ্গে ওঁর ঝগড়া। আমার বাবা বলেছেন, কক্ষনো ওই পিসেমশাইয়ের বাড়িতে যাবি না!'

'তা হলে বারুইপুরে তোমার পিসেমশাইয়ের বাড়িতে সন্তুকে নিয়ে গিয়েছিলে কেন?'

'সে তো শুধু একবার দেখাবার জন্য। তখন কি আমি জানি যে , পিসেমশাই আপনাকে চেনেন আর আপনার ওপর ওঁর খুব রাগ?'

'তা অবশ্য ঠিক। একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোন। ভদ্রলোক আমাদের শুধু শুধু এই মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত টেনে এনে এই ঝঞ্ঝাট বাধালেন। এখন এ জায়গাটা থেকে দূরে চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু আবার আমরা ভাল্লুক দুটোর খপ্পরে না পড়ে যাই।'

জোজো বলল, 'আজকের রাতটা কোনও গাছে চড়ে কাটিয়ে দিলে হয় না?'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি তো ক্রাচ বগলে নিয়ে গাছে চড়তে পারব না। তোমরা দু'জনে চেষ্টা করে দেখতে পার।'

সন্তু জোজোকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই আবার ওই শালগাছটায় উঠতে পারবি?'

জোজো বলল, 'আমি হিমালয়ে গিয়ে অনেক গাছে চড়েছি। তবে সেসব অন্য গাছ। শাল গাছে চড়া ঠিক প্র্যাকটিস নেই।'

'আপাতত আমরা হিমালয়ে যাচ্ছি না, সুতরাং এখানকার গাছেও ওঠা হবে না।'

কাকাবাবু বললেন, 'গাড়িটা যেখানে আটকেছে, তার খানিকটা নিচেই একটা নদী আছে দেখলাম। ওই নদীর ধারে যাবার দরকার নেই। রাত্তিরবেলা অধিকাংশ জন্তু-জানোয়ার নদীতে জল খেতে আসে। মধ্যপ্রদেশের এই সব জঙ্গলে বাঘও আছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে যাওয়াই ভাল। ঠিক রাস্তার ওপর দিয়ে নয়।'

টর্চটা হাতে নিল সন্তু। সে মাঝে-মাঝে আলো জ্বেলে দেখে নিতে লাগল সামনেটা। অন্যরা চলল তার পেছনে পেছনে।

খানিকটা দূর যাওয়ার পরই একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। সন্তু বলল, 'ওই ওরা আসছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি কি লর্ড নারানপুরে পৌঁছে যেতে পারবে? মনে হয় না। হয়তো অন্য কোনও গাড়ি। অন্য গাড়ি হলে আমরা লিফট্ নিতে পারি।'

সন্তু বলল, 'যদি কোনও শর্টকাট থাকে, লর্ড তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়?'

কাকাবাবু বললেন, 'তা ঠিক। এসব জায়গায় সন্ধের পর গাড়ি বিশেষ চলেই না। এত রাতে আর কার গাড়ি আসবে? তবু, রাও-এর গাড়ি দেখলে তো আমরা চিনতে পারব। এখন আমাদের গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল। খানিকটা ছড়িয়ে ছড়িয়ে। অন্য গাড়ি হলে চেঁচিয়ে থামাব।'

কাকাবাবু রিভলভারটা হাতে নিলেন। সন্তু নিবিয়ে দিল টর্চ।

১৪

গাড়িটা একটু আগেই থেমে গেল। প্রথম দু-এক মিনিট গাড়ি থেকে কেউ নামল না। ইঞ্জিনের শব্দ হতে লাগল ধক্-ধক্-ধক্-ধক্ করে। জ্বলতে লাগল হেড লাইট। তারপর গাড়ি থেকে প্রথমে নামল রাও, তারপর ভীমু, তারপর লর্ড, তার মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধা। একেবারে শেষে অংশুমান চৌধুরী।

রাও-এর হাতে রাইফেল, অংশুমান চৌধুরীর হাতে তার লাঠি, ভীমুর হাতেও কী যেন একটা রয়েছে।

রাও জিজ্ঞেস করল, 'এই জায়গাটাই তো ঠিক?'

লর্ড বলল, 'হ্যাঁ, আমার মনে আছে, এ রাস্তা দিয়ে কতবার গেছি। ডান দিকে একটু খুঁজলেই নিশ্চয়ই গাড়িটা পাওয়া যাবে।'

'কেউ কি সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড হয়েছে?'

'মনে তো হয় না। কাছাকাছি থাকবে ওরা।'

অংশুমান চৌধুরী জোরে দু'বার নিঃশ্বাস টেনে বললেন, 'ভীমু এখানে একটা জন্তু-জন্তু গন্ধ পাচ্ছি।'

ভীমু বলল, 'কই না তো স্যার। কিছু তো দেখা যাচ্ছে না!'

'দেখা না গেলেও গন্ধ পাওয়া যায়। খুব বিচ্ছিরি বোঁটকা গন্ধ!'

লর্ড বলল, 'এইখানেই দুটো ভাল্লুক ছিল, সেই গন্ধ পেতে পারেন। জঙ্গলে এসে কোনও না কোনও জন্তুর গন্ধ পাবেনই! এড়াবেন কি করে?'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'সে ব্যবস্থাও আমি করে এসেছি। ভীমু আমার লাঠিটা ধর তো!'

পকেট থেকে তিনি একটা মুখোশ বার করলেন। সেটা দু'হাত দিয়ে টেনে ঠিক করতে করতে বললেন, 'এটা আমার নিজের তৈরি। জঙ্গলের জন্য স্পেশ্যাল, কোনও গন্ধ আমার নাকে আসবে না। হাওয়া ছেঁকে আসবে।'

অংশুমান চৌধুরী মুখোশটা পরে ফেললেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মুখটা বদলে গেল, নাকের জায়গাটা এমন অদ্ভুত যেন একজন মানুষের দুটো নাক। সেই মুখোশ পরে

এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এবার রাজা রায়চৌধুরীকে একটু শিক্ষা দিতে হবে। লোকটার বড্ড বাড় বেড়েছে।'

রাও বললেন, 'অংশুমানবাবু আপনি আর ভীমু এই গাড়িটার কাছে দাঁড়ান, ভাল করে নজর রাখবেন। আমরা অন্য গাড়িটার অবস্থা দেখে আসছি।'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'ঠিক আছে, চটপট ঘুরে আসুন।'

নিস্তব্ধ রাত, ওদের প্রত্যেকটি কথাই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। গাড়ির হেড লাইটটা জ্বালাই রয়েছে। মুখোশ-পরা অংশুমান চৌধুরীকে মনে হল অন্য গ্রহের মানুষ। হাওয়ায় একবার গাছের পাতার সরসর শব্দ হল। একটা বড় ঝুপসি গাছের মধ্যে কিসের যেন একটা ঝটাপটির আওয়াজ শোনা গেল।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'ভীমু, দেখে আয় তো ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে কি না?'

ভীমু বলল, 'না স্যার,মনে হচ্ছে, পাখির বাসায় সাপ ঢুকেছে।'

'কি করে তুই বুঝলি? পাখির বাসায় সাপ কেন ঢুকতে যাবে, সাপ তো মাটির গর্তে থাকে।'

'সাপ পাখির ডিম কিংবা বাচ্চা চুরি করে খেতে যায়।'

'সাপেরা চোর হয়? ঠিক আছে, তোর কথা সত্যি কিনা দেখা যাক।'

অংশুমান চৌধুরী তাঁর লাঠিটা তুলে টিপ করলেন। ঝুপসি গাছটা এখনও ঝটাপটির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অংশুমান চৌধুরীর লাঠির ডগা থেকে কয়েক ঝলক আগুনের শিখা ছুটে গেল সেই দিকে। গুলি নয় কারণ, কোনও শব্দ নেই, শুধু আগুন। সঙ্গে-সঙ্গে সেই গাছের খানিকটা অংশ ঝলসে গেল, আর চিঁচিঁ করে কয়েকটা বাচ্চা পাখির কান্না আর ক্রোয়াঁ ক্রোয়াঁ শব্দে একটা বড় পাখির আর্তনাদ। তারপর বাসা সমেত পাখিগুলো খসে পড়ল মাটিতে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'যা ভীমু, দেখে আয় ওর মধ্যে সাপ আছে নাকি?'

প্রায় দু'শো গজ দূরে, একটা মোটা শিমূলগাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু সব দেখছেন। আস্তে-আস্তে সন্তু আর জোজোও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল।

কাকাবাবু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের নিঃশব্দ থাকতে বললেন। তারপর আর একটা হাতের ইঙ্গিত করে ওদের বোঝালেন পিছিয়ে যেতে। তিনি নিজেও এক-পা এক-পা করে পেছতে লাগলেন।

বড় রাস্তা ছেড়ে তাঁরা চলে এলেন অনেকখানি বনের গভীরে। কাকাবাবু রিভলভার হাতে নিয়ে মাঝে-মাঝেই ঘুরে দেখছেন চারদিক। হঠাৎ কোনও হিংস্র জানোয়ারের সামনে পড়ে যাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়।

একটা ফাঁকা জায়গা দেখেও তিনি থামলেন না। সন্তু আর জোজোকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'ওরা আমাদের খুঁজবে। প্রথমে রাস্তার ওই দিকটায়, যে দিকে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সেই দিকেই দেখবে। তারপর এদিকে আসবে। ওদের কাছে

ভাল অস্ত্রশস্ত্র আছে। সম্ভবত রাও-এর গাড়ির মধ্যে কিংবা নারানপুরের ওই বাড়িতে এসব জমা করা ছিল। ওদের সামনাসামনি পড়ে গেলে আমাদের ধরা দিতেই হবে, বুঝলি? সেইজন্য আমাদের আরও অনেকটা ভেতরে চলে যাওয়া দরকার।

এবারে কাকাবাবু টর্চটা মাটির দিকে মুখ করে জ্বালালেন। গোল করে খানিকটা জায়গা দেখে নিয়ে আবার বললেন, 'বড়-বড় জন্তু-জানোয়ারকে বেশি ভয় নেই, তারা চট করে মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু দেখিস, হঠাৎ কোনও সাপের গায়ে পা না পড়ে। আমি আলো দেখাব তোরা আমার পেছন-পেছন আয়।'

আরও প্রায় এক ঘন্টা চলার পর কাকাবাবু থামলেন। বড়-বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, 'ওঃ, হাঁপিয়ে গেছি। গাড়ি ছেড়ে ওরা এতটা দূরে আসবে না মনে হয়। এবারে বিশ্রাম নেওয়া যাক।'

জঙ্গলের মাঝখানে মাঝে মাঝে হঠাৎ-হঠাৎ খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা যায়। এই জায়গাটাও সেরকম ফাঁকা, এমনকি সমান্য ঘাসও নেই। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো কয়েকটা পাথর। এক পাশে একটা গাছ ঠিক মাঝখান থেকে ভাঙা, দেখলে মনে হয় হাতিতে ভেঙেছে। আকাশ মেঘলা। চাঁদ বা একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না।

কাকাবাবু সেই ফাঁকা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে বসে পড়ে বললেন, 'এখানেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক। তোরা দু'জনে শুয়ে পড়, ঘুমিয়ে নে, আমি পাহারা দিচ্ছি।'

সন্তু বলল, 'ঘুমোবার দরকার নেই। আমরাও জেগে থাকব।'

জোজো বলল, 'হ্যাঁ আমরাও জেগে থাকব।'

কাকাবাবু বললেন, 'সবাই মিলে জাগার তো কোনও মানে হয় না। না ঘুমিয়ে পারা যাবে না। কাল অনেকখানি হাঁটতে হবে। আমাকেও ঘুমিয়ে নিতে হবে খানিকটা। রাত্তিরটা তোরা ঘুমো, ভোর হবার পর আমিও ঘন্টা দু-এক ঘুমিয়ে নেব।'

সন্তু আর জোজো তবু আপত্তি করতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, তোরা শুয়ে থাক। যদি ঘুম আসে তো ঘুমবি!'

একটু পরেই জোজোর নাক দিয়ে পিঁচ-পঁচ শব্দ হতে লাগল। সন্তু তখনও ঘুমোয়নি। হঠাৎ বহু দূরে একটা যেন রাইফেলের গুলির শব্দ হল। সন্তু তখনই উঠে বসল ধড়মড়িয়ে। কাকাবাবু বললেন, 'ওরা কাকে গুলি করছে?'

সন্তু বলল, 'বোধ হয় সেই,ভাল্লুক!'

'হ্যাঁ, হতে পারে। ভাল্লুক খুব কৌতূহলী প্রাণী, সহজে ওই জায়গা ছেড়ে যাবে না। ওখানেই ঘুর ঘুর করবে।'

'কাকাবাবু, এদিকে কি যেন ছুটে আসছে।'

কাকাবাবু রিভলভার তুলে ডানদিকে ফিরলেন। জঙ্গলের শুকনো পাতার খরখর শব্দ হচ্ছে। কিছু যেন ছুটে আসছে এদিকেই।

কাকাবাবু কান খাড়া করে আওয়াজটা শুনে বললেন, 'মানুষ নয়, বুনো শুয়োর হতে পারে।'

তারপরই তিনি দেখতে পেলেন বনের মধ্যে পাশাপাশি দু'জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। অন্ধকারে যে-কোনও জন্তুর চোখই আগুনের মতন জ্বলে, শিকারিরা ওই চোখের রং দেখে বুঝতে পারে কোনটা কী প্রাণী।

কাকাবাবু বললেন, 'ও দুটো খরগোশ! দ্যাখ, চোখ কতটা নিচুতে!'

সত্যিই দুটো খরগোশ জঙ্গল ছেড়ে-চলে এল ফাঁকা জায়গায়। এখানে যে কয়েকজন মানুষ রয়েছে সে জন্য তারা ভ্রূক্ষেপও করল না, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল অন্য দিকে।

তারপর আর কোনও শব্দ নেই। আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সন্তু শুয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম এসে গেল তার চোখে।

একসময় একটা চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল সন্তুর। চোখ মেলেই দেখল, ভোরের আলো ফুটে গেছে! পাখি ডাকছে। আর পাগলের মতো জোজো চিৎকার করছে, 'মরে গেলুম, মরে গেলুম!'

ঘুমের ঘোরে জোজো গড়িয়ে গিয়েছিল খানিকটা দূরে। কাকাবাবু আর সন্তু সেখানে এসে দেখল কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করছে জোজো, দু'হাতে মাটি চাপড়াতে চাপড়াতে বলছে, 'বাঁচাও, বাঁচাও, মরে যাচ্ছি, মরে গেলুম।'

সন্তু ভাবছে জোজো ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখছে!

কাকাবাবু দু'হাতে জোজোকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে খানিকটা সরে এসে আবার মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইস, এ যে সাঙঘাতিক ব্যাপার। জোজো, চোখ বুজে থাক, চোখ খুল না। ভয় নেই!

সন্তু এবার দেখতে পেল জোজোর সারা গায়ে অসংখ্য লাল পিঁপড়ে। তার মুখখানা এত পিঁপড়েতে ছেয়ে গেছে যে চেনাই যাচ্ছে না। যেন কোটি কোটি পিঁপড়ে এসে আক্রমণ করেছে জোজোকে।

কাকাবাবু জোজোর জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, 'সন্তু, তুই ওর মুখ থেকে পিঁপড়ে ছাড়া, মাটি থেকে ধুলো নিয়ে ঘসে দে, চোখ দুটো সাবধান।'

জামা-প্যান্টের মধ্যে দিয়েও পিঁপড়ে ঢুকে গেছে, তাই কাকাবাবু চটপট ওর সব পোশাক খুলে দিলেন। যন্ত্রণায় জোজো মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

সন্তু আর কাকাবাবু তাকে জোর করে সেখান থেকে তুলে আবার আর-একটা জায়গায় শোওয়ালেন। সেখানে কয়েকটা ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা ঝড়ে পড়ে আছে। সেই শুকনো পাতা ঘষা হতে লাগল তার গায়ে।

এক সময় সব পিঁপড়ে ছাড়ান হল বটে, কিন্তু ততক্ষণে জোজোর সাড়া শরীর ফুলে গেছে। মুখখানা পাকা বাতাবি লেবুর মতন। চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেছে তার। সে ফ্যাসফ্যাস করে নির্জীবভাবে বলতে লাগল, 'জল, জল!'

পিঁপড়ে ছাড়াতে গিয়ে কাকাবাবু আর সন্তুরও কম পরিশ্রম হয়নি। তাঁদেরও জলতেষ্টা পেয়ে গেছে। এখন জল কোথায় পাওয়া যায়!

কাকাবাবু বললেন, 'জোজোর দোষ নেই, গড়াতে গড়াতে খানিকটা দূরে চলে গেছে তো! ওখানে একটা উঁচু মতন ঢিবি , ওটা লাল পিঁপড়ের বাসা। ঘুমের ঘোরে জোজো ওই ঢিবিটাকে বালিশ বলে জড়িয়ে ধরেছে। ঢিবিটা ভেঙে যেতেই পিল পিল করে পিঁপড়েরা বেরিয়ে এসে ওকে আক্রমণ করেছে।'

সন্তু বলল, 'ওর গাঢ় ঘুম। আমার গায়ে প্রথমে একটা দুটো পিঁপড়ে উঠলেই জেগে যেতুম।'

কাকাবাবু বললেন, 'আমাকেও এর মধ্যে কয়েকটা পিঁপড়ে কামড়ে দিয়েছে, ওইটুকু প্রাণীর কি বিষ, আমার হাত জ্বালা করছে।'

সন্তু জোজোর সামনে মুখ ঝুঁকিয়ে বলল, 'জোজো, জোজো, এখন উঠতে পারবি?'

জোজো ফিসফিস করে বলল, 'আমি চোখ মেলতে পারছি না। আমি কি মরে গেছি?'

জোজোর চোখের পাতা দুটো ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।

কাকাবাবু জোজোর প্যান্ট আর শার্ট ঝেড়েঝুড়ে দেখে নিলেন তার মধ্যে আর পিঁপড়ে আছে কিনা। তারপর সন্তুকে বললেন, এগুলো পরিয়ে দে। ও যদি হাঁটতে না পারে, ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর নীলমূর্তি খুঁজতে যাওয়া হবে না। এখন ছেলেটার চিকিৎসা করানই সবচেয়ে আগে দরকার।'

সন্তু জোজোর পোশাক পরিয়ে দিল। তারপর বলল, 'জোজো, জোজো, আমি তোর হাত ধরছি একটু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কর।'

জোজো বলল, 'পারছি না। গলা শুকিয়ে গেছে। আমি মরে যাচ্ছি রে, সন্তু!'

এরই মধ্যে জোজোর গায়ে সাঙ্ঘাতিক জ্বর এসে গেছে। সে থরথর করে কাঁপছে।

সন্তু বলল, 'আমি ওকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারি। কাকাবাবু তুমি একটু ধর ..'

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো রেখে, জোজোকে তুলে দিতে গেলেন সন্তুর কাঁধে। হঠাৎ একটা কুকুরের ডাক শুনে দু'জনেই চমকে তাকালেন সামনের দিকে।

ফাঁকা জায়গাটার একধারে, জঙ্গলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তিন জন মানুষ, তাদের খালি গা, পরনে নেংটি, হাতে তীর-ধনুক, আর প্রত্যেকের পাশেই একটা করে কুকুর।

১৫

গাড়ি থেকে স্যান্ডউইচ-এর প্যাকেট আর চা-ভর্তি ফ্লাস্ক নিয়ে এল ভীমু। নদীর ধারে বালির ওপর একটা ম্যাপ সামনে বিছিয়ে বসে আছেন অংশুমান চৌধুরী। লর্ড আর রাও তার পাশে বসে দেখছে। ভীমু কাগজের গেলাসে চা ঢেলে একটা করে দিল সবাইকে।

সবে মাত্র ভোর হয়েছে। শোনা যাচ্ছে নানারকম পাখির ডাক। হাওয়ায় বেশ শীত-শীত ভাব। নদীর ওপারের জঙ্গলে দেখা যাচ্ছে নতুন সূর্যের রেশমি-লাল ছটা।

অংশুমান চৌধুরীর মুখে সেই দুটো নাকওয়ালা মুখোশ। দুই কানে লাগান একটা ওয়াকম্যানের মতন যন্ত্র, যাতে বাইরের যে-কোনও আওয়াজের মধ্য থেকে ছেঁকে শুধু মানুষের গলার আওয়াজ যায়। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত গামবুটের মতো জুতো।

চা ও স্যান্ডউইচ খাবার পর অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'এবার দেখা যাক, রাজা রায়চৌধুরী আর ছেলে দুটো কোন দিকে যেতে পারে। এখানে জঙ্গল বেশি ঘন নয়, দিনের বেলা এখানে ওরা বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না।'

লর্ড বলল, 'আমার মনে হয়, রাস্তার অন্য কোন গাড়িতে লিফ্‌ট নিয়ে ওরা এতক্ষণ কোন্ডাগাঁওতে ফিরে গেছে। রাজা রায়চৌধুরী কলকাতায় ফিরবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিল।'

রাও বলল, 'রাজা রায়চৌধুরীকে আর খোঁজাখুঁজি করে লাভ কি? আমাদের নীলমূর্তিটা উদ্ধার করা নিয়ে কথা। আপনিই তো সেটা পারবেন!'

রাও-এর দিকে ফিরে কটমট করে তাকিয়ে অংশুমান বললেন, 'রাজা রায়চৌধুরীকে আমি আগে ন্যাড়া করে তবে ছাড়ব!'

কয়েকবার জোরে নিঃশ্বাস নেবার পর তিনি একটু শান্ত হলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'রাজা রায়চৌধুরীকে তোমরা চেন না, অতি ধুরন্ধর লোক। একবার সে যখন ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে, তখন সহজে হাল ছাড়বে না! রাজা রায়চৌধুরী এখন দুটো ব্যাপার করতে পরে। হয় সে জগদলপুরে গিয়ে পুলিশকে সব কথা জানাবে, তারপর পুলিশবাহিনী নিয়ে এসে আমাদের আটকাবে। কিংবা সে নিজেই অবুঝমাড়ের দিকে চলে গিয়ে আমাদের আগেই নীলমূর্তিটা হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করবে!'

রাও জিজ্ঞেস করল, 'উনি আমাদের আগে ওখানে কি করে পৌঁছবেন? অনেকটা দূর তো!'

অংশুমান ম্যাপে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এই দ্যাখো নারানপুর, এই দিকে জগদলপুর, আর এই এখানে অবুঝমাড়, এখান থেকেও আরও চোদ্দ-পনের মাইল যেতে হবে পাহাড়ি রাস্তায়।'

লর্ড বলল, 'রাজা রায়চৌধুরী খোঁড়া লোক, পনের মাইল পাহাড়ে উঠতে তার সারাদিন লেগে যাবে। যদি শেষ পর্যন্ত উঠতে পারে।'

অংশুমান বললেন, 'আমি ওকে কোনও ব্যাপারে বিশ্বাস করি না। আমাদের এখন উচিত, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবুঝমাড় পাহাড়ের কাছে পৌঁছে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা!'

ভীমু বলল, 'কারা যেন আসছে!'

সবাই মুখ তুলে তাকাল। নদীর ওপারের জঙ্গলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন লোক। তাদের হাতে একটা করে টাঙ্গি। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে-চলা রাস্তা আছে। নদীতে জল কম, অনায়াসে হেঁটে পার হওয়া যায়।

লর্ড বলল, 'ওরা নিরীহ সাধারণ লোক, জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসেছে।'

রাও বলল, 'ওরা নদী পেরিয়ে এদিকেই আসবে মনে হচ্ছে।'

লর্ড বলল, 'আসুক না, ওরা আমাদের দেখলেও কিছু বলবে না। এখানকার লোকেরা খুব কম কথা বলে।'

অংশুমান চৌধুরীর মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'এবার তোমাদের একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখাচ্ছি। ভীমু, আমার হ্যান্ড ব্যাগটা নিয়ে আয় তো গাড়ি থেকে!'

ভীমু দৌড়ে গাড়ি থেকে একটা বেশ মোটাসোটা ব্যাগ নিয়ে এল। অংশুমান সেটা খুলে প্রথমে একটা বেশ বড় সেন্টের শিশির মতন শিশি বার করলেন। তাতে স্প্রে করার ব্যবস্থা আছে। তারপর নিজে যেমন মুখোশ পরে আছেন, সে রকম আরও কয়েকটা মুখোশ বার করে অন্যদের বললেন, 'এগুলো তোমরা মুখে লাগিয়ে নাও!'

লর্ড প্রতিবাদ করে বলল, 'আমরা মুখোশ পরব কেন? এগুলো বিচ্ছিরি দেখতে!'

অংশুমান তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'যা বলছি কর! সময় নষ্ট কোর না।'

উলটো দিকের লোকগুলো বোধহয় অনেকটা হেঁটে এসেছে। তাই তক্ষুনি নদী পার না হয়ে কয়েকজন বসে জিরোতে লাগল। কয়েকজন নদীর জলে চোখ-মুখ ধুতে শুরু করল। একজন একটা গাছের নিচু ডালে উঠে দোল খেতে লাগল বাচ্চাদের মতন।

অন্যদের মুখোশ লাগানর পর অংশুমান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই বার দ্যাখ আমার খেলা।'

তিনি এগিয়ে গিয়ে নদীর একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওপারের লোকগুলো তাঁকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। অংশুমান হাতের শিশিটা উঁচু করে তুলে ফোঁসফাঁস করে স্প্রে করতে লাগলেন তাদের দিকে।

কয়েকবার মাত্র এই রকম করে তিনি ফিরে এসে আগের জায়গায় বসে পড়ে বললেন,'এইবার দ্যাখ মজাটা! কেউ কথা বোল না!'

ওপারের লোকগুলো মাথার ওপর হাত তুলে হাই তুলতে লাগল। যারা নদীর জলে নেমেছিল,তারা ওপারে উঠে গিয়ে বসে পড়ল। অন্যরাও শুয়ে পড়ল একে-একে। যে লোকটা গাছের ডালে দোল খাচ্ছিল, সে ধপাস করে পড়ে গেল নিচে। সামান্য উঁচু থেকে পড়েছে। তার তেমন লাগবার কথা নয়। কিন্তু সে আর উঠে দাঁড়াল না, যেমনভাবে পড়েছিল, সেইরকমভাবেই স্থির হয়ে রইল।

শিউরে উঠে রাও বললেন, 'ওরা মরে গেল?'

অংশুমান কোনও উত্তর না দিয়ে মুচকি মুচকি হেসে মাথা নাড়তে লাগল।

রাও আবার উত্তেজিত ভাবে বলল, 'আপনি ওদের মেরে ফেললেন? ওরা অতি নিরীহ মানুষ!'

অংশুমান বললেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ? আমি কি খুনি? অতগুলো লোককে এমনি এমনি মেরে ফেলব কেন? ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিলুম!'

রাও তবু অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আপনি এতদূর থেকে কি একটা স্প্রে করলেন,আর অমনি লোকগুলো সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল; এরকম কোনও ওষুধ আছে নাকি? অসম্ভব!'

'মিঃ রাও, বিজ্ঞানের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। এটা আমার নিজের আবিষ্কার। এই ওষুধ স্প্রে করে আমি একটা গোটা গ্রামের লোককে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি!'

'মাফ করবেন মিঃ চৌধুরী, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনাকে আমি আগেই বলেছি, আমরা কোনও খুন-জখমের মধ্যে যেতে চাই না।'

'তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তুমি নদীর ওপারে গিয়ে ওদের দেখে এস।'

'লর্ড, আমার সঙ্গে যাবে? একবার দেখে আসতে চাই।'

ওরা দু'জনে পা থেকে জুতো খুলে নদীতে নামল। নদীর মাঝখানেও হাঁটুর বেশি জল নয়। তবে স্রোতের বেশ শব্দ আছে।

রাও ওদিকের মানুষগুলোর নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখল ওদের নিঃশ্বাস পড়ছে স্বাভাবিকভাবে। হাতের নাড়ি টিপে দেখল, তাও স্বাভাবিক। সবাই সত্যিই ঘুমন্ত। যে লোকটা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল, সেও নাক ডাকছে।

রাও অস্ফুট ভাবে বলল, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য!'

লর্ড বলল, 'ওই অংশুমান চৌধুরী মোটেই সাধারণ নয়। ওর দিকে তাকালে আমারই মাঝে মাঝে ভয় করে।'

রাও বলল, 'দ্যাখ, দ্যাখ, দুটো পাখি পড়ে আছে। এ-দুটোও কি ঘুমিয়ে আছে না মরে গেছে?'

লর্ড বলল, 'পাখি দুটোকে তুলে নিই, পরে মাংস রেঁধে খাওয়া যাবে!'

রাও বলল, 'না, না, থাক। শুধু শুধু পাখি মারা আমি পছন্দ করি না!'

ওরা আবার ফিরে এল নদীর এপারে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'দেখলে তো? ওরা এখন ঠিক পাঁচ ঘন্টা ঘুমোবে। একেবারে গাঢ় ঘুম। যখন উঠবে, তখন আবার পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কাজে বেশি উৎসাহ পাবে। এই ঘুমের ওষুধে কোন ক্ষতি হয় না!'

রাও বলল, 'আপনি এই ওষুধ বাজারে বিক্রি করলে তো বড় লোক হয়ে যাবেন! এরকম ইনস্ট্যান্ট ঘুমের ওষুধের কথা আমি কখনও শুনিইনি!'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'আমার কোনও আবিষ্কার আমি বিক্রি করি না। আমার টাকাপয়সার কোনও অভাব নেই! এবারে তাহলে রওনা হওয়া যাক!' লর্ড বলল দুটো গাড়িই নিয়ে যাওয়া হবে?'

রাও বলল, না, শুধু শুধু দুটো গাড়ি নিয়ে গিয়ে লাভ কী ! একটা এখানে রেখে গেলেই তো হয়।'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'না, এখানে ফেলে রাখা চলবে না। রাজা রায়চৌধুরী যদি গাড়িটা ব্যবহার করতে চায়, সে রিস্‌ক আমরা নিতে পারি না। লর্ড তুমি ওই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চল। ওটা আমরা নারানপুরে রেখে যাব। তুমি আগে এগিয়ে পড়। আমরা রাও-এর গাড়িতে যাচ্ছি, তোমাকে তুলে নেব। কিছু খাবার-দাবার জোগার করে নিতে হবে।'

রাত্তিরেই লর্ড তার গাড়িটাকে ঠিকঠাক করে নিয়েছিল। সবাই মিলে চলে এল সেই গাড়িটার দিকে। অংশুমান চৌধুরী চোখে একটা কালো চশমা পরে নিয়ে বললেন, 'কাল যে ভাল্লুকটাকে গুলি করা হয়েছিল, সেটা কি মরেছে?

রাও বলল, 'না, আমি শুধু ওকে ভয় দেখাবার জন্য গুলি চালিয়েছিলাম।'

'ওটা আবার কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে না তো?'

'দিনের বেলা এদিকে আসবে না বোধহয়।'

'রাও তোমার গাড়িতে আমরা এদিক-ওদিক আর একটু খুঁজে দেখব। যদি রাজা রায়চৌধুরী আর ছেলে দুটিকে পাওয়া যায়। আধ মাইলের মধ্যে ওদের দেখা গেলেই আমাকে বলবে।'

দুটি গাড়িই স্টার্ট দিয়ে চলে এল বড় রাস্তায়। তারপর রাওয়ের গাড়িটা ঢুকে পড়ল রাস্তার উলটো দিকের জঙ্গলে।

১৬

তিনটে কুকুর এক সঙ্গে হিংস্রভাবে ডেকে উঠল। তীর-ধনুকওয়ালা মানুষ তিনজন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সন্তুদের দিকে। কাকাবাবু জোজোকে ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সন্তুকে বললেন, 'ভয় পাসনি রে, এরা নিরীহ, শান্ত লোক। এরা আমাদের ক্ষতি করবে না।'

তারপর ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে হিন্দিতে বললেন, 'আমাদের ওই ছেলেটিকে বিষ পিঁপড়ে কামড়েছে, তোমরা এর কিছু ওষুধ জান?'

একজন লোক এগিয়ে গেল জোজোর দিকে। আর একজন কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'ওকে কি করে পিঁপড়ে কামড়াল? তোমরা এখানে শুয়েছিলে?'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ,আমরা সারারাত এখানেই শুয়েছিলাম।'

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, 'ও।'

কেন যে এই তিনজন অচেনা মানুষ এই জঙ্গলের মধ্যে সারারাত শুয়েছিল, তা আর জানতে চাইল না। যেন এটা একটা খুব সাধারণ ঘটনা।

কুকুর তিনটে সন্তু আর কাকাবাবুর গায়ের কাছে এসে লাফালাফি করছে। সন্তু কুকুরকে ভয় পায় না, তার নিজেরই একটা কুকুর আছে। কিন্তু এই কুকুরগুলোর কেমন যেন হিংস্র আর জংলি-জংলি ভাব।

কাকাবাবুই বললেন, 'তোমাদের কুকুর সামলাও তো।'

যে-লোকটি জোজোকে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েছিল, জোজো তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে।

সন্তু বলল, 'জোজো, জোজো, একটু চুপ করে থাক।'

সেই লোকটি মুখ ফিরিয়ে আগে নিজের সঙ্গীদের কি যেন বলল। তাদের সম্মতি পেয়ে কাকাবাবুকে বলল, 'এ ছেলেটাকে আমাদের গ্রামে নিয়ে চলুন। আমরা সারিয়ে দেব।'

কাকাবাবু বললেন, 'তাই চল রে সন্তু!'

জোজো তবু ভয় পাচ্ছে। এখন সে আর সন্তুর কাঁধে চড়তে রাজি হল না, নিজেই উঠে দাঁড়াল। সে যে খুবই কষ্ট পাচ্ছে তা বোঝা যায়। তার চোখ দুটো প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। সন্তু ধরে ধরে নিয়ে চলল তাকে।

এই লোক তিনটি বড্ড তাড়াতাড়ি হাঁটে। এদের সঙ্গে তাল মেলান সন্তুদের পক্ষে মুশকিল। কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'একটা ব্যাপার কি জানিস, এরা অনায়াসে আট-দশ মাইল হেঁটে যায়, এদের গ্রামটা কত দূরে কে জানে!'

একটা টিলার কাছে এসে সেই তিনজনের মধ্যে দু'জন খুব বিনীতভাবে কাকাবাবুকে বলল যে, 'তাদের একটু অন্য দিকে যেতে হবে। কাজ আছে। বাকি লোকটি কাকাবাবুদের গ্রামে নিয়ে যাবে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের গ্রামটা কত দূরে?'

তৃতীয় লোকটি হাত তুলে এমনভাবে দেখাল, যেন মনে হল খুবই কাছে। এতদূর আসার পর আর ফেরা যায় না। কাছে হোক বা দূরে হোক, যেতেই হবে। কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, চল, তোমার নাম কি ভাই!'

লোকটি বলল, 'লছমন।'

'লছমন, তোমরা কি ছত্রিশগড়ী না মুরিয়া?'

'মুরিয়া। আমাদের গ্রামের নাম ছোটা বাংলা।'

বাংলা কথাটা শুনে সন্তু অবাক হয়ে তাকাল কাকাবাবুদের দিকে। কাকাবাবু বললেন, 'বাংলা হচ্ছে আসলে বাংলো। এদের গ্রামের কাছাকাছি কোথাও বোধহয় সরকারি বাংলো-টাংলো আছে।'

আরও প্রায় আধ ঘন্টা হাঁটার পর ওরা পৌঁছল একটা গ্রামে। ছোট-ছোট গোল ঘর, কিন্তু মানুষজন বিশেষ দেখা গেল না। দু'চারজন শুধু অতি বুড়োবুড়ি এক-একটা বাড়ির সামনে বসে আছে। অন্য সবাই নিশ্চয়ই কাজ করতে গেছে মাঠে কিংবা জঙ্গলে।

লছ্‌মন ওদের একটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বড় বাড়িতে নিয়ে এস বলল, 'এটা ঘোটুল, ঘোটুল! এখানে তোমরা বস!'

কাকাবাবু বললেন, 'ও ঘোটুল! বুঝলি সন্তু। এখানে গ্রামের অল্পবয়েসী ছেলে-মেয়েরা রাত্রে এসে থাকে। এদের সমাজের ছেলেমেয়েরা বাব-মা'র সঙ্গে থাকে না, বাচ্চা বয়েস থেকেই আলাদা থাকতে শেখে।'

ওদের বসিয়ে রেখে লোকটি চলে গেল। খানিক বাদেই সে দু'জন থুরথুরে বুড়ো মানুষকে নিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে একটা মাটির হাঁড়ি আর এক গাদা ঘাস পাতা। বুড়ো দু'জন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল জোজোকে। তারপর সেই ঘাসপাতার মধ্য থেকে বেছে-বেছে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মাটির হাঁড়ির ভেতরের কি একটা কালো রঙের তরল জিনিসের সঙ্গে মেশাতে লাগল।

আন্দামানের একটা দ্বীপে জারোয়াদের একটা গ্রামের ঘরবাড়ি কিংবা মানুষজনের সঙ্গে এই গ্রামটার চেহারা কিংবা মানুষজনের বিশেষ কিছু তফাত নেই। কিন্তু জারোয়ারা হিংস্র, তারা পোশাক পরে না, তাদের দেখলেই ভয় করে। আর এই মুরিয়ারা কিন্তু খুবই ভদ্র। বুড়ো দুটিও এসেই আগে কাকাবাবুকে হাতজোর করে প্রণাম করেছিল।

কাকাবাবু বললেন, 'এদের ওষুধে অনেক সময় ম্যাজিকের মতন কাজ হয়। আমার আগের অভিজ্ঞতা আছে। সন্তু, তুই দ্যাখ, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।'

পাশেই একটা চাটাই পাতা আছে। কাকাবাবু তার ওপর শুয়ে পড়লেন। একটু পরেই তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে বোঝা গেল যে, ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

সন্তু হিন্দি খুব কম জানে, এদের হিন্দিও অন্যরকম। তবু সে আকারে ইঙ্গিতে এদের সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে লাগল। কোনও অসুবিধে হল না। জোজোর সারা গায়ে কাদার মতন ওষুধ লেপে দিয়ে একটা তালপাতার পাখা এনে একজন জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। জোজোও ঘুমিয়ে পড়ল সেই হাওয়া খেয়ে। সন্তু জেগে বসে রইল একা।

দুপুরবেলা একদঙ্গল লোক দেখতে এল ওদের। লছ্‌মন ভাত আর কলাইর ডালও নিয়ে এসেছে। কাকাবাবুকে ডেকে তুলতে হল তখন।

কাকাবাবু উঠেই চোখ কচলাতে কচলাতে বললেন, 'জোজো কোথায়?

জোজোকে দেখে তিনি চিনতেই পারলেন না। চেনা সম্ভবও নয়। জোজোর গায়ে মাখানো পুরু কাদার মতন ওষুধ এখন শুকিয়ে গিয়ে মাটি মাটি রং হয়েছে। জোজোকে এখন দেখাচ্ছে কুমোরটুলির রং-না-করা একটা মাটির মূর্তির মতন।

লছমন জোজোর পাশে বসে পড়ে সেই ওষুধ খুঁটে খুঁটে তুলতে লাগল। খানিকবাদে সব উঠেগেলে জোজোর হাতধরে বাইরে নিয়ে গিয়ে দু'হাঁড়ি জল ঢেলে দিল তার মাথায়। জোজো একটুও আপত্তি করছে না।

ভিজে গায়ে ফিরে এসে সে বলল, 'এখন বেশ ভাল লাগছে রে, সন্তু। একটুও ব্যথা নেই।'

কাকাবাবু বললেন, 'দেখলি এদের আশ্চর্য চিকিৎসা।'

এরপর খেতে বসতে হল ওদের। গরম গরম লাল রঙের ভাত আর কলাইয়ের ডাল অপূর্ব লাগল। জোজো আর সন্তু দু'জনেই ভাত খেয়ে নিল অনেকখানি। কাকাবাবু বললেন, 'একটা করে আলুসেদ্ধ থাকলে আরও ভাল লাগত, কী বল? তবে রাত্তিরে যদি থাকিস, তা হলে এরা শুয়োরের মাংস খাওয়াতে পারে। এরা রাত্তিরেই ভাল করে খায়।'

খাওয়া হয়ে গেলে কাকাবাবু তিন-চারজন বয়স্ক লোককে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে নানারকম খোঁজ খবর নিতে লাগলেন।

তারপর তিনি মাটিতে উবু হয়ে বসে একটা কাঠি দিয়ে ম্যাপ আঁকতে লাগলেন মাটির ওপরে।

ম্যাপের চর্চা করা কাকাবাবুর শখ। তিনি চোখ বুজে বঙ্গদেশের ম্যাপ এঁকে দিতে পারেন। কিন্তু এখানকার লোকেরা ম্যাপ বোঝে না। কাকাবাবু যে জায়গাটার সন্ধান জানতে চাইছেন, সেটা এরা বুঝতে পারছে না কিছুতেই।

কাকাবাবু এবার একটা ছোট মন্দির আঁকলেন, তারপর তার সামনে একটা লম্বামতন মূর্তি। কাকাবাবু সেটার ওপর আঙুল দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মন্দিরটা কোথায় বলতে পার?'

তিনজন বৃদ্ধ মাথা নেড়ে 'হ হ হ হ' করতে লাগল। কিন্তু কোথায় যে মন্দিরটা সেটা কিছুই বলতে পারে না।

বাইরে যে কয়েকজন লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এসে কাকাবাবুর আঁকা ছবিটা দেখল মন দিয়ে। তারপর সে ছবিটার সামনে শুয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, 'আমি জানি। আমি দেখিয়ে দিতে পারি।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কত দূরে? কতক্ষণ লাগবে যেতে?'

লোকটি বলল, 'এই সামনে একখানা পাহাড়,তার পরের পাহাড়ে।'

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে জোজোকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখন হাঁটতে পারবে? আমাদের মনে হয়, বেশি সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

জোজো বলল, 'হ্যাঁ, হাঁটতে পারব।'

'তা হলে. চল, বেরিয়ে পড়া যাক!'

তিনজন বুড়ো তখন কাকাবাবুর হাত চেপে ধরল। তারা কাকাবাবুকে ছাড়তে চায় না। কাকাবাবুকে তারা রাত্তিরটা থেকে যেতে বলছে।

কাকাবাবু কিছু বলতে যেতেই তারা 'না, না, না, না' বলে মাথা নাড়ছে। কাকাবাবু অতি কষ্টে তাদের বোঝালেন যে, এখন একটা বিশেষ কাজে তাঁকে চলে যেতেই হবে, ফেরার সময় তিনি এখানে আসবার চেষ্টা করবেন।

তারপর তিনি লছমনকে একপাশে ডেকে দু'খানা কুড়ি টাকার নোট তার হাতে দিতে গেলেন। লছমন সে টাকা কিছুতেই নেবে না। খুব জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

শেষপর্যন্ত কাকাবাবু লজ্জিত হয়ে টাকাটা পকেটে পুরে ফেললেন।

সন্তুদের তিনি বললেন, 'এরা কিরকম ভদ্র দেখেছিস? আমাদের যত্ন করে খাওয়াল, জোজোর চিকিৎসা করল ... এরা গরিব হতে পারে কিন্তু খুব আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, কিছুতেই পয়সা নিতে চায় না। আবার রাত্তিরেথেকে যেতে বলছে। আমাদের উচিত ছিল, এদের কিছু উপহার দেওয়া, কিন্তু কিছুই তো নেই আমাদের কাছে।'

যে-লোকটি মন্দিরের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তার নাম শিবু। সে লছমনকেও সঙ্গে নিয়ে নিল। আবার শুরু হল হাঁটা।

সামান্য একটা জঙ্গল পার হবার পরেই উঠতে হবে পাহাড়ে। ক্রাচ নিয়ে পাহাড়ে উঠতে কাকাবাবুর খুবই কষ্ট হয়। তবু তিনি দাঁতে দাঁত চেপে উঠতে লাগলেন। ঘাম গড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর কপাল দিয়ে। মাথার ওপর গনগন করছে দুপুরের সূর্য। জঙ্গলের মধ্যে তবু ছায়া ছায়া ভাব ছিল, এই পাহাড়টা একেবারে ন্যাড়া।

সেই পাহাড়টি পেরিয়ে যাবার পর একটা ছোট নদী পার হতে হল। সে নদীতে এখন জল প্রায় নেই, বালিই বেশি। সামনেই একটা ছোট পাহাড়, সেটা ছোট-ছোট খাদে ভরা। এখানে ঢেউয়ের মতন একটার পর একটা পাহাড়।

তলা থেকে দেখা যায়, সেই পাহাড়ের মাঝখানে একটা মন্দিরের চূড়া। শিবু হাত দেখিয়ে বলল, 'ওই যে!'

কাকাবাবু বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এত কাছে যে মন্দিরটা হবে, তা তিনি আশাই করেননি। আগের গ্রামের বৃদ্ধরা তা হলে বলতে পারল না কেন? তারা কি ছবিটা দেখে বুঝতে পারেনি।

নতুন উৎসাহ নিয়ে কাকাবাবু এবারে উঠতে গেলেন পাহাড়টায়। মন্দিটা দেখে সন্তুর ইচ্ছে করছে দৌড়ে আগে আগে উঠে যেতে। কিন্তু কাকাবাবু তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন না, জোজো, কোনও রকমে তার কাঁধ ধরে ধরে হাঁটছে। বেচারি

জোজো পিঁপড়ের কামড় খাবার পর থেকে একেবারে চুপসে গেছে, মুখে আর কোনও কথা নেই।

কপা কপ্ কপা কপ শব্দ শুনে সন্তু একবার পেছন ফিরে তাকাল। ছোট-ছোট ঘোড়ায় চেপে চারজন লোক আসছে এদিকে। এখানে একটা পায়ে চলা পথ আছে, সন্তুরা একপাশে সরে দাঁড়াল। ঘোড়াগুলো তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, লোকগুলো তাদের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল বটে কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞেস করল না।

ছোট হলেও এই পাহাড়টা বেশ খাড়ামতন, ঘোড়াগুলোও উঠছে আস্তে আস্তে। কাকাবাবু খুবই হাঁপিয়ে গেছেন, কিন্তু একবারও থামবার কথা বলছেন না।

মন্দিরটার কাছে পৌঁছতে আরও প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেল।

একটা চৌকো মতন পাথরের মন্দির, তাতে সাদা চুনকাম। এমন কিছু পুরনো নয়। কাছাকাছি কোনও গ্রাম নেই, এখানে এরকম একটা মন্দির কে তৈরি করল কে জানে।

কাকাবাবু সামনে চাতালে দাঁড়িয়ে রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগলেন।

সন্তু দৌড়ে গেল মন্দিরের ভেতরের মূর্তিটা দেখবার জন্য। ধুতি-পরা একজন লোক পেছন ফিরে বসে আছে মূর্তিটার সামনে। খালি গা, পিঠের ওপর বেশ মোটা একটা পৈতে।

মূর্তিটা প্রায় এক হাত উঁচু, নীলচে রং, ঠিক কোন্ যে ঠাকুর, তা বোঝা গেল না। অনেকটা যেন মা-কালীর মূর্তির মতন, কিন্তু জিব-কামড়ান নয়। পায়ের নিচে মহাদেবও নেই। ধুতি-পরা পুরোহিতটির চেহারা দেখেও এখানকার আদিবাসী মনে হয় না।

কাকাবাবু এবারে আস্তে-আস্তে এসে সন্তুর কাছে দাঁড়ালেন। তারপরই অবাক হয়ে বললেন, 'আরে, এ মূর্তিটা তো নয়। এ তো অন্য মন্দির!'

সন্তু বলল, 'নীল রং কিন্তু!'

কাকাবাবু বললেন, 'তা হোক, অংশুমান চৌধুরীর কাছে আমি মূর্তিটার একটা কপি দেখেছি। সেটা একেবারে অন্যরকম। আরও লম্বা। সেটা পুরুষের মূর্তি, পায়ে গামবুট। আমরা ভুল জায়গায় এসেছি।'

মন্দিরের পুরোহিতটি এবারে মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে খুব অবাকভাবে চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। তারপর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

বস্তারের জঙ্গলে, একটা ছোট পাহাড়ের ওপর মন্দিরের পুরোহিতকে বাংলায় কথা বলতে শুনে ওরা তিনজনেই অবাক। সন্তু জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'আপনি বাংলা জানেন? কি করে বাংলা শিখলেন?'

পুরোহিতটি ফ্যাকাসেভাবে হেসে বললেন, 'বাঙালির ছেলে বাংলা জানব না? অবশ্য বাঙালি ছিলাম অনেক আগে, এখন আর নেই।'

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আসুন, মন্দিরের মধ্যে বসে একটু বিশ্রাম করে নিন।'

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে পড়ে বললেন, 'একটু জল খাব!'

পুরোহিত মন্দিরের পেছন দিয়ে গিয়ে একটা পেতলের ঘটি ভর্তি জল আনলেন। খুব ঠান্ডা জল। ওরা তিনজনেই জল খানিকটা পান করল, আর খানিকটা দিয়ে চোখমুখ ধুয়ে নিল।

জোজো বলল, 'আর একটু জল খাব।'

এবারে পুরোহিত আর এক ঘটি জলের সঙ্গে আনলেন কয়েকটা তিলের নাড়ু। সেগুলো এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একটু মিষ্টি খেয়ে তারপর জল খান। নইলে তেষ্টা মিটবে না।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আগে দন্ডকারণ্যে ছিলেন, তাই না?'

পুরোহিত এবারে চমকে গেলেন খানিকটা। কাকাবাবুর মুখের দিকে একটুক্ষণ অবাকভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কি করে বুঝলেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনার বাংলার মধ্যে পূর্ববঙ্গের একটা টান আছে। তাই আন্দাজ করা এমন কিছু শক্ত নয়।'

পুরোহিত বললেন, 'আমার নাম ধনঞ্জয় আচার্য। এক সময় দন্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু কলোনিতে ছিলাম। সেখানে কষ্ট ছিল খুব। একদিন মা কালী আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'তুই ডুমডুমি পাহাড়ে যা, সেখানে আমার ভাঙা মন্দির দেখতে পাবি। সেখানে গিয়ে আমার মূর্তি স্থাপন কর, তা হলে তুই উদ্ধার পেয়ে যাবি। ডুমডুমি পাহাড় কোথায় তা তো চিনতাম না। ক্যাম্প ছেড়ে তবু বেরিয়ে পড়লাম। দিনের পর দিন এই দিকের সব পাহাড়ে ঘুরেছি। কতদিন কিছু খাওয়া জোটেনি, কখনও গাছের ফলমূল খেয়ে কাটিয়েছি। তারপর এই পাহাড়ে এসে ভাঙা মন্দিরের সন্ধান পেলাম। তখন ভেবেছিলাম, এখানে মন্দিরে যদি থেকে যাই, তা হলে খাব কি? এই পাহাড়ের ওপর কে আসবে? তবু রয়ে গেলাম। প্রথম তিনদিন-চারদিন একজন মানুষও আসেনি, আমি একেবারে উপবাস করে কাটিয়েছি। ঠিক করেছিলাম, যদি না খেতে পেয়ে মরতে হয়, তবু এখান থেকে যাব না। তারপর আস্তে-আস্তে লোকেরা কী করে যেন এই মন্দিরের কথা জেনে গেল। এখন অনেকেই আসে।'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, দেখছি তো, ঘোড়ায় চড়ে অনেক লোক আসছে।'

ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, 'আমি ছাড়াও আরও পাঁচজন লোক এখন এই মন্দিরে থাকে। আমি পাহাড় থেকে নিচে নামি না। ওরাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনে। আপনারা এদিকে এলেন কি করে? এ পর্যন্ত এখানে আর কোন বাঙালি আসেনি।'

কাকাবাবু বললেন, 'আমরাও এদিকে এসেছি একটা মন্দিরের খোঁজে। কাছাকাছি গ্রামের একজন লোক আমাদের পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এল। কিন্তু আমি খুঁজছি একটা অন্য মন্দির। আপনি বোধহয় আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

কাকাবাবু তাঁকে গামবুটের মতন জুতো পরা পুরুষ-দেবতার মূর্তিটির কথা বুঝিয়ে বললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মূর্তিটি এই তল্লাটে কোথায় আছে বলতে পারেন?'

ধনঞ্জয় আচার্য দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, এরকম কোনও মূর্তির কথা আমি শুনিনি। বললাম তো, আমি এই পাহাড় থেকে নিচে নামি না। আপনি বলছেন, জুতো-পরা মূর্তি। এটা আবার কি ঠাকুর?'

কাকাবাবু বললেন, 'তা আমি জানি না। বইয়ে পড়েছি এই মূর্তিটার কথা, সেইজন্যেই সেটা দেখার এত কৌতূহল।'

ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, 'দেখি আমার লোকেরা কেউ কিছু সন্ধান দিতে পারে কি না!'

তিনি দুজন লোককে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে ওখানকার ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। সন্তুরা সেই ভাষা এক বর্ণ বুঝতে পারল না।

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেবারে নেপাল গিয়ে তুই তো খুব ঘোড়ায় চেপেছিলি। মনে আছে? এখন ঘোড়ায় চাপতে পারবি?'

সন্তু বলল, 'হ্যাঁ, পারব।'

জোজো এতক্ষণে খানিকটা চাঙা হয়ে উঠেছে। সে বলল, 'আমি খুব ভাল ঘোড়া চালাতে জানি। বাবার সঙ্গে একবার টার্কিতে গিয়ে প্রত্যেকদিন ঘোড়ায় চড়ে কত মাইল যে গেছি!'

কাকাবাবু বললেন, 'বাঃ, তা হলে তো খুব ভাল কথা। ভাবছি, এই পুরুতমশাইয়ের কাছ থেকে দুটো অন্তত ঘোড়া ধার চাইব। এখান থেকে ঘোড়ায় যেতে পারলে অনেক পরিশ্রম বাঁচবে।'

কাছেই একটা গাছে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা আছে। সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল জোজো, আমরা একটু ঘোড়ায় চড়া প্রাকটিস করি। ওদের বললে ওরা নিশ্চয়ই একটু চাপতে দেবে।'

জোজো নাক সিঁটকে বলল, 'এইটুকু ছোট ছোট ঘোড়া, এতে কী চাপব! এগুলো তো গাধা! আমি বিরাট-বিরাট ঘোড়া, যাকে ওয়েলার ঘোড়া বলে, সেই ঘোড়ায় চাপতে পারি!'

সন্তু বলল, 'ওই গাঁট্টাগোট্টা লোকগুলো এই ছোট ঘোড়ায় চেপেই তো ঘুরে বেড়ায়। আমরা কেন পারব না? চল না দেখি!'

সন্তু জোজোর হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। গাছতলায় যে লোকগুলো দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, 'আমাদের একটু ঘোড়ায় চাপতে দেবেন?'

ওদের সঙ্গে শিবু নামে যে লোকটি এসেছিল, সেও গল্প করছিল এখানকার লোকদের সঙ্গে। সেই শিবু সন্তুদের কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলল ওদের।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি। দুটো ঘোড়া খুলে এনে ওদের সাহায্য করল পিঠে চাপতে। তারপর একজন করে ঘোড়ার দড়ি ধরে হাঁটাতে লাগল ঘোড়াটাকে। ওরা গোল হয়ে খানিকটা জায়গা ঘুরল।'

সন্তু বলল, 'এই ঘোড়াগুলো বেশ শান্ত রে, জোজো। কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না।'

জোজো ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'যাঃ, এগুলো আবার ঘোড়া নাকি, গাধার অধম। আমি ঘোড়া ছুটিয়েছি, এইট্টি, নাইনটি মাইল্স স্পিডে! আরব দেশের আসল ঘোড়া।'

সন্তু তার সঙ্গের লোকটিকে বলল, 'আপনি একবার একটু ছেড়ে দিন না, নিজে-নিজে চালাই!'

দু'জন লোকই ঘোড়ার দড়ি ছেড়ে দিল। জোজো তার ঘোড়ার পেটে একটা লাথি মেরে চেঁচিয়ে বলল, 'হ্যাট, হ্যাট, হ্যাট....'

সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াটা তড়বড়িয়ে ছুটতে শুরু করল, আর জোজো ছিটকে পড়ে গেল তার পিঠ থেকে। তবে সৌভাগ্যবশত সে পড়ল একটা ঝোপের ওপর, তার চোট লাগল না।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে জামা ঝাড়তে-ঝাড়তে জোজো বলল, 'দেখলি, দেখলি সন্তু, কিরকম একখানা ডাইভ দিলাম? তুই পারবি?'

কাকাবাবু মন্দিরের সিঁড়িতে বসে ওদের দেখছেন আর হাসছেন।

এরপর তিনি নিজে যখন ঘোড়ায় চাপবেন, তখন জোজো আর সন্তুও বোধহয় হাসবে। তাঁরও অনেকদিন ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস নেই, তা ছাড়া খোঁড়া পা নিয়ে অসুবিধে হবে। কিন্তু ঘোড়া ছাড়া এখানে পায়ে হেঁটে বেশি দূর ঘোরাঘুরি করা সম্ভব নয়।

ধনঞ্জয় আচার্য তাঁর লোকদের সঙ্গে কথা শেষ করে কাকাবাবুর কাছে এসে বললেন, 'হ্যাঁ, ওদের একজন ওই মূর্তিটার কথা জানে। নিজের চোখে দেখেনি, তবে অন্যদের কাছে শুনেছে। ওর কথা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু ওখানে আপনার যাওয়ার দরকার নেই।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন বলুন তো?'

ধনঞ্জয় বললেন, 'জায়গাটা অনেক দূর। অবুঝমাড় পেরিয়ে আরও অনেকখানি। আপনি তিরাংদের নাম শুনেছেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি মারিয়া, আর মুরিয়াদের কথা জানি। এই সব জায়গায় আগে একবার ঘুরেছি। কিন্তু তিরাংদের কথা তো শুনিনি।'

'এদের কথা খুব কম লোকই জানে। মাত্র দু'তিন খানা গ্রামে ওরা থাকে। এদের একটা গ্রামে এই মূর্তি আছে। সেখানে বাইরের লোক বিশেষ কেউ যায় না।'

'এরা কি হিংস্র নাকি? বাইরের লোক দেখলে আক্রমণ করতে আসে?'

'সে-রকম কিছু শোনা যায়নি। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীরা এমনিতে বেশ শান্ত। কিন্তু কোনও কারণে রেগে গেলে তখন আর হিতাহিত-জ্ঞান থাকে না। তখন একেবারে খুন করে ফেলতেও এদের চোখের একটি পাতাও কাঁপে না। আপনি নিজে....মানে....আপনার দুটি পা ঠিক নেই, সঙ্গে দুটি অল্পবয়সী ছেলে, এই অবস্থায় আপনাদের ওদিকে যাওয়া উচিত হবে না।'

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'মুশকিল কী জানেন, আমি যদি যেতে নাও চাই ছেলে দুটি ছাড়বে না। ওরা বড্ড জেদি। জায়গাটা ঠিক কোথায়, অপনি একটু ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দেবেন?'

'জেনেশুনে আপনাদের ওই বিপদের মধ্যে পাঠাই কি করে?'

'কাছাকাছি গিয়ে দেখে আসি অন্তত, সে-রকম বিপদ দেখলে ভেতরে ঢুকব না। আর একটা কথা, ধনঞ্জয়বাবু আপনার শিষ্যদের তো বেশ কয়েকটা ঘোড়া রয়েছে দেখছি। তার থেকে দুটো ঘোড়া ধার নিতে পারি? ঘোড়া ছাড়া অতদূর যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা ঘোড়া দুটো বাবদ টাকা জমা রেখে যাব আপনার কাছে।'

'টাকার কথা উঠছে না, আপনাদের আমি অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না।'

কাকাবাবু তবু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধনঞ্জয় আচার্যকে দিয়ে একটা ম্যাপ আঁকিয়ে নিলেন। ওখানে কোনও সাদা কাগজ নেই, মন্দিরের দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছিল, তারই একটা পাতা ছিঁড়ে নেওয়া হল। কলম পাওয়া গেল সন্তুর কাছে।

ধনঞ্জয় আচার্য এককালে একটু-আধটু লেখাপড়া জানতেন, কিন্তু গত পঁচিশ বছর কিছুই লেখেননি, তাই বাংলা অক্ষর লিখতে ভুলে গেছেন। অবুঝমাড় লিখতে গিয়ে 'অ' অক্ষরটাই লিখতে পারেন না।

কাকাবাবু বললেন, 'আপনি জায়গাগুলোর নাম বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি।'

দেখতে-দেখতে সন্ধে হয়ে এল। মন্দিরের কাছাকাছি জঙ্গলের গাছে অনেক রকম পাখি ডাকছে। একটু দূরে একটা কোনও পাখি খুব জোরে পিঁয়াও পিঁয়াও করে ডাকছে, গলায় তার সাংঘাতিক জোর।

সন্তু বলল, 'এটা কি পাখি? এরকম ডাক তো শুনিনি!'

জোজো বলল, 'এটা মোটেই পাখি নয়, এটা ফেউয়ের ডাক। বাঘ বেরুলেই পেছন পেছন ফেউ বেরোয় শুনিসনি? আমি খুব ভাল চিনি।'

সন্তু বলল, 'ভ্যাট্, ফেউ আবার কি? ফেউ তো আসলে শেয়াল, বাঘ দেখে ভয় পেয়ে শেয়ালের ডাক তখন বদলে যায়। এটা পাখিরই ডাক।'

জোজো বলল, 'তুই কিছু জানিস না। এটা পাখি হতেই পারে না। এটা নির্ঘাৎ ফেউ।'

দু'জনে তর্ক করতে করতে এক সময় বাজি ধরে ফেলল। এক বোতল কোল্ড ড্রিংক।

ওরা কাকাবাবু আর ধনঞ্জয় আচার্যর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি ডাকছে?'

কাকাবাবু উত্তর দেবার আগেই ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, 'ওটা তো ময়ূর। এদিকের জঙ্গলে কিছু ময়ূর আছে।'

সন্তু প্রথমে লজ্জা পেল। ময়ূরের ডাক সে আগে অনেক শুনেছে, তার চিনতে পারা উচিত। এখানে ডাকটা খুব জোরে শোনাচ্ছে।

তারপরই সে জোজোকে বলল, 'তুই হেরে গেছিস! কোল্ড ড্রিংকটা পাওনা রইল। কলকাতায় ফিরে গিয়ে খাওয়াতে হবে কিন্তু!'

জোজো বলল, 'হেরেছি মানে? ময়ূর কি পাখি?'

আবার তর্ক লাগিয়ে দিল ওরা।

কাকাবাবু ধনঞ্জয় আচার্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই জঙ্গলের মধ্যে মন্দির করেছেন, এখানে বুনো জন্তু-জানোয়ার আসে না?'

ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, 'সন্ধের দিকে প্রায়ই হাতি আসে। আজ তো এখানেই থাকছেন আপনারা। হয়তো দেখতেও পেয়ে যাবেন।'

১৭

ভোরবেলাতে আবার যাত্রা শুরু হল। একটি ঘোড়ার পিঠে জোজো আর সন্তু। আর একটি ঘোড়ায় কাকাবাবু। দুটোর বেশি ঘোড়া পাওয়া গেল না। তা ছাড়া জোজো নিজে আলাদা একটা ঘোড়া চালাতেও পারত না।

কাকাবাবু তার ক্রাচ দুটো বেঁধে এক পাশে ঝুলিয়ে নিয়েছেন। একটা পা প্রায় অকেজো হলেও তাঁর ঘোড়া চালাতে অসুবিধে হচ্ছে না। কাকাবাবুকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে, খানিকটা যাবার পর তিনি উৎফুল্লভাবে বললেন, 'দ্যাখ, সন্তু, এখন কি কেউ আর আমাকে খোঁড়া লোক বলতে পারবে? ভাবছি, এরপর থেকে কলকাতা শহরেও একটা ঘোড়ায় চেপে ঘুরলে কেমন হয়। তা হলে আর ক্রাচ লাগবে না। গাড়ি চালাতে গেলেও অ্যাকসিলারেটর, ব্রেক আর ক্লাচ সামলাবার জন্য দুটো পা লাগে। ঘোড়া চালাবার জন্য সে ঝামেলা নেই। এই ঘোড়াটাও বেশ শান্ত। বিখ্যাত বীর

তৈমুরলঙও নাকি খোঁড়া ছিল। সেও তো এক পায়ে ঘোড়া ছুটিয়েই কেল্লা ফতে করেছে!'

জোজো বলল, 'জানেন কাকাবাবু, নেপোলিয়ান চলন্ত ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে নিতেন!'

কাকাবাবু বললেন, 'তাই নাকি?'

জোজো বলল, 'হ্যাঁ! নেপোলিয়ান বিছানায় শুয়ে ঘুমনো একেবারে পছন্দ করতেন না!'

কাকাবাবু বললেন, 'সেটা নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, আমি কিন্তু বাপু ঘোড়ার পিঠে ঘুমোতে পারব না!'

সন্তু বলল, 'জোজো এমনভাবে বলছে, যেন ও নেপোলিয়নকে ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়তে নিজের চোখে দেখেছে! না-শুয়ে বুঝি ঘুমনো যায় না?'

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে সুর পালটে বলল, 'আমার এক কাকা আছেন, কানপুরে থাকেন উনি দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। এমন কি ঘুমোতে ঘুমোতে হাঁটেন।'

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন।

তাঁর ঘোড়াটা যাচ্ছে আগে-আগে। ম্যাপ দেখে তিনি মনে-মনে একটা রাস্তা ছকে নিয়েছেন। পাকা রাস্তা এড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে-দিয়েই এগোতে হবে। অংশুমান চৌধুরীরা গাড়িতে যাবেন, তাঁদের পাকা রাস্তা দিয়েই যেতে হবে, তাঁদের সামনে পড়া চলবে না। অংশুমান চৌধুরীরা দলে ভারি, তাঁদের সঙ্গে অস্ত্রও অনেক বেশি। কাকাবাবুর কাছে রয়েছে শুধু একটি রিভলভার, তাতে মোটে চারখানা গুলি। ওঁদের কাছ থেকে কাকাবাবু রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছিলেন. কিন্তু এক্সট্রা গুলি তো আর নেওয়া হয়নি।

আদিবাসীদের একটা মূর্তির জন্য অংশুমান চৌধুরী প্রচুর টাকা খরচ করেছেন, অনেক রকম ব্যবস্থা করেছেন, সুতরাং কাকাবাবু বাধা দিতে গেলে তিনি সহজে ছাড়বেন না।

আগের রাত্তিরটায় নিরামিষ ডাল-ভাত-তরকারি খেয়ে, ভাল করে ঘুমিয়ে নেওয়া হয়েছে। সন্তু আর জোজো হাতি দেখার জন্য জেগেছিল বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতি আর আসেনি এদিকে, ওরা দূরে গাছপালা ভাঙার মড়মড় শব্দ শুনেছে শুধু।

ধনঞ্জয় পুরোহিত ওদের যত্ন করেছেন খুবই। আসবার সময় তিনি মস্ত এক পোঁটলা ভর্তি চিঁড়ে আর গুড় দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে, জঙ্গলের মধ্যে অন্য কোথাও খাবার না পাওয়া গেলে এই চিঁড়ে-গুড় খেয়েই পেট ভরান যাবে।

এখানে জঙ্গল খুব ঘন নয়, মাঝে-মাঝে পার হতে হচ্ছে ছোট-ছোট টিলা। শোনা যাচ্ছে নানারকম পাখির ডাক। এক জায়গায় দেখা গেল এক ঝাঁক বাঁদর। তারা

গাছের ডালে দোল খেতে-খেতে খুব কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল এই দলটাকে। যেন প্যান্ট-শার্ট পরা মানুষ তারা আগে কখনও দ্যাখেনি।

একটু পরে সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'কাকাবাবু, ওদের দলটা তো আগে আগে এগিয়ে গেছে। তা ছাড়া ওরা গেছে গাড়িতে। এতক্ষণে কি ওরা মূর্তিটা চুরি করে নিয়ে যায়নি?'

কাকাবাবু বললেন, 'ওরা গাড়িতে গেলেও সবটা গাড়িতে যাওয়া যাবে না। তিরাংদের ওই গ্রামটা পাহাড়ের একেবারে ওপরে। বেশ বড় পাহাড়। ওদের তুলনায় আমাদের বরং একটা সুবিধে আছে, আমরা ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের ওপরে অনেকটা উঠে যেতে পারব।'

জোজো বলল, 'একটা কাজ কবলে হয় না?' আমাদের পাহাড়ে ওঠার দরকার কি? আমরা পাহাড়টার কাছে পৌঁছে নিচে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারি। ওদের গাড়িটার আশেপাশে। তারপর ওরা মূর্তিটা চুরি করে নেমে এলে আমরা হঠাৎ ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা কেড়ে নেব। ব্যাস! তারপর ওদের গাড়িটাও পেয়ে যেতে পারি!'

কাকাবাবু বললেন, 'তুমি যে এই কথাটা ভাবলে, ওরাও কি এটা ভাবতে পারে না? অন্যপক্ষকে কখনও বোকা ভাবতে নেই। ওরাও পাহাড়ের নিচে, গাড়িটার কাছে কোনও ফাঁদ পেতে রাখতে পারে, আমরা সেখানে পৌঁছলেই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আড়াল থেকে! এই জঙ্গলের মধ্যে আমাদের তিনজনকে খুন করে রেখে গেলেও কেউ টের পাবে না।'

সন্তু বলল, 'আমাদের উচিত উলটো দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া!'

কাকাবাবু বললেন, 'আমিও ঠিক সেটাই ভেবে রেখেছি। তিরাংদের গ্রাম যে-পাহাড়টার ওপর, সেটাকে দূর থেকে দেখতে অনেকটা গন্ডারের মাথার মতন। দেখলেই চেনা যায়। ধনঞ্জয় পুরুতের একজন আদিবাসী শিষ্যের কাছ থেকে আমি সে পাহাড়ের উলটো দিকে যাবার রাস্তাটাও জেনে নিয়েছি। একটা শর্টকাট আছে।'

জোজো বলল, 'কাকাবাবু, আমার পিসেমশাই আপনাকে একটা কমপিটিশনে নামাতে চেয়েছিলেন, আপনি রাজি হননি তখন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আপনাকে সেই কমপিটিশনেই নামতে হল।'

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ, তা ঠিক। আমরা এখন অনায়াসে কলকাতার দিকে রওনা হতে পারতুম। কিন্তু মূর্তিটা সম্পর্কে খুবই কৌতূহল হচ্ছে। এমন কী দামি মূর্তি হতে পারে, যার জন্য পট্টনায়ক, রাও আর অংশুমান চৌধুরী কাঠ-খড় পোড়াচ্ছেন? সেই জন্যই একবার দেখে যেতে চাই।'

জোজো বলল, 'কিন্তু ওদের আগে পৌঁছতে হবে আমাদের।'

সন্তু বলল, 'আমরা তো পৌঁছবই! যদি তা না পারি, আগে যদি তোর পিসেমশাই মূর্তিটা চুরি করে নিয়ে যায়, তা হলে বারুইপুর পর্যন্ত তাড়া করে যাব!'

জঙ্গলটা এক জায়গায় বেশ ঘন হয়ে এসেছিল, হঠাৎ সামনে দেখা গেল একটা মস্ত বড় জলাশয়। অনেকটা হ্রদের মতন। কাকাবাবু ঘোড়া থামিয়ে বললেন, 'বাঃ কী সুন্দর! অপূর্ব!'

জায়গাটা সত্যি ভারি সুন্দর। জল একেবারে স্বচ্ছ। মাঝখানেও ফুটে আছে অনেক লাল রঙের শালুকফুল। একঝাঁক সাদা বক বসে আছে কাছেই। একটা মস্ত বড় শিমুল গাছ থেকে টুপটাপ করে ফুল খসে পড়ছে জলে।

কাকাবাবু বললেন, 'সন্তু, তোরা এসে একটু ধর তো আমাকে, এখানে একবার নামব।'

খোঁড়া পা নিয়ে ঘোড়ায় উঠতে ও নামতে কষ্ট হয় কাকাবাবুর। সন্তু নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে এক লাফে নেমে এল।

জোজো বলল, 'কাকাবাবু, এখানে থামলেন? আমাদের দেরি হয়ে যাবে না?'

কাকাবাবু বললেন, 'যতই ব্যস্ততা থাক, কোনও সুন্দর জিনিসকে অগ্রাহ্য করতে নেই। সন্তু, তোকে আগে একবার রামায়ণের সেই অংশটার কথা বলেছিলুম না? রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, সোনার হরিণ মেরে ফিরে এসে সীতাকে না পেয়ে রাম পাগলের মতন খুঁজছেন, খুঁজতে-খুঁজতে পম্পা সরোবরের তীরে এসে রাম মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সীতার কথা ভুলে গিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য। এই জায়গাটা পম্পা সরোবরের চেয়ে খারাপ কিসে?'

ঘোড়া থেকে নেমে কাকাবাবু হ্রদটার তীরে গিয়ে আঁজলা ভরে জল নিয়ে মুখে ছেটালেন। তারপর বললেন, 'আঃ, কী ঠান্ডা জল! এক-এক সময় আমার কী মনে হয় জানিস, সন্তু, এই যতসব বদমাশ আর গুন্ডাদের পেছনে ঘুরে বেরিয়ে কত সময় নষ্ট করি। তার চেয়ে ওসব ছেড়েছুড়ে এই সব সুন্দর জায়গায় এসে সময় কাটালে কত ভাল লাগত! আজকাল আর ওই সব কাজের ভার নিতেও চাই না, তবু পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়তে হয়।'

সন্তু বলল, 'এখানে তো ওই অংশুমান চৌধুরী তোমাকে জোর করে টেনে এনেছে!'

কাকাবাবু বললেন, 'যাই হোক, তবু তো এই একটা সুন্দর জায়গা দেখা গেল!'

মুখ-টুখ ধুয়ে, ঘাসের ওপর বসে পড়ে তিনি আবার বললেন, 'ঘোড়া দুটোকে জল খেতে দে। ওদেরও তো বিশ্রাম দরকার।'

তারপর তিনি হাতে-আঁকা ম্যাপটা খুলে দেখতে লাগলেন। সন্তুও ঝুঁকে পড়ে বোঝবার চেষ্টা করল ম্যাপটা। কাকাবাবু আঙুল দিয়ে এক জায়গায় দেখিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ওরা বলেছিল, এখানে একটা বড় জলাও থাকবে। উলটো দিকে একটা ছোট পাহাড়। এখান দিয়ে কোনাকুনি যাওয়া যেতে পারে। আমার কী মনে হয় জানিস, সন্তু, এখন তো সবে শীত শেষ হয়েছে, এদিকে এখনও বর্ষা নামেনি, এই হ্রদের জল বেশি

হবে না। আমরা ঘোড়া নিয়ে যদি এই হ্রদটা পার হয়েযেতে পারি, তা হলে অনেকটা সময় বেঁচে যাবে।'

'যদি বুক-জলের বেশি হয়?'

'তাতেও ক্ষতি নেই। ঘোড়া সাঁতার কাটতে পারে। আমরাও ডুবে যাব না। ও, ভাল কথা, তোর বন্ধু জোজো সাঁতার জানে তো?'

'মনে তো হয় জানে। তবে বিশ্বাস নেই।'

জোজো ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে। সন্তু তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'এই জোজো, তুই আবার যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়ছিস? যদি ফের পিঁপড়ে কামড়ায়?

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলল, 'ওরে বাবা, এখানেও পিঁপড়ে আছে নাকি?'

'শোন, তুই সাঁতার জানিস তো?'

'সাঁতার? হেঃ, কি বলছিস? কতবার আমি সাঁতরে গঙ্গা এপার-ওপার করেছি। একবার বাবার সঙ্গে রাশিয়ায় গিয়ে ক্যাস্পিয়ান সাগরে ঘোরার সময় আমাদের মোটরবোট উল্টে গেল, আমাদের গাইড যে ছিল, সে সাঁতার জানত না, আমি তাকে পিঠে করে নিয়ে গিয়ে বাঁচালুম!'

সন্তু হাসি মুখে বলল, 'তা বেশ করেছিস! এখন আমরা এই লেকটা পেরুব ঘোড়ায় চেপে, ঠিক আছে তো?'

জোজো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'এটা ভারি তো একটা লেক, হাঁটুজল হবে কিনা সন্দেহ। তবে কিনা, জামা প্যাণ্ট ভিজে যাবে, শুধু শুধু এটা পার হবার দরকার কি? পাশ দিয়ে গেলেই তো হয়।'

ঘোড়া দুটো জল খাচ্ছিল, হঠাৎ এক সঙ্গে মুখ তুলে তাকিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করল বাঁ দিকে, কান দুটো লটপট করতে লাগল। তারপর পেছন ফিরে ছুট লাগাবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সন্তু, শিগগির ওদের লাগাম ধর!'

কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়েও নিজেই লাফিয়ে উঠে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললেন, অন্য ঘোড়াটাকে সন্তু আর জোজো দু'জনে মিলেও আটকাতে পারল না। সে তীরবেগে ছুটে মিলিয়ে গেল জঙ্গলে।

কাকাবাবু বললেন, 'একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না। এই ঘোড়াতেই তিনজন উঠতে হবে।'

তিনজন সওয়ার নিয়েই এই ঘোড়াটা তড়বড়িয়ে চলে এল লেকের প্রায় মাঝখানে।

কাকাবাবু ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও হিংস্র জানোয়ার এসেছিল, তাই ঘোড়া দুটো ভয় পেয়েছে। বাঘ-টাঘ হওয়াই সম্ভব।

জোজো অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'দিনের বেলায় বাঘ?'

সন্তু বলল, 'কেন, দিনের বেলা বাঘ বেরুতে পারবে না, এমন কোনও আইন আছে?'

কাকাবাবু বললেন, 'এই জঙ্গলে লেপার্ড আছে জানি। লেপার্ডরা মানুষকে আক্রমণ করতে সাহস পায় না, কিন্তু ওরা ঘোড়ার মাংস খুব ভালবাসে। কিন্তু....একটা ঘোড়া চলে গেল....এখন তিনজনে মিলে এই একটা ঘোড়ায় কি করে যাব? এ বেচারি বেশিক্ষণ আমাদের বইতে পারবে না।'

সন্তু বলল, 'লেকটা পার হবার পর আমি আর জোজো হেঁটে যাব। তুমি ঘোড়ায় যাবে। পাহাড়ে ওঠার সময় তিনজনে এর পিঠে বসে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

পেছন ফিরে তাকিয়েও ওরা অবশ্য বাঘ বা লেপার্ড দেখতে পেল না। ঘোড়াটা হ্রদ পার হয়ে এসে গা-ঝাড়া দিতে লাগল। হ্রদটার সত্যিই জল বেশি ছিল না। কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো এই ঘোড়াটার সঙ্গেই বাঁধা আছে, চিঁড়ে-গুড়ের পোঁটলাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে অন্য ঘোড়াটার সঙ্গে-সঙ্গে।

কাকাবাবু আপত্তি করলেন না, তিনি একা বসে রইলেন ঘোড়ার পিঠে, সন্তু আর জোজো হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। এটাই সুবিধেজনক।

সামনের ছোট টিলাটার পাশ ঘুরে অন্য দিকে যেতেই চোখে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে দু'একটা কুঁড়েঘর। ঠিক গ্রাম নয়, সব মিলিয়ে তিনটে মাত্র বাড়ি।

কাকাবাবু বললেন, 'দুহাত উঁচু করে রাখ। এরা যেন না ভাবে যে, আমরা এদের শত্রু।'

তিনি নিজেও হাত তুললেন মাথার ওপর।

একটা বাড়ির সামনে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে একজন লোক। পাশে তীর-ধনুক। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেও লোকটা একবারও নড়ল-চড়ল না, মুখ তুলে তাকালও না।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'লোকটা মরে গেছে নাকি? কেউ ওকে মেরে রেখে গেছে?'

১৮

কাছেই একটা ছোট ঝরনা, সন্তু আঁজলা করে জল এনে ছিটিয়ে দিতে লাগল লোকটির চোখে-মুখে। আগেই সে লোকটির নাকে হাত দিয়ে দেখে নিয়েছে যে তার নিঃশ্বাস পড়ছে । কোনও কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে সে । কাকাবাবু ঘোড়াটিকে একটা কুঁড়েঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে অতি কষ্টে নিজেই নামলেন। সেই ঘরের সামনে আর একটি মেয়ে শুয়ে আছে। সেও অজ্ঞান। এই মেয়েটির মুখেও জলের ঝাপটা দেওয়া হল, তবু সে চোখ মেলল না ।

জোজো অন্য ঘরগুলো ঘুরে দেখে এসে অবাক হয়ে বলল, 'আরও চারজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কী ব্যাপার বলুন তো, কাকাবাবু?'

কাকাবাবু বললেন, 'এ যে দেখছি রূপকথার মতন। ঘুমন্ত পুরী। এখন বেলা সাড়ে এগারোটা, সবাই এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে!'

সন্তু বলল, 'এটা ঘুম নয়। এরা নিশ্চয়ই কিছু খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, বিষাক্ত কোনও ফল-টল খেয়েছে বোধহয়।'

কাকাবাবু বললেন, 'সবাই মিলে বিষাক্ত ফল খাবে? তা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। যাই হোক, আমাদের তো এখানে কিছু করার নেই। ওদের নিঃশ্বাস পড়ছে যখন, বেঁচে উঠবে নিশ্চয়ই! আমাদের আর এখানে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

জোজো কাকাবাবুকে আবার ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করল। সন্তু কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে ঘুরে দেখে এল। তার মনে একটা সন্দেহ হয়েছিল, সেটা মেলেনি। এদিকে গাড়ি যাবার কোনও রাস্তা নেই, এমন জঙ্গলে গাড়ি চালাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অংশুমান চৌধুরীরা তা হলে এদিকে আসেনি।

কাকাবাবু ঘোড়ায় চড়ে এগোলেন, সন্তু আর জোজো ঠিক পাশাপাশি না থেকে খানিকটা দূরে দূরে রইল। কেন যেন মনে হচ্ছে, কাছাকাছি কোনও বিপদ ওত পেতে আছে।

জঙ্গল ক্রমশ ঘন হচ্ছে, ওরা ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে, কিন্তু পাহাড়ের মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। তিরাং-রা যে-পাহাড়ে থাকে, সেই পাহাড়ের একটা চূড়া গন্ডারের শিঙের মতন। ওরা কি সেই পাহাড়েই উঠছে?

আরও খানিকটা যাবার পর পাওয়া গেল একটা ফাঁকা জায়গা। তার এক কোণে তিন-চারটে মোষ ঘাস খাচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে জোজোর খিদে পেয়ে গেল। সকাল থেকে ওদের কিছু খাওয়া হয়নি। চিড়ে-গুড়ের পুঁটুলিটা চলে গেছে পলাতক ঘোড়াটার সঙ্গে। এখন দুপুর প্রায় দুটো।

জোজো বলল, 'ওদিকে যখন মোষ চরছে, তখন কাছাকাছি নিশ্চয়ই গ্রাম আছে। তিরাংদের গ্রাম হতে পারে।'

কাকাবাবু ঘোড়া থামিয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সামনের দিকে। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে জোজো আর সন্তুকে চুপ করতে বললেন। একেবারে স্থির হয়ে রইল ওরা। দু'একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে মোষগুলো ঘাস খাওয়া শেষ করে আস্তে-আস্তে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। কাকাবাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ফুঃ! ও গুলো তোরা সাধারণ মোষ ভেবেছিস! ও তো বাইসন। জঙ্গলের সবচেয়ে সাংঘাতিক প্রাণী। বাঘেরা ওদের ভয় পায়। ওরা দল বেঁধে তাড়া করলে হাতিও সামনে দাঁড়াতে পারে না।

জোজো বলল, 'কাকাবাবু, জংলিদের গ্রামের কী একটা মূর্তি সেটা দেখতে যাওয়া কি আমাদের খুবই দরকার? এই ঝুটঝামেলা বাদ দিলে হয় না?'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, 'তুই ফিরে যেতে চাস নাকি?'

জোজো বলল, 'এখন ফিরে গিয়ে পরে একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে আসলেই তো হয়। এত কষ্ট করাব কোনও মানে হয় না।'

কাকাবাবু বললেন, 'তাই তো, জোজো একা তো ফিরে যেতে পারবে না ? কে ওর সঙ্গে যাবে? সন্তু, তুই যাবি নাকি?'

সন্তু বলল, 'সে কোশ্চেনই ওঠে না। আমি মোটেই ফিরতে চাই না।'

জোজো অভিমানের সঙ্গে বলল, 'কাকাবাবু, আপনি বারবার বলেছিলেন, যে, আপনি আমার পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কমপিটিশনে নামবেন না। এখন তো আমার পিসেমশাই কাছাকাছি নেই, তবু আপনি ইচ্ছে করে তাকে ফলো করছেন!'

কাকাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিকই বলেছ। কিন্তু কী করি, কৌতূহল সামলাতে পারছি না যে। ওই মূর্তিটার ওপর বাইরের লোকের কেন এত লোভ, সেটাই জানতে ইচ্ছে করছে খুব। এতদূর এসে ফিরে যাবার কোনও মানে হয়?'

জোজো বাচ্চা ছেলের মতন বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে! বেশিক্ষণ না খেয়ে থাকলে আমার মাথা ঝিমঝিম করে।'

সন্তু বলল, 'আমাদের বুঝি খিদে পায় না? কিন্তু এই জঙ্গলে কোনও ফল-টলের গাছও দেখছি না।'

কাকাবাবু হালকাভাবে বললেন, 'বরং তাড়াতাড়ি চল, তিরাংদের গ্রামে গেলে ওরা নিশ্চয়ই কিছু খেতে-টেতে দেবে!'

আবার শুরু হল চলা। যে দিকে বাইসনগুলো গেছে, তার উলটো দিকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুব সন্তর্পণে আরও খানিকটা যাবার পর চোখে পড়ে গেল গন্ডারের শিং-এর মতন সেই পাহাড়। খুব কাছেই। মাঝখানে শুধু একটা সবুজ উপত্যকা। এই পাহাড় থেকে ওই পাহাড়ের গ্রামের ঘর-বাড়িও চোখে পড়ে একটু একটু।

কাকাবাবু বললেন, 'এই তো এইবার এসে গেছি! আর কতক্ষণ লাগবে, বড়জোর এক ঘণ্টা?'

সন্তু বলল, 'কাকাবাবু এখানে গাড়িতে আসার কোনও উপায় নেই। ওদেরও হেঁটে আসতে হবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'ওরা আসবে পাহাড়ের উলটো দিক থেকে। অবুঝমাড়ের রাস্তা ওইদিকেই হবে। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তোদের জন্য থামব। একসঙ্গে যেতে গেলে তোরা হাঁপিয়ে যাবি। জোজো, এখন থেকে তুমি সন্তুর কাছাকাছি থাক, দু'জনে আলাদা হয়ে গেলে আবার খুঁজতে সময় লাগবে।'

কাকাবাবু নেমে গেলেন ঢালু উপত্যকার দিকে।

সন্তু জোজোর একটা হাত ধরে বলল, 'মোটে তো একবেলা খাসনি, তাতেই তুই এত কাহিল হয়ে গেলি?'

জোজো বলল, 'কাল দু'বেলাই যে নিরামিষ খেয়েছি। নিরামিষে কি পেট ভরে? উঃ, কতদিন যে একটা ডিমসেদ্ধ খাইনি!'

সন্তু বলল, 'তিরাংরা যদি ভাল লোক হয়, তা হলে ওদের গ্রামে নিশ্চয়ই মুরগির ডিম পাওয়া যাবে। মনে মনে ভাব। একটু পরেই ডিমসেদ্ধ খাব, একটু পরেই ডিমসেদ্ধ খাবে, তা হলে দেখবি খিদেটা কমে যাবে।

জোজো রেগে গিয়ে বলল, 'ধ্যাত! খাবার কথা ভাবলে খিদে আরও বেড়ে যাবে না!'

দু'জনে হাত ধরে দৌড় মারল নিচের দিকে। মাইলখানেক দূরে কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন একটা বড় গাছের নিচে। ওদের দেখে বললেন, তোরা এখানে একটু জিরিয়ে নে, আমি আবার এগোচ্ছি!'

এইরকম তিনবার করবার পর, গম্ভার পাহাড়ের সিকি ভাগ উঠে কাকাবাবু বললেন, 'এইবার একটা পরীক্ষা আছে। সামনে চেয়ে দ্যাখ, একটা গাছের ওপর মাচা বাঁধা, ওখানে নিশ্চয়ই কোনও লোক বসে থাকবে। তার মানে, তিরাংরা তাদের গ্রামে ঢোকার মুখটা পাহারা দেয়। তিরাংদের ভাষা আমি জানি না। ওরা নাকি হিন্দি বোঝে না! আমরা এগবার চেষ্টা করলেই যদি ওপর থেকে তীর ছুঁড়ে মারে?'

একটা ঝোপের আড়ালে খানিকটা গুঁড়ি মেরে গিয়ে সন্তু দেখল, সামনের পাশাপাশি দুটো গাছের ডগার কাছে মাচা বাঁধা, সেই মাচাটা প্রায় একটা ঘরের মতন, সেখানে রাত্তিরে কেউ শুয়েও থাকতে পারে। মাচাটায় এমনভাবে বেড়া দেওয়া যে, এখন ওখানে কেউ রয়েছে কি না তা বোঝার উপায় নেই।

সন্তু ফিরে আসার পর কাকাবাবু বললেন, 'আমি ঘোড়া ছুটিয়ে ওই ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারি। তীর ছুঁড়লেও আমার গায়ে লাগবে না। কিন্তু তাতে লাভ কি? তোদের তাতে আরও বিপদ হবে!'

সন্তু বলল, 'তা হলে তো মনে হচ্ছে, সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। অন্ধকারে যদি যাওয়া যায়।'

জোজো আঁতকে উঠে বলল, 'সন্ধে পর্যন্ত এখানে বসে থাকব, কেন অন্য কোনও দিক দিয়ে যাওয়া যায় না?'

কাকাবাবু বললেন, 'অন্য দিক দিয়ে যাবার রাস্তা থাকলে সেখানেও নিশ্চয়ই পাহারা থাকবে। এদিককার আর কোনও গ্রামে এরকম পাহারার ব্যবস্থা দেখিনি। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, ওদের মন্দিরের মূর্তিটাকে ওরাও খুব দামি মনে করে।'

সন্তু বলল, 'কাকাবাবু, আর একটা কাজ করা যেতে পারে। তোমরা ওই ডান দিকটায় গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে খানিকটা শব্দ-টব্দ কর। লোকটা তা হলে

ওদিকেই মনোযোগ দেবে। সেই ফাঁকে আমি বাঁ দিক দিয়ে বুকে হেঁটে হেঁটে মাচাটার কাছে এগিয়ে যাব।'

জোজো জিজ্ঞেস করল, 'এগিয়ে যাবার পর কি করবি?'

সন্তু বলল, 'চুপিচুপি মাচাটায় উঠে লোকটাকে ঘায়েল করব!'

জোজো বলল, 'ওখানে যদি একটা জোয়ান লোক হাতে তীর-ধনুক বা ছুরি নিয়ে বসে থাকে, তুই তাকে ঘায়েল করতে পারবি? ওসব সিনেমায় হয়! অত সোজা নয়!'

সন্তু বলল, 'যদি রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে যাই?'

কাকাবাবু বললেন, 'নাঃ। এরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। এদের আপত্তি থাকলে গ্রামে ঢোকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমরা জানান দিই দেখা যাক ওরা কি করে?'

কাকাবাবু খুব জোরে চেঁচিয়ে হিন্দিতে বললেন, 'আমরা বন্ধু। আমরা কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। আমরা গ্রামের সর্দারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

দু'তিনবার এরকম চিৎকারেও মাচা থেকে কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে আস্তে বললেন, 'ওরা হিন্দি না বুঝলেও কিছু তো একটা উত্তর দেবে।'

আরও কয়েকবার চেষ্টা করা হল। ওদিকে কোনও লোকই দেখা গেল না। এত চ্যাঁচামেচিতে গ্রাম থেকেও দু' একজনের ছুটে আশা উচিত ছিল।

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে তোরা এখানে দাঁড়া। আমি ঘোড়া ছুটিয়েই এই জায়গাটা পার হয়ে যাই। মাচার তলায় গিয়ে দাঁড়াব। দেখি কেউ নেমে আসে কি না।'

কাকাবাবু রিভলভারটা একবার হাতে নিয়েও পকেটে ভরে রাখলেন। সন্তু জানে কাকাবাবু রিভলভার নিয়ে শুধু ভয় দেখান, কোনও মানুষকে তিনি কিছুতেই গুলি করতে পারেন না।

জোজো আর সন্তু মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, কাকাবাবু খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাতেও কেউ তীর ছুঁড়ল না, মাচার ওপর কেউ একটু নড়াচড়াও করল না।

কাকাবাবু হেঁকে বললেন, 'এখানে কেউ নেই মনে হচ্ছে। তোরা চলে আয়।'

মাথা নিচু করে সন্তু আর জোজোও দৌড় মারল। প্রতি মুহূর্তে তাদের মনে হচ্ছে, পিঠে এসে তীর বিঁধবে, কিন্তু হল না কিছুই।

কাকাবাবু বললেন, 'যার পাহারা দেবার কথা, সে বোধহয় এখন খেতে গেছে। তার বদলে অন্য কেউ ডিউটি দিতে আসেনি।'

সন্তু বলল, 'ওপরটায় উঠে একবার দেখে আসব? মন্দিরটাও দেখা যেতে পারে!'

মাচায় ওঠবার কোনও সিঁড়ি নেই। সন্তু গাছে চড়ায় ওস্তাদ, মোটা গাছটার গুঁড়ি ধরে তরতরিয়ে ওপরে উঠে গেল। মাচার মধ্যে ঢুকে পড়ে সে প্রথমেই অবাকভাবে বলল 'আরেঃ!'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল?'
'এখানেও একটা লোক অজ্ঞান হয়ে আছে।'
'অজ্ঞান।'
'হ্যাঁ। নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে। মুখটা হাঁ করা। একটা কালো হাঁড়িতে সাদা সাদা কী যেন রয়েছে। বোধহয় ওই জিনিসটা খাচ্ছিল।'
'ঠিক আছে, তুই নেমে আয়।'
'কাকাবাবু, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, খানিকটা দূরে, আমার পেছন দিকে আর একটা লোক শুয়ে আছে মাটিতে। সেই আগে যে গ্রামটা দেখেছিলুম, সেই রকম এখানকার লোকরাও কিছু খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'
কাকাবাবু খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সেই লোকটাকে দেখতে পেলেন। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। দু'চারবার তাকে ধাক্কা দিতেও সাড়া পাওয়া গেল না।
তারপর একটার পর একটা বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। কোনও কোনও বাড়ির সামনে, কোথাও গাছের নিচে পড়ে আছে অজ্ঞান মানুষ। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বাচ্চা সবারই একই রকম অবস্থা। কোনও জাদুকর যেন এদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে।
কাকাবাবু শুধু বলতে লাগলেন, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য!'
সন্তু বলল, 'আমি ওপর থেকে মন্দিরটাও দেখতে পেয়েছি। একটা ঝরনার ধারে। আধ মাইল মতন দূর হবে।'
জোজো বলল, 'চলুন, চট করে আমরা মন্দিরটা দেখে এখান থেকে সরে পড়ি। জায়গাটা কিরকম ভুতুড়ে-ভুতুড়ে লাগছে!'
সারা গ্রামে আর কোনও আওয়াজ নেই, শুধু শোনা যাচ্ছে ঝরনার জলের শব্দ। সেখানে পৌঁছতে বেশি দেরি হল না। মাটির তলা থেকে ফুঁড়ে বেরোচ্ছে জল। তার পাশেই মন্দির।
মন্দিরটা পাথর দিয়ে তৈরি। চৌকোমতন একটা ঘর। ছাদে উড়ছে অনেকগুলো সাদা রঙের পতাকা। কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন।
একটা সাদা বেদীর ওপর রয়েছে মূর্তিটা। আড়াই ফুটের মতন উঁচু। নীল রঙের পাথরের তৈরি। মূর্তিটা কোনও পুরুষ দেবতার। পায়ে গামবুটের মতন জুতো, মাথায় মুকুট।
কাকাবাবু বললেন, 'একটা আদিবাসী গ্রামে এরকম মূর্তি থাকা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের এক পাশে একটা সূর্য মূর্তি আছে, অনেকটা সেইরকম।'
সন্তু বলল, 'তা হলে আমরা ওদের আগেই এসে পৌঁছে গেছি। ওরা বোধহয় এখনও রাস্তা খুঁজছে। ঘোড়াটা পেয়ে আমাদের খুব সুবিধে হয়েছে।'

কাকাবাবু মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেন। এখানেও একজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বোধহয় মন্দিরের পুরোহিত। কাকাবাবু মূর্তিটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কয়েকবার টোকা দিলেন। ভেতরটা ফাঁপা। টংটং শব্দ হল।

কাকাবাবু বললেন, ‘এই মূর্তিটা নকল!’

সন্তু আহত বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, ‘নকল?’

জোজো বলল, ‘এখানে হাওয়ায় যেন কিসের গন্ধ? নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না?’

সন্তু বলল, ‘হ্যাঁ, তাই তো, মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি কিসের যেন ......’

বলতে বলতে সন্তুর কথা জড়িয়ে গেল। জোজো বসে পড়ল মাটিতে। কাকাবাবু দারুণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘শিগগির, শিগগির এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ক্লোরোফর্মের গন্ধ। আমাদের ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। তিরাংরা জেগে উঠে আমাদের চোর বলবে। সন্তু, জোজো, বাইরে ....’

সন্তু আর জোজো ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। কাকাবাবু ওদের দু’জনের কাঁধ ধরে টেনে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। মন্দিরের দরজার কাছে এসে তিনি নিজেও ঘুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

১৯

পাহাড়ের গায়ে ছোট একটা জলাশয়, সেখানে পৌঁছে অংশুমান চৌধুরী বললেন, এবারে এখানে একটু বসা যাক। ভীমু, তোর ফ্লাস্কে আর চা আছে? খাবার-টাবার কিছু আছে? খিদে পেয়ে গেছে।’

ভীমু বলল, ‘হ্যাঁ আছে, স্যার। চা আছে, সন্দেশ আছে।’

লর্ড বলল, ‘এবারে আমাদের মুখোশ খুলে ফেলতে পারি? মাথাটা ভীষণ ভারি ভারি লাগছে।’

অংশুমান চৌধুরী বললেন, ‘তোমাদের মুখোশ খুলে ফেলতে পার। অনেকটা দূরে চলে এসেছি। তবে আমি খুলছি না। কতরকম পাখপাখালি, পোকামাকড় থাকতে পারে। ভীমু ভাল করে দেখে নে, এখানে খরগোশ-টরগোশ কিছু আছে কি না, তা হলে দূর করে দে।’

মাধব রাও বললেন, ‘এখানে থাকার দরকার কি? একেবারে পাহাড় থেকে নেমে গেলে হত না? আদিবাসীগুলো যদি জেগে উঠে হঠাৎ তাড়া করে আসে?’

অংশুমান চৌধুরী হেসে বললেন, ‘ওরা অন্তত পৌনে চার ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকবেই, আমার ঠিক হিসেব আছে। তা ছাড়া, ওরা জেগে উঠলেই বা, আমি আবার ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি না? আমি সঙ্গে থাকলে পৃথিবীতে কাউকে ভয় পাবার দরকার নেই।’

মাধব রাও বললেন, 'তবু যাই বলুন, আমার আর এই জায়গাটায় থাকতে ভাল লাগছে না। কাজ যখন হাসিল হয়েই গেছে, এত সহজে যে হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি, সত্যি ধন্য আপনার ক্ষমতা মিঃ চৌধুরী। এবারে এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়া উচিত না!'

অংশুমান চৌধুরী মুচকি হেসে বললেন, 'আপনার কাজ হাসিল হয়েছে বটে, কিন্তু আমার কিছুটা কাজ এখনও বাকি আছে।'

ভীমু আর লর্ড ততক্ষণে মুখোশ খুলে ফেলেছে। লর্ড বলল, 'এক কাপ চা না খেয়ে আমি নড়ছি না।'

মাধব রাও মুখোশ খুললেন, ভীমু চা ও সন্দেশ দিল সবাইকে।

আকাশে হঠাৎ কোথা থেকে যেন চলে এসেছে একদঙ্গল মেঘ। রোদের তাপ অনেকটা কম। ফিনফিনে হাওয়া বইছে, বোধহয় একটু পরেই বৃষ্টি নামবে। সামনের জলাশয়টায় ফুটেছে কয়েকটা লাল রঙের শালুক। কয়েকটা ফড়িং উড়ছে সেখানে।

চা-টা খাওয়ার পর লর্ড আর মাধব রাও ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিল। মাথার ওপরে একটা বড় তেঁতুল গাছ। পাহাড়ি রাস্তায় একবার বিশ্রাম নিতে বসলেই আর উঠতে ইচ্ছে করে না।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, ভীমু তুই একবার ফিরে যা গ্রামটায়। দেখে আয় রাজা রায়চৌধুরীরা এসে পৌঁছেছে কি না!'

ভীমুর মুখখানা পাংশু হয়ে গেল, সে রাজা রায়চৌধুরীকে যতটুকু দেখেছে, তাতেই সে আর ওই লোকটার ধারে-কাছে যেতে চায় না। সে ফ্যাঁসফেসে গলায় বলল, 'আবার ওই গ্রামে ফিরে যেতে হবে স্যার?'

অংশুমান চৌধুরী ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই কি ভয় পাচ্ছিস নাকি? কিসের ভয়? আদিবাসীরা সবাই এখনও ঘুমোচ্ছে। ওই এরিয়ার মধ্যে ঢুকলে রাজা রায়চৌধুরও জেগে থাকতে পারবে না। তুই দেখে আয়, ওরা এসেছে কিনা। মন্দিরের ভেতরটা ঢুকে দেখবি।'

ভীমু উঠে দাঁড়াতেই অংশুমান চৌধুরী আবার বললেন, 'মাস্কটা পরে যা! নইলে তুইও তো ঘুমিয়ে পড়বি!'

ভীমু এক পা দু'পা করে চলে গেল।

লর্ড বলল, 'আমার এখানেই ঘুম পেয়ে গেছে। এখানেও কি আপনার ওষুধের এফেক্ট আছে নাকি?'

'একটু-আধটু থাকতে পারে। ঘুম যদি পায়, মিনিট পনের ঘুমিয়ে নাও, জাগাবার ওষুধও আমার কাছে আছে।'

'আপনার কাছে সত্যি জাগাবার ওষুধও আছে?'

হ্যাঁ। এমনকি পাগল করে দেবার ওষুধও আছে!'

'অ্যাঁ? কী বললেন?'

মাধব রাও কয়েকবার নাক ডেকেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললেন, অ্যাঁ, কিসের ওষুধ আছে আপনার কাছে? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কেন? আমি যদি আর না জাগতাম? মিঃ চৌধুরী, আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাই না। আমি এক্ষুনি চলে যেতে যাই! চলুন, চলুন, আর এখানে বসে থাকবেন না।'

অংশুমান চৌধুরী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাধব রাও-এর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'বেশ তো, আপনি এখানে আর থাকতে চান না তো চলে যান! আপনাকে কি আমি জোর করে ধরে রেখেছি?'

মাধব রাও বিস্ময়ে ভুরু তুলে বললেন, 'আমি চলে যাব....মানে, আমি একা চলে যাব?'

'একা না যেতে চান, লর্ডকে নিয়ে যান!'

'আপনি যাবেন না?'

'বললুম না, আমার কিছুটা কাজ এখনও বাকি আছে। আমার যেতে দেরি হবে। আপনার তাড়া আছে যখন, এগিয়ে পড়ুন।'

'আমরা চলে যাব....আপনি থাকবেন....মানে....তা হলে মূর্তিটা কি হবে?'

'মূর্তিটা আপনি নিয়ে যান! মূর্তিটা আমার কাছে রেখে কি হবে?'

'আমি মূর্তিটা নিয়ে যাব?'

'মূর্তিটা পাবার জন্যই তো এতদূর এসেছেন, তাই না? মূর্তিটা না নিয়ে চলে যাবেন কেন?'

অংশুমান চৌধুরী একটা লম্বা ব্যাগ খুললেন, তার থেকে বার করলেন একটা নীল মূর্তি। সেই মূর্তির গাটা চকচক করছে।

দু'হাতে মূর্তিটা উঁচু করে তুলে ধরে মুগ্ধভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'দুর্দান্ত জিনিসটা! এর এত দাম কেন জানেন! এরকম নীল রঙের পাথর চট করে দেখা যায় না। এর আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, মূর্তিটার পিঠে এই যে দুটো গোল গোল গর্ত আছে দেখুন। হাওয়া ঢুকলে এখানে কখনো কখনো বাঁশির মতন শব্দ বেরোয়। এলুইন সাহেবের বইতে সে কথা লেখা আছে। তবে, এমনি ফুঁ দিলে বাজে না, ঝড়ো হাওয়া উঠলে বেজে ওঠে, সেইজন্য এরা মনে করে, স্বর্গের দেবতা এই মূর্তির মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে।'

মাধব রাও বললেন, 'মূর্তিটা দেখতেও খুব সুন্দর। কিন্তু এই মূর্তির পায়ে এরকম জুতো কেন, এখানকার আদিবাসীরা নিজেরাই জুতো পায় দেয় না, তারা এরকম একটা মূর্তি কী করে বানাল?'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'আমার ধারণা কোনও সাহেবকে দেখেই এখানকার কোনও শিল্পী এটা বানিয়েছিল এক সময়। তারপর আস্তে-আস্তে সেটা দেবতা হয়ে গেছে!'

মূর্তিটা মাধব রাও-এর হাতে তুলে দিয়ে অংশুমান চৌধুরী তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা কী চমৎকারভাবে মিটে গেল, বলুন তো ? আপনার বন্ধু পটনায়েক সাহেব এই মূর্তিটা চেয়েছিলেন, তিনি সেটা পেয়ে গেলেন। আদিবাসীদের মন্দিরে আমি অবিকল এর নকল একটা মূর্তি বসিয়ে দিয়েছি, ওরা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবে, ওদের মন্দিরের মূর্তি ঠিকই আছে, ওদের গ্রাম থেকে কিছুই চুরি যায়নি। সবাই মিলে কেন যে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই ভেবে অবাক হবে শুধু। ওদের মূর্তিটা হয়তো আর বাঁশির মতন বাজবে না। কিন্তু সেটা ওরা ভাববে, দেবতারা দয়া করছে না!'

মাধব রাও বললেন, 'সত্যি অদ্ভুত আপনার বুদ্ধি। আমরা রাজা রায়চৌধুরীর কাছে প্রথমে শুধু শুধু গিয়েছিলাম! ওঁকে দিয়ে এসব কিছুই হত না! এত টাকা-পয়সা খরচ করে রাজা রায়চৌধুরীকে এতদূর টেনে আনারও কোনও মানে হল না!'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'রাজা রায়চৌধুরীকে নিয়ে আসাটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। যে টাকা-পয়সা আমি খরচ করেছি এবার সেটা উসুল করব। আপনারা এগিয়ে পড়ুন।'

লর্ড জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে গাড়ির কাছে অপেক্ষা করব?'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'হ্যাঁ, আমার ঘণ্টা দু'এক লাগবে। চিন্তার কোনও কারণ নেই।'

লর্ড আর মাধব রাও এগিয়ে পড়বার পর অংশুমান চৌধুরী মনের আনন্দে গুনগুন করে একটা গান ধরলেন; তাঁর মুখে এখনও মুখোশ।

একটু বাদেই ভীমু ফিরে এল ছুটতে ছুটতে। সে-ও মহা আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, 'স্যার, স্যার, কেল্লা ফতে! ওই রাজা নামে খোঁড়া বদমাইশটা অজ্ঞান হয়ে উলটে পড়ে আছে। আর ওর সঙ্গের বাচ্চা ছেলে দুটোও কাত! এবারে ওদের খতম করে দেব স্যার?'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'চোপ! তোকে বলেছি না, খতম-টতমের কথা একেবারে উচ্চারণ করবি না! রাজা রায়চৌধুরী অজ্ঞান হয়ে গেছে, দেখলি?'

'হ্যাঁ, স্যার, নিজের চোখে দেখেছি! মন্দিরের সিঁড়িতে!'

'তাকে ধরে নিয়ে আসতে পারলি না?'

'আপনি তো ধরে আনতে বলেননি। শুধু দেখে আসতে বলেছেন।'

'মাথায় একটু বুদ্ধি খেলাতেও পারিস না? একটা লোক অজ্ঞান হয়ে আছে, তার পা দুটো ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। চল, চল আমার সঙ্গে।'

অংশুমান চৌধুরীর লম্বা চেহারা। তিনি হনহন করে এগিয়ে গেলেন। মন্দিরটা সেখান থেকে বেশি দূর নয়। আকাশে মেঘ কালো হয়ে এসেছে। বৃষ্টি নামতে আর দেরি নেই।

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর হাত দু'খানা ধরে টেনে নিয়ে এলেন খানিকটা। তারপর কাকাবাবুর দু'গালে দুই থাপ্পর দিয়ে দেখলেন, কাকাবাবু সত্যি অজ্ঞান কিনা। কাকাবাবু চোখের একটা পলকও পড়ল না। তিনি হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ করে হেসে বললেন, 'রাজা রায়চৌধুরী, এইবার? আমার সঙ্গে বুদ্ধির খেলা খেলতে এসেছিলে?'

ভীমু বলল, 'স্যার, ওঁকে নিয়ে যাব আমি?'

অংশু চৌধুরী বললেন, 'ওকে আমি একাই টেনে নিয়ে যেতে পারব! তুই এক কাজ কর, সেই ছেলেদুটো কোথায়? তাদের এখানে ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। তাদের তুই নিয়ে আয়!'

'দুজনকে এক সঙ্গে নিয়ে যাব স্যার? না, দু'বারে এসে একজন একজন করে....'

'দুটো বাচ্চা ছেলেকে তুই নিয়ে যেতে পারবি না? তুই কি হয়েছিস? এরকম করলে তোর চাকরি ছাড়িয়ে দেব! কিংবা ,তোকে একেবারে অদৃশ্য করে দেব।'

'ঠিক আছে স্যার, যাচ্ছি স্যার, আপনি এগোন!'

অংশুমান চৌধুরীর তুলনায় ভীমুর গায়ের জোর বেশ কম। অসুখে ভুগে ভুগে বেচারা রোগা হয়ে গেছে। সন্তু আর জোজোকে মন্দিরের সিঁড়ি থেকে খানিকটা সরিয়ে নিতেই সে হিমশিম খেয়ে গেল, ঘাম বেরিয়ে গেল কপালে।

একসঙ্গে দু'জনকে টেনে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। তা হলে উপায়? না নিয়ে গেলে অংশুমান চৌধুরী রেগে গিয়ে যে কী করবেন তার ঠিক নেই। ওই যে বলে গেলেন অদৃশ্য করে দেবার কথা। সেরকম কোনও ওষুধও ওঁর কাছে আছে কিনা কে জানে!

এমন সময় মচ্ মচ্ মচ্ মচ্ শব্দ শুনতে পেল। ঠিক যেন জুতোর আওয়াজ। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল ভীমু। তবে কী মন্দিরের জুতো পরা দেবতা....

তারপরেই একটা ফ-র-র-র, ফ-র-র-র শব্দে তার ভুল ভাঙল। জুতোর আওয়াজ নয়, কোনও একটা প্রাণী ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। শব্দটা আসছে মন্দিরের পেছন থেকে।

ভীমু আস্তে-আস্তে সেদিকে গিয়ে দেখল, একটা ঘোড়া সেখানে একলা একলা ঘাস খেতে খুব ব্যস্ত। দেখে মনে হয়, বেশ শান্ত ঘোড়া। ভীমুর এক সময় ঘোড়ায় চড়ার শখ ছিল। আফগানিস্তানে অংশুমান চৌধুরীর সঙ্গে থাকার সময় সে নিয়মিত ঘোড়ায় চেপেছে। ঘোড়া দেখলেই তার চাপতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু এখন তো ঘোড়ায় চাপার সময় নয়। বরং তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল, ওই অজ্ঞান ছেলে দুটোকে তো ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে নেওয়া যায়! তা হলে আর বইতে হবে না!

সে আস্তে আস্তে ঘোড়াটার পাশে গিয়ে তার গায়ে কয়েকটা চাপড় মারল। ঘোড়াটা পালাবার চেষ্টা করল না। তখন সে আরও কয়েকবার আদর করে তারপর লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টেনে আনল মন্দিরের সামনে। সন্তু আর জোজোকে টেনে তুলে ঝুলিয়ে দিল, ঘোড়াটার পিঠে। এবার তার আর কোনও পরিশ্রম নেই। নিজের বুদ্ধিতে নিজেরই কাঁধ চাপড়ে দিতে ইচ্ছে হল তার।

কয়েক পা এগিয়েই তার আবার একটা কথা মনে পড়ল। অংশুমান চৌধুরী কোনও জন্তু-জানোয়ার সহ্য করতে পারে না। ঘোড়াটাকে দেখলেই তো খেপে উঠবে!

কিন্তু সন্তু আর জোজোকে আবার ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাতে তার ইচ্ছে করল না। ঘোড়াটাকে অন্তত কিছুটা দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাক। আস্তে আস্তে। তারপর যা হয় তা হবে!

২০

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর হাত দুটো ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন জলাশয়টার ধারে। একটা পাতলা গাছের গায়ে কাকাবাবুকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়ে তিনি হাঁফাতে লাগলেন। কাকাবাবুর বেশ বলশালী চেহারা, তাঁকে এতটা টেনে আনতে পরিশ্রম কম হয়নি। পরিশ্রান্ত হলেও অংশুমান চৌধুরী তাঁর মুখোশ পরা মাথাটা নাড়তে লাগলেন বারবার, তাঁর খুব আনন্দ হয়েছে, এতদিন বাদে তাঁর জীবনের একটা বড় সাধ পূর্ণ হতে চলেছে।

নিজের ব্যাগ থেকে তিনি একটা শক্ত দড়ি বার করে কাকাবাবুকে খুব ভাল করে বাঁধলেন সেই গাছটার সঙ্গে। পকেট থেকে বার করে নিলেন রিভলভারটা।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু অংশুমান চৌধুরী তা গ্রাহ্য করলেন না। তিনি উবু হয়ে বসে কাকাবাবুকে দু'গালে দুটি চড় মেরে বললেন, 'কী রাজা রায়চৌধুরী, এবার?'

কাকাবাবুর যে জ্ঞান নেই, তা যেন উনি ভুলেই গেছেন! কাকাবাবুর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনে, চোখদুটি যেন আঠা দিয়ে আটকানো। সাধারণ ঘুম হলে মুখখানা এরকম অজ্ঞানের মতন দেখায় না।

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে মাথাটাকে সোজা করে ধরে বিড়বিড় করে বললেন, 'মাথা ভর্তি কালো চুল, অ্যাঁ? খুব গর্ব? এবারে বুঝবে ঠ্যালা! সারা জীবনের মতন ন্যাড়া!'

পেছনে একটা শব্দ হতেই অংশুমান চৌধুরী চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভীমু এসেছিস?'

একটু দূর থেকে ভীমু উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, স্যার!'

ভীমু ঘোড়টাকে থামিয়েছে খানিকটা দূরে একটা ঝোপের আড়ালে। অংশুমান চৌধুরী মুখোশ পরে আছেন বলে ঘোড়ার গন্ধ পাবেন না ভাগ্যিস! ঘোড়াটার পিঠ থেকে সন্তু আর জোজোকে নামিয়ে, সে ঘোড়াটার পিঠে দু'বার আদরের চাপড় মেরে বলল, 'যাঃ যাঃ! বাড়ি যাঃ!'

তারপর সে সন্তু আর জোজোকে টানতে টানতে নিয়ে এল অংশুমান চৌধুরীর কাছে।

অংশুমান চৌধুরী বলল, 'ঠিক আছে। এবারে তুই একটা কাজ করত ভীমু! ওই পুকুরটা থেকে খানিকটা জল এনে রাজা রায়চৌধুরীর মাথায় ঢেলে দে। 'ওর চুলগুলো ভাল করে ভেজাতে হবে!'

ভীমু বলল, 'বৃষ্টিতেই তো মাথা ভিজে গেছে, স্যার!'

অংশুমান চৌধুরী ধমক দিয়ে বললেন, 'যা বলছি, তাই কর!'

ভীমু দু'তিনবার আঁজলা ভরে জল এনে কাকাবাবুর মাথা ভিজিয়ে দিতে লাগলেন। অংশুমান চৌধুরী নিজের ব্যাগ থেকে একটা ক্ষুর বার করলেন। বাঁ হাতের তেলোয় ক্ষুরটা ঘষতে ঘষতে মনের আনন্দে হাসতে লাগলেন, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে।

তারপব ক্ষুরটা ভীমুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দে, এবার ব্যাটার মাথাটা কামিয়ে দে ভাল করে।'

ভীমু বলল, 'আমি! স্যার, আমি তো নাপিতের কাজ জানি না! যদি গলাটা কেটে দিতে বলেন তো...'

অংশুমান চৌধুরী প্রচন্ড জোরে চেঁচিয়ে বললেন, 'চোপ; তোকে বলেছি না খুন-জখমের কথা আমার সামনে উচ্চারণ করবি না! আমি যা বলব, শুধু তাই-ই করবি। ভিজে চুল কামিয়ে ফেলা অতি সহজ কাজ, এর জন্য নাপিতের কাজ শিখতে হয় না!'

ভীমু ক্ষুরটা হাতে নিয়ে প্রথমেই এক পোঁচে কাকাবাবুর একদিকের ঝুলপি উড়িয়ে দিল। এমন জোরে সে ক্ষুরটা টানল যে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এল কাকাবাবুর কানের গোড়ায়।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'দেখিস ব্যাটা, কানটা উড়িয়ে দিস না! তুই কি একটু আস্তে চালাতে পারিস না। আচ্ছা দে, আমকেই দে!'

ক্ষুরটা ফেরত নিয়ে অংশুমান চৌধুরী কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর আবার হেসে বললেন, 'ভীমু, লোকটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে আরও মজা হবে, তাই না? চোখ প্যাটপ্যাট করে দেখবে যে ওর মাথার চুল শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভুরুও কামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারপর ওখানে এমন একটা তেল মাখিয়ে দেব যে জীবনেও আর ওর চুল গজাবে না!'

ব্যাগ থেকে একটা স্প্রে বোতল বার করে অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'এইবার দ্যাখ মজা। এই ওষুধ দিলে আধ মিনিটের মধ্যে জেগে উঠবে!'

ভাল করে কাকাবাবুর মুখের ওপরে সেই ওষুধ স্প্রে করে দিলেন অংশুমান চৌধুরী।

আধ মিনিট কাটবার আগেই সন্তু উঃ উঃ শব্দ করে উঠল। অংশুমান চৌধুরী পেছন ফিরে বললেন, 'ওঃ হো! ওদের কথা তো ভুলেই গেছলাম! আমার এই জাগরণী ওষুধ এত স্ট্রং যে ওদের নাকে একটুখানি গেলে ওরাও জেগে উঠবে এক্ষুনি। ওদের হাত পা বাঁধা দরকার। নইলে ঝামেলা করতে পারে। আজকালকার বাচ্চারাও এত বিচ্ছু হয়! তোর কাছে দড়ি আছে?'

ভীমু বলল, 'না তো স্যার! ওদের আবার ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিন না!'

'সেইটাই তো মুশকিল রে! একবার জাগরণ ওষুধ দিয়ে জাগালে আর সহজে ঘুম পাড়ানো যায় না। এটা বেশি স্ট্রং! ঠিক আছে তুই এক কাজ কর, রিভলভারটা হাতে ধরে থাক। ওরা জেগে উঠলে ভয় দেখাবি।'

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে চোখ মেলে অংশুমান চৌধুরীর মুখোশ-পরা মুখটা দেখে একটু চমকে উঠে বললেন, 'কি ব্যাপার?'

অংশুমান চৌধুরী থিয়েটারি কায়দায় প্রথমে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে একটা হাসি দিলেন। তারপর বললেন, 'পরাজয়! পরাজয়! রাজা রায়চৌধুরী, তুমি হেরে গেছ আমার কাছে! তুমি নীল মূর্তি উদ্ধার করতে পারনি, তুমি আমাকে বাধা দিতে পারনি, তুমি এখন আমার হাতে বন্দী!'

কাকাবাবু মাথাটা ঝাঁকালেন একবার। চোখ রগড়াবার কথা ভাবার পর বুঝলেন তাঁর হাত-পা বাঁধা। তিনি বললেন, 'ওরকম একটা মুখোশ পরে আছেন কেন? ওতে আপনাকে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'সে আমাকে যেরকমই দেখাক, ও মুখোশ আমি খুলছি না। কার্য-উদ্ধার করেছি তো!'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার বুদ্ধি আর ক্ষমতা আছে, তা স্বীকার করছি। খুব হেভি ডোজের ক্লোরোফর্ম ছড়িয়ে আপনি গোটা গ্রামের লোকজনদের অজ্ঞান করে ফেলেছেন। এরকম আগে দেখিনি।'

'তা হলে হার স্বীকার করলে তো, রাজা রায়চৌধুরী? এবারে তোমার শাস্তি হবে! আমার মাথায় চুল নেই, তোমারও চুল থাকবে না। উপরন্তু তোমার ভুরুও থাকবে না। এই দ্যাখো ক্ষুর! মনে আছে সেবারের কথা?'

'হ্যাঁ মনে আছে। কিন্তু সেবারে আমি আপনার মাথা কামিয়ে দিইনি। দিয়েছিল পাহাড়িরা।'

'কিন্তু তুমি আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলে! তুমি বাঙালি হয়ে আর একজন বাঙালি বৈজ্ঞানিককে হিংস্র পাহাড়িদের হাতে তুলে দিয়েছিলে!'

'আপনি সরল পাহাড়িদের ঠকাচ্ছিলেন। যারা মানুষকে ঠকায়, তারা আবার বাঙালি-অবাঙালি কি? তাও আপনাকে আমি একবার সাবধান করে দিয়েছিলাম। আপনি গ্রাহ্য

করেননি। বাধ্য হয়েই আপনার বুজরুকি আমাকে ফাঁস করে দিতে হয়েছিল। পাহাড়িরাই আপনাকে শাস্তি দিয়েছে। আপনাকে মারধোর করেনি, শুধু মাথা কামিয়ে গাধার পিঠে উলটো করে চাপিয়েছিল।'

'এবার তোমাকে আমি কী শাস্তি দিই, তা দ্যাখ! রাজা রায়চৌধুরী, তোমার মাথা কামাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কান দুটোও কেটে ফেললে কেমন হয়? তুমি দু'কান কাটা হয়ে ঘুরে বেড়াবে এখন থেকে।'

কাকাবাবুর মুখে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল। তিনি অংশুমান চৌধুরীর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'তা আপনি পারবেন না!'

সন্তু আর জোজো পুরোপুরি জেগে ধড়মড় করে উঠে বসল। ভীমু তাদের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে বলল, 'খবরদার, একটুও নড়াচড়া করবে না। নড়লেই গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!'

জোজো কাঁচুমাচুভাবে বলল, 'আমি তো তোমাদের দলে। উনি আমার পিসেমশাই! আপন পিসেমশাই!'

সন্তু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'বিশ্বাসঘাতক!'

অংশুমান চৌধুরী এদিকে কান না দিয়ে কাকাবাবুকে বললেন, 'পারব না মানে? এক্ষুনি কচাত কচাত করে যদি তোমার দুটো কান উড়িয়ে দিই, তা হলে কে আমাকে বাধা দেবে? তুমি? হে-হে-হে! আমার দিকে ওরকম প্যাটপ্যাট করে তাকালে কি হবে? তুমি কি আমাকে হিপনোটাইজ করবে নাকি? তুমি কি ম্যানড্রেক! ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। আমাকে হিপনোটাইজ করার সাধ্য নেই।'

কাকাবাবু বললেন, 'আমি হিপনোটাইজ করতে জানি না, তাও বলছি আপনি পারবেন না!'

'কে বাধা দেবে, কে আমাকে আটকাবে? তোমার হাত-পা বেঁধে রেখেছি, তুমি তা খুলতে পারবে ভেবেছ? তুমি কি জাদুকর হুডিনি না পি সি সরকার?'

'আমি তাও না! কিন্তু আপনার থেকে আমার অনেকগুলো বেশি অ্যাডভান্টেজ আছে। আমি মুখোশ পরে থাকি না। আমি সাধারণ জীবজন্তু দেখে ভয় পাই না। ঠিকমতন বাঁচতে গেলে চোখ মেলে সব কিছু দেখতে হয়, কান খুলে সব শব্দ শুনতে হয়, নাক দিয়ে নিঃশ্বাসে সবরকম গন্ধ নিতে হয়। মানুষের চোখ-কান-নাক রয়েছে তো এই জন্যই! বাঁচবার জন্য মানুষ প্রত্যেক মুহূর্তে এইগুলো ব্যবহার করে!'

'তুমি যত খুশি নাক-কান-চোখ ব্যবহার কর, তবু দেখব এই মুহূর্তে কে তোমাকে রক্ষা করে। আগে ভেবেছিলুম, তোমার চুল আর ভুরু কামিয়ে দেব, এখন মনে হচ্ছে, তোমার কান দুটো কেটে দিলে আরও মজা হবে! ইচ্ছে করলে তোমার নাকটাও একটু ছোট করে দিতে পারি।'

সন্তু ঠিক করেছে, অংশুমান চৌধুরী ক্ষুরটা দিয়ে কাকাবাবুর কান কাটতে গেলে সে ভীমুর রিভলভার অগ্রাহ্য করেই অংশুমান চৌধুরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তারপর যা হয় দেখা যাবে। কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হল, কাকাবাবু সন্তুর মনের কথা বুঝতে পেরেছেন, তিনি দুবার চোখের পলক ফেলে ইঙ্গিতে সন্তুকে এক্ষুনি কিছু করতে নিষেধ করলেন।

কাকাবাবুর মুখে একটুও ভয়ের চিহ্ন নেই, ঠোঁটে হাসিমাখা। তিনি বললেন, 'অংশুমানবাবু, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে আপনি শোনেননি? অতি দর্পে হত লঙ্কা! আপনারও সে অবস্থা হবে। মাধব রাও আর লর্ড-এর কি হল? তাদেরও আপনি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন নাকি?'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'ওদের কথা থাক, আগে তোমার কী অবস্থা হবে শোন। আর বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না। তোমার মাথা আর ভুরু কামিয়ে, কান দুটো কেটে এইখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রেখে যাব। আমি বাচ্চাদের শাস্তি দেওয়া পছন্দ করি না। মাধব রাও-দের কি হয়েছে শুনবে? ওরা তিরাংদের নীলমূর্তিটা চেয়েছিল, সেটা ওদের দিয়েছি। মূর্তিটা বহু মূল্য টারকোয়াজ পাথরের। তা ছাড়া হাওয়া ঢুকলে মূর্তিটার মধ্যে থেকে বাঁশির মতন শব্দ হয়। আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট মিউজিয়াম এই মূর্তিটা পেলে এক মিলিয়ান ডলার দাম দেবে। মূর্তিটা পেয়ে মাধব রাওরা খুশি মনে ফিরে গেছে! হাঃ হাঃ হাঃ, ওরা জানে না যে ওদের মূর্তিটাও নকল। আমি দুটো নকল মূর্তি বানিয়ে এনেছিলুম। একটা বসিয়ে দিয়েছি তিরাংদের মন্দিরে, আর একটা দিয়েছি মাধব রাওদের। আসলটা রয়েছে আমার কাছে! আগামী সপ্তাহেই আমি আমেরিকা চলে যাব।'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনার দেখছি, সত্যি বুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধি যদি ভাল কাজে লাগাতেন....'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'এবারে আমার শেষ কাজটা করি। অনেক কথা হয়েছে, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।'

অংশুমান চৌধুরী ক্ষুরটা নিয়ে এগোতেই কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সন্তু, ঘোড়া!'

সন্তু পেছন ফিরে দেখল ওদের ঘোড়াটা কখন যেন ওদের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে এক লাফ দিল সেদিকে। জোজো সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভীমুর ওপর।

অংশুমান চৌধুরী ঘোড়াটাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। ক্ষুরটা ফেলে দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর ব্যাগ হাতড়ে বার করতে চেষ্টা করলেন অন্য কোনও অস্ত্র। কিন্তু তার সময় পেলেন না। সন্তু ঘোড়াসুদ্ধ হুড়মুড় করে এসে পড়ল তাঁর ওপর। অংশুমান চৌধুরীর সব কিছু ছিটকে গেল, তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, 'না, না, না, আমাকে এভাবে মের না! ক্ষমা চাইছি।'

অংশুমান চৌধুরীকে দলিত মথিত করে ঘোড়াটা চলে গেল খানিকটা দূরে, সন্তু আবার সেটার মুখ ফেরাল। জোজো ততক্ষণে কয়েকটা ঘুসি মেরে ভীমুকে কাবু

করে ফেলেছে, সন্তু এক পলক দেখে নিয়ে আবার অংশুমান চৌধুরীর দিকেই ছোটাল ঘোড়াটা।

অংশুমান চৌধুরী কোনক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না, ঘোড়াটার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন জলাশয়টার মধ্যে। সেই অবস্থাতেও চেঁচিয়ে বললেন, 'মরে যাব, আমি সাঁতার জানি না!'

ঘোড়ায় চেপে সন্তুর এমন বীরত্ব এসে গেছে যে সে আর ঘোড়া থেকে নামতেই চাইছে না। সে ঘোড়া দাপিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে আর চিৎকার করছে, 'আমরা জিতেছি! আমরা জিতেছি! হু-র-রে, আমরা জিতেছি!'

জোজো এসে কাকাবাবুর বাঁধন খুলে দিতে লাগল। তার এক হাতে ভীমুর রিভলভার সেও বেশ সিনেমার নায়কদের মতন ভীমুর দিকে রিভলভারটা উঁচিয়ে বলল, 'কোনও রকম চালাকি করবার চেষ্টা করেছ কি, একখানা মোটে গুলি, আমার টিপ কি রকম জান না, একবার ইটালিতে তিন-তিনটে গুন্ডাকে....'

কাকাবাবু বললেন, 'ওহে, তোরা অংশুমান চৌধুরীকে আগে জল থেকে তোল, ভদ্রলোক সাঁতার জানেন না বললেন....'

ভীমু হাত জোড় করে বলল, 'স্যার, আমি কিন্তু রিভলভার দিয়ে ইচ্ছে করে গুলি করিনি! আমি ছোট ছেলেদের মারি না, আমি ঘোড়া খুব ভালবাসি, ঘোড়ার গায়েও গুলি করতে পারি না। আমি স্যার খুন জখমের লাইনে নেই!'

কাকাবাবু বললেন, 'তুমি গিয়ে তোমার স্যারকে জল থেকে তোল! উনি ডুবে যাচ্ছেন যে!'

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর সন্তুকে ডেকে বললেন, 'এই সন্তু, ঘোড়াটার সঙ্গে আমার ক্রাচ দুটো বাঁধা আছে। ওগুলো দে!'

সন্তু এবারে কাকাবাবুর কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল। তার মুখখানা আনন্দে ঝলমল করছে। সে বলল, 'জোজোটাকে এক সেকেন্ডের জন্য বিশ্বাসঘাতক মনে হয়েছিল, কিন্তু জোজোও খুব ভাল ফাইট দিয়েছে।'

জোজো বলল, 'আমি ইচ্ছে করেই ওই কথা বলেছিলুম, যাতে আমাকে ওদের দলের মনে করে। ওই ভীমুর রিভলভারটা হাতানই আমার মতলব ছিল। কি রকম একখানা স্কোয়ার কাট ওর নাকে ঝাড়লুম বল্! এক ঘুসিতেই কাত! এটা মহম্মদ আলির টেকনিক! কাকাবাবু, এবারে কিন্তু সন্তু আর আমিই আপনাকে বাঁচিয়েছি। আমার পিসেমশাই আর-একটু হলেই আপনার মাথায় ক্ষুর চালিয়ে দিত!'

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক বলেছ!'

ভীমু গিয়ে অংশুমান চৌধুরীকে জল থেকে তুলে এনেছে ততক্ষণে। দুটো নাকওয়ালা মুখোশটা এখনও খোলা হয়নি। অংশুমান চৌধুরী খুঁখুঁ করে কাঁদলেন আর বললেন, 'গেল, গেল, আমার সব গেল! হতচ্ছাড়া একটা ঘোড়া, কোথা থেকে এল একটা ঘোড়া, ওফ, মরে গেলাম!'

কাকাবাবু বললেন, 'অংশুমানবাবু, এবার মুখোশটা খুলে ফেলুন!'

অংশুমান চৌধুরী আর্তকণ্ঠে বললেন, 'না, না, ওরে বাবা, না, না,!'

'আপনি নিজে থেকে না খুললে জোর করে খুলে দেওয়া হবে। আপনি নিজেকে বলেন বৈজ্ঞানিক, অথচ এই সরল, নিরীহ, আদিবাসীদের গ্রাম থেকে তাদের দেবতার মূর্তি চুরি করতে এসেছিলেন। এটা কি কোনও বৈজ্ঞানিকের কাজ? আপনি আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছিলেন, আপনি একটা কাপুরুষ। আপনি এ-দেশ থেকে দামি মূর্তি পাচার করে আমেরিকায় বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন...এই প্রত্যেকটা অপরাধের জন্য আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।'

কাকাবাবু এগিয়ে এসে একটানে খুলে ফেললেন অংশুমান চৌধুরীর মুখোশ। প্রথমেই ঘোড়টাকে দেখতে পেয়ে তিনি 'ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে' বলে চিৎকার করে চোখ ঢাকলেন, তারপর বললেন, 'বিশ্রী দুর্গন্ধ, আমি অজ্ঞান হয়ে যাব!'

কাকাবাবু বললেন, 'সন্তু, ঘোড়াটাকে তুই এই ভদ্রলোকের একেবারে কাছে নিয়ে আয় তো। দেখি উনি কী রকম অজ্ঞান হয়ে যান!'

অংশুমান চৌধুরী শুধু 'ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে' বলে চ্যাঁচাতেই লাগলেন, কিন্তু অজ্ঞান হবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

কাকাবাবু বললেন, 'আর কোনও জন্তু-জানোয়ার কিংবা পোকা-মাকড় নেই কাছাকাছি? সেগুলোও ছেড়ে দিতাম ওর গায়ে।'

সন্তু বলল, 'কাকাবাবু, জোজোকে যে-রকম লাল পিঁপড়ে কামড়েছিল, সেই রকম একটা পিঁপড়ের ঢিপি রয়েছে ওইখানে একটা গাছের গোড়ায়!'

কাকাবাবু বললেন, 'তাই নাকি, বাঃ বাঃ, তা হলে তো খুবই ভাল!'

কাছেই একটা সন্দেশের খালি কাগজের বাক্স পড়ে আছে, সেটা দেখিয়ে সন্তুকে বললেন, 'এটাতে করে বেশ কয়েক মুঠো পিঁপড়ে নিয়ে আয় তো!'

জোজো রিভলভারটা নিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে, কাকাবাবু তাকে বললেন, 'এটা আমাকে দাও। আমি এবার অংশুমান চৌধুরীর ব্যাগটা ঘেঁটে দেখি, ওতে আর কী কী সম্পত্তি আছে!'

কান্না থামিয়ে অংশুমান চৌধুরী বলে উঠলেন, 'না, না, আমার ব্যাগে হাত দেবেন না!'

হঠাৎ প্রচন্ড চিৎকার করে কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'চোপ! আপনার লজ্জা করে না, একটু আগে আমাকে 'তুমি তুমি' করছিলেন, এখন আবার 'আপনি' বলতে শুরু করেছেন। আপনাকে দু'খানা থাপ্পড় মারার ইচ্ছে যে আমি কত কষ্টে দমন করছি...'

ভীমু ঘোড়াটার গায়ে হাত বুলোচ্ছে আর ঘোড়াটা অংশুমান চৌধুরীকে ঠেসে ধরে আছে একটা গাছের সঙ্গে। অংশুমান চৌধুরীর 'তিড়িং তিড়িং' নাচ আর কান্না দেখে ঘোড়াটাও বোধহয় মজা পাচ্ছে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন,'ওরে ভীমু, ঘোড়াটাকে সরা। তুই আমাকে আগে

বলতে পারিসনি যে, ঘোড়াটা এদিকে আসছে? তোর চাকরি যাবে, তোর চাকরি যাবে, তোকে আমি এমন শাস্তি দেব....'

ভীমু বলল, 'আমি আর চাকরির পরোয়া করি না, স্যার! আপনি নিজে আগে বাঁচবেন কি না দেখুন! তারপর তো আমায় শাস্তি দেবেন!'

'দেখবি, দেখবি, আমার কাছে এখনও এমন ওষুধ আছে!'

'স্যার, উনি আপনার দিকে রিভলভার তাক করে আছেন কিন্তু!'

সন্তু কাগজের বাক্সটা নিয়ে এসে বলল, 'কাকাবাবু, অনেক পিঁপড়ে এনেছি! মাথায় ঢেলে দেব?'

অংশুমান চৌধুরী দু'হাতে মাথা চাপা দিয়ে হাহাকার করে বলে উঠলেন, 'না, না, পিঁপড়ে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না! খুদে শয়তান! ওরে জোজো, তুই আমার আত্মীয়, তুই আমাকে বাঁচা!'

জোজো বলল, 'ওই পিঁপড়ের কামড় খেয়ে আমি মরে যাচ্ছিলুম আর একটু হলে, আপনার জন্যই তো! এবার আপনি একটু পিঁপড়ের কামড় খেয়ে দেখুন! সন্তু আমার বেস্ট বন্ধু, তার কাকাবাবুর আপনি কান কেটে দিতে যাচ্ছিলেন!'

কাকাবাবু বললেন, 'দে সন্তু, পিঁপড়েগুলো ওঁর ওই ন্যাড়া মাথায় ছড়িয়ে দে।'

অংশুমান চৌধুরী যাতে বাধা দিতে না পারেন, সেইজন্য হঠাৎ ভীমুই নিজে থেকে চেপে ধরল তাঁর দু'হাত। সন্তু পুরো বাক্সটা খালি করে দিল অংশুমান চৌধুরীর মাথায়।

কাকাবাবু সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'বাঃ, বেশ হয়েছে, এবার তোরা ওঁর নাচ দ্যাখ!'

কাকাবাবু অংশুমান চৌধুরীর ব্যাগটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। রিভলভারটা পাশে নামিয়ে রেখে, ব্যাগটার ভেতর থেকে বার করে আনলেন আসল নীল পাথরের মূর্তিটা।

নকল মূর্তির মতন আসল মূর্তিটা অত চকচকে নয়। গায়ে একটা ধুলোর আস্তরণ। কাকাবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে সেটা ঘষতে লাগলেন। এটা চিনে-মাটির নয়, দামি কোনও পাথরের, তাতে সন্দেহ নেই। মূর্তিটা এত ভারি যে, নিরেট পাথরের বলেই মনে হয়, কিন্তু পেছন দিকে দুটো গোল গোল গর্ত। কাকাবাবু একটা গর্তে ফুঁ দিলেন, ঠিক নিটোল বাঁশির মতন শব্দ হল।

কাকাবাবু মূর্তিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। অন্তত দু'তিন শো বছরের পুরনো মনে হয়। দু'পায়ে দুটো পরিষ্কার জুতোর মতন, এইটাই আশ্চর্যের।

'হ্যান্ডস আপ!'

কাকাবাবু চমকে তাকিয়ে দেখলেন, একটা ঝোপ ঠেলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেছে মাধব রাও আর লর্ড। মাধব রাওয়ের হাতে একটা রাইফেল।

কাকাবাবু মূর্তিটা ধরে রেখেই হাত দুটো তুলেছেন মাথার ওপরে। তাঁর রিভলভারটা পড়ে আছে ব্যাগটার আড়ালে, সেটা এখন আর নেবার উপায় নেই।

মাধব রাও কর্কশ সুরে বলল, 'রাজা রায়চৌধুরী, উঠে দাঁড়াও!'

লর্ড ছুটে গেল অংশুমান চৌধুরীর দিকে। সন্তুকে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে সে দু'হাত দিয়ে অংশুমান চৌধুরীর মাথা থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে লাগল।

অংশুমান চৌধুরী হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!' এরা আমাকে নরক যন্ত্রণা দিয়েছে। এই ঘোড়াটাকে সরিয়ে দাও!'

লর্ড ঘোড়াটার পেটে একটা লাথি কষাতেই সেটা দৌড় লাগাল প্রাণপণে। তারপর সে অংশুমান চৌধুরীকে বলল, 'ভাগ্যিস আমাদের ফিরে আসার কথা মনে হল! আপনার দেরি হচ্ছে দেখে মনে হল, আপনার হয়তো কোনও সাহায্য দরকার। খানিকটা উঠে আসার পর আপনার কান্নার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলুম, নিশ্চয়ই আপনি বিপদে পড়েছেন।'

অংশুমান চৌধুরী কয়েকবার হেঁচকি তুলে কান্না থামিয়ে বলল, 'এবারে আমি রাজা রায়চৌধুরীকে এমন শাস্তি দেব ও জীবনে ভুলবে না! ওর হাত দুটো বেঁধে ফ্যাল। ও ডেঞ্জারাস লোক আর এই ভীমুটা, ও পর্যন্ত বিট্রে করছে, ওদের দলে ভিড়েছিল, ওকে আমি তিরাংদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাব!'

মাধব রাও রাইফেলটা একবার সকলের দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'কেউ এক পা নড়বে না। যে চালাকির চেষ্টা করবে সে খোঁড়া হয়ে যাবে। রাজা রায়চৌধুরী তুমি আমার সামনে এগিয়ে এস। হাতে ওটা কি, তুমি তিরাংদের মন্দির থেকে মূর্তিটা তুলে এনেছ? এই যে আগে তুমি খুব সাধু সেজেছিলে, ওদের মূর্তি চুরি করায় তোমার খুব আপত্তি ছিল....'

কাকাবাবু সামান্য হেসে বললেন, 'মাধব রাও, তুমি এককালে সিভিলিয়ান ছিলে, এখন বন্দুক তুলে লোককে ভয় দেখাচ্ছ? আমি যদি তোমার হুকুম না শুনি। তা হলে কি গুলি করে আমায় মেরে ফেলবে? খুন করতেও তোমার আপত্তি নেই?'

মাধব রাও চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'রাজা রায়চৌধুরী, তোমার কাছে আমরা সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম, তুমি আমাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। এখন তুমি আমাদের পদে-পদে বাধা দিচ্ছ। মিস্টার অংশুমান চৌধুরী আমাদের দারুণ সাহায্য করেছেন, তুমি তাঁকে....'

কাকাবাবু এবার হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'অংশুমান চৌধুরী তোমাদের সাহায্য করেছেন? তাই নাকি? তোমাদের একটা নকল মূর্তি দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিলেন....'

অংশুমান চৌধুরী চেঁচিয়ে বলল, 'মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা! ওর কথায় বিশ্বাস কোর না!'

মাধব রাও বলল, 'দেখি, ওই মূর্তিটা আমাকে দাও।'

কাকাবাবু বললেন, 'এই নাও।'

প্রচন্ড জোরে তিনি মূর্তিটা ছুঁড়ে মারলেন মাধব রাওয়ের রাইফেল-ধরা হাতটার ওপর। রাইফেলটা ছিটকে পড়ে গেল খানিকটা দূরে, ঠকাস করে শব্দ হল। হাতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল মাধব রাও।

লর্ড আর অংশুমান চৌধুরী, অন্যদিক থেকে সন্তু আর জোজোও গেল রাইফেলটা আগে কুড়িয়ে নেবার জন্য। সেটার কাছে পৌঁছবার আগেই অংশুমান চৌধুরী পেছন ফিরে সন্তু আর জোজোকে কিল আর লাথি মারতে মারতে চেঁচিয়ে বলল, 'লর্ড, লর্ড তুমি রাইফেলটা হাত কর....'

লর্ড নিচু হয়ে রাইফেলটা ধরতে যেতেই তার হাতে একটা গুলি এসে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, 'ওহে লর্ড, ওখান থেকে সরে না গেলে এর পরের গুলিটা তোমার মাথার খুলিতে লাগবে! সন্তু, রাইফেলটা নিয়ে আয় আমার কাছে।'

গুলির ধাক্কায় লর্ড পড়ে গেছে মাটিতে, উড়ে গেছে তার বাঁ হাতের দুটো আঙুল। অংশুমান চৌধুরী আতঙ্ক-বিহ্বল চোখে থমকে গিয়ে বললেন, 'যাঃ!'

রিভলভারটা হাতে নিয়ে, ক্রাচ ছাড়াই কাকাবাবু এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এসে দাঁড়ালেন মাধব রাওয়ের কাছে। রাগে তাঁর মুখ থমথম করছে।

মাধব রাওয়ের চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমার দিকে যারা বন্দুক-পিস্তল তোলে, তাদের আমি কোনও না কোনও শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না। তোমাকে আমি কি শাস্তি দেব? একটা হাত ভেঙে দেব মুচড়ে?'

মাধব রাও উঠে বসে মাথা হেঁট করে ফেলল। তার মাথা ভর্তি বাবরি চুল। লর্ড হাতের যন্ত্রণায় মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। তারও মাথায় অনেক চুল।

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। অংশুমান চৌধুরী, আপনি আমার মাথা কামাতে চাইছিলেন না? আপনার নাপিত সাজার খুব ইচ্ছে? এবার এই দু'জন লোকের মাথা ন্যাড়া করে দিন।'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'আমি পারব না, আমি পারব না!'

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে আমার মতন আপনিও একটা পা খোঁড়া করতে চান?' আপনার সম্পর্কে আমার আর কোনও দয়া-মায়া নেই। আমি তিন গুনব, তার মধ্যে যদি ক্ষুরটা হাতে না নেন....এক, দুই....'

অংশুমান চৌধুরী ছুটে গিয়ে মাটি থেকে ক্ষুরটা তুলে নিয়ে রাওয়ের মাথার সামনে গিয়ে বসলেন, তারপর বলল, 'জল দিয়ে চুল ভেজাতে হবে।'

কাকাবাবু বললেন, 'কোনও দরকার নেই। শুরু করুন!'

মাধব রাও মুখ তুলে একবার শুধু অংশুমান চৌধুরীর দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'আপনার যা খুশি করুন!'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাধব রাও ন্যাড়া হয়ে গেল। ক্ষুরের খোঁচায় তার মাথার খুলির মধ্য দিয়ে একটু-একটু করে রক্ত ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, 'এবারে লর্ডকে ধরুন, তার আগে একটা কথা....তিরাংদের ঘুম ভাঙতে আর কতক্ষণ বাকি আছে?'

অংশুমান চৌধুরী হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, 'আরও প্রায় দুঘন্টা।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সন্তু, একটা কাজ করতে পারবি? তিরাংদের মন্দিরে গিয়ে ওদের এই মূর্তিটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারবি?'

সন্তু বলল, 'হ্যাঁ, দিয়ে আসব।'

অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'ওটা ফিরিয়ে দিচ্ছেন? ওটা খুবই দামি....তিরাংরা ওর মূল্য বোঝে না....ওদের মন্দিরে একটা নকল মূর্তি থাকলেও ক্ষতি নেই।'

কাকাবাবু বললেন, 'চুপ! এখনও চুরি করার শখ মেটেনি? নিজের কাজ করুন? সন্তু, তুই যা। এই আসল মূর্তিটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে নকলটা নিয়ে চলে আসবি!'

জোজো বলল, 'চল সন্তু, আমিও তোর সঙ্গে যাই!'

লর্ড নিজের মাথার চুল বাঁচাবার জন্য মাটিতে আরও জোরে জোরে গড়াগড়ি দিতে লাগল। ভীমু গিয়ে চেপে ধরল তাকে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে লর্ডের শখের চুলও ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।'

কাকাবাবু বললেন, 'বাঃ, ঠিক হয়েছে। এবারে আপনি নিজের কান দুটো কেটে ফেলুন তো!'

অংশুমান চৌধুরী আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অ্যাঁ?'

কাকাবাবু বললেন, 'কেন, আমার কান কাটতে চাইছিলেন, এখন নিজের কান কাটতে আপত্তি কিসের? নিজের হাতে পারবেন না? তা হলে ভীমুকে ক্ষুরটা দিন।'

ভীমু সাগ্রহে বলল, 'দেব স্যার, আমি ওঁর কান দুটো কেটে দেব স্যার? এক মিনিট লাগবে!'

অংশুমান চৌধুরী এবারে সটান শুয়ে পড়ে কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'দয়া করুন, দয়া করুন! আমার কান কাটবেন না। তা হলে আর কোনও দিন মুখ দেখাতে পারব না।'

কাকাবাবু পা-টা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ছিঃ! আমি কি সত্যি-সত্যি আপনার কান কেটে দিতাম? উঠে বসুন, এরপর একটা দরকারি কথা আছে!'

মাধব রাও, লর্ড আর অংশুমান চৌধুরীকে তিনি এক লাইন করে বসালেন। তারপর সন্তু আর জোজোকে ফিরে আসতে দেখে তিনি বললেন, 'এবার আর একটা প্রতিযোগিতা শুরু হবে! এই পাহাড়ের নিচে আপনাদের গাড়িটা আছে না? সেই গাড়িটা চাই। আমরা এখান থেকে রওনা হবার আধঘণ্টা পরে আপনারা উঠবেন। তার আগে উঠলে আমি গুলি চালাব। আমি খোঁড়া লোক, আধঘণ্টা গ্রেস তো পেতেই পারি, তাই না? তারপরও গিয়ে যদি আপনারা আগে গাড়িটা দখল করতে পারেন, তা হলে আমাদের কিছুই বলার নেই!'

সন্তু আর জোজো ফিরে আসতেই তিনি বললেন, 'রাইফেলটা, অংশুমান চৌধুরীর ব্যাগ এই সব নিয়ে নে। ওরা খুনে-গুন্ডা, ওদের হাতে কোনও রকম অস্ত্র দেওয়া ঠিক নয়। ভীমু, তুমি ফ্রি। তুমি যেখানে খুশি যেতে পার! ঘোড়াটা পাওয়া গেলে খুব ভাল হত।'

ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবু তিনটি ন্যাড়া মাথার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গুড বাই!'

অন্ধকারে সবুজ আলো

১

সেদিন সকালবেলাতেই বিমান খবর পেল যে তার বন্ধু স্বপন গতরাত থেকেই অজ্ঞান হয়ে আছে। এখনও জ্ঞান ফেরেনি।

সবেমাত্র বালিগঞ্জের লেকে সাঁতার কেটে বাড়িতে ফিরেছে বিমান। সামনের মাসে বাঙ্গালোরে সাঁতারের কম্পিটিশনে যোগ দিতে যাবে। লেক থেকে বাড়ি ফিরে রোজই সে আর একবার কলের জলে স্নান করে নেয়। সেদিনও বাড়ি ফিরে বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময় প্রিয়ব্রতর ফোন এল!

'কী রে বিমান, লেক থেকে ফিরলি কতক্ষণ ? শোন্ কতক্ষণে রেডি হতে পারবি ?'

'কে, প্রিয়দা ? কেন, রেডি হব কেন ? কোথায় যেতে হবে বল তো।'

'আমি এক্ষুনি বেরুচ্ছি। গিয়ে বলব।'

'কিন্তু কোথায় যাব এখন ? আমার তো আজ কলেজ আছে।'

'কলেজ আজ আর যাওয়া হবে না। একবার দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে রে।'

'দক্ষিণেশ্বরে ? হঠাৎ এই সক্কালবেলা ?'

'কেন, তুই শুনিসনি কিছু ? স্বপনের যে এখনও জ্ঞান ফেরেনি রে!'

'স্বপন ? আমাদের স্বপন ? জ্ঞান ফেরেনি মানে ? কি হয়েছে ওর ?'

স্বপনের ঠিক যে কী হয়েছে, তা প্রিয়ব্রতও জানে না। সারা রাত স্বপন অজ্ঞান হয়ে আছে এইটুকুই শুধু সে জেনেছে। স্বপনের মামা প্রিয়ব্রতকে আজ ভোরে ফোন করেছিলেন। শুধু বোঝা গেল তিনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন।

স্বপনদের বাড়ি ভবানীপুরে। কিন্তু কয়েকদিন ধরে স্বপন দক্ষিণেশ্বরে তার মামার বাড়িতে রয়েছে, এ খবর বিমান জানত। সেই জন্যেই স্বপনের সঙ্গে বিমানের দেখা হয়নি এ-কদিন। পাঁচদিন ছুটি থাকার পর আজই ওদের কলেজ খুলছে।

ধাঁ করে স্নান সেরে, চট্‌পট্ দুখানা টোস্ট আর একটা ডিম সেদ্ধ খেয়ে বিমান জামা-প্যান্ট পরে জুতোর ফিতে বাঁধছে এমন সময় প্রিয়ব্রতর গাড়ির হর্ন বেজে উঠল রাস্তায়। তিনতলার বারান্দা থেকে বিমান হাত নেড়ে 'আসছি' বলেই ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

প্রিয়ব্রত বি. এ. পাশ করার পর পুলিশে চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন করার পর তার আর ও-চাকরি ভাল লাগল না। তখন ওই চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা বেশ

বড় কোম্পানিতে সিকিউরিটি অফিসারের কাজ নিয়েছিল । কিন্তু সে চাকরিতেও তার মন টিঁকল না । বাঁধাধরা কোনও কাজই তার পছন্দ হয় না । এখন তাকে বরং বেকারই বলা যায় । তবে ওদের অবস্থা বেশ ভাল । এর মধ্যে কোথায় যেন একটা নিলাম থেকে সে একটা পুরনো জিপ গাড়ি কিনে সেটাকে সারিয়ে-টারিয়ে টক্‌টকে লাল রং করে নিয়েছে । প্রায়ই সে বলে এই গাড়িটা নিয়ে সে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে । স্বপন আর বিমানকেও সে সঙ্গী হিসেবে নিতে রাজি । কিন্তু সত্যি সত্যি কবে যে যাওয়া হবে, তার ঠিক হয়নি এখনও ।

জিপের স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে শিস্ দিয়ে প্রিয়ব্রত একটা গান গাইছিল । বিমান এসে তার পাশে বসতেই জিপ্ স্টার্ট দিল । এখান থেকে দক্ষিণেশ্বর অনেক দূরের পথ ।

জিপটা চলতে শুরু করতেই বিমান জিজ্ঞেস করল, 'প্রিয়দা, স্বপন হঠাৎ কেন অজ্ঞান হয়ে গেল সে কথা ওর মামা কিছু জানাননি তোমায় ? অমন সুস্থ, সবল ছেলে !'

'না । মনে হচ্ছে, ওর মামার বাড়ির কেউই কারণটা ঠিক বুঝতে পারেননি । কোনও জায়গা থেকে পড়ে যায়নি, মাথায় কেউ ডাণ্ডাও মারেনি । শরীরে কোনও চোট নেই । হঠাৎ অজ্ঞান ! তাও একেবারে সারারাত ধরে অজ্ঞান ! হ্যাঁরে, তুই কি জানিস, স্বপন আগে কখনও এ-রকম অজ্ঞান হয়েছে ?'

'না তো ।'

'এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকাটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, ভয়েরও । ওকে হাসপাতালে পাঠান উচিত ছিল ।'

'ওকে অজ্ঞান অবস্থায় কোথায় পাওয়া গেছে ?'

'ছাতে ।'

দক্ষিণেশ্বরে স্বপনের মামাবাড়ির ছাতের দৃশ্যটা মনে পড়ল বিমানের । সে ওখানে কয়েকবার গেছে । দেখবার মতন ছাত একটা । পুরনো আমলের বাড়ি, মস্ত বড় ছাত । সেখানে অন্তত দেড়শটা নানা জাতের ফুলের টব । কত রকমের ফুলই না রয়েছে সেখানে ! বেশির ভাগ ফুলেরই নাম জানে না বিমান । স্বপন অবশ্য জানে । স্বপন গাছপালা খুব ভালবাসে । ওই ছাতের বাগানটার জন্যেই স্বপন মাঝে মাঝেই মামার বাড়িতে যায় । ছাঁতের মাঝখানে খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা ঘর আছে । মামার বাড়িতে থাকার সময় সেখানে বসেই স্বপন পড়াশুনা করে ।

প্রিয়ব্রত একটু পরে বলল, 'শুনলুম, কাল দুপুরেই নাকি ওখানকার একটা ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল স্বপনের !'

বিমান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্বপন ঝগড়া করেছিল ? যাঃ !'

স্বপনের চেহারা রোগা পাতলা, মাথার চুল কোঁকড়া কোঁকড়া, চোখে পুরু লেন্সের ওই চশমা ছাড়া স্বপন প্রায় দেখতেই পায় না। স্বপন সব সময় হাসিঠাট্টা করতে আর মজা করে কথা বলতে ভালবাসে, কখনও রেগে যায় না। সেই স্বপন কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছে, এ কথা শুনলে তো আশ্চর্য হতেই হয়।

প্রিয়ব্রত বলল, 'ওদের পাড়ায় গুণ্ডা মতন কিছু ছেলে আছে জানিস তো? তাদের কাজই হল লোকের সঙ্গে পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করা। সেই রকমই একটা ছেলে–'

'কিন্তু তারা ঝগড়া করতে চাইলেও স্বপন তো উলটে ঝগড়া করার ছেলে নয়!'

'শোন্ না! দুপুরবেলা স্বপন ওই ছাতের ঘর বসে বই পড়ছিল। এক সময় সামনের রাস্তায় খুব চ্যাঁচামেচি হচ্ছে শুনে সে উঠে এসে রেলিং দিয়ে উঁকি মারল। রাস্তায় কতকগুলো বেশ বড় বড় ছেলে তখন ক্যাম্বিশ বল্ দিয়ে ক্রিকেট খেলছিল। স্বপনকে দেখতে পেয়েই তারা বলল, তাদের বলটা ওভারবাউণ্ডারি হয়ে ওদের ছাতে চলে এসেছে। সেটা ফেলে দিতে বলল তারা। স্বপন এতক্ষণ বই পড়ছিল মন দিয়ে, বলটা পড়েছে কিনা টেরই পায়নি। তাছাড়া অতবড় ছাতের কোনও একদিকে বল পড়লে টের না পেতেও পারে। সে খোঁজাখুঁজি করেও বলটা পেল না। চেঁচিয়ে ওদের বলল যে, বলটা পাওয়া গেল না বোধহয় উড়ে অন্য কোথাও গিয়ে পড়েছে। কিন্তু রাস্তার ওই ছেলেগুলো শুনবে কেন সে কথা? ওরা বললে যে ওরা নিজেরা এসে দেখতে চায়। ওদের বাধা দেবারও উপায় নেই। ওরা উঠে এল ছাতে—'

হঠাৎ প্রিয়ব্রত ঘ্যাঁচ্ করে ব্রেক কষল। রাস্তার মাঝখানে ড্রপ খাচ্ছে একটা ক্যাম্বিশ বল, আর সেটা ধরার জন্য পাগলের মতন্ ছুটে আসছে একটা ছেলে। দেখা গেল ডান পাশের গলিতে ইটের উইকেট সাজিয়ে ক্রিকেট খেলা চলেছে।

ছেলেটা বলটা কুড়িয়ে নিয়ে যাবার পর প্রিয়ব্রত আবার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, 'শীত কবে শেষ হয়ে গেছে, এখনও পাড়ায় পাড়ায় গলির মধ্যে ক্রিকেট খেলা চলছে। মনে হয় ভিশি কি কপিলের অভাব হবে না আমাদের দেশে।' তারপর একটু দুঃখের সুরে বলল, 'কত ছেলে যে চাপা পড়ে এইভাবে।'

'প্রিয়দা, তুমি কখনও গলিতে ক্রিকেট খেলেছ?'

'খেলেছি বই কি। উপায় কি বল্, কলকাতায় কটাই বা খেলার মাঠ আছে!'

'যাক্‌গে, এখন বল স্বপনের ওখানে কি হল তারপর? এতসব কথা তোমায় জানালই বা কে?'

'স্বপনের ছোটমামা ইন্দ্রবাবু। তিনিই তো আমায় টেলিফোন করেছিলেন। তুই হয়তো জানিস না, ওই ইন্দ্রদার কাছে আমি পড়েছি এক সময়। ইন্দ্রদার ধারণা,

আমি এখনও পুলিশে কাজ করি ।'

'বুঝেছি । তারপর ?'

'ছেলেগুলো তো ছাতে এসে বলটা খোঁজাখুঁজি করতে লাগল । কিছুতেই আর পায় না । ওদের ছাতে অত ফুল গাছ, তার মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে আছে বলটা ! খুঁজে পাওয়া সত্যিই শক্ত !'

'তাতে স্বপনের সঙ্গে ওদের ঝগড়া হবে কেন ?'

'ওদের ধারণা হল, স্বপন বলটা লুকিয়ে রেখে, ইচ্ছে করেই ওদের দিচ্ছে না ।'

'স্বপন তা করতেই পারে না ।'

'সে তো তুই বলছিস । কিন্তু ওদিকে ব্যাপারটা কি হল জানিস, স্বপন ওদের সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়েই মুশকিল বাধাল । ওদের মধ্যে বেশ একটা ষণ্ডা-গুণ্ডা মতন চেহারার ছেলের হাতে ছিল ব্যাট । স্বপন তাকে বলল, আপনিই বল্টা মেরেছিলেন তো ? আপনার যা চেহারা, তাতে মনে হয় আপনি এত জোরে হাঁকড়েছিলেন যে বল্টা এতক্ষণে উড়তে উড়তে স্বর্গে পৌঁছে গেছে !

'সেই কথা শুনে রেগে গেল ছেলেটা, বলল, খুব তো দাঁত বের করে কথা বলা হচ্ছে । এখন বলটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, বার কর তো চাঁদু ! স্বপন তার উত্তরে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে একটা ফুট্‌কি দেখতে পাচ্ছেন, ও-–ই যে মনে হচ্ছে আপনার বল্টা এখন স্বর্গের দিকে ছুটে চলেছে !'

'স্বপনের এই রকম ইয়ার্কি করাই তো স্বভাব !' বলল বিমান !

'কিন্তু সবাই তো ইয়ার্কি বোঝে না, আর হাসতেও জানে না ! রেগে যাওয়া বরং সহজ । স্বপনের কথা শুনে সেই ছেলেটা রেগে গর্‌গর্‌ করতে লাগল । ওদিকে অন্য ছেলেরা বল্টা খুঁজতে গিয়ে ততক্ষণে ফুলগাছগুলো একেবারে তছনছ করেছে, দু' একটা টব উল্টেও দিয়েছে । তাই দেখে স্বপন ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, আপনারা এভাবে গাছ নষ্ট করছেন কেন ? পুরনো বল্টা গেছে যাক্‌, আপনাদের আমি একটা নতুন বল কেনার পয়সা দিয়ে দিচ্ছি । যে-ই না এই কথা বলা, অমনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, সেই ছেলেটা । দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, বড্ড যে টাকার গরম দেখাচ্ছ চাঁদ ! আমাদের চেন না দেখছি, । বলটা এক্ষুনি বের কর, নইলে তোমার মুণ্ডুটা নিয়ে আজ ক্রিকেট বল্‌ বানাব !'

বিমান হেসে উঠল ।

প্রিয়ব্রত বলল, 'তুই হাসছিস ! কিন্তু ওই সব ছেলেদের বিশ্বাস নেই, যখন খুশি যা-তা কাণ্ড করে ফেলতে পারে ।'

বিমান বলল, 'স্বপন শান্ত ছেলে, কিন্তু আমি হলে তক্ষুনি ওই ছেলেটার মুখের মতো জবাব দিতুম। হ্যাঁ, তারপর কী হল ?'

'তারপর স্বপনের ছোট মামা এসে ছেলেগুলোকে বল্ কেনবার জন্যে পাঁচটা টাকা দিলেন। ওরা টাকাটা নিল ঠিকই, কিন্তু স্বপনের ওপর ওদের রাগ রয়েই গেল। যাবার সময় সেই ছেলেটা বলে গেল, বিকেলের মধ্যে আমাদের বলটা যদি ফেরত না পাই, তা হলে দেখ তোমার কী হয় !'

'এবার বুঝলুম, ইন্দ্রমামা কেন সকালবেলা তোমাকেই ফোন করেছিলেন।'

'ওঁরা বরানগর থানাতেও খবর দিয়েছেন। আমিও ওখানকার থানায় খবর দিলুম। ও. সি. আমার চেনা। ও. সি আমায় বললেন স্বপনদের মামার বাড়ির পাড়ায় ছোট এককড়ি নামে একটি উঠতি মস্তান আছে। খুব রগচটা, মারামারি করে একবার জেলও খেটেছে। কিন্তু সে যে স্বপনদের কোনও ক্ষতি করেছে, তার কোনও প্রমাণ নেই। ছেলেটা শুধু মুখে ভয় দেখিয়েছে, আর কিছু করেনি। স্বপনও কাল সারাদিনে একবারও বেরোয়নি বাড়ি থেকে।'

'স্বপন কাল অজ্ঞান হয়েছে কখন ?'

'রাত সাড়ে নটা-দশটার সময়। ওদের বাড়িতে শিবু বলে একটা ছেলে কাজ করে। সে ছাতে এসেছিল স্বপনকে খাবার জন্যে ডাকতে। এসে দেখল ছাতের ঘরটার ঠিক দরজার সামনেই মাটিতে চিত হয়ে পড়ে আছে স্বপন। অনেকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে সে—'

গাড়িটা আবার আটকাল শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে। ট্রাফিক জ্যাম। ওদের জিপটার ঠিক গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট গাড়ি। সে—গাড়িতে এক ভদ্রলোকের পাশে বসে আছে একটা ন'-দশ বছরের ছেলে। বোধহয় স্কুলে যাচ্ছে। বাচ্চা ছেলেটি জিপটার দিকে দেখিয়ে বলল, 'বাবা, দ্যাখ, দ্যাখ কি রকম লাল টুকটুকে জিপ গাড়ি। আমার ওই রকম একটা খেলনা জিপ আছে না ?'

প্রিয়ব্রত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

বিমান বলল, 'সত্যি প্রিয়দা, তুমি গাড়িটার এমন রং করেছ, ঠিক যেন মনে হয় ডিংকি টয়। সবাই তাকিয়ে দেখে !'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আমি তো তাই-ই চাই !'

একটু বাদে গাড়িটা শ্যামবাজার পেরিয়ে বি টি রোড ধরে ছুটতে লাগলো।

বিমান জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ কি এই ছোট এককড়ি না কী যেন ওই ছেলেটাকে ধরেছে ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ধরবে কেন ? বিনা প্রমাণে পুলিশ কারুকে ধরে রাখতে পারে ? পুলিশ ভোরবেলা ওর কাছে গিয়ে কিছু কথা জিজ্ঞেস করে এসেছে। ছোট এককড়ি বলেছে, সে কিছু জানে না।

সামান্য একটা ক্যাম্বিশের বলের জন্য সে কি কাউকে মারতে পারে ?'

'ধর, এমন তো হতে পারে, ওই ছোট এককড়ি বা অন্য কেউ চুপি চুপি সন্ধের পর ও-বাড়ির ছাতে উঠে এসে স্বপনকে কিছু দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে পালিয়েছে !'

'তুই তো আচ্ছা বুদ্ধু ! মারলে দাগ থাকবে না ? রক্ত বেরবে না ? সে-সব কিছুই নেই।'

'শুনেছি রবারের ডাণ্ডা কি বালির বস্তা দিয়ে মারলে কোনও দাগ থাকে না, রক্তও বেরোয় না, কিন্তু খুব লাগে।'

'ধুত্। ওসব তো পুলিশী মার। এই সব রগচটা ধরনের গুণ্ডা ছেলেরা ঝগড়ার সময় হাতের কাছে যা পায় তাই দুম্ করে মেরে বসে। পরিকল্পনা করে, বুদ্ধি খাটিয়ে মারা ওদের স্বভাব নয়। তা ছাড়া যে-সব ছেলে ক্রিকেট খেলে, তারা কখনও কখনও মারামারি করতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ খুন করে না।'

'খুন ?'

'স্বপন বারো ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে আছে। যদি এমন মার কেউ মারে, যাতে একজনকে বারো ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকতে হয়, তা হলে তো সে খুনও হয়ে যেতে পারে।'

বিমান হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

জিপটা এবার দক্ষিণেশ্বরের দিক বাঁক নিল। খানিকক্ষণ বিমান কোন কথাই বলছিল না। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'একটানা বার ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকা খুব খারাপ, তাই না প্রিয়দা ?'

প্রিয়ব্রত উত্তর দিল, 'খারাপ তো বটেই ?'

২

স্বপনের মামার বাড়ির গলিটার মুখেই একটা চায়ের দোকান।

প্রিয়ব্রতর জিপটা যখন ওখানে পৌঁছুল তখন ওই দোকানটার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল কতকগুলো ছেলে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় বেকার। বিমান আর প্রিয়ব্রত দু'জনেই তাকাল ওদের দিকে। কে জানে এই ছেলেদের দলটাই হয়তো কাল গলিতে ক্রিকেট খেলছিল। এদের মধ্যেই বোধহয় কারুর নাম ছোট এককড়ি। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ফিসফিস করে। স্বপন যে অজ্ঞান হয়ে

আছে, সে কথা ওরা নিশ্চয়ই জানে । সেই কথাই বোধ হয় বলাবলি করছে—ভাবল বিমান ।

জিপটা থামল একটা লোহার গেটওয়ালা বাড়ির সামনে । আরও দুটো গাড়ি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে একটা গাড়ি ডাক্তারের । প্রিয়ব্রত আর বিমান জিপ থেকে নেমে আস্তে আস্তে ঢুকল বাড়ির মধ্যে ।

বাড়িতে তখন অনেক লোকজন । ভবানীপুর থেকে স্বপনের বাবা-মা এসে পড়েছেন । এখানকার একজন ডাক্তার তো রয়েছেনই স্বপনের বাবাও তাঁদের আত্মীয় একজন বড় ডাক্তারকে এনেছেন সঙ্গে করে । দুই ডাক্তার বসে আছেন স্বপনের খাটের দু'পাশে ।

স্বপন শুয়ে আছে চিত হয়ে । চোখ দুটো বোজা, ঠিক মনে হয় যেন ঘুমিয়ে আছে । স্বপনের দিকে তাকিয়েই বিমানের মনে হল স্বপনকে যেন একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে । কী যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে তার মুখে ! কিন্তু সেটা যে কী তা বিমান ঠিক ধরতে পারল না । স্বপনের চোখে এখন চশমা নেই, সেই জন্যেই কি ওই রকম দেখাচ্ছে তাকে ?

অসুস্থ লোকের কাছে গেলেই লোকে একবার তার কপালে হাত ছোঁয়ায় । বিমানও স্বপনের শিয়রের কাছে গিয়ে তার কপালে হাত রাখল । নাঃ, স্বপনের জ্বর নেই, কপালটা বেশ ঠাণ্ডা ।

বিমান স্বপনের মাথাটা ধরে জোরে নাড়িয়ে ডাকল, 'স্বপন, এই স্বপন !'

একজন ডাক্তার বললেন, 'উঁহু, ও-রকম কর না, ওতে লাভ হবে না ।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ওকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় কাকাবাবু ?'

স্বপনের বাবার সঙ্গে যিনি এসেছেন, সেই ডক্টর সোম বললেন, 'আমার তো তাই মনে হয় ।'

স্বপনের বাবা তাকালেন স্বপনের বড় মামার দিকে । বড় মামা হাসপাতাল-টাসপাতালের মতন জায়গাগুলোকে খুব ভয় পান । ওঁর ধারণা, হাসপাতালে কেউ একবার গেলে সে আর বাড়ি ফেরে না । তিনি বললেন, 'কেন, হাসপাতালে নিতে হবে কেন ? এখানে ওর চিকিৎসা হতে পারে না ? কী যে হয়েছে ছেলেটার, সেটাই তো আপনারা এখনও ধরতে পারলেন না ?'

স্থানীয় ডাক্তারটি বললেন, 'সত্যিই ধরতে পারছি না । শরীরে কোনও রোগের লক্ষণ নেই, আঘাত কি রক্তপাতের চিহ্নও নেই । কাল সারা দিনই যে সুস্থ ছিল, সে হঠাৎ অজ্ঞানই বা হয়ে গেল কেন আর এতক্ষণ অজ্ঞান হয়েই বা থাকবে কেন ? ব্লাড প্রেশার ঠিক আছে । পাল্‌স বিট একটু স্লো, তাও প্রায় স্বাভাবিকই

ধরা যায় । সুতরাং এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকার কোনও কারণই বোঝা যাচ্ছে না ।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ধরুন, কোনও ভারি কিছু জিনিস দিয়ে কেউ যদি ওর মাথায় মারে—'

বড়মামা বলেন, 'কে মারবে ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সেটা না হয় পরে দেখা যাবে...যদি সে রকমভাবে কেউ মারে যাতে কাটল না কি রক্ত বেরুল না, কিন্তু ভেতরে আঘাত লাগল—'

স্থানীয় ডাক্তারটি বললেন, 'ভারি কোনও জিনিসের আঘাত লাগলে জ্ঞান হারাতে পারে । কিন্তু তাতে তো কেউ এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকে না ।'

ডাক্তার সোম বললেন, 'আমি পি জি-তে আছি । সেখানে ওকে নিয়ে গেলে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে ।'

স্বপনের ছোটমামা ইন্দ্রবাবু বড়মামাকে বললেন, 'দাদা, আমারও মনে হয় হাসপাতালে পাঠানই উচিত । হাসপাতালে নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতির যত সুবিধে পাওয়া যায়—'

বড়মামা ভয়-পাওয়া মুখে বললেন, 'পি-জি তো অনেক দূরে । এতখানি রাস্তা—'

প্রিয়ব্রত এই সময় চোখের ইশারায় বিমানকে ডেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । বিমান তার কাছে যেতেই প্রিয়ব্রত বলল. 'চল্, ছাতটা একবার দেখে আসি ।'

ছাতের দরজায় খিল দেওয়া । খিল খুলে ওরা ঢুকল ভেতরে । সমান সাইজ করে একটা ফুল গাছের টব সাজান । মাঝখানে দাঁড় করান আছে অনেক প্ল্যাস্টিকের পাইপ । ছাতের ট্যাঙ্ক থেকে ওই পাইপগুলোতে করে সব টবে জল দেওয়া হয় । দেখে মনে হচ্ছে আজ সকালে গাছে জল দেওয়া হয়নি ।

প্রিয়ব্রত ছাতটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'এত বড় ছাতে একটা বল হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া সত্যিই খুব শক্ত ।

বিমান এগিয়ে গেল খড়ের ঘরটার দিকে । ভারি সুন্দর ঘরটা । ঠিক মনে হয় গ্রামের একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর কেউ যেন শহরের এক তিনতলায় বাড়ির ছাতের ওপর বসিয়ে দিয়েছে । ঘরটায় রয়েছে একটা টেবিল, দুটো চেয়ার আর একটা ইজিচেয়ার ।

টেবিলের ওপরে স্বপনের বইপত্র ছড়ান, একটা বই উল্টে পড়ে আছে মাটিতে । বিমান বইটা তুলে দেখল এভারেস্ট অভিযানের ওপর লেখা একটা ইংরেজি বই । এই বইটা বিমানই স্বপনকে উপহার দিয়েছিল ।

টেবিল ল্যাম্পটা তখনও জ্বলছে । কাল রাত্তিরে স্বপনকে এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখার পর গোলমালের মধ্যে কারুর আর আলোটা নিবিয়ে দেওয়ার কথা মনে পড়েনি । এ ঘরে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্নই কিন্তু ছিল না ।

এমন সময় প্রিয়ব্রত ঘরে ঢুকে বিমানের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'এই দ্যাখ্ ।'

প্রিয়ব্রতর হাতে কাদামাখা নোংরা একটা ক্যাম্বিশের বল্ ।

বিমান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এসেই ওটা খুঁজে পেলে ? ওরা সবাই মিলে খুঁজল —'

হাসতে হাসতে প্রিয়ব্রত বলল, 'ওদের চেয়ে আমার খোঁজাটা একটু অন্যরকম হবেই । হাজার হলেও এক সময় পুলিশে চাকরি করেছি তো ।'

'কোথায় পেলে ?'

'ব্যাপারটা হয়েছিল কী জানিস্ ? ওরা টবগুলো সরিয়ে সরিয়ে তার আড়ালে বল্টা আছে কি না খুঁজেছে । কিন্তু বলটা ছিল একটা টবের মাটিতে আধখানা গাঁথা অবস্থায় । ফলে মাটির রং আর বল্টার রং তো প্রায় একই হয়ে গিয়েছিল, তাই ওদের চোখে পড়েনি । যাক্ একটা জিনিস প্রমাণ হল যে স্বপন ইচ্ছে করে ওদের বলটা লুকিয়ে রাখেনি !'

'আমি তো বলেই ছিলুম, স্বপন ও-রকম কাজ কক্ষোনও করবে না ।'

'বলটা দেখছি বেশ পুরনো । এইরকম একটা সামান্য বলের জন্যে কেউ রাত্তিরবেলা চুপি চুপি ছাতে উঠে স্বপনের মাথায় ডাণ্ডা মেরে যাবে, এটা বিশ্বাস করা যায় না । তবে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছি । অন্তত চারটে ফুলের টব কাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে । কিন্তু...কেন ?'

'পাড়ার ছেলেরা দুপুরে খোঁজার জন্যে কয়েকটা টব উলটে দিয়েছিল, তুমিই তো বলেছ ।'

'এই তো তোদের দোষ, বিমান ! তোরা যুক্তি অনুসরণ না করেই মতামত দিয়ে ফেলিস । ছেলেরা দুপুরবেলা টব উলটে দিতে পারে, কিন্তু তারপরও তো স্বপন বহুক্ষণ ছাতে ছিল । স্বপন ফুলগাছ ভালবাসে । তার পক্ষে কি স্বাভাবিক ছিল না, টবগুলো আবার সোজা করে দেওয়া ? কাত হয়ে পড়ার জন্যে অন্তত দুটো ফুলগাছের বেশ ক্ষতি হয়েছে দেখলুম !'

তা-ও তো ঠিক । স্বপনের একটা অদ্ভুত অভ্যেস আছে । মামার বাড়িতে ও যখনই এসে থাকে, প্রত্যেকদিন খুব ভোরে আর বিকেলবেলা ও প্রত্যেকটা ফুলগাছের গায়ে হাত বুলোয় । ওর ধারণা গাছেদের আদর করলে গাছরা তা টের পায় । তারা খুশি হয় !

আর ধারণাটা বিশেষ ভুলও নয় । আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিকও এই কথা বলেন । গাছদের শুধু যে প্রাণ আছে তা নয়, তাদের অনুভূতিও আছে । একজন অকারণে গাছের পাতা ছেঁড়ে আর একজন গাছকে আদর করে—এই দু'ধরনের লোকেদের গাছেরা চিনে রাখে ।

বিমান কিছুক্ষণ এইসব ভেবে প্রিয়ব্রতকে বলল, 'তার মানে তুমি বলতে চাও, স্বপন অজ্ঞান হয়ে যাবার পর এই টবগুলো কেউ উলটে দিয়েছে ?'

'সেটা ভেবে দেখতে হবে ।'

এই সময় নিচ থেকে ওদের ডাক পড়ল । স্বপনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ঠিক হয়েছে । একবার কথা হয়েছিল, অ্যামবুলেন্স ডাকা হবে । কিন্তু তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে বলে এখন ডক্টর সোমের গাড়িতেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্বপনকে ।

ধরাধরি করে একতলায় নামান হল স্বপনকে । এই সময় স্বপনের মা কাঁদতে শুরু করে দিলেন । এতক্ষণ কেউ কাঁদেনি, এই প্রথম কান্না । স্বপনের মাকে কাঁদতে দেখে বড়মামারও চোখে জল এসে গেল ।

স্বপনের বাবা কিন্তু বেশ শক্ত আছেন । ডক্টর সোমের গাড়ির পেছনের সিটে শুইয়ে দেওয়া হল স্বপনকে । ওর বাবা বললেন, 'বিমান, তুই ওর মাথাটা কোলে নিয়ে বোস্, আমি সামনে বসছি ।'

আগে আগে চলল প্রিয়ব্রতর জিপ, তারপর ডক্টর সোমের গাড়ি । মোড়ের চায়ের দোকানটার কাছে এসে প্রিয়ব্রত ছেলেদের দলটার দিকে বল্‌টা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এই যে ! একটা টবে গেঁথে ছিল ।'

স্বপনের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে থাকা অবস্থায় বিমানের বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল । স্বপন অজ্ঞান হয়ে আছে, কোনও কথা বলছে না, এ-রকম অবস্থায় স্বপনকে সে কখনও দেখেওনি । স্বপনের যদি আর জ্ঞান না ফেরে !

গাড়ি অনেকটা চলে এসে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে যখন যাচ্ছে, তখন স্বপন চোখ মেলল । অবাক চোখে তাকিয়ে বললে, 'কে ? আমি কোথায় ?'

ডক্টর সোম সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা থামিয়ে দিলেন । বিমান বলল, 'স্বপন, স্বপন ! জ্ঞান ফিরেছে তোর ? আমি বিমান ।'

স্বপনের বাবা পেছন দিকে ফিরে ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, 'ওরে স্বপন, এই দ্যাখ্ আমি ।'

সারা শরীরটা ধনুকের মতন বাঁকিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে স্বপন হঠাৎ অদ্ভুত বিকৃত গলায় খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই ! ওই ! সবুজ আলো ! সবুজ আলো !'

তারপরই আবার ধপ্ করে পড়ে গেল বিমানের কোলে । আবার সে অজ্ঞান ।

৩

পি. জি.-তে স্বপনের জ্ঞান ফিরল দু'দিন পরে। প্রথম চোখ মেলেই সে ডেকে উঠল, 'মা!'

হাসপাতালের ডাক্তাররা এই দু'দিন হাজার চেষ্টা করেও তার অসুখ যে কি তা ধরতে পারেননি। অনেক রকম ওষুধ দিয়েও কোনও কাজ হয়নি।

স্বপনের মা সেই সময় হাসপাতালেই ছিলেন। স্বপনের জ্ঞান ফিরেছে শুনে তিনি ছুটে এসে ঢুকলেন কেবিনের মধ্যে। স্বপনের হাত ধরে বললেন, 'কি রে, খোকা! ওঃ, আমি যে ঠাকুরকে কত ডাকছিলুম তোর জন্যে—'

স্বপন উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, 'মা, আমি হাসপাতালে কেন?'

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন নার্স। মা কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, 'উঠো না, উঠো না, তোমার শরীর এখনও দুর্বল!'

স্বপন খাট থেকে নেমে বলল, 'দুর্বল! কই, আমি তো একটুও দুর্বল নই। আমার চশমাটা কোথায়?'

বিমান আর প্রিয়ব্রত বসেছিল হাসপাতালের মাঠে। খবর পেয়ে তারা ভেতরে আসবার আগেই স্বপন বেরিয়ে এল বাইরে। তার পেছন পেছন ছুটে এল হাসপাতালের কয়েকজন আর্দালি আর নার্স।

স্বপন বাইরে এসেই বলল, 'বিমান তুই? প্রিয়দা তুমি? ব্যাপার কি! আমাকে এরা হাসপাতালে আটকে রেখেছে কেন?'

স্বপনকে এ-রকম সুস্থ অবস্থায় হঠাৎ বেরিয়ে আসতে দেখে বিমান এমনই খুশিতে অভিভূত হয়ে গেল যে কোনও কথাই বলতে পারল না। শুধু বলল, 'তুই...তুই...'

প্রিয়ব্রত বলল, 'উঃ, কি চিন্তাতেই ফেলেছিলি আমাদের! আমরা ভাবলুম তুই বুঝি এবার মরেই গেলি।'

স্বপন বলল, 'কেন, আমার কি হয়েছিল?'

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল 'কিচ্ছু মনে নেই তোর?'

স্বপন বলল, 'কি মনে থাকবে? আমি...আমি তো দক্ষিণেশ্বরে মামার বাড়ি গিয়েছিলুম...তারপর রাত্তিরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ছাতে...সেখান থেকে হাসপাতালে এলুম কি করে!'

একজন নার্স একজন ডাক্তারকেও ডেকে এনেছেন এর মধ্যে। তিনি এসে বললেন, 'এই যে স্বপন, তুমি তো দেখছি ভাল হয়ে গেছ বাঃ, ফাইন! একবারটি ভেতরে এস, তোমাকে একটু চেক্‌আপ করে নিই।'

স্বপন আর কিছুতেই হাসপাতালের মধ্যে ঢুকতে চায় না। সে বলল, হাসপাতাল জায়গাটাই তার বিচ্ছিরি লাগে। এখানে কি রকম একটা গন্ধ থাকে, সেটা তার মোটেই সহ্য হয় না!

প্রিয়ব্রত আর বিমান অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে নিয়ে গেল ভেতরে। তারপর ওকে শুইয়ে দেওয়া হল একটা উঁচু মতন খাটে। দু'জন ডাক্তার নানারকম করে ওকে পরীক্ষা করে দেখলেন। এর মধ্যে স্বপনদের আত্মীয় সেই ডাক্তার সোমও এসে পড়লেন। তিনি সব দেখে-শুনে বললেন, স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ; ওর শরীরে এখন তো কোনও রকম রোগের লক্ষণ নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ ছেলে, অথচ প্রায় তিনদিন অজ্ঞান হয়ে রইল!'

শুয়ে থাকা অবস্থাতেই স্বপন বলল, 'আমি তিন দিন অজ্ঞান হয়েছিলুম। না, না, হতেই পারে না।'

একটু বাদেই ডাক্তাররা স্বপনকে ছেড়ে দিলেন, তাকে এখন আর হাসপাতালে আটকে রাখার কোনও মানেই হয় না।

বাইরে এসে ওরা উঠল প্রিয়ব্রতর লাল রঙের জিপ গাড়িটায়।

স্বপন বিমানকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার সত্যিই কি হয়েছিল বল তো।'

বিমান বলল, 'বাঃ, সেটা তো তুই-ই আমাদের বলবি।'

স্বপন বলল, 'আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে মামার বাড়ির ছাতের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তোর মাথায় কি কেউ মেরেছিল হঠাৎ?'

স্বপন বলল, 'না তো। আমায় আবার কে মারবে? কেনই বা মারবে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সেদিন দুপুরে ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়েছিল, ছোট এককড়ি বলে একটা ছেলে তোকে মারবে বলে শাসিয়েছিল, সে কথা মনে আছে?'

স্বপন বলল, 'হ্যাঁ, আছে। সে তো একটা বলের ব্যাপারে... না, না, সে ছেলেটা ছাতে উঠে আমায় মারবে কি করে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সে-ই তো সমস্যা! কেউ মারল না, তবু তুই অজ্ঞান হলি কি করে?'

বিমান বলল, 'প্রিয়দা, তোমাকে তো আমরা রহস্যভেদী বলি। এই রহস্যের তুমি সমাধান করতে পার না? কিছু একটা হয়েছিল নিশ্চয়।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আমি কাল স্বপনের মামার বাড়ি ঘুরে এসেছি একবার। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

পরের দিন থেকে স্বপন কলেজে যাওয়া শুরু করল । তার সব কিছুই আবার আগের মতন স্বাভাবিক । শুধু মাঝখানে ওই তিনদিন সে অজ্ঞান হয়েছিল । স্বপনকে অনেকে মিলে জেরা করেও কিছু ফল হয়নি । সে কেন অজ্ঞান হয়েছিল, সে সম্পর্কে তার নিজেরই কোনও ধারণা নেই । ব্যাপারটা একটা ধাঁধাই রয়ে গেল ।

৪

দিন সাতেক পরে একদিন প্রিয়ব্রত হন্তদন্ত হয়ে হাজির হল বিমানের বাড়িতে । সেদিন ওদের কলেজের ছুটি ছিল । ছাতের ওপর একটা ছোট ঘরে বিমান পড়াশুনা করে । প্রিয়ব্রত সেখানে উঠে এসে বলল, 'কী রে বিমান, পড়ছিস ?'

বিমান বলল, 'আর বল কেন প্রিয়দা ? আজ ছুটি, কালই আবার ফিজিক্স অনার্স-এর পরীক্ষা নেবে বলেছে !'

প্রিয়ব্রত হঠাৎ বলল, 'হ্যাঁ রে, আজকের খবরের কাগজ পড়েছিস ?'

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে বিমান একটু অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, পড়েছি তো । কেন ?'

—'তোর খট্‌কা লাগেনি ? খবরটা দেখেছিস ?'

—'কিসের জন্যে খট্‌কা লাগবে ?' তুমি কোন্ খবরটার কথা বলছ ?

—'এই তো তোদের দোষ । ভাল করে খবরের কাগজটাও পড়িস না ! আমি রোজ সকালে উঠে তিনখানা কাগজ তন্ন তন্ন করে পড়ি !'

—'তোমাকে তো আর কলেজের পড়াশুনো করতে হয় না, প্রিয়দা ।'

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজের পাতা বার করে সেটা ছড়িয়ে ধরল । তারপর বলল, 'এই যে তোর জন্যে নিয়ে এসেছি । এই জায়গাটা পড়ে দ্যাখ্ ।'

একটা ছোট্ট খবরের চারদিকে লাল পেন্সিলের দাগ ! মফস্বলের সংবাদদাতার খবর । ওপরে লেখা আছে —

"বালকের অদ্ভুত ব্যাধি"

তার নিচের খবরটা এই ঃ মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে এক আদিবাসী বালকের অদ্ভুত একটা অসুখ হয়েছে । একদিন সন্ধেবেলা সে একটু বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল, তারপর সারা রাত তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি । পরের দিন সকালবেলা দেখা গেল, সে একটা মাঠের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে । তার শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। নিশ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক । তবু অনেক চেষ্টা করেও তার জ্ঞান ফেরান যায়নি । গ্রামের মানুষ সবাই ভূতপ্রেতে দারুণ বিশ্বাসী । ছেলেটির বাড়ির লোকেরা

প্রথমে ভেবেছিল, রাত্তিরে ছেলেটাকে বোধ হয় ভূতে পেয়েছে । রোজা, ঝাড়-ফুঁক সব চলল, কিন্তু কিছুতেই জ্ঞান ফিরছে না দেখে পরে তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে । ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে সে দু'দিন ধরে অজ্ঞান হয়ে আছে, ডাক্তাররাও কিছুই করতে পারছে না । তবে মাঝে মাঝে সে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে 'সবুজ বাত্তি সবুজ বাত্তি' বলে চিৎকার করে ওঠে, তারপরই আবার ধপ করে বিছানায় পড়ে যায় । ছেলেটিকে দেখবার জন্যে হাসপাতালে বহু লোক ভিড় করে আসছে ।

খবরটা পড়ার পর বিমান প্রিয়ব্রতর চোখের দিকে তাকাল ।

প্রিয়ব্রত বলল, 'এবার বুঝলি ? এখানেও সবুজ আলো !'

বিমান বলল, 'স্বপনও সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, আর অত দূরে ঝাড়গ্রামে একটা ছেলে ঠিক একইভাবে একই কথা বলছে ! খুবই আশ্চর্য মিল তো !'

—'নিশ্চয়ই ! শোন্ আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে । চল্ ঝাড়গ্রাম ঘুরে আসি ।'

—'কবে' —

—আজই । আজ তো তোদের ছুটি । আমার জিপে ঝাড়গ্রামে যেতে ঘণ্টা চারেকের বেশি লাগবে না । চল্ ছেলেটাকে দেখে আসি ।

—'কালকের মধ্যে ফিরতে পারব ?'

—'কেন পারব না ? নে, চটপট তৈরি হয়ে নে ।'

—'প্রিয়দা, তুমি বাবার কাছ থেকে পারমিশনটা নিয়ে নাও । কাল আবার পরীক্ষার ব্যাপারটা আছে তো ।'

'সে তোকে ভাবতে হবে না, আমি ম্যানেজ করছি । তুই তাড়াতাড়ি কর ।'

—'প্রিয়দা, স্বপনকে সঙ্গে নেবে না ?'

প্রিয়ব্রত ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করতে লাগল ।

বিমান বলল, 'এক কাজ করা যাক্ না । স্বপনকে আসল ব্যাপারটা কিছু বলবার দরকার নেই । ওকে বলব, চল্, আজ ঝাড়গ্রাম থেকে বেড়িয়ে আসি ।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'স্বপনকে না নিলে হয় না !'

—'কিন্তু স্বপন যখন শুনবে তোমাতে আমাতে জিপে করে ঝাড়গ্রামে বেড়াতে গেছি, তখন ও কি ভাববে বল তো ? আমরা ওকে বাদ দিয়ে কখনও কোথাও গেছি ?'

—'আর তো কিছু নয়, আমার শুধু ভয় হচ্ছে, স্বপন যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে ?'

—'না, না । ও খুব ভাল আছে । কাল ও তো কলেজে ব্যাডমিন্টন খেলল ।'

—'তা হলে চল্, স্বপনকে ডেকে নেওয়া যাক্ ।'

৫

হঠাৎ ঝাড়গ্রাম যাবার প্রস্তাব শুনে স্বপন বেশ অবাক হল । খবরের কাগজের ছোট্ট খবরটা ও পড়েনি । ওকে কিছু জানানও হল না ।

বাইরে বেড়াতে যাবার ব্যাপারে স্বপনের চিরদিনই খুব উৎসাহ । ও আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল ।

স্বপন উঠে বসতেই প্রিয়ব্রত গাড়িটায় স্টার্ট দিল । কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা ছাড়িয়ে বালি ব্রিজের দিকে ছুটে চলল প্রিয়ব্রতর লাল জিপ ।

বালি ব্রিজের কাছেই দক্ষিণেশ্বরে স্বপনের মামার বাড়ি । সেখানেই ঘটেছিল দুর্ঘটনাটা ।

স্বপন অবাক হয়ে বলল, 'সবুজ আলো ? কিসের সবুজ আলো ?'

বিমান বলল, 'না, মানে বলছি যে খুব জোরাল সবুজ আলো হঠাৎ কখনও তোর চোখে পড়েছিল ?'

স্বপন বলল, 'হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন ?'

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়েই থেমে গেল । দেখল প্রিয়ব্রত ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আছে । যেন চোখ দিয়ে বলতে চায়, বিমানের এই প্রসঙ্গটা এখন তোলা উচিত হয়নি ।

কথাটা ঘোরাবার জন্যে প্রিয়ব্রত বলল, 'বিমানটার মাথায় যেন গোবর ভরা । সবুজ আলো তো সবাই দেখেছে । রেল লাইনের পাশে গ্রিন সিগ্ন্যাল দেখা যায় না । দূর থেকে জ্বলজ্বল করে ।'

প্রিয়ব্রতর কাছে ধমক খেয়ে বিমান আর মুখ খুলল না । স্বপনও বসে রইল চুপচাপ করে ।

ব্রিজ পেরিয়ে ওরা চলল দিল্লি রোড দিয়ে । খানিক দূর গিয়ে বাঁ দিকে আর একটা ব্রিজ পেরিয়ে পাওয়া গেল বম্বে রোড । এই রাস্তা দিয়েই ঝাড়গ্রাম যাওয়া যাবে ।

চা খাওয়ার জন্য ওরা থামল কোলাঘাটে ।

স্বপন বলল, 'প্রিয়দা, তুমি কিন্তু বড্ড জোরে চালাচ্ছ !'

প্রিয়ব্রত বলল, 'এই জিপটা নিয়ে বিশ্বভ্রমণে যাব কি না, তাই একটু প্র্যাকটিস করে নিচ্ছি !'

বিমান বলল, 'কবে বিশ্বভ্রমণে যাবে, প্রিয়দা ? তুমি তো অনেক দিন থেকেই বলছ । এবার দিন ঠিক কর, আমরা তৈরি হয়ে নিই ।'

—'তোরাও যাবি নাকি ?'

'নিশ্চয়ই ।'

—'তা হলে চল্, এই শীতেই বেরিয়ে পড়ি !'

স্বপন জিজ্ঞেস করল, 'প্রিয়দা, গ্রিসে যাবে তো ? ওঃ, গ্রিস—গ্রিস—আমার স্বপ্নের দেশ । যতবার ইতিহাস পড়ি, ততবারই আমার মনে হয়, একদিন না একদিন গ্রিসে যাবই ।'

প্রিয়ব্রত হেসে বলল, 'ঠিক আছে, তোকে আমরা গ্রিসেই রেখে দিয়ে আসব ।'

৬

কোলাঘাট থেকে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল ঝাড়গ্রাম । কিন্তু প্রথমেই তো আর হাসপাতালে যাওয়া যায় না, তাহলে স্বপন সন্দেহ করবে । কলকাতা থেকে এত দূরে এসেই কী আর কেউ একটা হাসপাতাল দেখতে যায় !

ডাকবাংলোয় একটা ঘর বুক করল প্রিয়ব্রত । লাল মাটি আর শাল গাছের ঠাস বুনুনির মাঝে ঝাড়গ্রাম শহরটা । ছোট্ট হলেও বেশ সুন্দর । তাছাড়া স্বাস্থ্যকর শহর বলেও এর খ্যাতি দেশজোড়া । ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামায় জায়গাটা যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠল ।

স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে ওরা ভাত খেয়ে নিল আগে । তারপর প্রিয়ব্রত বলল, 'বিমান, তুই স্বপনকে নিয়ে ডাকবাংলোতে গিয়ে বিশ্রাম কর, আমি একটু ঘুরে আসছি । আমার একজন চেনা লোক আছে এখানে, তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি ।'

বিমান বুঝতে পারল যে প্রিয়ব্রত এই ছুতোয় হাসপাতালটা একবার ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছে । যে-কোনও কারণেই হোক সেখানে এখনই স্বপনকে নিয়ে যেতে চায় না প্রিয়ব্রত ।

প্রিয়ব্রত অবশ্য একেবারে মিথ্যে কথাও বলেনি । এখানে সত্যিই তার চেনা লোক আছে একজন । এখানকার ডি এফ. ও. অর্থাৎ ডিষ্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার সুকোমল রায় ওর কলেজ জীবনের বন্ধু ।

প্রিয়ব্রত চলে যাবার পর স্বপন বিমানকে বলল, 'প্রিয়দা যার সঙ্গে দেখা করতে গেল, দেখে নিস্ তার সঙ্গে আজ দেখা হবে না ।'

বিমান চমকে উঠে বলল, 'তার মানে তুই জানিস প্রিয়দা কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ?'

—'না, তা জানি না ।'

—'তা হলে কি করে বুঝলি দেখা হবে না ।'

—'আমার মাঝে মাঝে এই রকম মনে হয় । প্রিয়দা ফিরে এলে দেখিস তুই, আমার কথা মেলে কি না । ঝাড়গ্রাম জায়গাটা বেশ সুন্দর তাই না রে, বিমান ? এখানে কটা দিন থেকে গেলে হয় না ?'

—'কাল কলেজ খোলা আছে ভুলে গেছিস ? আমার আবার একটা ক্লাস টেস্ট রয়েছে ।'

—'তা বলে আজ এসে আজই ফিরে যাব ?'

—প্রিয়দা বলেছে, সন্ধের পর রওনা হলে আমরা মাঝরাতের মধ্যে ফিরে যেতে পারি কলকাতায় ।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর চেয়ারেই হেলান দিয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল স্বপন ।

বিমান উঠে পায়চারি করতে লাগল বাগানে ।

একটু পরেই ফিরে এল প্রিয়ব্রত । বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল বিমানকে । বিমান কাছে যেতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'স্বপন কোথায় রে ?'

—'ঘুমোচ্ছে ।'

—'ভালই হল । ততক্ষণে কয়েকটা জরুরি কথা সেরে নিই । হাসপাতালে সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হল না রে ।

বিমান অমনি একবার চট্ করে পেছন ফিরে ঘুমন্ত স্বপনের দিকে তাকাল । তারপর বলল, 'আশ্চর্য ! স্বপন আগে থেকেই সে কথা বুঝল কি করে ? যাই হোক, ছেলেটার সঙ্গে দেখা হল না কেন ?'

—'আজকের খবরের কাগজে যে খবরটা বেরিয়েছে, সেটা আসলে পুরনো খবর । ঘটনাটা ঘটেছে কয়েকদিন আগে ! মফঃস্বলের খবর অনেক সময় এ-রকম দেরিতেই বেরয় । ইতিমধ্যে ছেলেটা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি চলে গেছে ।'

—'তা হলে ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না ?'

—'না রে না, আমি ছেলেটার নাম ঠিকানা জোগাড় করে এনেছি । ছেলেটা ঠিক ঝাড়গ্রামের ছেলে নয় । দইজুড়ি নামে একটা গ্রাম আছে এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে, সেখানে থাকে । ওর নাম শম্ভু মাহাতো । এক আদিবাসী চাষীর ছেলে, বছর দশেক বয়স ।'

—'এত দূরে এসে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে যাবে না ?'

—'দেখা তো করতেই হবে । আজ আর তা হলে কলকাতায় ফেরা হচ্ছে না ।'

—'কিন্তু আমার পরীক্ষার কি হবে ?'

—'আরে ক্লাস টেস্ট তো ? এর আগেকার টেস্টগুলো তো ভালই দিয়েছিস । এটা না দিলেও তোর কোনও ক্ষতি হবে না । আর তোদের আর স্বপনদের বাড়িতে আমি হাসপাতাল থেকেই ফোন করে দিয়েছি আমার সঙ্গে আছিস, তাই তাঁদের কোনও আপত্তিই নেই ।'

—'তুমি তো দেখছি আগেই আটঘাট বেঁধে নিয়েছ ?'

—'শুধু শুধু কি আর এতদিন পুলিশে কাজ করেছি ?'

—'তা তো বুঝলুম, কিন্তু দইজুড়ি গ্রামে ছেলেটার বাড়িতে আমরা হঠাৎ যাব, তারা কী ভাববে ?'

—'আমরা বলব আমরা খবরের কাগজের রিপোর্টার । কলকাতা থেকে এসেছি ওই ছেলেটার রহস্যময় অসুখের ব্যাপারটা জানবার জন্যে ।'

—'স্বপনকেও সব খুলে বলতে হয় তা হলে ?'

—'এক্ষুনি জানাবার দরকার নেই । বীজপুর নামে এদিকে আর একটা সুন্দর জায়গা আছে, সেখানে একটা ভাল বাংলোও আছে । আজ রাতটা আমরা সেখানেই কাটাব । বীজপুর যাবার পথেই দইজুড়ি গ্রাম । সেখান থেকে আমরা ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে যাব ।'

—'সেটাই ভাল হবে ।'

—'তুই এখন স্বপনকে ডেকে জিনিসপত্তর গুছিয়ে নে । আমি আমার বন্ধু ডি এফ ও'র সঙ্গে দেখা করে বীজপুরের বাংলোটা রিজার্ভ করে আসছি ।'

প্রিয়ব্রত আবার চলে যেতেই বিমান এসে স্বপনকে ডাকল ।

স্বপন চোখ মেলে বলল, 'যাঃ, কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি তো । একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলুম —'

বিমান বলল, 'তোর নামই তো স্বপন । নিশ্চয়ই তুই রোজই ঝুড়ি ঝুড়ি স্বপ্ন দেখিস । তাই না ? একেই বলে সার্থকনামা । হ্যাঁ, শোন তোর ইচ্ছেই পূর্ণ হল '

—'তার মানে ?'

—'আজ আর আমাদের ফেরা হচ্ছে না। আজ রাতটা থেকে যেতে হচ্ছে।'

—'হুর্‌রে। চমৎকার। কিন্তু থেকে যেতে হচ্ছে কেন ?'

—'প্রিয়দার কী একটা কাজ আছে এখানে। আজ হল না। কাল সকালে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ রাত্তিরে আমরা থাকব এর চেয়েও ভাল জায়গায়। আরও খানিকটা দূরে বীজপুর বলে একটা জায়গায় এর চেয়েও নাকি অনেক সুন্দর একটা বাংলো আছে।'

—'দারুণ ব্যাপার তো। আজ রাত্তিরে আমি ওই বাংলোতে মাংস রান্না করব।

—'তাহলেই হয়েছে আর কী। সে মাংস আর কাউকে খেতে হবে না। শিমুলতলায় গিয়ে সেই যে সেবারে তুই মুরগি রেঁধেছিলি ? উঃ, কী নুনেপোড়া !'

—'কিন্তু সেবারে আমার রান্না আলু ভাজাটা তো ভাল হয়েছিল। বল্‌, ভাল হয়নি ?

—'হ্যাঁ ভাল হয়েছিল, খুব ভাল হয়েছিল। এখন নে, চটপট আমাদের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিতে হবে। প্রিয়দার ক্যামেরাটা কোথায় ? বিকেলে আমি রাস্তায় ছবি তুলব।'

—'প্রিয়দা যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তার সঙ্গে দেখা হয়নি নিশ্চয়ই ?'

—'তুই আগে থেকে এসব বলিস কি করে রে ? তুই কি জ্যোতিষ জানিস নাকি ?'

— 'হাঃ হাঃ, বাবা। কায়দা আছে, কায়দা।'

প্রিয়ব্রত ফিরে এসে বলল — 'আমরা বীজপুরে না গিয়ে কাঁকড়াঝোড়েও যেতে পারি। সেটা আরও দূরে, একবারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে।'

স্বপন বলল—'তা সেখানেই চল। জঙ্গলের মধ্যে রাত্তিরে খুব ভাল লাগবে। সেখানে বাঘ আছে ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'বাঘ আছে কি না জানি না, তবে হাতি আছে। দু'তিনটে হাতি নাকি কয়েকদিন ধরে খুব উৎপাত করছে।'

সে কথা শুনে আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠল বিমান আর স্বপন দু'জনেই। ওরা কেউই আগে বুনো হাতি দেখেনি।

ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে খানিক দূরে যেতেই রাস্তার পাশে মাইলপোস্টে দেখা গেল

দইজুড়ির নাম । আর মাত্র দু'মাইল দূরে । সেখানে গিয়ে শম্ভু মাহাতো নামের ছেলেটার বাড়ি খুঁজে বার করতে হবে । নিশ্চয়ই তাতে কোনও অসুবিধে হবে না । খবরের কাগজে যখন ওর কথা বেরিয়েছে তখন ছেলেটা নিশ্চয়ই বিখ্যাত হয়ে গেছে । এখন শম্ভু মাহাতোর নাম বললেই ওখানে সবাই চিনবে ।

কিন্তু দইজুড়িতে গিয়ে শম্ভু মাহাতোর বাড়ি খুঁজতে হল না ওদের । তার আগেই একটা দারুণ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল ।

দইজুড়িতে একটা তিন মাথার মোড় আছে । জিপটা তখনও সেখানে পৌঁছয়নি, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে । রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছে চার পাঁচটা ছেলে । হঠাৎ তাদের দেখে স্বপন চিৎকার করে উঠল, 'থাম, থাম, প্রিয়দা, শিগ্‌গির, গাড়িটা থামাও ।'

ঘ্যাঁচ্ করে ব্রেক কষে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল 'কী রে, কি ব্যাপার !'

একটা ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে স্বপন বললে, 'কী আশ্চর্য ! আজ দুপুরেই তো আমি এই ছেলেটাকে স্বপ্নে দেখেছি ।'

কথাটা বলতে বলতেই জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লে স্বপন ।

তারপর দুটো হাত তুলে স্বপন চিৎকার করে উঠল, 'সবুজ আলো সবুজ আলো ।'

ছেলেদের দলের মধ্যে বছর দশেক বয়সের একটা ছেলেও ঠিক ওই রকমভাবেই দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'সবুজ বাত্তি । সবুজ বাত্তি ।' স্বপন দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ছেলেটিকে । সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে ধপাস্ করে পড়ে গেল মাটিতে ।

প্রিয়ব্রত আর বিমান অবাক্ হবারও সময় পেল না । তক্ষুনি ওদের তোলা হল জিপে । প্রিয়ব্রত ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে চলে এল ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে ।

৭

ডাক্তাররা হাজার চেষ্টা করেও পুরো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওদের দু'জনের জ্ঞান ফেরাতে পারলেন না । কোনও কিছু খাওয়াবারও উপায় নেই । পাশাপাশি দুটো খাটে ওরা শুয়ে রইল নিথর হয়ে । সামান্য একটু নিশ্বাস পড়ছে । এ ছাড়া বেঁচে থাকার কোনও চিহ্নই নেই ।

বিমান আর প্রিয়ব্রত রাতটা কাটাল ডাক বাংলোয় । স্বপনের বাড়িতে খবরটা দেওয়া উচিত। কিন্তু অনেক বার চেষ্টা করেও টেলিফোনের লাইন পাওয়া গেল না কলকাতার । প্রিয়ব্রত আর বিমান প্রায় সারা রাত জেগেই কাটাল । দু'জনেই হতবুদ্ধি হয়ে গেছে ।

স্বপন এর আগে কখনও ঝাড়গ্রামে আসেনি । ওই সাঁওতাল ছেলেটিকে তার চেনবার কোনও কারণই নেই । আর সাঁওতাল ছেলেটিই বা চিনবে কী করে স্বপনকে ? তবু দু'জনে দু'জনকে দেখা মাত্র ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল । আর দু'জনেই চেঁচিয়ে উঠলো 'সবুজ আলো' বলে ।

কোথায় কলকাতা আর কোথায় ঝাড়গ্রাম । এই দু'জায়গার দু'জন.অচেনা ছেলে পরস্পরকে দেখে হঠাৎ 'সবুজ আলো' বলে চিৎকার করে উঠবেই বা কেন ?

একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিমান জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, প্রিয়দা, এটা ওই যে কী বলে জাতিস্মর-টাতিস্মরের ব্যাপার নয় তো ।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ধুত্ । আমি ওসব মানি না ।'

বিমান বলল, "আমি কিন্তু শুনেছি, আগের জন্মের কথা অনেকের নাকি মনে থাকে । সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা' বইটাতে যেরকম আছে ....."

প্রিয়ব্রত বলল, 'তুই বলতে চাস্, দু'জনেরই এক সঙ্গে আগের জন্মের কথা মনে পড়েছে ?'

—'তা ছাড়া আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে ?'

—"তা হলে 'ওই সবুজ আলো'র ব্যাপারটা কি ? আগের জন্মের আর কিছু মনে পড়ল না, শুধু ওই সবুজ আলোর কথাই মনে পড়ল । এ হতেই পারে না ।"

—'তা হলে ?'

—'নিশ্চয়ই এর অন্য ব্যাখ্যা আছে ।'

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ওরা আবার ছুটল হাসপাতালে ছেলে দুটোর খবর নিতে । খোঁজ নিয়ে জানতে পারল তখনও সেই একই অবস্থা ।

তখুনি ওরা ঠিক করল, আর ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয় । আজই স্বপনকে কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা দরকার । আর ওই সাঁওতাল ছেলেটির বাড়ির লোকজন যদি রাজি হয় তাহলে ওকেও চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে ।

কাছেই রেল স্টেশন । ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এল প্ল্যাটফর্মে । দু'জনে দু' ভাঁড় চা নিল । সাতটার পর একটা ট্রেন আসবে জামশেদপুর থেকে । সেই ট্রেনে কলকাতায় খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায় । কিন্তু প্রিয়ব্রতর জিপটার তা হলে কি হবে ? এই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করল দু'জনে । তারপর ঠিক হল জিপে করেই সকলে মিলে ফেরা হবে । প্রিয়ব্রত ঠিক মতন চালালে ট্রেনের চেয়ে খুব বেশি দেরি লাগবে না ।

৮

স্টেশন থেকে বাইরে এসে ওরা জিপে উঠতে যাবে, এমন সময় একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এখানে হাসপাতালটা কোথায় বলতে পারেন ?'

লোকটি যেমন লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্যবান্ । মাথার চুল কাঁচা-পাকা, নাকের নিচে শেয়ালের ল্যাজের মতন মোটা গোঁফ । পরনে একটি সিল্কের শার্ট, খাকি ফুল প্যান্ট আর পায়ে খয়েরি রঙের কাবুলি জুতো ।

প্রিয়ব্রত লোকটিকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল – 'হাসপাতাল এই তো কাছেই । আমরা সেখানেই যাচ্ছি ।

ভদ্রলোক প্রিয়ব্রতর জিপটার দিকে তাকিয়ে বললেন – 'এই জিপটা আপনার ? আপনি কি পুলিশ নাকি ?'

প্রিয়ব্রত বিমানের দিকে একবার তাকাল । প্রিয়ব্রত তো সত্যিই কিছুদিন আগেও পুলিশে চাকরি করত । তাকে দেখলে কি এখনও বোঝা যায় ?

সে হাসতে হাসতে বলল 'না' । পুলিশ নই । হঠাৎএকথা আপনার মনে হল কেন ?'

—'জিপটার এ-রকম লাল রং দেখে ?'

—'ওঃ, তা-ই ! ওটা আমার শখ্ ।'

—'আপনাদের গাড়িতে আমি যেতে পারি ? আপনারা যখন হাসপাতালেই যাচ্ছেন ।'

—'ঠিক আছে, উঠুন ।'

বিমান সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ভদ্রলোককে । প্রিয়ব্রত গাড়িতে স্টার্ট দিল ।

ভদ্রলোক গাড়িতে বসেই হঠাৎ সবিনয়ে বললেন, 'নমস্কার । আমার নাম চক্রধারী সরখেল । আমি এই কাছেই গালুডিতে থাকি । আপনারা ?'

প্রিয়ব্রত তাদের দু'জনের পরিচয় জানিয়ে বলল, আমরা আসছি কলকাতা থেকে ।'

—'বেড়াতে এসেছেন ?'

—'তা এক রকম বেড়ানই বলতে পারেন ।'

—'বেড়াতে এসেছেন, তা এই সকাল বেলাতেই হাসপাতালে যাচ্ছেন কেন ?'

—'আমার সঙ্গে আর একজন ছিল, সে হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে ।

তা আপনি হাসপাতালে যাচ্ছেন কেন ? আপনার চেনা কেউ আছে বুঝি ?'

—'না, মশাই, চেনা-টেনা কেউ নেই । তবে কেন যে যাচ্ছি সে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় । শুনলে আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না কে জানে !'

বিমান একটু কুঁকড়ে বসে আছে । লোকটির গায়ে ভীষণ পেঁয়াজের গন্ধ । তাছাড়া এই গরমে সিল্কের জামা পরে আছে বলে গা-টাও কী রকম যেন চটচটে ।

চক্রধারী সরখেল আবার বললেন, 'আমি মশাই ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করি । আমার দু'খানা ট্রাক আছে । এই রাঁচি, জামশেদপুর, চাইবাসা, কলকাতা পর্যন্ত যায় । ড্রাইভার চালায়, আমি নিজেও অনেক সময় চালাই । এক একবার গাড়ি নিয়ে বেরুই, দু'তিন দিন পরে ফিরি ।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আপনার চক্রধারী নামটা দেখছি সার্থক ।'

—'কেন ? ও কথা বললেন কেন ?'

—'গাড়ির স্টিয়ারিংটা তো অনেকটা সুদর্শন চক্রের মতনই দেখতে, তাই না ? আপনি সেটা ধরে থাকেন ...'

—'বাঃ, বেশ বলেছেন তো ! আগে কেউ বলেনি তো একথা । তাহলে আর একটা মজার কথা আছে, শুনবেন ? এদিকে চক্রধরপুর বলে একটা জায়গা আছে, জানেন তো ? সেখানে আমি গেলেই অনেকে বলে ওঠে, এই যে মালিক আ গিয়া, মালিক আ গিয়া ।'

ভদ্রলোক নিজেই হেসে উঠলেন হো-হো করে ।

প্রিয়ব্রত হঠাৎ জিজ্ঞেস করল —'আপনি এত সকালে গালুডি থেকে এলেন কি করে ? এখন তো কোনও ট্রেনও আসেনি !

—'আমার একটা ট্রাক যাচ্ছিল খড়্গপুরে, ভোর চারটেয় ছেড়েছে । সেটাতেই এসে নেমে পড়লাম এখানে । আমার মেয়ে জোর করে আমায় পাঠাল ।'

—'কেন, গালুডিতে হাসপাতাল নেই ?'

—'আপনি বুঝি ভাবছেন এখানকার হাসপাতালে আমি নিজের চিকিৎসার জন্য এসেছি ? না, না, আমি ডাক্তার কবিরাজের কাছে পারত পক্ষে যাই না মশাই । আমার কোনও অসুখই হয় না । একটু কখনও জ্বর-টর যদি হয়ও আমি গ্রাহ্য করি না । এখন ব্যাপারটা হয়েছিল কি জানেন ? আমি মশাই দিন তিনেক বাড়িতে ছিলাম না, ট্রাক নিয়ে গিয়েছিলাম অল্কোবাদ । কোনদিন গেছেন সেখানে ? ভারি সুন্দর জায়গা । তা আপনারা তো বেড়াতেই এসেছেন, চলুন না, সেখান থেকে ঘুরে আসবেন একবার ।'

—'না, মশাই আমাদের আজই কলকাতায় ফিরতে হবে ।'

—'আপনাদের সঙ্গে পথে এইভাবে আলাপ হল, ভেবেছিলুম, আপনাদের গালুডিতেও আমার বাড়িতে একবার নিয়ে যাব !'

—'এবারে হল না, পরে যদি আবার আসি যাওয়া যাবে ।'

জিপটা একটু পরেই পৌঁছে গেল হাসপাতালের সামনে । প্রিয়ব্রত বলল, 'এসে গেছি, নামুন !'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'এইটে হাসপাতাল ? ঝাড়গ্রামের ওপর দিয়ে কতবার গেছি, এসেছি, কোনদিন খোঁজও করিনি তো ।'

প্রিয়ব্রত নেমে পড়েছে, কিন্তু চক্রধারীবাবু নামেননি বলে বিমানও নামতে পারছে না ।

—'কি হল, নামুন !' –তাড়া দিল বিমান ।

—'ও মশাই, আমার যে বড্ড ভয় করছে । আমি যে কোনদিন হাসপাতালে যাইনি ।'

প্রিয়ব্রত আর বিমান দু'জনেই দারুণ অবাক্ । এমন একটা লম্বা চওড়া জোয়ান লোকের মুখখানা সত্যিই ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেছে !

প্রিয়ব্রত বলল, —'হাসপাতালে ঢুকতে ভয় পান, তা হলে এসেছেন কেন ?'

চক্রধারীবাবু বললেন —'আমি কি আর সাধে এসেছি ? আমার মেয়ে জোর করে পাঠাল যে । আমার মেয়ের নাম সীতা । সে আমায় উঠতে বসতে শাসন করে ।'

—'আপনার মেয়ে আপনাকে পাঠিয়েছে কেন ? আপনার কি কোনও অসুখ করেছে ?'

—'না, না, বললুম তো, আমার কখনও অসুখ হয় না । আর সে রকম কোনও বড় অসুখ হলে আমি কি আর জামশেদপুরে দেখাতে পারতুম না ? এই ঝাড়গ্রামে আসতে হবে আমাকে ?'

—'কী মুশকিল, তাহলে এলেন কেন ?'

—'দয়া করে আপনি ভাই আমায় একটু সাহায্য করুন । আমার সব কথা শুনলেই আপনি বুঝবেন । একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন ?'

—'আমরা বিশেষ ব্যস্ত, আপনি সংক্ষেপে বলুন ।'

—'হ্যাঁ, তাই বলছি । ওই যে বললুম, আমি নিজে দুটো ট্রাকের মালিক হলেও প্রায়ই নিজেই ট্রাক চালাই । কখনও কখনও তিন-চারদিন বাড়ি ফিরি না —'

প্রিয়ব্রত একটু চটে গিয়েই বলল—'তা তো আগেই শুনেছি । আসল কথাটা চট্‌পট বলে ফেলুন ।'

বিমান আরও অধৈর্য হয়ে উঠেছে । এই লোকটাকে তার ভালও লাগছে না । সে স্বপনের জন্যে খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছে । তার মধ্যে এখন আবার এই লোকটা এসে ঝামেলা বাধাচ্ছে কেন ?

চক্রধারীবাবু বললেন, 'আমরা যে কোথায় কখন থাকব, তার ঠিক নেই । অনেক সময় তো রাস্তার ধারে পাঞ্জাবিদের হোটেলে ট্রাক থামিয়ে রাত্তিরটা ঘুমিয়ে নিই ওদের খাটিয়ায় শুয়ে । কখনও কখনও ট্রাকের মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকি ।'

—'বেশ, বুঝলুম সব । এখন আসল কথাটা বলুন ।'

—'আমি খবরের কাগজ-টাগজ বিশেষ পড়ি না । পড়ার অভ্যেসও নেই, সময়ও পাই না ।'

অধৈর্য হয়ে বিমান বলল, 'প্রিয়দা, তুমি তা হলে এঁর কাছে গল্প শোন, আমি ভেতরে গিয়ে স্বপনের খবরটা নিয়ে আসি ।'

চক্রধারীবাবু বিমানের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'একটু দাঁড়াও ভাই, তুমিও শোন । আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কখনও স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠি না । সবাই বলে ঘুমোলে আমার নাকি নাক ডাকে । কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে ভয় পেয়ে কখনও চেঁচিয়ে উঠেছি, এ রকম কথা কেউ বলতে পারবে না ।'

প্রিয়ব্রত বেশ রাগতভাবেই বলল, 'কী মুশকিল আমরা কি এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনব ?'

—'দোহাই, রাগ করবেন না । সবটা শুনলেই আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবেন । আমি কি আর আপনাদের মতন গুছিয়ে কথা বলতে পারি ! লেখাপড়াও বেশি শিখিনি, পরে ট্রাক চালানর সময় দিনের পর দিন কারুর সঙ্গে কথাই হয় না । আর ওই যে বললুম, খবরের কাগজ আমি পড়ি না, আমার মেয়ে কিন্তু পড়ে । মেয়ের পড়াশুনোয় খুব মাথা—'

—'একবার বলছেন ঘুমের কথা, একবার বলছেন খবরের কাগজের কথা । আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুতেই তো বুঝতে পারছি না ।'

—'চারদিন বাড়ি ছিলুম না, কাল রাতে বাড়ি ফিরছি । অমনি আমার মেয়ে সীতা বললে, বাবা, তুমি কাল ভোরেই ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে চলে যাও ।'

—'কেন ? সেটাই তো আমরা জানতে চাইছি ।'

—'খবরের কাগজে নাকি বেরিয়েছে যে এই হাসপাতালে একটা সাঁওতাল ছেলে ভর্তি হয়েছে । সে অজ্ঞান অবস্থায় চেঁচিয়ে ওঠে, সবুজ আলো ! সবুজ আলো ! আমার মেয়ে তো বললে এই কথা । মেয়ে তো আর মিথ্যে বললে না ! সে বললে,

শিগগির যাও বাবা —'

বিমান আর প্রিয়ব্রত পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে । এই বাক্যবাগীশ লোকটার মুখেও সবুজ আলোর কথা শুনবে, ওরা আশাই করেনি ।

—'আপনি সেই ছেলেটিকে দেখতে এসেছেন ?'

—'হ্যাঁ ।'

—'কেন ?'

—'সেটা তো আমি নিজেই জানি না । তবে আমার মেয়ে বলছে, মেয়ের মা বলছে, আমি নাকি একদিন ট্রাকের মধ্যে শুয়ে থেকে বারবার 'সবুজ আলো,' 'সবুজ আলো' বলে চেঁচিয়েছি । তারপর বারো চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে কেউ আমায় ঠ্যালাঠেলি করেও নাকি জাগাতে পারেনি । আমার তো বিশ্বাসই হয় না । কিন্তু সবাই বলছে .....'

প্রিয়ব্রত আর বিমান পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে । বিমানের শরীরটা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল একটু । তার মাথাও গুলিয়ে যাচ্ছে । তাহলে এই নিয়ে তিনজন হল !

তিনজন মানুষ 'সবুজ আলো' 'সবুজ আলো' বলে কোনও না কোনও সময় চেঁচিয়ে উঠেছে । অথচ কেউ কাউকে চেনে না । একজন থাকে কলকাতায় একজন ঝাড়গ্রামে আর একজন গালুডিতে । কেউ কারুকে কোনদিন চোখে দেখেনি তো বটেই তিনজনের বয়সেরও অনেক তফাত ।

চক্রধারী সরখেলের বয়স অন্তত পঞ্চাশ বছর তো হবেই । ভদ্রলোক ট্রাকের মালিক, নিজেও ট্রাক চালান, বহু জায়গা ঘুরেছেন । এই সব লোক সাধারণত খুব শক্ত ধাতের হয় । কিন্তু চক্রধারীবাবুর মুখখানা এখন তো ভয়ে কুঁকড়ে গেছে একেবারে ।

চক্রধারী সরখেল অসহায়ের মতন বললেন, 'এসব কি ব্যাপার বলুন তো মশাই ? আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না । আমার মেয়ে আমাকে জোর করে পাঠাল এখানে —'

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, 'আপনি 'সবুজ আলো' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কেন ? আপনি কি কোন 'সবুজ আলো' দেখেছিলেন ।

চক্রধারীবাবু বললেন, —'কী জানি মোশাই । আমার তো কিছুই মনে নেই । আমি নাকি কুম্ভকর্ণের মতন ভোঁস ভোঁস করে গোটা একটা দিন ঘুমিয়েছি । ব্যাপারটা হয়েছিল কি, অলকোবাদ থেকে ট্রাক চালিয়ে ফিরছিলাম তো ? খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম । বাড়ির একেবারে কাছাকাছি এসে...আর যেন পারি না, রাতও হয়ে গিয়েছিল অনেক । রাস্তার ধারে ট্রাকটা থামিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে গেছি, ব্যাস,

অমনি ঘুম এসে গেল । সেখান থেকে আমার বাড়ি মোটে আর এক মাইল .....

বিমান বলল, 'মাত্র এক মাইল দূরে আপনার বাড়ি, তাহলে বাড়ি ফিরেই তো ঘুমোতে পারতেন ?'.

—'ঠিক ! কিন্তু কেন যে ঘুমিয়ে পড়লুম কে জানে !'

—'তারপর ?'

—'সেইভাবেই রাত কেটে গেল । ও হ্যাঁ, এখন যেন একটু একটু মনে পড়ছে । একটা খুব জোরাল আলো আমার মুখে এসে পড়ায় আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার ......'

—'সেটা কি সবুজ রঙের আলো ?'

–'তা মনে নেই ! কে যে সেই আলো ফেলেছিল তাও মনে করতে পারছি না ... মাঝরাতে অনেক সময় রাস্তায় ডাকাতি হয় । কিন্তু ডাকাতি হবে ....কিছু নেয়নি তো আমার ...কোমরের গেঁজেতে শ' আড়াই টাকা ছিল, তা ঠিক ছিল, হাতে ঘড়ি ছিল, তাও নেয়নি ।'

—'সেই আলোটা চোখে পড়ার পর জেগে উঠে আপনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না ?'

—'নিশ্চয়ই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কিংবা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম, নইলে আর কিছু মনে করতে পারছি না কেন ? সকালবেলা আমায় ট্রাকের মধ্যে ঘুমোতে দেখে দু'একজন চেনা লোক আমার বাড়িতে খবর দেয় । তখন আমারই আর একজন ড্রাইভার রামস্বরূপ লোকজন নিয়ে আমায় ডাকতে আসে । কিন্তু অনেক ঠেলাঠেলি করেও তারা নাকি আমার ঘুম ভাঙাতে পারেনি । শেষ পর্যন্ত রামস্বরূপ ট্রাকটা চালিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে । কয়েকজন মিলে নাকি আমায় ধরাধরি করে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় । আমার মেয়ে তো ভেবেছিল যে আমি মরেই গেছি ! একজন ডাক্তারও নাকি ডেকে এনেছিল । সেই ডাক্তার নাড়ি টিপে কিছুই বুঝতে পারিনি । কী সব ওষুধ-মোষুধ দিয়েছিল, তাও পেটে যায়নি আমার । সারাদিন ঘুমিয়েছি নাক ডাকিয়ে । মাঝে মাঝে ওই ঘুমের মধ্যেই নাকি দু'চারবার 'সবুজ আলো', 'সবুজ আলো' বলে চেঁচিয়েছি !'

—'এখন আপনার শরীর বেশ সুস্থ আছে তো ?'

—'হ্যাঁ । একদম আগেকার মতন ।'

—'তা হলে এই সক্কালবেলা হাসপাতালে এলেন কেন ?'

—'আমার মেয়ে যে বললে ! সে খবরের কাগজে পড়েছে যে একটা সাঁওতাল ছেলে নাকি এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, সেও 'সবুজ আলো' 'সবুজ আলো' বলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল । কী ভৌতিক ব্যাপার বলুন দেখি মশাই ! কোথায় একটা

সাঁওতাল ছেলে আর কোথায় আমি, দু'জনেই ঘুমের মধ্যে একই দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে এক কথা বলে চ্যাঁচালুম ? আর কী যে দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তাও মনে করতে পারছি না ছাই !'

'আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, আমাদের এক বন্ধুও কলকাতায় একই রকম চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল !'

—'অ্যাঁ ? বলেন কি ? কলকাতায় ?'

—'হ্যাঁ !'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আপনারা দু'জনে এবার জিপ থেকে নামুন ।'

চক্রধারীবাবু জিপ থেকে নেমে প্রিয়ব্রতর হাত চেপে ধরে বললেন, 'কলকাতায় আপনাদের বন্ধু ওই একই দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, অ্যাঁ ? তা আপনারা এই ঝাড়গ্রামে এসেছেন কেন ?'

—'আপনার মেয়ে যে কারণে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে, সেই একই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছিলাম ! ওই সাঁওতাল ছেলেটিকে দেখবার জন্যেই ।'

—'চলুন তা হলে আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাই । ভাগ্যিস আপনাদের সঙ্গে দেখা হল । আমি মশাই একলা এই হাসপাতালে ঢুকতে পারব না । কথাটা ভাবলেই আমার গা শিউরে উঠছে । চলুন স্যার —'

—'নাঃ !'

—'কী বললেন ?'

—'আপনার হাসপাতালের মধ্যে যাওয়া এখন ঠিক হবে না । আপনি বরং বাড়ি ফিরে যান ।'

—'কেন, এ কথা বললেন কেন ? আমার মেয়ে যে বললে ... যে ডাক্তার ওই সাঁওতাল ছেলেটির চিকিৎসা করছে, তাঁর কাছে আমার সব কথা জানাতে । আমার মেয়ের খুবই বুদ্ধি, পড়াশুনোয় ফার্স্ট হয় । সে তো এলেবেলে কথা বলবে না ।'

—'আপনার মেয়ে ঠিকই বলেছে । কিন্তু এর পরের ঘটনাটা তো সে জানে না । ওই সাঁওতাল ছেলেটিকে আপনি দেখে ফেললে তার ফলও খারাপ হতে পারে !'

—'ফল খারাপ হবে ? তার মানে ? একটা ছোট ছেলেকে দেখলে ....'

বিমানের মনে পড়ল দইজুড়ি গ্রামের ঘটনাটার কথা । সাঁওতাল ছেলেটিকে দেখা মাত্র স্বপন ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল । তারপর দু'জনেই সবুজ আলো, সবুজ আলো বলতে বলতে অজ্ঞান । চক্রধারী সরখেলের সঙ্গে ওদের দেখা হলেও ঠিক ওই রকমই হবে কি না কে জানে ?

বিমান বলল, "প্রিয়দা, তবু একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত না ? এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলেও ওদের একই অবস্থা হয় কি না —'

প্রিয়ব্রত বলল,'কিন্তু যদি ওরা আবার অজ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে আমাদের আবার একটা দিন এখানে থাকতে হবে । তা ছাড়া বারবার এ-রকম অজ্ঞান হওয়াও তো ভাল নয় স্বাস্থ্যের পক্ষে ।'

এই সময় হাসপাতালের গেট দিয়ে একজন ডাক্তারকে বেরিয়ে আসতে দেখে প্রিয়ব্রত এগিয়ে গিয়ে ডাকল,—'ডক্টর মৌলিক, একটু দাঁড়াবেন, দয়া করে ?'

এই ডক্টর মৌলিকের অধীনেই কাল স্বপন আর সাঁওতাল ছেলেটিকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল ।

ডক্টর মৌলিককে চক্রধারী সরখেলের ঘটনাটা সংক্ষেপে জানাল প্রিয়ব্রত ।

সব শুনে ডক্টর মৌলিক বললেন,'স্ট্রেঞ্জ । ভেরি স্ট্রেঞ্জ ! এ-রকম কক্ষনও শুনিনি তো । তাহলে তো পুলিশে খবর দেওয়া উচিত, তাই না ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'পুলিশ কি করবে ! এর মধ্যে তো চুরি ডাকাতি কিংবা মানুষ খুনের কোনও ব্যাপার নেই । যাই হোক, আপনি আপনার রুগীদের কেমন দেখলেন ?'

--'রুগী কোথায়, আজ সকালে ওরা তো সম্পূর্ণ সুস্থ । স্বপন চা খেয়েছে, আর শম্ভু মাহাতো নামে ছেলেটিকে দেওয়া হয়েছে এক গেলাস দুধ । দু'জনকে রাখা হয়েছে দুটি পাশাপাশি বেডে কিন্তু কেউ যে কাউকে চেনে এমন কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না । অথচ, আপনি বললেন, কাল ওরা পরস্পরকে দেখা মাত্রই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল ।'

—'সত্যিই তাই হয়েছিল । রহস্যটা আমিও বুঝতে পারছি না ।' যাই হোক, এখন এই চক্রধারীবাবুকে নিয়ে কি করা যায় ?

—'উনি যদি হাসপাতালে ভর্তি হতে চান, আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি, ওঁর কোনো রোগ আছে কি না ।'

—'উনি বলছেন, উনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ । আমি চাই না এই ভদ্রলোকের সঙ্গে মাহাতো কিংবা স্বপনের দেখা হোক ।'

—'আমি কিন্তু চাই ।'

—'যদি ওরা তিনজনই আবার অজ্ঞান হয়ে যায় ?'

—'তা হলেও এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা কী করে ঘটছে, তা আমি নিজের চোখে দেখতে চাই । এক কাজ করুন না, বেশি লোকজনের সামনে এসব ঘটনা না ঘটাই ভাল ... কাছেই আমার কোয়ার্টার, সেখানে আসুন । আমার ওখানে চা খাবেন, চক্রধারীবাবু থাকবেন, স্বপন আর শম্ভুকেও নিয়ে আসা হবে —'

—'বারবার অজ্ঞান হলে ক্ষতি হবে না ?'

—'দু'বারে তো কোনো ক্ষতি হয়নি দেখা যাচ্ছে । আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন প্রথম বারের চেয়ে দ্বিতীয়বার ওদের জ্ঞান ফিরেছে অনেক তাড়াতাড়ি ।'

—'তা ঠিক ।'

—'তা হলে সেই ব্যবস্থাই করা যাক । ওই যে—দেখতে পাচ্ছেন তো আমার কোয়ার্টার্স । আপনারা চক্রধারীবাবুকে নিয়ে ওখানে চলে যান । আমি স্বপন আর শম্ভুকে রিলিজ করে নিয়ে আসছি এক্ষুনি ।'

৯

ডক্টর মৌলিক আবার ঢুকে গেলেন হাসপাতালে । প্রিয়ব্রত জিপটার কাছে এসে চক্রধারীবাবুকে বললে, 'চলুন ।'

চক্রধারীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় ?'

—'ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্সে । উনি আপনাকে চা খাবার নেমন্তন্ন করেছেন । সেখানে আপনার সব কথা ওঁকে খুলে বলবেন ।'

চক্রধারীবাবু জিব কেটে বললেন, 'এই যাঃ । আমি তো চা খাই না । ডাক্তারবাবু নেমন্তন্ন করলেন, অথচ আমি যদি চা না খাই, উনি রাগ করবেন না তো ?'

—'আপনি একদম চা খান না ?'

—'নাঃ । চা খেলে আমার অম্বল হয় । সকালবেলা আমার জিলিপি আর গরম দুধ খাওয়া অভ্যেস । আজ এখনও কিছু খাইনি, খিদেটা বেশ পেয়েছে বটে...স্টেশনের ধারে গরম গরম জিলিপি ভাজছিল তখন দেখেছি, কিনে নিয়ে আসব ?'

—'আবার অত দূরে যাবেন ? ডাক্তারবাবু এখুনি এসে পড়বেন বোধহয় ।'

—'কতক্ষণ আর লাগবে ? আপনারা গিয়ে বসুন না, আমি না হয় সাইকেল রিকশা নিয়ে ফিরব, যাব আর আসব —'

যে কোনও কারণেই হোক, এই চক্রধারী সরখেলকে এখন একা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হল না প্রিয়ব্রতর । সে একটু চিন্তা করে বলল, —'থাক । জিলিপি দুধ পরে খাবেন । ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কাজটা আগে সেরে নেওয়া যাক্ । আপনি চা না খান, বিস্কুট খান তো ? আমাদের জিপে বিস্কুট আর চিজ্ আছে, না রে বিমান ?

—'হ্যাঁ, আছে ।'

—'সেগুলো নামিয়ে নে । জিপটা এখানেই থাক্ ।'

ওরা গিয়ে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্সের সামনে দাঁড়াতেই হাসপাতাল থেকে একজন আর্দালি এসে বলল, 'ডাক্তার, সাব আপনাদের ভিতরে বসতে বলেছেন । উনি একটু পরে আসছেন ।'

আর্দালি চাবি খুলে দিলে । সামনেই একটা বসবার ঘর । একটা টেবিলের চার পাশে সাত আটখানা চেয়ার । দেওয়ালে নানান ওষুধ কোম্পানির ক্যালেণ্ডার । এক দেওয়ালে একটা ব্যারোমিটার । এই কোয়ার্টার্সে ডক্টর মৌলিক একাই থাকেন মনে হল ।

চক্রধারীবাবু চিজের গন্ধ শুঁকে বললে, —'এতে যে মশাই পচা দুধের গন্ধ ! এ আমি খাব না । দিন, ক'খানা বিস্কুটই শুধু খাই ।'

অন্যমনস্কভাবে প্রায় সাত-আট খানা বিস্কুট খেয়ে নিয়ে তিনি ঘরের কোনার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওটা ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ওটা একটা ওজনের যন্ত্র ।'

—'আমারও তাই মনে হচ্ছিল । তা হলে নিজেকে একটু ওজন করে দেখা যাক্ । অনেকদিন ওজন নিইনি ।'

ওজন যন্ত্রটার ওপর উঠে দাঁড়িয়েই তিনি যেন একেবারে আঁতকে উঠলেন । ব্যাকুলভাবে বললেন, —'এ কী । আমার যে একেবারে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে ।'

প্রিয়ব্রত চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল—'কি হল ?'

'—আর মশাই, সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার । গত মাসে আমার ওজন ছিল নব্বুই কিলো, এখন দেখছি মোটে পঁচাত্তর । এক মাসে পনরো কিলো কমে গেল । এ কি সর্বনেশে কথা ।'

বিমান হাসতে হাসতে বলল—'তা ওজন কমা তো ভালই আপনার পক্ষে, এখন আপনার যা চেহারা ।'

—'তা বলে এক মাসে পনরো কিলো কমবে ? এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে ? সেই জন্যই শরীরটা দুর্বল লাগছে কাল থেকে ।'

'—আপনি খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন ?'

—'মোটেও না । খাওয়া-দাওয়াই যদি কম করব, তা হলে আর রোজগার করা কেন ? তা হলে টাকা পয়সার কি দরকার ? আমার কি হল বলুন তো ? দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ওঠা, তারপর এত ওজন কম...এ রকম আগে কক্ষনও হয়নি ।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আহা, আগেই এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন ? হয়তো এই ওজনের যন্ত্রটা খারাপ, কিংবা এক মাস আগে যেখানে নিয়েছিলেন সেটা খারাপ ছিল...'

—'সেটা অনেক বড় যন্তর...মাল-পত্তর চাপাবার জন্যে....'

—'বুঝেছি। তবু দুটোর যে কোনও একটা খারাপ হতে পারে... আপনার চেহারা দেখে মোটেই দুর্বল মনে হচ্ছে না।'

মুখখানা বেজার করে চক্রধারীবাবু এসে চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, 'স্টেশনের সামনে গরম গরম জিলিপি...কিনে আনলেই হত। বিস্কুটে কি খিদে মরে? দিন তো আর ক'খানা...'

একটু পরেই বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

প্রথমে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল স্বপন। খুব স্বাভাবিকভাবে সে বলল, — 'প্রিয়দা, তোমার জিপটা হাসপাতালের সামনে রেখে এসেছ কেন?'

ডক্টর মৌলিক শম্ভুর হাত ধরেছিলেন, তিনি তাকে দরজার সামনের এগিয়ে দিলেন।

শম্ভু আমাদের দেখবার আগেই তার চোখ পড়ল চক্রধারীবাবুর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠল,—'সবুজ বাত্তি! সবুজ বাত্তি।'

স্বপনও চক্রধারীবাবুকে দেখতে পেয়ে একইভাবে চিৎকার করে উঠল —'সবুজ আলো। সবুজ আলো।'

তারপর স্বপন আর শম্ভু দু'জনেই চক্রধারীবাবুর দিকে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ওই একই কথা বলতে লাগল ব্যাকুলভাবে।

চক্রধারীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিব্রতভাবে বললেন, —'আরে, আরে, এ কী ব্যাপার। চোখ দুটো এমন করছে কেন। পাগল নাকি?'

স্বপন আর শম্ভু অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাবার আগেই প্রিয়ব্রত আর ডক্টর মৌলিক এসে ধরে ফেললেন ওদের।

বিমান অবাক হয়ে চেয়ে রইল চক্রধারীবাবুর দিকে। উনি অজ্ঞানও হননি, সবুজ আলো বলে চেঁচিয়েও ওঠেননি!

সকলেই এমন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে বেশ কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনও কথা বলতে পারল না।

তারপর স্বপন আর শম্ভুকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল পাশের ঘরে। বিমান উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল—'ওদের এক্ষুনি আবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় কি?'

ডক্টর মৌলিক বললেন, 'না, তার দরকার হবে না। কাল থেকে আমি ওদের অবজার্ভ করছি। শুধু অজ্ঞান হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও কমপ্লিকেশান নেই।'

চক্রধারীবাবু ধপ্ করে বসে পড়ে বললেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড । ছেলে দুটোর মির্‌গি রোগ আছে নাকি রে বাবা ? ঘরে ঢুকেই অজ্ঞান হয়ে গেল ? আর আমার দিকেই বা অমন করে ছুটে এল কেন ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'মনে হচ্ছে, ওরা আপনাকে চিনতে পেরেছে ।'

চক্রধারীবাবু চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে বললেন, 'আমাকে ? ওরা আমাকে চিনবে কি করে ? আমি তো জম্মে ওদের কখন দেখিনি !"

—'তা হলে ওরা আপনার দিকে ছুটে এল কেন ? অচেনা লোকের দিকে কেউ অমনভাবে ছুটে আসে ?'

—'আমিও তো সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি !'

—'আপনিও ঘুমের ঘোরে সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ওরাও সবুজ আলো সবুজ আলো বলে চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে গেল । এই দিক থেকেও আপনার সঙ্গে ওদের মিল আছে ।'

—'এই সবুজ আলোর ব্যাপারটাই তো আমি বুঝতে পারছি না মশাই । আলো আবার সবুজ রঙের হয় না কি ?'

—'কেন হবে না ? সব রঙেরই আলো হয় । চক্রধারীবাবু, আপনি খুব ভাল করে মনে করে দেখুন তো, আপনি যে বললেন মাঝ রাস্তায় ট্রাক থামিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তারপর চোখে একবার তীব্র আলো পড়ায় জেগে উঠেছিলেন, সেই আলোর রং কি সবুজ ছিল ?'

—'আপনি যখন বলছেন, হতেও পারে ।'

—'হতেও পারে-টারে ছাড়ুন । আমি জানতে চাই সেটা সত্যি সত্যি অদ্ভুত ধরনের কোনও সবুজ আলো ছিল কি না ।'

—'সেটা আমার ভাল মনে নেই । অনেকটা যেন স্বপ্নের মতন....' 'ওদের দু'জনেরই চোখের পাতা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে । খুব সম্ভব তাড়াতাড়িই জ্ঞান ফিরে আসবে ।'

বিমান বলল, 'ওরা জেগে উঠে চক্রধারীবাবুকে দেখে যদি আবার অজ্ঞান হয়ে যায় ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'না, না, সে ঝুঁকি নেওয়া আর ঠিক হবে না । বারবার এ-রকম জ্ঞান হারান মোটেই ভাল নয়, তাই না ডক্টর মৌলিক ?'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'আমি কি তা হলে বাড়ি ফিরে যাব ? আমার তা হলে কোনও চিকিৎসার দরকার নেই তো ?'

ডক্টর মৌলিক বললেন, 'আপনার তো কোনও অসুখ নেই, তা হলে আর চিকিৎসা হবে কেন ?'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'বাঁচালেন ডাক্তারবাবু, বাড়ি ফিরে গিয়ে, আমার মেয়েকে সেই কথাই বলব । কী সব ভূতুড়ে ব্যাপার রে বাবা । আমি ঘুমের ঘোরে সবুজ আলো বলে চেঁচিয়ে উঠলাম, এখানে দুটো ছেলেও সেই সবুজ আলো, সবুজ আলো বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল !'

বিমান বলল, 'আপনি কিন্তু অজ্ঞান হননি ।'

চক্রধারীবাবু রীতিমতন অবাক হয়ে বললেন, 'আমি অজ্ঞান হব কেন ? জলজ্যান্ত সুস্থ লোক.... আমার কোনও দিন মাথা ঘোরে না, বুক ধড়ফড় করে না, আমি কেন অজ্ঞান হব ?'

বিমান বলল, 'আমাদের স্বপন যখন ওই শম্ভু ছেলেটাকে দেখে তখন ওরা দু'জনেই সবুজ আলো সবুজ আলো করে চেঁচিয়ে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল । আবার আজ একটু আগে স্বপন আর শম্ভু দু'জনেই এই চক্রধারীবাবুকে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল । কিন্তু চক্রধারীবাবুর কিছু হল না । অথচ, উনিও সবুজ আলোর লোক ।'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'আমি সবুজ আলোর লোক কি মশাই । আমি ট্রাক চালাই । কারুর ব্যাপারে মাথা গলাই না । আমি কোনও লাল বা সবুজ আলোর লোক নই ।

এই সময় স্বপন দুটো ঘরের দরজার মাঝখানে এসে দাঁড়াল । এর মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছে ।

চক্রধারীবাবু বেশ খানিকটা যেন ভয়ে ভয়েই তাকিয়ে রইলেন স্বপনের দিকে ।

স্বপন এবার আর চেঁচিয়ে উঠল না, চক্রধারীবাবুকে চিনতেও পারল না ।

সে বিমানের কাছে এসে বলল, —'তোরা এই ঘরে বসে গল্প করছিস, আর আমাকে পাশের ঘরে শুইয়ে রেখেছিলি কেন রে ?'

বিমান বলল, 'তুই যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি ?'

স্বপন বলল, 'আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম ? কেন ?'

প্রিয়ব্রত পেছন থেকে ইঙ্গিত করছে, যাতে বিমান স্বপনকে এইসব কথা এক্ষুনি না বলে দেয় ।

কিন্তু বিমান তার ইশারা দেখতে পেল না । সে আবার স্বপনকে বলল—তুই আর শম্ভু এই ভদ্রলোককে দেখামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলি । 'সবুজ আলো,' 'সবুজ আলো,' বলে চেঁচিয়ে ছুটে এঁকে জড়িয়ে ধরেই অজ্ঞান হয়ে গেলি ।'

স্বপন চক্রধারীবাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখল । তারপর ভুরু কুঁচকে বলল, 'এই ভদ্রলোক কে ? আগে তো এঁকে কখনও দেখিনি ।'

চক্রধারীবাবু যেন অনেকখানি স্বস্তি পেয়ে বললেন 'দেখলেন তো আপনারা, আমি ঠিকই বলেছিলুম । আমিও এই ছেলেটিকে চর্মচক্ষে কোনদিন দেখিনি ।'

ডক্টর মৌলিক, বললেন, 'ব্যাপারটা যে ক্রমশ আরও দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে প্রিয়ব্রতবাবু । যাই, শম্ভু ছেলেটার কি হল দেখি ?'

তিনি পাশের ঘরে গিয়ে দেখলেন শম্ভুর জ্ঞান ফিরে এসেছে, সে খাটের ওপর বসে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে ।

এর আগে স্বপন আর শম্ভু দু'জনেই অনেক বেশি সময় অজ্ঞান হয়েছিল । এবার ওদের জ্ঞান ফিরে এসেছে বড় জোর দশ মিনিটের মধ্যে ।

এ ঘরে এসে শম্ভুও চক্রধারীবাবুকে দেখে চিনতেই পারল না ।

সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, —'হামার ভুখ্ লেগেছে । হামি ঘরকে যাবে ।'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'জিলিপি খাবে ? স্টেশনের ধারে খুব গরম গরম জিলিপি ভাজতে দেখেছি । দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি ।'

ডক্টর মৌলিক বলেন, 'না, না, আপনাকে যেতে হবে না । আমার আর্দালিই আনিয়ে দেবে ।'

কিন্তু চক্রধারীবাবু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেছেন । পেছন না ফিরেই বললেন, 'আমি এই যাব আর আসব । আপনারা ততক্ষণ কথা বলুন না । আমারও খুব খিদে পেয়েছে কি না ।'

প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি ।

ডক্টর মৌলিক ততক্ষণ শম্ভুকে এক কাপ দুধ আর দু'খানা বিস্কুট খেতে দিলেন । স্বপন কিছুই খেল না, কারণ ও দুধ আর বিস্কুট এই দুটো জিনিসই খুব অপছন্দ করে । তা ছাড়া আর তার খিদেও পায়নি ।

বিমান শম্ভুকে দেখিয়ে স্বপনকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে স্বপন তুই এই ছেলেটাকে আগে দেখেছিস কখনও ?'

স্বপন বলল, 'ও-ই তো পাশের ঘরে আমার পাশের খাটে শুয়েছিল । কে এই ছেলেটা ? ওকে আগে আমি কখনও দেখিইনি ।'

'সে কী রে ! আমরা দইজুড়ি গ্রামের দিকে গিয়েছিলাম, সেখানে রাস্তায় এই ছেলেটার সঙ্গে তোর দেখা হল, তুই ওকে দেখে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলি । সে সব কথা তোর মনে নেই ?'

স্বপন বলল, 'পাগলের মতন কী সব বকছিস ? আমি ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরব কেন ?'

প্রিয়ব্রত আর বিমান চোখাচোখি করল ।

প্রিয়ব্রত এবার শম্ভুকে জিজ্ঞেস করল, —'শম্ভু ভাইয়া, তুম্ এহি দাদাকে আগাড়ি কভি দেখা ?'

শম্ভু বেশ বাংলা জানে । সে বলল, 'না, দেখি নাই তো ।'

—'আচ্ছা শম্ভু, তুমি সবুজ বাত্তি দেখেছ কোথাও ?'

শম্ভু দুদিকে মাথা নাড়াল ।

বিমান হঠাৎ খুব বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'দূর ছাই ? এ ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না । যাই হোক গে, স্বপন আর শম্ভু তো ভাল হয়ে গেছে, প্রিয়দা, এবার আমরা কলকাতায় ফিরে যাই ।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সেই ভাল ।'

এই সময় ডক্টর মৌলিক বললেন, 'আমাদের চক্রধারীবাবু কোথায় গেলেন বলুন তো প্রিয়ব্রতবাবু ? এখনও তো ফিরলেন না জিলিপি নিয়ে ?

প্রিয়ব্রত বলল, 'তাই তো, প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল উনি কি এক ঝাঁকা জিলিপি আনছেন নাকি ?'

ডক্টর মৌলিক বললেন, 'কিন্তু আমি তো আর ওর জন্যে বসে থাকতে পারছি না । আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে । আপনারা বরং বসুন....'

প্রিয়ব্রত বলল, —'না, না আমরাও আর বসতে চাই না । আমরাও বরং স্টেশনের দিকে এগোই । চক্রধারীবাবুর কাছ থেকে ওখানেই বিদায় নিয়ে নেব । তারপর শম্ভুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমরা জিপ নিয়ে ফিরব কলকাতার দিকে ।

এর পরও ডাক্তারবাবুর অনুরোধে মিনিট দশেক অপেক্ষা করল ওরা । কিন্তু চক্রধারীবাবু তখনও ফিরলেন না দেখে ডাক্তারবাবুকে হাসপাতালের কাছে ছেড়ে দিয়ে ওরা জিপটা নিয়ে চলে এল স্টেশনের কাছে । পথে চক্রধারীবাবুর দেখা পাওয়া গেল না । জিলিপির দোকানেও তিনি নেই । দোকানদারের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, ওই রকম চেহারার কোনও লোক তার কাছ থেকে আধঘন্টার মধ্যে জিলিপি কিনতে আসেনি ।

প্রিয়ব্রতর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল । ডক্টর মৌলিকের কোয়ার্টার্স থেকে জিলিপির দোকানটা আর কতটাই বা পথ ? এর মধ্যে ভদ্রলোক কোথায় উধাও হয়ে গেলেন ? নাকি ইচ্ছে করেই চলে গেলেন অন্য কোথাও ?

স্টেশনের কাছে পৌঁছে ঠিক হল শম্ভু মাহাতোকে আগে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা হবে । সবাইকে জিপে তুলে স্টার্ট দিল প্রিয়ব্রত ।

খানিকটা যাবার পর স্বপন জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, প্রিয়দা আমরা এখানে কবে এসেছি ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তা দুদিন কেটে গেছে ।'

বিমান বলল, 'এর মধ্যে এত কিছু ঘটে গেল, মনে হচ্ছে যেন অনেকগুলো দিন কেটে গেছে ।'

স্বপন জিজ্ঞেস করল, 'কী কী ঘটনা ঘটেছে রে ?'

বিমান বলল, 'সবই তো তোকে নিয়ে ।'

'আমাকে নিয়ে ? তার মানে ?'

প্রিয়ব্রত গম্ভীরভাবে বলল, 'ওসব কথা এখন থাক্ । কলকাতায় গিয়ে হবে ।'

১০

দইজুড়ি গ্রামে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না ।

শম্ভু মাহাতোর বাবা লুকা মাহাতো বেশ একজন ভারিক্কি ধরনের লোক । লম্বা, পেটান চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল । তিনি তখন হাসপাতালে যাবার জন্য বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন ।

জিপ থেকে নেমেই শম্ভু ছুটে বাবার কাছে চলে গেল । লুকা মাহাতো কপালের ওপর হাত রেখে রোদ আড়াল করে ভাল করে দেখলেন গাড়িটা, তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপলোগ কেয়া পুলিশ হ্যাঁয় ?'

প্রিয়ব্রতর লাল রঙের জিপটা দেখে অনেকেই একথা মনে করে ।

প্রিয়ব্রত মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, আমরা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি ।'

লুকা মাহাতো এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বেপার বলুন তো ? হামার লেড়কাটাকে আপনারা লিয়ে চইলে গেলেন....'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আপনার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাই ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম ।'

—'হাঁ, হাঁ, বিমারি তো হয়েই ছিল, তা আপনারা কেন লিয়ে গেলেন ?'

—'আমাদের একজনেরও তো ওই একই বেমারি । সেইজন্য তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করাবার জন্য.....'

—'ইতো বড়া আজিব বেমারি ? সবুজ বাত্তি, সবুজ বাত্তি বলে চিল্লাতে থাকে, তারপর ব্যস্ ? আর লড়ে না চড়ে না । ইটা কি বেমারি রে ?'

—'ব্যাপারটা তো আমরাও বুঝতে পারছি না । তবে, আপনার ছেলেকে এখন থেকে একটু সাবধানে রাখবেন । দেখবেন, ও যেন রাত্রে বের না হয় । আচ্ছা, আমরা

এখন তাহলে চলি ।'

প্রিয়ব্রত আবার স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরাল ।

বিমান বলল, 'প্রিয়দা, আমরা একদিনের মধ্যে ফিরব বলে এসেছিলুম, বাড়িতে নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে ।'

স্বপন বলল, 'আমার কিন্তু বেড়াতে খুব ভাল লাগছে । এদিকে আর দু' একটা জায়গা ঘুরে গেলে হয় না ?'

বিমান বলল, 'খুব মজা না ? কলেজ খুলে গেছে, মনে নেই ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে একবার গালুডি ঘুরে যাওয়া দরকার । চক্রধারীবাবু কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন ? আমার ভাই খট্‌কা লাগছে ।'

বিমান বলল, 'না প্রিয়দা, আর দেরি করা সম্ভব নয় । বাবা রাগ করবেন ।'

'তুই তা হলে এক কাজ কর্, বিমান । তুই আর স্বপন ফিরে যা, তোদের আমি ট্রেনে তুলে দিচ্ছি ।'

স্বপন বলল, 'কি বললে, প্রিয়দা ? আমরা ফিরে যাব ?'

'হ্যাঁ, সেটাই তো ভাল ।'

'কথাটা তুমি বলতে পারলে ?'

—'তোদের কলেজ খুলে গেছে, তোরা কলকাতায় ফিরে যা । আমি ব্যাপারটা একটু ভাল করে দেখে যেতে চাই ।'

—'তুমি একলা একলা মজা করবে, আর আমরা কলকাতায় গিয়ে কলেজ করব ?'

—'এর মধ্যে আবার মজার কি আছে ?'

বিমান মুখ গোঁজ করে বসে আছে, সে আর কোনও কথাই বলছে না । বোঝাই যায় সে রেগে গেছে খুব । হঠাৎ সে বলে উঠল, 'চক্রধারীবাবুর বাড়িতে গিয়ে কি লাভ হবে ? উনি বলবেন, আমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই চলে এসেছি ।'

—'তা বলে আমাদের কিছু না বলে এভাবে চলে যাবেন ?'

—'কতক্ষণ লাগে গালুডি যেতে ?'

—'খুব বেশি দূর তো নয় । ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব ।'

—'তাহলে চল, আমরা সবাই মিলে সেখানে যাই । চক্রধারীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে আর কতক্ষণ লাগবে ? তারপর আমরা সবাই একসঙ্গে কলকাতায় ফিরব ।'

—'কিন্তু যদি কোনও কারণে দেরি হয়ে যায় ? আমরা আরও অন্যদিকে চলে যাচ্ছি তো । হয়তো আজ রাতের মধ্যে কলকাতায় ফেরাই হবে না ! সেইজন্যই বলছি, তোরা বরং ট্রেনে চেপে ফিরে যা ।'

স্বপন বলে উঠল, 'না, তা কিছুতেই হবে না ।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তাহলে এক কাজ করে নেওয়া যাক । আগে তোমাদের কারুর একজনের বাড়িতে একটা ট্রাঙ্ককল কিংবা টেলিগ্রাম পাঠান যাক । দায়িত্ব তো আমাকেই নিতে হবে ।'

১১

ঝাড়গ্রাম স্টেশনের কাছে আবার ফিরে এল সবাই । এবার ভাগ্য ভাল । পোস্টঅফিস থেকে কলকাতায় লাইন পাওয়া গেল । বিমানের বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলল প্রিয়ব্রত । তারপর স্বপন আর বিমান যে ভাল আছে সে কথা বোঝাবার জন্যে ওরাও টেলিফোনে কথা বলল একটু করে ।

টেলিফোন করার পর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আর এক কাপ করে চা খেয়ে নিয়ে এবার ওরা ছুটল গালুডির দিকে ।

এর আগে ওরা স্টেশন থেকে খবর নিয়ে এসেছে যে ইতিমধ্যে একখানা ট্রেন গেছে গালুডির দিকে । তাছাড়া বাসেও যাওয়া যায় অবশ্য । অর্থাৎ চক্রধারীবাবুর এর মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবার কথা ।

গালুডি পৌঁছে চক্রধারীবাবুর বাড়ি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধেই হল না । ছোট জায়গা, সবাই সবাইকে চেনে । তাছাড়া, চক্রধারীবাবুর যখন ট্রাকের ব্যবসা, তখন পেট্রল পাম্পের লোকেরা চিনবেই ।

জিপ গাড়িতে পেট্রল ভরে নেবার জন্য ওরা সেখানে ঢুকে যে ছেলেটি পেট্রল দেয়, তাকে চক্রধারীবাবুর নাম বলতেই সে হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলল, —ওই যে মাঠের ওধারে ছোট্ট সাদা কুঠিটা দেখছেন, ওটাই ।

চক্রধারীবাবুর নিজের বাড়ির যে-রকম বর্ণনা দিয়েছিলেন, বাড়িটা সেই রকমই । সামনে একটা ছোট্ট বাগান, সেখানে অনেকগুলো পুরনো লরি-টরি পড়ে আছে ।

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একজন বুড়ো মতন লোক বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কৌন ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'চক্রধারীবাবু হ্যাঁয় ?'

বুড়ো কোনও উত্তর না দিয়ে চলে গেল ভেতরে । এরপর বেরিয়ে এল একটি

চোদ্দ-পনরো বছরের মেয়ে।

সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কাকে চান ? কোথা থেকে আসছেন ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'আমরা আসছি ঝাড়গ্রাম থেকে। একবার চক্রধারীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

প্রিয়ব্রত আশা করেছিল, এবার মেয়েটি বলবে, উনি তো ঝাড়গ্রামেই গেছেন। কিংবা উনি তো ঝাড়গ্রাম থেকে এই মাত্র ফিরলেন।

কিন্তু মেয়েটি সে কথা বলল না, একটু অবাকও হল না। সে বলল, 'উনি তো ঘুমোচ্ছেন।'

ঘড়িতে বাজে সকাল সাড়ে এগারোটা। এ-সময় কোনও মানুষের ঘুমোবার কথা নয়। চক্রধারীবাবু কি ঝাড়গ্রাম থেকে এসেই ঘুমিয়ে পড়লেন ?

প্রিয়ব্রত বলল, 'একটু বিশেষ দরকার আছে। ওঁকে ডাকা যায় না ?'

মেয়েটি বলল, 'তা হয়তো যায়। কিন্তু সাড়া কি পাওয়া যাবে ? উনি তো দু'দিন ধরেই একটানা ঘুমোচ্ছেন।'

বিমান চমকে উঠে বলে উঠল, 'দু'দিন ধরে ?'

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রত তার হাত চেপে ধরে বলল, 'তাই নাকি ? কেন, ওঁর কি কোনও অসুখ করেছে ?

মেয়েটি বলল, 'তা তো বুঝতে পারছি না। কেন যেন দু'দিন ধরে ঘুমিয়েই রয়েছেন।'

—'জাগাবার চেষ্টা করেননি ?'

—'হ্যাঁ, ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন বটে, চোখ মেলে চাইছেনও। আবার ঘুমিয়ে পড়ছেন।

প্রিয়ব্রত দু'এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি চক্রধারীবাবুর মেয়ে নিশ্চয়ই ?'

মেয়েটি ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা জানলেন কি করে ?'

বিমান আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রত তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'ওঁকে আমরা চিনি তো, ওঁর মুখ থেকেই আপনারা কথা শুনেছি। যদি কিছু মনে না করেন, আমরা একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি ?'

মেয়েটি বলল 'হ্যাঁ, আসুন না।'

মেয়েটি ওদের নিয়ে গেল ভেতরের একটি ঘরে। পুরান আমলের একটা বড় খাটে শুয়ে আছেন চক্রধারীবাবু। সকালবেলা ওঁকে যে পোশাকে ঝাড়গ্রামে দেখা গিয়েছিল, অবিকল সেই পোশাক।

বিমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাল । মেয়েটি দারুণ মিথ্যেবাদী তো । বলে কিনা দু'দিন ধরে একটানা ঘুমচ্ছে—তাহলে সকালে দেখা হল কার সঙ্গে ?

প্রিয়ব্রত এগিয়ে গিয়ে চক্রধারীবাবুর শিয়রের কাছে দাঁড়াল ।

বিমান আর স্বপন দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, প্রিয়ব্রত হাতছানি দিয়ে বলল, 'স্বপন, তুই আমার কাছে আয় তো ।'

স্বপন কাছে আসতেই প্রিয়ব্রত ফিসফিস করে ডাকল, 'চক্রধারীবাবু ও চক্রধারীবাবু ।'

কোনও সাড়া নেই ।

দু' তিনবার ডেকেও যখন কোনও ফল হল না, তখন প্রিয়ব্রত ওঁর গায়ে হাত দিয়ে একটু ঠেলল । সঙ্গে সঙ্গে উনি চোখ মেললেন । মুখ ঘুরিয়ে প্রথম দেখলেন প্রিয়ব্রতকে । তারপর স্বপনের দিকে চোখ পড়তেই উনি আস্তে আস্তে উঠে বসলেন, তারপর দুহাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'সবুজ আলো ! সবুজ আলো !'

সে চিৎকার শুনে স্বপন পিছিয়ে গেল কয়েক পা । উত্তরে সে কিন্তু সবুজ আলো বলে চেঁচাল না । বরং চক্রধারীবাবু স্বপনকে জড়িয়ে ধরার জন্যে উঠে আসতেই স্বপন যেন খানিকটা ভয় পেয়েই দৌড় দিল ।

প্রিয়ব্রত কড়া গলায় বলে উঠল 'কোথায় যাচ্ছেন ? বলেই চক্রধারীবাবুর হাতটা চেপে ধরল ।'

অমনি একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল ।

প্রচণ্ড বিদ্যুতের শক্ লাগলে যেমন হয় তেমনি কেঁপে উঠল প্রিয়ব্রতর সমস্ত শরীরটা । সে যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে ।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দারুণ কর্কশ গলায় 'সবুজ আলো', 'সবুজ আলো' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে চক্রধারীবাবু দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন স্বপনের দিকে ।

স্বপনের মুখখানা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে । সে 'না,' 'না,' বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে ।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যাওয়ায় বিমান প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল ! স্বপন কেন অত ভয় পাচ্ছে সে বুঝতে পারল না । প্রিয়দাই বা কেন পড়ে গেল মাটিতে ? চক্রধারীবাবুরই বা ও-রকম করার কারণ কি ? সে স্বপনকে সাহায্য করার জন্যে বাইরে যাবে, না প্রিয়দাকে আগে দেখবে ?

প্রিয়ব্রত মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াচ্ছে আর গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে । হঠাৎ তার শরীরটা থেমে গেল , মুখের আওয়াজও বন্ধ হল ।

বিমান তক্ষুনি প্রিয়ব্রতর পাশে বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে ডাকল, 'প্রিয়দা ! প্রিয়দা ।'

কোনও সাড়া নেই ।

চক্রধারীবাবুর মেয়ে সীতা এই সব দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল ।

বিমান বলল, 'জল । শিগগির একটু জল নিয়ে এস ।'

সেই ঘরেই একটা জলের কলসি ছিল । সীতা তার থেকে জল গড়াতে লাগল ।

প্রিয়ব্রতর শরীরটা এমনই নিঃস্পন্দ হয়ে গেছে যে বিমানের একবার মনে হল, প্রিয়দা মরে যায়নি তো ? চক্রধারীবাবুকে ছোঁয়া মাত্র এ-রকমটা হলই বা কেন ?

বিমান প্রিয়ব্রতর শরীরটাকে চিত করে তার বুকে মাথা কান ছোঁয়াল । হ্যাঁ, একটু দুপ্ দুপ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে । নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখল, নিশ্বাসও পড়ছে একটু একটু ।

সীতা এক ঘটি জল নিয়ে আসতেই বিমান সেই জল সবটা ছিটিয়ে দিতে লাগল প্রিয়ব্রতর চোখে-মুখে । কয়েকবার ঝাপটা লাগাবার পর প্রিয়ব্রতর চোখ দুটো পিট পিট করে উঠল একবার ।

বিমান ব্যাকুলভাবে ডাকল, 'প্রিয়দা প্রিয়দা !'

এবার প্রিয়ব্রত ভালভাবে তাকিয়ে বলল, 'ভয় নেই আমি ঠিক আছি ।'

বিমান জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছিল ? চক্রধারীবাবু তোমায় কি করলেন ?'

সীতা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, —আমার বাবা এ-রকম করছেন কেন ? আপনারা কে ? কোথা থেকে আসছেন ?

প্রিয়ব্রত ধড়মড় করে উঠে বসে সীতার দিকে তাকিয়ে বলল, — 'ওই লোকটা তোমার বাবা নয় ।'

তারপর বিমানকে জিজ্ঞেস করল,—'স্বপন কোথায় ?'

বিমান বলল, 'স্বপন বাইরে পালিয়েছে । চক্রধারীবাবু ওকে তাড়া করে গেছেন ।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ওই লোকটা কিছুতেই চক্রধারীবাবু হতে পারেন না । নিশ্চয়ই অন্য কেউ । শিগগির চল্ । স্বপনকে বাঁচাতে হবে ।'

সকলে হুড়মুড়িয়ে চলে এল ঘরের বাইরে ।

১২

বাড়িটার সামনে মাঠে তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার চলছে।

চক্রধারীবাবু স্বপনকে ধরবার জন্য তাড়া করে চলেছেন আর স্বপন গোল হয়ে ঘুরছে। চক্রধারীবাবুর হাত দুটো একরকমভাবে সামনে বাড়ান। কানামাছি খেলার সময় চোখবাঁধা ছেলেরা সামনে দু'হাত বাড়িয়ে যেমন ছোটে, ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছে।

প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল, 'স্বপন, সাবধানে। দেখিস, তোকে যেন কিছুতেই ধরতে না পারে।'

সীতা কয়েক পা এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'বাবা, তোমার কি হয়েছে ? তুমি ও-রকম করছ কেন ?'

প্রিয়ব্রত চট্ করে সীতার হাত ধরে টেনে এনে বলল, —'খবরদার, ওকে ছুঁয়ো না। বললুম না, ওই লোকটা তোমার বাবা নয়।'

সীতা বলল, 'আমার বাবা নয় ? তা হলে ও কে ? আমার বাবা তবে কোথায় গেল ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সব কথা এখন বুঝিয়ে বলার সময় নেই। পরে বলব। ওই লোকটা স্বপনকে ধরে ফেললেই খুব বিপদ হবে। হ্যাঁ শোন, তোমাদের বাড়ি বাঁশের লাঠি আছে ?

গোলমাল শুনে এর মধ্যে সীতার মা আর সেই বুড়ো লোকটিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন বাড়ির বাইরে। সীতার মা বললেন, 'অ সীতা, এ-সব কি কাণ্ড হচ্ছে ? উনি অমন করছেন কেন ?'

সীতা কিছু বলবার আগেই প্রিয়ব্রত প্রায় ধমক দিয়ে বলল, 'লাঠি আনতে বললুম না। লাঠি কই ?'

সীতা দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

চক্রধারীবাবুর মতন দেখতে লোকটা তখনও ছুটছে আর স্বপন কিত্ কিত্ খেলার কায়দায় একবার এদিকে আর একবার ওদিকে পালাচ্ছে।

সীতা এই সময় একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে এল।

প্রিয়ব্রত বলল, 'না, এতে হবে না ! বাঁশের লাঠি নেই ?'

বুড়ো লোকটি বলল, 'লাঠি ? ও সীতা, আমার লাঠিটা এনে দে।'

সীতা এবার নিয়ে এল একটা তেলচকচকে বাঁশের লাঠি।

প্রিয়ব্রত সেটা হাতে বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেল চক্রধারীবাবুর মতন দেখতে

লোকটার দিকে ।

সীতাও তার সঙ্গে সঙ্গে এসে বলল, 'একি, আপনি আমার বাবাকে মারবেন নাকি ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'বললুম তো, ওই লোকটা তোমার বাবা নয় ।'

সীতা বলল, 'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব কেন ? আমার বাবাকে আমি চিনি না ? বাবা হঠাৎ অদ্ভুত মতন ব্যবহার করছে বলেই আপনি তাকে লাঠি দিয়ে মারবেন ?'

বিমানও এগিয়ে এসেছে প্রিয়ব্রতর পাশে পাশে । প্রিয়ব্রত তাকে বলল, 'বিমান, এই মেয়েটিকে ধরে থাক্, দেখিস যেন এগতে না পারে । তোরা দু'জনেই দূরে থাকবি, কোনমতেই যেন ওই লোকটার সঙ্গে তোদের ছোঁয়া না লাগে !'

বিমান সীতার একটা হাত চেপে ধরতেই সে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'ছেড়ে দিন । আমায় ছেড়ে দিন । আপনারা কে ? কেন আমার বাবাকে মারছেন ?'

বিমান বলল, 'ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় নেই । আমরা তোমার কিংবা চক্রধারীবাবুর শত্রু নই । আমরা এসেছি কলকাতা থেকে । এখানে ভয়ংকর কিছু কাণ্ড চলছে । প্রিয়দা পরে সব বুঝিয়ে বলবে !'

প্রিয়ব্রত লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে চক্রধারীবাবুর মতন লোকটির দিকে এগিয়ে গেল এক পা এক পা করে । প্রিয়ব্রতকে দেখে সাহস পেয়ে স্বপন তার পাশে এসে দাঁড়াল ।

লোকটা তখনও হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে স্বপনের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল 'সবুজ আলো, সবুজ আলো !'

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে ?'

লোকটা সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সোজা এগিয়ে আসতে লাগল স্বপনের দিকে ।

প্রিয়ব্রত বলল, 'কে আপনি ? কেন ওকে ধরতে চাইছেন ? ওকে আপনি কিছুতেই ধরতে পারবেন না ।'

লোকটা সে কথা গ্রাহ্যই করল না ।

তখন প্রিয়ব্রত হাতের লাঠিটা ঘুরিয়ে খুব জোরে মারল লোকটার পায়ে ।

সেই মার খেয়ে লোকটা লাফিয়ে উঠল । এত উঁচুতে লাফিয়ে উঠল সে যা কোনও মানুষের পক্ষে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফিয়ে ওটা সম্ভব নয় ।

প্রিয়ব্রত তখন স্বপনকে ঠেলে দিয়ে বললে,—'তুই সরে যা লোকটাকে আমি

ঠাণ্ডা করছি । ওই বাড়ির মধ্যে পালিয়ে যা তুই ।'

লোকটা মাটিতে নেমে এবার প্রিয়ব্রতর দিকে ঘুরে দাঁড়াল ।

প্রিয়ব্রত বলল, 'এখনও বলুন আপনি কে ? কি চান এখানে ?'

লোকটার চোখে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলে উঠল । সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'সবুজ আলো ।'

প্রিয়ব্রতর মনে হল, সে ওই কথা দুটো ছাড়া আর কোনও কথা জানে না ।

লোকটা এইবার প্রিয়ব্রতব দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল ।

প্রিয়ব্রত বলল, 'সাবধান, আমাকে ধরবার চেষ্টা করবেন না । আমি জানি, আপনার শরীরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আছে ।'

লোকটা তবু এগিয়ে এল ওকে ধরতে ।

প্রিয়ব্রত এবার লাঠিটা ঘুরিয়ে মারতে গেল লোকটার কাঁধে । কিন্তু ওর গায়ে লাগবার আগেই লোকটা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল লাঠিটা । তারপর এক হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল সেটা । অসম্ভব শক্তি লোকটার গায়ে । সেই টানের চোটে প্রিয়ব্রত নিজেই আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল হুমড়ি খেয়ে ।

লোকটা কিন্তু লাঠিটা নিয়ে প্রিয়ব্রতকে সেটা দিয়ে উল্টে মারবার চেষ্টা করল না । লাঠিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে এল প্রিয়ব্রতকে ধরতে ।

এবার প্রিয়ব্রত পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল দৌড়ে । তারপর রিভলবারের নিশানা ঠিক করে বলল, 'আমি সাবধান করে দিচ্ছি, মানুষ মারতে আমি চাই না, কিন্তু আর এক পা এলেই গুলি ছুঁড়ব ।'

এর মধ্যে মাঠের এক দিকে কিছু লোকের ভিড় জমে গেছে । তারা কেউই বুঝতে পারছে না কী ব্যাপার চলছে । প্রিয়ব্রতকে রিভলবার বার করতে দেখে সবাই ভয়ে শব্দ করে উঠল ।

হঠাৎ সেই ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলেন আর একজন চক্রধারীবাবু ।

তিনি দু'হাত তুলে বললেন, 'কী ব্যাপ্যার ? ও প্রিয়বাবু, এসব কী ভূতুড়ে কাণ্ড হচ্ছে আমার বাড়িতে ? এই লোকটা কে ?'

প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল, —আসবেন না, এদিকে আসবেন না । আপনি দূরে থাকুন ।'

চক্রধারীবাবু বললেন, 'এ দেখছি ঠিক আমারই মতন চেহারার একজন লোক । এ কী কাণ্ড ? অ্যাঁ ? এ কোথা থেকে এল ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'বলছি, এখানে আসবেন না ! দূরে থাকুন ।'

প্রথম লোকটি এবার দ্বিতীয় চক্রধারীবাবুর দিকে ফিরে হুকুমের সুরে বলল, 'সবুজ আলো ! সবুজ আলো !'

সেই কথা শুনে দ্বিতীয় চক্রধারীবাবু কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন ।

প্রিয়ব্রত দেখল, ভিড় ঠেলে স্বপনও আবার এদিকে ছুটে আসছে ।

প্রিয়ব্রত বলল, 'স্বপন, স্বপন, আসিস না, পালিয়ে যা ।'

স্বপন সে নিষেধে কান না দিয়ে দ্বিতীয় চক্রধারীবাবুর পাশে এসে মাটিতে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে । তারপর দু'জনে এক সঙ্গে এমনভাবে হাত জোড় করে রইল, যেন ওরা ওই লোকটিকে পুজো করছে ।

প্রিয়ব্রতর মনে হল, লোকটির চোখ দিয়ে সবুজ মতো একটা অস্বাভাবিক আলো বেরুচ্ছে । আর সে কাঠের পুতুলের মতন টলতে টলতে এগিয়ে আসছে চক্রধারীবাবু আর স্বপনের দিকে ।

প্রিয়ব্রত আর ঝুঁকি নিতে চাইল না । লোকটিকে একবার ছুঁয়ে সে নিজেই বুঝেছে যে ওর গায়ে অসম্ভব জোরালো বিদ্যুৎ তরঙ্গ আছে । ও যদি চক্রধারীবাবু আর স্বপনকে জড়িয়ে ধরে, তাহলে ওরা দু'জন আর বাঁচবে না ।

প্রিয়ব্রত খানিকটা এগিয়ে এসে স্বপনদের আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি যে-ই হও, আমি এখনও সাবধান করে দিচ্ছি । আর এক পা এগলেই আমি গুলি করব ।'

লোকটা তবু এগবার জন্য পা বাড়াতেই গুলি চালাল প্রিয়ব্রত ।

ওর হাতের টিপ সাঙ্ঘাতিক । তার ওপর এত কাছ থেকে ছুঁড়েছে, গুলি না লেগে পারেই না । কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল লোকটা ।

দিন-দুপুরে এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেউ কখনও দেখেনি ।

মাত্র দশ-বারো হাত দূর থেকে গুলি ছুঁড়েছে প্রিয়ব্রত, মানুষ হলে গায়ে না লেগে পারত না । কিন্তু লোকটা কি তাহলে মানুষ নয় ? কোথায় গেল সে ? প্রিয়ব্রতর সারা শরীরটা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায় ।

দূরে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভূত মনে করে ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল ।

বিমানও এসব দেখে এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল বেশ কিছুক্ষণ সে কোনও কথাই বলতে পারল না । তার মনে শুধু তোলপাড় করতে লাগল এটা কি কোনও ভূতুড়ে ব্যাপার, না অলৌকিক কাণ্ড ? চোখের সামনে থেকে একটা মানুষ এভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে কি করে !

ওদিকে স্বপন আর চক্রধারীবাবু তখনও বসে আছে সেই একভাবে। চোখ বড় বড় করে খোলা, পলক পড়ছে না।

প্রিয়ব্রতই প্রথম খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বলল, 'চল বিমান, আমাদের এ-রকম খোলা মাঠের মধ্যে থাকা উচিত নয়! কোনও একটা বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে আমাদের।'

বিমান খানিকটা তোতলাতে তোতলাতে বলল, প্রি-প্রি—প্রিয়দা, ব্যাপারটা কী-কী-কী হল?

প্রিয়ব্রত বলল, 'সে পরে আলোচনা করা যাবে। এখন স্বপনদের তুলতে হবে!'

হঠাৎ আকাশে একটা গুম্ গুম্ শব্দ শোনা গেল। মনে হল অনেকটা দূর দিয়ে যেন একটা জেট প্লেন উড়ে যাচ্ছে।

বিমান দু'পা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এই স্বপন ওঠ্, চক্রধারীবাবু, উঠুন।'

ওরা কোনও সাড়া দিল না। বিমান স্বপনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে দেখল, ওর শরীরটা যেন কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত রিভলবারটা তখনও পকেটে ভরেনি। চারদিক ঘুরে একবার দেখে নিল খুব সাবধানে। সেই লোকটা কোথাও নেই, সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সীতা ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'আমার বাবা....আমার বাবাকে আপনি গুলি করলেন...! বাবা কোথায় গেল? ইনি কে?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'ইনিই তোমার বাবা! তুমি ওঁকে ধর, এক্ষুনি বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।'

সীতা জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে আগে যে ছিল সে কে?—'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সে তোমার বাবার কার্বন কপি!

—'তার মানে?'

—'সব এখন বুঝিয়ে বলার সময় নেই। আগে তোমার বাবাকে টেনে তোল।'

কিন্তু ওরা সবাই মিলে টানাটানি করেও স্বপন আর চক্রধারীবাবুকে তুলতে পারল না। ওরা দু'জনে যেন জড়-ভরত হয়ে গেছে। মুখে কোনও কথা নেই, মানুষ চিনতে পারছে না।

ওদিকে আকাশে গুম-গুম শব্দটা ক্রমেই জোর হচ্ছে। প্রিয়ব্রত মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। তারপর সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল।

সকাল থেকেই আকাশটা ছিল মেঘলা। মেঘ ক্রমেই জমাট বাঁধছিল। হঠাৎ

দেখা গেল, আকাশে ঘন মেঘের পর্দার মাঝখানটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে । ঠিক যেন মেঘ কেটে বেরিয়ে আসছে একটা খুব চওড়া নদী । কিন্তু কী দিয়ে যে মেঘটা ও-রকমভাবে কেটে যাচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না ।

প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বলল, 'আর একটুও সময় নেই বিমান, তুই আর সীতা মিলে স্বপনকে জোর করে টেনে নিয়ে যা । আমি চক্রধারীবাবুকে কাঁধে তুলে নিচ্ছি ।'

কিন্তু সে সুযোগ আর ওরা পেল না । সেই চক্রধারীবাবুর মতন দেখতে লোকটা আবার ফিরে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল ।

এখন আর তাকে 'লোকটা' বলা যায় না । ঠিক যেন একটা স্ফটিকের মূর্তি, তার সারা গা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে ! তার চোখ দুটোর জায়গায় এখন কিছুই নেই । কপাল থেকে বেরিয়ে আসছে একটা তীব্র সবুজ আলোর রেখা ।

প্রিয়ব্রত রিভলবারটা উঁচু করেও গুলি ছুঁড়তে পারল না । তার আগে নিজেই 'সবুজ আলো' 'সবুজ আলো' বলে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল ।

বিমান আর সীতারও সেই অবস্থা । তারাও ওই একই রকম চিৎকার করতে করতে পড়ে গেল মাটিতে । স্ফটিকের মূর্তিটা একটা হাত তুলল স্বপন আর চক্রধারীবাবুর দিকে । অমনি তারা দু'জন মন্ত্রমুগ্ধের মতন উঠে দাঁড়িয়ে এক পা এক পা এগিয়ে গেল তার দিকে ।

মাথার ওপরে জেট প্লেনের মতো সেই শব্দটা এখন সাংঘাতিক জোর হয়ে উঠেছে । কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না ।

পরের মুহূর্তেই সেই মূর্তিটা স্বপন আর চক্রধারীবাবুকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশের বুকে ।

১৩

বিকেলের মধ্যেই গালুডি শহর একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল । দূর দূর জায়গা থেকে লোক ছুটে আসছে । পুলিশের বড় বড় কর্তা, আরও অনেক সরকারি ব্যক্তিও এসেছেন । ঠিক কী যে হয়েছে ব্যাপারটা কেউই সঠিক বলতে পারছে না । ফলে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে চার দিকে ।

মাঠ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় প্রিয়ব্রত, বিমান আর সীতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে । সেখানে তাদের জ্ঞান ফেরার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না ।

দেশ-বিদেশের সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা এল তার পরের দিন । প্রিয়ব্রতদের অজ্ঞান অবস্থার ছবি ছাপা হল অনেক কাগজে । তা দেখে বিমান আর স্বপনের বাবা ছুটে এলেন গালুডিতে ।

তিন দিন পরে প্রথম জ্ঞান ফিরে এল প্রিয়ব্রতর। তারপর বিমান আর সীতার।

বিছানায় উঠে বসেই প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, —'আমার কি হয়েছিল ?'

তখন পুলিশের লোক আর রিপোর্টাররা ছেঁকে ধরল প্রিয়ব্রতকে। সবাই এক সঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। প্রিয়ব্রত একটারও উত্তর দিল না। সে খালি বলতে লাগল, —'আমার কি হয়েছিল, আগে বলুন। আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।'

তারপর এসে পড়ল মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের লোক।

সবাইকে সরিয়ে দিয়ে তারা ওদের তিনজনকে নিয়ে চলে গেল জামশেদপুরে। সেখানে কোনও গোপন জায়গায় ওদের জেরা চলতে লাগল।

পরেরদিন জামশেদপুরে বসেই ওরা খবর পেল যে চক্রধারীবাবু ফিরে এসেছেন। ভোরবেলা তাঁর বাড়ির সামনের মাঠে তাঁকে পাওয়া গেছে অজ্ঞান অবস্থায়। শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। ঠিক যেন ঘুমোচ্ছেন।

তক্ষুনি জামশেদপুর থেকে মিলিটারির গাড়ি চলে গেল। চক্রধারীবাবুকে নিয়ে আসবার জন্য।

স্বপনের বাবা ট্রাঙ্ককল্ করলেন কালকাতায়। তাতে জানলেন যে স্বপনও ফিরে এসেছে। তাকেও অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে ছাতে, সেই দক্ষিণেশ্বরে মামাদের বাড়িতে।

মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের লোক, পুলিশ আর ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেও প্রিয়ব্রতদের কাছ থেকে কোনও খবরই বার করতে পারল না। সত্যিই ওদের কারুর কিছু মনে নেই। এমনকি নিজেদের নামও ওরা ভাল করে মনে করতে পারছে না।

দিনসাতেক বাদে ছেড়ে দেওয়া হ'ল ওদের। ওরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেল।

সীতা বাড়ি ফিরে চক্রধারীবাবুকে দেখেই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। চক্রধারীবাবুও সীতাকে দেখে চিনতে পারলেন না, শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মেয়েটি কে ?'

দু'জনকে শুইয়ে রাখা হল আলাদা দুটো ঘরে।

তিনদিন পরে চক্রধারীবাবু হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, —'বাবা রে-বাবা! আমি কতকাল এ-রকম ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি ? আমার ব্যবসা-পত্তর সব যাবে যে। সীতা, ও মা সীতা। আমার খাবার দিতে বল। আমি আজই ট্রাক নিয়ে বেরুব।'

সীতাও খুব স্বাভাবিকভাবেই এ-ঘরে চলে এসে বলল, 'বাবা, তুমি তো আজ বাজারই কর নি, রান্না হবে কি ?'

ক্রমে সবই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল । মাঝখানে যেন কিছুই ঘটেনি । মাঝের সেই অংশটা ওদের কারুরই একদম মনে নেই । এখন অন্য কেউ এসে চক্রধারীবাবুকে যখন জিজ্ঞেস করে, আপনি যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তারপর কি হয়েছিল ? তখন চক্রধারীবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন । কিংবা কখনও রাগ করে বলে ওঠেন, 'কী বাজে কথা বলছেন ? আমি আবার অদৃশ্য হলুম কবে ! '

ওদিকে কলকাতায় স্বপন, বিমান আর প্রিয়ব্রতও স্বাভাবিক হয়ে উঠল আস্তে আস্তে । সবুজ আলোর কোনও ঘটনাই এখন আর ওদের মনে নেই । স্বপন আর বিমান কলেজ যাওয়া শুরু করে দিয়েছে । প্রথম প্রথম ওদের বন্ধুরা খুব বিরক্ত করত ওদের । খবরের কাগজে সব ঘটনা পড়েছিল তারা । তারা চেপে ধরত স্বপন আর বিমানকে—হ্যাঁরে, স্বপন, তুই সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলি, না কোথাও লুকিয়েছিল ঘাপটি মেরে ? কিরে, বিমান, তুই নাকি চারদিন একটানা ঘুমিয়েছিলি ? গুল দেবার আর জায়গা পাসনি তোরা ?'

স্বপন আর বিমান কোনও কথা বলে না । চুপ করে থাকে ! আর বলবেই বা কী ? সত্যিই তো তাদের কিছু মনে নেই ।

১৪

এর পর কেটে গেছে প্রায় ছ'মাস ।

এর মধ্যে প্রিয়ব্রত বম্বে, গোয়া আর আরও অনেক জায়গায় ঘুরে এসেছে । আগামী মাসেই সে তার লাল জিপটা নিয়ে ইউরোপের দিকে বেরিয়ে পড়বে ঠিক করেছে ।

সেদিন একটা বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্নয় ওদের তিনজনের দেখা হ'ল অনেক দিন পরে । খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে অনেক রাত হয়ে গেল ওদের । তারপর রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটছে তিনজনে, এমন সময় আকাশে একটা গুড় গুড় আওয়াজ হতেই ওরা চমকে তাকাল ওপরের দিকে ।

নাঃ, অন্য কিছু নয় ! লাল-নীল আলো জ্বেলে উড়ে যাচ্ছে একটা সত্যিকারের জেট প্লেন ।

প্রিয়ব্রত হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'সে সব দিনের কথা তোদের কিছু মনে পড়ে না, না রে ?'

বিমান বলল, —'গত কয়েকদিন ধরে আমার যেন ঝাপসা মতন মনে পড়ছে । তবে জেগে স্বপ্ন দেখছি কিনা তাও বুঝতে পারছি না । একটা স্ফটিক

দিয়ে গড়া মূর্তির মতন মানুষ । তার চোখ নেই । কপাল দিয়ে বেরুচ্ছে কী রকম যেন থক্‌থকে সবুজ আলো ।'

স্বপন বলল, 'আরে ! আমিও তো ভাবছিলুম যে ওটা স্বপ্ন । পরশু থেকে বারবার যেন দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে ।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'তা হলে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের তিনজনেরই স্মৃতি ফিরে আসছে এক সঙ্গে । আমার আরও মনে পড়ছে । ঠিক চক্রধারীবাবুর মতন চেহারার একটা নকল লোক এসেছিল । সেই লোকটাকে আমি গুলি করতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল । আবর সে-ই ফিরে এল স্ফটিকের মূর্তি হয়ে ।'

বিমান বলল, 'হ্যাঁ, এ-সবই আমরা নিজের চোখে দেখেছি ঠিকই, তবু কেন যেন বিশ্বাস করতে পারছি না !'

প্রিয়ব্রত বলল, 'চল, সামনের পার্কটায় একটু বসি ।'

স্বপন বলল, 'রাত্তির বেলা খোলা জায়গায় বসলে আজকাল আমার কেমন যেন গা ছম্‌ ছম্‌ করে ।'

—'কেন রে ?'

—'দু'দিন আগেও বুঝতুম না কেন ভয় করে । আজ বুঝতে পারছি । সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে যায় বলে । আবার যদি সে রকম সবুজ আলো দেখি !'

পার্কের বেঞ্চিতে বসে প্রিয়ব্রত বলল 'ভয়ের কি আছে ? আর যাই হোক, যারা ওই সবুজ আলো দেখিয়েছিল, তারা তো আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি । যদিও ইচ্ছে করলেই তারা আমাদের মেরে ফেলতে পারত ।'

বিমান জিজ্ঞেস করল, 'যারা মানে কারা প্রিয়দা ?'

প্রিয়ব্রত বলল, 'জোর দিয়ে কিছু বলা শক্ত । তবে. তোরা এনকাউন্টার অব দ্য থার্ড কাইণ্ড' ফিল্মটা দেখেছিস ? আমার মনে হয় সেরকমই কিছু ব্যাপার ।'

বিমান বলল, 'না ওই ফিল্মটা দেখিনি । কি ছিল তাতে ?' প্রিয়ব্রত বলল, 'অন্য কোনও গ্রহের বুদ্ধিমান্‌ প্রাণী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে । তারা আমাদের শত্রু নয় । কিন্তু তারা তো আমাদের ভাষা জানে না, তাই ঠিকমতো যোগাযোগ করতে পারছে না কিছুতেই । এবারও মনে হয় সেই রকম একটা চেষ্টা করেছিল ।'

বিমান বলল, 'ওই সবুজ আলো দেখলেই আমরা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যেতাম কেন ?'

—'ওরা বোধহয় ওই আলো দিয়েই কথা বলে । কিন্তু আমরা ওই অত কড়া আলো সহ্য করতে পারি না । কিংবা আর একটা ব্যাপারও হতে পারে । ওই আলো দিয়ে ওরা হয়তো আমাদের ছবি তুলে নিয়েছে । ঠিক সাধারণ ছবি নয় । তৈরি

করে নিয়েছে অবিকল আমাদের মতন একটা করে মানুষ । যে রকমভাবে একজন দ্বিতীয় চক্রাধারীবাবুকে আমরা দেখেছিলাম । মনে হয় ওই আলোর মধ্যে এক ধরনের চুম্বকের মতন ব্যাপার আছে, সেই জন্য যে যে ওই আলো দেখেছে, তারা নিজেদের দেখলেই চিনতে পারে !'

স্বপন বলল, 'কিন্তু প্রথম চক্রধারীবাবু তো ঝাড়গ্রামে সেই ডাক্তারের বাড়িতে আমাদের দেখে 'সবুজ আলো' বলে চেঁচিয়ে ওঠেননি ।

—'উনি বয়স্ক লোক, গায়ে আর মনেও জোর বেশি, উনি তখন বোধহয় সেই চুম্বকের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন ।'

বিমান জিজ্ঞেস করল 'আচ্ছা, স্বপন, তুই যখন অদৃশ্য হয়ে গেলি, তখন তোকে নিশ্চয়ই ওরা ওদের রকেটে তুলে নিয়েছিল । তাই না ? সেখানে কি হল রে ?'

স্বপন বলল, 'সে সব কথা একদমই মনে নেই । একেবারে অন্ধকার ।'

প্রিয়ব্রত বলল, 'সেটা ওরা তো স্মৃতি থেকে মুছে দেবেই । ওদের রকেটের ভেতরের ব্যাপার আমাদের জানতে দেবে কেন ?'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ওরা ।

তারপর প্রিয়ব্রত আকাশের দিকে চেয়ে বলল, 'আজ আকাশ কেমন পরিষ্কার । কত গ্রহ-নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে । হয়তো এরই মধ্যে কোনও একটা থেকে এসেছিল ওরা ! হয়তো সেখানে ঠিক আমাদের মতন চেহারার আর একজন করে মানুষ এখন রয়েছে, ওরা তাদের নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে । আর একটা প্রিয়ব্রত, আর একটা বিমান, স্বপন, চক্রধারীবাবু, সীতা ....

বিমান বলল, 'যাই বলো প্রিয়দা, এখন বিশ্বাস হয় না । সবই যেন স্বপ্ন !'

হঠাৎ স্বপন জোরে চেঁচিয়ে উঠল 'প্রিয়দা, ওই দ্যাখ আবার সবুজ আলো, ওই যে পার্কের কোণে—'

প্রিয়ব্রত চমকে সেদিকে তাকিয়ে একটু দেখে নিয়ে বলল, 'দূর বোকা, ওটা তো রাস্তায় ট্রাফিকের সবুজ আলো । এই দ্যাখ, আবার লাল হয়ে গেল । তুই কি আলো দেখলেই ভয় পাচ্ছিস নাকি স্বপন ?'

বিমান হেসে উঠল হো হো করে ।